আশাপূর্ণাদেবীর রচনা সম্ভার

পঞ্চম খণ্ড

আশাপূর্ণা দেবী

জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং
২২/এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯
১৩৬৩

প্রকাশক :
শ্রীগৌরকিশোর রায় মুখোপাধ্যায়
জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং
২২/এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
পরাণ চন্দ্র ঘোষ
পরাণ প্রেস
৯৯/এ, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

সাহিত্যে যিনি দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা লেখার কোন প্রয়োজন নেই। লেখিকার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক, তবে পাঠকের পক্ষে অনাবশ্যক নয়।

উৎকৃষ্ট সাহিত্যকে চিনে নিতে পাঠককে সাহায্য করা সমালোচকের দায়িত্ব। আমরা সাহিত্যে রসের চিরন্তনতার কথা বলে থাকি। সেই চিরন্তনকে সমকালীন সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্য থেকে খুঁজে বের করা সহজ নয়। কারণ সাহিত্যের কাছে আমাদের প্রত্যাশা বিচিত্র। কেউ চান সাহিত্যে সমাজের প্রতিফলন, কেউ চান বিশুদ্ধ আর্ট, কেউ চান নীতি কেউ চান প্রকাশচারুতা। কোনটা দিয়ে সে চিরন্তনতা আসে বলা শক্ত। রামায়ণে সবই আছে সেই জন্যই কি রামায়ণ চিরন্তন সাহিত্য? কিন্তু রামায়ণের সমাজ তো আজ নেই। তেমনি রামায়ণে রামচন্দ্রের ধর্মনিষ্ঠা আজকের পৃথিবীতে শুধু যে দুর্লভ তা নয়, অবাস্তব এমন কি অনুচিত বলেও মনে হতে পারে। সীতা সতীত্বের চিরকালীন আদর্শ বলে জয়ধ্বনিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ল্যাবরেটরি গল্পের সোহিনীর সঙ্গে সীতার দূরত্ব অতিক্রম করা যাবে কোন সংজ্ঞা দিয়ে?

সতীত্বের একটা ধারণা দীর্ঘকাল চলে এসেছে। সতী নারী ছায়েবানুগতাপতিম্। ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে যে-নারী তিল-তুলসী দিয়ে স্বামীর পায়ে আত্মসমর্পণ করেছেন তিনিই সতী। লক্ষ হীরারগল্প তো আমাদের সংস্কৃতিরই সৃষ্টি। স্বামীর পরিতৃপ্তির জন্য সতীই স্বামীকে গণিকাগৃহে নিজেই পৌঁছে দেয়। ভারতীয় কালচারের সৃষ্টি সাবিত্রী-সত্য-বানের কাহিনী, তেমনি সৃষ্টি বেহুলার অসাধ্য সাধন—লক্ষীন্দরকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা। আমরা মানি যত বড়ো সতীই হোক মৃত স্বামীকে সজীব করে তোলা অবাস্তব। কিন্তু কোনো একটা জায়গায় কোনো এক অর্থে বোধহয় আমরা কথাটা বিশ্বাস করতাম। আমাদের সাহিত্যে সংস্কৃতিতে সেই বিশ্বাস ছড়িয়ে আছে। সতীত্বের তপশ্চর্যায় যুগলজীবনে বিচ্ছেদ কখনো ঘটতেই পারে না। সতীত্বের সেই শক্তি আমাদের মুগ্ধ বিস্মিত এবং শ্রদ্ধাশীল করে এসেছে। স্থূল দেহবাস্তবের ক্ষেত্রে এ-শক্তিকে ব্যর্থ বলে যদি মনে হয়, তবে আমরা বাস্তবটাকেই বলে এসেছি অসম্পূর্ণ।

এই আদর্শের মধ্যে যে মহত্ত্ব ছিল, তাই আমাদের অভিভূত করে রেখেছিল অনেক দিন। কিন্তু সে-ভাবটা আজকাল যেন কেটে যাচ্ছে। নানা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। নারী স্বামীর ইচ্ছাতেই আপনাকে সমর্পণ করে দেবে, তার আলাদা কোন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন নেই—এটা একালের মানুষ আর বিশ্বাস করতে চায় না। স্বামীর ন্যায়-অন্যায় কর্মের বিচারও পত্নী করতে পারবে না, কিংবা স্বামীর ইচ্ছা ব্যতিরিক্ত তারও স্বতন্ত্র ইচ্ছার মূল্য থাকবে না বিংশ শতাব্দীর মানুষের সে প্রত্যয় আর নেই।

নারী ও পুরুষ মিলে সমাজের প্রথম বন্ধন। এই বন্ধনের সূত্রে নানা দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য, নীতি। প্রথমে গৃহবন্ধন, পরে সন্তান-সন্ততি পাড়াপ্রতিবেশীদের নিয়ে সমাজ রূপ পেতে থাকে। পরস্পরের প্রতি দায়-দায়িত্ব নিয়ে তৈরী হয় নীতিশাস্ত্র। এর মধ্যে শুধু যে প্রয়োজন আছে তা নয় আর একটা আশ্চর্য জিনিস আছে, বন্ধন রচনায় তার ভূমিকা অসামান্য, তার নাম ভালোবাসা। নারী ও পুরুষ যে জৈব আকর্ষণেই ঘর বাঁধে, এটাই বড়ো কথা নয়। ভালোবাসে বলে ঘর বাঁধে সেটাও কম কথা নয়। এ-কথাটা প্রথমেই উল্লেখ করি নি, তার কারণ আমাদের সমাজে এবং অনেক সমাজেই বিবাহবন্ধন হলে তার পরেই ভালোবাসা অঙ্কুরিত হয়। তারপরে ভালোবাসা হয় অচলপ্রতিষ্ঠ। পুত্রকন্যার ভিতর দিয়ে ভালোবাসা শাখা মেলে দেয়। নারীর ভালোবাসাই সতীত্বের রূপ নেয়। শরৎচন্দ্রের অন্নদাদিদি তার স্বামীকে অনুসরণ করে সমাজ ত্যাগ করে এসেছিল, সে তো শুধু প্রেমহীন সতীত্বে নয়। অন্নদাদিদি প্রেমহীন হলে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিতে পারত কি?

শরৎচন্দ্র উপন্যাসে একটি জটিল প্রশ্নের ইঙ্গিত করেছিলেন। অন্নদাদিদি সতী না অসতী? সতীত্বের প্রশ্নটি রবীন্দ্রনাথও তুলেছিলেন তাঁর ল্যাবরেটরি গল্পে। সোহিণীর সঙ্গে নন্দকিশোরের আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয় নি, অথচ ভালোবাসার টানে নন্দকিশোরের সম্পদটিকে রক্ষা করবার জন্য সোহিণী যে ভ্রষ্টাচারণ করেছিল, তাকে কি সতীত্বের নিদর্শন বলব। এই দুই দৃষ্টান্তেই ভালোবাসা নামক বস্তুটি সতীত্ব নামক সামাজিক নীতির মধ্যে এসে পড়ে সংজ্ঞাকে জটিল করে তুলেছে। এর সুস্পষ্ট সূচনা আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে'। স্বামীর ইচ্ছাকে মেনে না নিয়ে এতদিনকার একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধনটিকে অন্তঃসারশূন্য এবং প্রেমহীন প্রমাণ করে মৃণাল স্বামীগৃহ ত্যাগ করে গেল। সে দিন বাঙালি পাঠক শুধু যে সাহিত্যেই ধাক্কা খেয়েছিল তা নয়, আমাদের সমাজের মূল শক্তিটা যে কোথায় তা নিয়েও ভাবতে শুরু করেছিল। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' বা 'গৃহদাহ' বস্তুত এই প্রশ্নটিকেই নানা দিক থেকে নাড়াচাড়া করে দেখতে চেয়েছে। প্রশ্নটা এই যে ভালোবাসার জন্য সতীত্ব না সতীত্বের জন্য ভালোবাসা। কিরণময়ীতে নারীর ব্যক্তিত্বকে একটা প্রখর রূপ দিয়েছেন। বিবাহ হয়েছে বলেই কি অক্ষম পঙ্গু স্বামীকে ভালোবাসতে হবে। বিবাহের পরিণামে স্বাভাবিক সান্নিধ্যে যদি ভালোবাসা না জন্মে থাকে, তবে অন্ধ সংস্কার বশে সতীত্বের ভাণ করার অর্থ নেই। গৃহদাহে অচলার নারীহৃদয় যদি একই সঙ্গে মহিম ও সুরেশ দু-জনকেই ভালোবেসে থাকে তবে প্রচলিত সংজ্ঞায় অচলারই বা সতীত্ব কেমন করে থাকে। নারী-ব্যক্তিত্বের জাগরণটাই আজকের সমাজের একটা অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্নকে জাগিয়ে তুলেছে।

এ-প্রশ্ন পাশ্চাত্য সাহিত্যে আরো আগেই এসেছিল। ইবসেনের রচনায় এটা তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসার আকারে এসেছে আবার টলস্টয়ের উপন্যাসে এটি নিয়েছে চমৎকার রসের রূপ। কিন্তু য়ুরোপীয় সমাজ আর বাঙালির গার্হস্থ্য সমাজ ঠিক একরকম নয়। য়ুরোপীয় সমাজের

স্বামী-স্ত্রীর পরিবার আর আমাদের পুত্রকন্যা-শাশুড়ী-ননদ-দেওরের পরিবার আলাদা। আমাদের পত্নী আত্মকেন্দ্রিক বিকাশে একই রকম করে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে না। বহু শত বৎসরের সংস্কারের ফলেই হোক, অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্যই হোক, স্বামীর সংসারকে বাদ দিয়ে আমাদের বধূ এখনও যেন উদ্ধত অবিনীত হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু নারী-ব্যক্তিত্ব জেগে উঠেছে. সংসার আছে, দাম্পত্যবন্ধন আছে, পুত্রকন্যা আছে, অথচ সবটাই যেন অভিনয়, কারণ প্রেম নেই, হৃদয় সাড়া দেয় নি। এই নীরস আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব প্রাণহীন সংসারে জাগ্রত নারীসত্তার ট্রাজেডি আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের নিগূঢ় রসের উদ্‌বোধন ঘটিয়েছে।

আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসের কাহিনী একটি মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের বধূ সুবর্ণলতাকে নিয়ে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে মধ্যবিত্ত পরিবারের শাশুড়ী-বউ নিয়ে গল্প অনেক লেখা হয়েছে। সে-গল্পের সঙ্গে এর পার্থক্য অনেকখানি। নম্র বিনীত নিঃশব্দ বধূটিকে নিয়ে শ্বশুরালয়বাসীর সমালোচনা, গার্হস্থ্য রাজনীতি, নানাভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন সেকালের এই শ্রেণীর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। পরিবারের গড়নটা এক থাকলেও আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসের বধূ সুবর্ণলতা আর আগের সেই আত্মলুপ্ত নিরীহ বধূ নয়। তার আদর্শ রুচি আচরণ ভিন্নতর। সংকীর্ণ গৃহবদ্ধতা তার পছন্দ নয়, দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ থাকতে সে চায় নি। রক্ষণশীল গোঁড়া পরিবারে সুবর্ণলতার মতো বধূ স্বভাবতই পদে পদে বাধা পায়। এ-বাড়ির বউদের খোলা বারান্দায় দাঁড়াবার অধিকার নেই, মেয়েদের লেখাপড়া শেখা অকল্পনীয়, রান্নাঘরে দিনের অধিকাংশ কাটিয়ে দিয়ে শাশুড়ী ও স্বামীর সব প্রয়োজন মিটিয়ে নিজের কোনো বাসনার বীজ অঙ্কুরিত হতে দেবার আর সময় থাকে না। এখানে দেওররাও শাশুড়ীর প্রশ্রয়ে বাড়ির বউদের উপর তর্জন গর্জন করে, স্বামী মায়ের অন্ধ নির্দেশে পরিচালিত। বিধাতার মনে কি ছিল, এই রকম একটি পরিবারে এল সুবর্ণলতা যার মা মেয়েকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আলাদা করে। তার মধ্যে দিয়েছিলেন সংস্কার মুক্তির ইঙ্গিত, আদর্শবাদের বীজ, উদার একটি শিক্ষিত মন। সংকীর্ণ গ্রাম্যতা তার সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। তার স্বামী প্রবোধ এই রক্ষণশীল ধারারই ব্যক্তি। তাই স্বামীর সঙ্গে বধূর মনের দিক দিয়ে কোনোই মিল নেই। প্রতি পদে পদে মতভেদ, বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব দিয়ে সুবর্ণলতার সমগ্র কাহিনী।

সুবর্ণলতার সঙ্গে তার স্বামীর মনের অমিল এই উপন্যাসের সমস্যা। এই সমস্যাকে শুধু একটা সামাজিক পরিবর্তনযুগের দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা চলবে না। আধুনিক নারীত্বের মধ্যে যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ ঘটছে, লেখিকা আমাদের বাঙালি সমাজের ফ্রেমে তার ছবি আঁকছেন —এ কথা সত্য। নারী যে নিজের মনটাকে বিশ্ববিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ গৃহধর্মে যান্ত্রিক কর্তব্য পালনের উপকরণে পর্যবসিত রাখতে অনিচ্ছুক সুবর্ণলতার কাহিনী তার দৃষ্টান্ত। তাই এই

কাহিনীতে আধুনিক সমাজ চেতনার প্রতিফলন হয়েছে। বিদেশী সমাজে যেমন নারীজাতি আত্মঅধিকারে সচেতন হতে শুরু করেছে, আমাদের সমাজেও তেমনি নারী জাতির ক্রমজাগরণের লক্ষণ দেখা গিয়েছে নানা ভাবেই। সুবর্ণলতা চরিত্রের পশ্চাৎপটে সেই ইতিহাস আছে। এই শিখাময়ী স্বাতন্ত্র্যসমুজ্জ্বল সুবর্ণলতা জাগ্রত নারীচেতনার প্রতীক। কিন্তু সুবর্ণলতাকে লেখিকা সংস্কারমূলক সামাজিক পরিবর্তনের প্রতীক রূপে আঁকেন নি। এই উপন্যাসে যদি সেটাই মূল বক্তব্য হত, তা হলে উপন্যাস হত নিছক একটা তাত্ত্বিক প্রচারমূলক রচনা। যে-নারীমুক্তির ইতিহাস রচিত হচ্ছিল মানুষের চিন্তাধারায়, সাহিত্যে তারই একটা দৃষ্টান্ত মাত্র পেতাম।

কিন্তু সুবর্ণলতা উপন্যাসে লেখিকা একটি গূঢ় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এ-প্রশ্ন একেবারে মৌলিক, আমাদের বাঙালি সমাজের একটি মূল আদর্শকে যুগের অগ্নি পরীক্ষায় নিয়ে এসেছেন। সুবর্ণলতার মধ্যে অনেক স্বপ্ন ছিল, বাসনা ছিল কিন্তু লেখিকা তাঁকে সমাজ-সেবিকা বা সংস্কার আন্দোলনের নেত্রী করতে চান নি। সে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারেরই বধূ—শুধু একটি মুক্ত উদার শিক্ষিত মন নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে চেয়েছে সংকীর্ণতামুক্ত পরিবেশে, স্বামীকে সে প্রত্যাশা করেছিল তারই নির্মল অভিপ্রায়ের সহযোগী হতে। স্বামীর চরিত্রধর্মে ও তার চরিত্রধর্মে যে বিরোধ ঘটল, এই বিরোধকে লেখিকা একটি পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে আমাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন অতল গভীরে যেখানে স্বামী এবং পত্নীর হৃদয়-বন্ধন জন্মজন্মান্তরের বলে আমাদের শাস্ত্রে, আমাদের বিশ্বাসে এবং ঐতিহ্যে কীর্তিত হয়ে এসেছে। স্বামীর ইচ্ছায় পত্নী যেখানে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়, সেখানেই আমাদের সমাজের চিরকীর্তিত সতীত্বমহিমা। সুবর্ণলতার সঙ্গে তার স্বামীর যে কোনদিনই মনের মিল হল না, অথচ একই সঙ্গে সারাজীবন ঘর করল, বহু সন্তানের জননী হল অবশেষে স্বামীর কাছে থেকেই জীবন থেকে বিদায় নিল—এই ভালোবাসাহীন নিষ্করুণ জীবন যাপন করে সুবর্ণলতা কোন সতীত্বের মহিমা দেখিয়ে গেল ?

লেখিকার শিল্পী হিসাবে কৃতিত্ব এই যে এই প্রশ্ন উত্থাপন করবার জন্য তিনি কোনো অস্বাভাবিক (abnormal) পরিস্থিতির কল্পনা করেন নি। নৈতিক অর্থে প্রবোধ চরিত্রবান ব্যক্তি, সুবর্ণলতার মনের মধ্যে অন্য কোনো পুরুষের প্রতি আসক্তির সুদূর আভাসও নেই। প্রবোধ একটু সন্দেহপরায়ণ বটে, কিন্তু তাতে সুবর্ণলতা কোনো নাটকীয় প্রতিক্রিয়াও কিছু দেখায় নি। সুতরাং প্রচলিত অর্থে প্রবোধ এবং সুবর্ণলতার মধ্যে সতীত্বের সম্পর্কে কোনো বাধা নেই। কিন্তু যখন ব্যক্তিত্বের উদ্ভেদ ঘটছে, চিন্তায় এবং মনোভাবে স্বামীর সঙ্গে যেখানে বিরোধ ঘটছে পদে পদেই অথচ সমগ্র জীবন কাহিনীতে কোথাও দেখা গেল না ভালোবাসার অন্তঃসঞ্চারী ধারা সেখানেও কি এই প্রশ্ন দেখা দেবে না। ইবসেন কি একেই 'পুতুলের সংসার' বলেন নি ? আশাপূর্ণাদেবীর সুবর্ণলতা উপন্যাসটিতে এই জিজ্ঞাসা প্রচ্ছন্ন। একে যদি

যুগজিজ্ঞাসা বলি, সব দেশের চিন্তাজগতেই এই জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে, আজ আর এটা কোনো বিশেষ দেশের বা বিশেষ সমাজের নিজস্ব সমস্যা থাকে নি। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে এই যুগই কেমন চিরন্তন জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে রসরূপ লাভ করে আশাপূর্ণার উপন্যাস তারই একটি মহৎ দৃষ্টান্ত। আমাদের খাঁটি বাঙালি পরিবেশের অভ্যস্ত নিত্য পরিচয়ের মধ্যে দিয়েই লেখিকা একটি গভীর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং যথার্থ শিল্পীর মতোই রমণীয় উত্তর দিয়ে কাহিনী সমাপ্ত করেন নি।

তাই সুবর্ণলতা শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডি। জীবনের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারল না। তার বদ্ধ স্থূল রুচিহীন অন্ধকার ক্ষুদ্রতায় ভরা সংকীর্ণ গৃহকোণ থেকে সুবর্ণলতা বাহিরের স্বপ্নই দেখেই গেল, সেখানে কোনোদিন পৌঁছুতে পারল না। তার জীবনবিধাতার পরিহাসস্বরূপ দুটি প্রতীকী ঘটনার উল্লেখ করা যায়। সুবর্ণলতার ভিতরে ছিল রচনার প্রেরণা। ওই পরিবেশে সেটা অপরাধ সন্দেহ নেই। তবু দুবার বাধা ঠেলেও, দেওর ও পুত্রদের দৃষ্টি এড়িয়ে সে বই ছাপতে গিয়েছিল। এটুকু হত তার মনের মুক্তির একটা পথ। কিন্তু তাও কি হল? অজস্র ছাপার ভুল, বিকৃত বানান শুধু নয়, নিকৃষ্ট কাগজে কুৎসিৎ মুদ্রণে যা বেরিয়ে এল তা বিকলাঙ্গ নবজাতের মতোই জননীর লজ্জা। লেখিকা এখানে পাঠকমনোমোহন একটি ঘটনা তৈরি করতে পারতেন। অন্তত চতুর্দিকের অন্তহীন জড়তা এবং সহানুভূতিহীন পরিবেশে ক্লান্ত সুবর্ণলতাকে সুন্দর শোভন তৃপ্তিকর গ্রন্থ-প্রকাশের সাফল্যটুকু যদি দিতেন যেমন রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় শরৎবাবুকে বলেছিলেন ব্যর্থ প্রেমিকাকে নানা কল্পিত সাফল্যে মণ্ডিত করতে, তবে পাঠক হয়তো একটুও স্বস্তি পেত, কিন্তু তাতে নিয়তির সত্য অস্বীকৃত হত, শিল্পও ক্ষুণ্ন হত।

দ্বিতীয়তঃ সুবর্ণলতা একবার আয়োজন করেছিল প্রতিবেশীদের সঙ্গে তীর্থে যাবে। পুণ্যার্জনের জন্য না হোক, বাহিরের তার স্বপ্নের পৃথিবীতে একবার সে মুক্তি পাবে এটা ছিল তার প্রত্যাশা। কিন্তু স্বামীর অনিচ্ছাকে ঠেলে ফেলে সে যদি যেতেও পারত, কিন্তু স্বামী যে মিথ্যা কলেরার অভিনয় করলেন তখন প্রতিবেশীরাই বাধা দিয়ে সুবর্ণলতাকে নিরস্ত করল। সুবর্ণলতা সবই বুঝল এবং ব্যর্থ হল গৃহকোণ থেকে জীবনে একবার বেরিয়ে আসবার এই সুযোগকে গ্রহণ করতে। ভাগ্য এমনি করে তাকে বঞ্চিত করল।

প্রবোধ কি সুবর্ণলতাকে মনে মনে গভীর ভাবে ভালোবাসে বলেই একবারও কাছছাড়া করতে চায় না? নিগূঢ় ভালোবাসাই কি উভয়ের মধ্যে নিত্য মনোমালিন্যের রূপ নিয়েছে? উপন্যাসের মধ্যে এ রকম ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে নানা তিক্ততা সত্ত্বেও প্রবোধ তার স্ত্রীকে ভালোবাসত। কিন্তু ঠিক এই সূত্র ধরে উপন্যাসের ঘটনার কোনো বিস্তার করা হয়নি। অপর পক্ষে সুবর্ণলতা উপন্যাসের প্রথম অথবা শেষ পর্ব কোনো স্থলেই প্রবোধের প্রতি সুবর্ণলতার কোনো নিগূঢ় প্রেমের ইঙ্গিত নেই। সুবর্ণলতা চরিত্র হিসাবে সেইজন্য আত্ম-

কেন্দ্রিক হয়তো এটাই তার স্বভাবগত ত্রুটি। সে নিজের চিন্তা দিয়েই দেখে, বিচার বিবেচনা তার নিজের। বলা আবশ্যক এটা স্বার্থপরতার কথা নয়। সুবর্ণলতা স্বার্থপর মোটেই নয়। শুধু যে অবস্থাচক্রে তাকে অন্যের প্রতি কর্তব্যে নিরত থাকতে হয়েছে তা নয়, তার চরিত্রে একটি স্বাভাবিক উদারতাবোধ আছে। সুবর্ণলতার ভালোমন্দ ন্যায়-অন্যায়বোধ তার নিজের—শাস্ত্র পুথি বা গুরুজনের নয়।

উপন্যাসের চরিত্রকে ফুটে উঠতে হয় শুধু আত্মঘোষণার দ্বারা নয়, অনেক হৃদয়ের রহস্য মোচন করতে করতে, অবুঝ অন্ধ হৃদয়াবেগের মধ্যে দিয়ে। যে-চরিত্র আপন সংকল্পে অটল তাকেও কোনো না কোনো সময়ে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়; নিজেকেও এক সময়ে নতুন করে চিনে নিতে হয়। সেখানেই উপন্যাসের চরিত্র প্রতীক রূপে না থেকে সহজ জীবন্ত প্রাণময় হয়ে ওঠে। প্রথম পর্বের সুবর্ণলতার চরিত্ররূপের সঙ্গে শেষ পর্বের চরিত্ররূপের এ দিক দিয়েই পার্থক্য ঘটে গিয়েছে, শিল্প সার্থকতর হয়েছে। প্রথম পর্বে সুবর্ণলতাকে প্রতি পদে দেখি আত্মঘোষণামুখর, প্রতি পদেই তার স্বামী শাশুড়ী পরিজনের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ। প্রথম পর্বের দীর্ঘ কাহিনীতে সুবর্ণলতার বয়স বাড়ছে বটে, কিন্তু ঘটনা অগ্রসর হয় নি অর্থাৎ শ্বশুরালয়ের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পাক খেয়ে সুবর্ণলতা বার বার ক্ষিপ্তই হয়ে উঠেছে। মনের গভীরে তেমন কোনো বিদ্যুৎ জ্বলে নি, নতুন কোনো পরিণতি যেন দেখতে পাই না।

কিন্তু শেষ পর্বে সুবর্ণলতাকে দেখি অনেকটা প্রশান্ত গম্ভীর। তার যুদ্ধপ্রবৃত্তি স্তিমিত, বাক্য সংযত। সংসারের প্রতি তার অভিযোগ কি ফুরিয়ে গিয়েছে? সে কি পেয়েছে এই কুশ্রী, সংকীর্ণ রক্ষণশীল, রুচিহীন গ্রাম্য পরিবেশটিকে পরিবর্তিত করতে? তার সারাজীবনের প্রতিবাদ কি কোনো সার্থকতা বহন করে আনতে পেরেছিল? তার নিজের একটা বাড়ি হয়েছে সত্য, কিন্তু এতটুকু বদলাতে পারে নি এই সংসারের মূল্যবোধকে, তার স্বামীকে দেওরকে শাশুড়ীকে। তার সারা জীবনের সীমাহীন ব্যর্থতাকে সে দেখেছে তার নিজের ছেলের মধ্যেই, যে মায়ের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শকে এতটুকুও পায় নি বরং যে রুচিহীন সংকীর্ণতাকে সুবর্ণলতা সবচেয়ে ঘৃণা করে এসেছে এবং অবশেষে আশা করে বসেছিল তার সন্তানকেই সে নিজের মনের মতো মানুষ করে তুলবে, সেই কদর্যতাকেই তার ছেলের মধ্যে ফিরে এসেছে দেখে সে শিউরে উঠেছে। এক মুহূর্তেই সে যেন বুঝতে পেরেছে, তার যেমন অতীত ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি ব্যর্থ তার ভবিষ্যৎ। এই শূন্যতাবোধ সুবর্ণলতার উপসংহার পর্বটিতে একটি গভীরতা এনে দিয়েছে। সুবর্ণলতার বার্ধক্য এল, পুত্রকন্যাদের বিয়ে হল, নাতিনাতনীতে ঘর ভরল, তার বধূজীবনের সেই দিনগুলি কবে কেটে গেল কিন্তু জীবনের প্রতি তার অভিমান কিছুতেই মিটল না। তার ঐশ্বর্য বিত্ত সব থাকলেও জীবনের কাছে যে প্রত্যাশা নিয়ে সুবর্ণলতার যাত্রা শুরু হয়েছিল, সে-প্রত্যাশার পূরণ কোনোদিনই

হল না। তার চরিত্রে অপেক্ষাকৃত প্রশান্ততা এল, আগের মত আর সে তর্ক করে না, ব্যঙ্গ করে না, উত্তেজিত হয়ে নিষ্ফল প্রতিবাদে আর লিপ্ত হয় না। এখানে সুবর্ণলতা চরিত্রে লেখিকা এনে দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা। একটা নির্লিপ্ত বেদনা সুবর্ণলতাকে ঘিরে রয়েছে। আগে সুবর্ণলতাকে পরিবেশের সংকীর্ণতা যতই উগ্র প্রখর করে তুলুক, তাকে বোঝা কিছু শক্ত ছিল না। তার স্বামী বা দেওর ভিন্ন স্তরের রুচি দিয়ে তার সহমর্মী হতে না পারলেও সুবর্ণলতাকে চিনে নেওয়া কখনোই তাদের কঠিন হয়নি। কিন্তু উপসংহার পর্বের সুবর্ণলতাকে তাদের চেনা কঠিন হয়েছে কেননা তার অভিজ্ঞতা তাকে যেমন করেছে মূক, তেমনি করেছে অভিমানী। তাই মৃত্যুশয্যায় স্বামী যখন জানতে চাইলেন কাউকে তার দেখতে ইচ্ছা হয় কিনা, তখন সে এমন একজনকে দেখতে চাইল যে স্বাভাবিক প্রত্যাশার মধ্যে পড়ে না। তার এই জীবনব্যাপী অভিমানকে তার স্বামীও বুঝতে পারলেন না, যিনি একদিনের জন্যও সুবর্ণলতার সান্নিধ্য ছাড়া হন নি।

উপন্যাসটি শেষ করার পর সুবর্ণলতার ট্রাজেডি পাঠককে এক অপরূপ বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দেয়। আর বিস্মিত করে লেখিকার বক্তব্যের গভীরতা। এই উপন্যাসে কোনো নাটকীয় ঘটনা নেই, এমন একটি ঘটনা নেই যা আমাদের নিত্যপরিচিতের মধ্যে নেই। এ-সব কাহিনী এতোই সাধারণ, এতোই ঘরোয়া যে তাই দিয়ে দীর্ঘ উপন্যাসের কাহিনীকে চালিয়ে নিতে কেউ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এমন কি ওই পরিবারের বাইরে একটি নাগরিক জীবন আছে, সেখানে নানা মানুষের ব্যস্ততা, নানা কর্মচঞ্চলতার আলোড়ন। বৃহৎ ওই সমাজ জীবনটি ব্যক্তি জীবনকেও আহত প্রহত করে তোলে। গার্হস্থ্য কাহিনীর পটভূমিতে ওই বৃহৎ সমাজ জীবনের চাঞ্চল্য আশাপূর্ণার উপন্যাসে অনুভব করা যায় না। তাঁর কাহিনী একান্তই পরিবারকেন্দ্রিক। এই পরিবারকেন্দ্রিক তাৎপর্যহীন দৈনন্দিন সংসারযাত্রার ঘটনাকে আশাপূর্ণা উপন্যাসের কাঠামো করে তুলেছেন। সুবর্ণলতার প্লট বলতে কিছু নেই কিন্তু থীম আছে, আর আছে একটি গভীর জীবনবোধ। এটাই আশ্চর্য। এত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এতখানি জিজ্ঞাসা লেখিকা ভরে দিয়েছেন।

আজকাল অনেকেই উপন্যাস ও গল্প দুইই লেখেন। বাংলায় গল্পের ফলন অজস্র এবং তাদের সার্থকতাও অসাধারণ। আশাপূর্ণার মতো প্রতিভাশালিনীও এই দুই দিকেই আপন চিহ্ন উজ্জ্বল করে রেখেছেন। সুতরাং এ-ব্যাপারটায় খুব একটা নতুনত্ব আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু অভিনবত্ব অন্য দিক দিয়ে।

বলা দরকার উপন্যাস লেখার রীতিপদ্ধতি যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে এ-যুগে অনেক বদলে গিয়েছে, গল্প লেখার পদ্ধতিও তেমনি যথেষ্ট বদলে গিয়েছে। আগে উপন্যাস ছিল নাট্যধর্মী—ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মালা রচনা করে গড়ে উঠত উপন্যাস। নাটক তো সংক্ষিপ্ত এবং অত্যন্ত পরিমিত আর্ট। বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে তরু, এমনি একটি রেখাক্রমে নাটকের ঘটনা এগিয়ে যায়। তার একটি পর্যায়ে কার্যকারণের ফাঁক থাকলে প্লট তার সমগ্রতা হারায়। নাটকের এই প্লট-নির্ভরতা উপন্যাসেরও লক্ষণ হয়েছিল। জীবন থেকে সুসংবদ্ধ ঘটনার মালাকে বাছাই করে নিতে হবে। রোজকার নিত্য অভ্যস্ত ঘটনার সেই যোগ্যতা নেই। সেকালের দিনে ইতিহাস অনেক অসাধারণ ঘটনার জোগান দিয়েছে। ইতিহাস না দিলে আধুনিক কাল দিয়েছে কিন্তু তাকে অকিঞ্চিৎকর বর্ণবিরল হলে চলে নি। চোখের বালিতে ইতিহাসের প্লট নেই বটে, কিন্তু ঘটনার কার্যকারণগত যোগ আছে এবং সেই যোগ ভাবগত ব্যঞ্জনায় অসাধারণত্ব অর্জন করে।

উপন্যাসের এই শিল্পরূপটি শরৎচন্দ্র এবং তারো পরবর্তী কালে অব্যাহত হয়ে এসেছে। কিন্তু প্লট যে উপন্যাসে থাকতেই হবে এ-বিশ্বাসও ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যেতে লাগল। শরৎচন্দ্র

নিজে নতুন উপন্যাসরীতির পরীক্ষা করেন নি, রবীন্দ্রনাথ করেছেন। তারাশংকর-পরবর্তী লেখকদের হাতে উপন্যাসের রীতিপদ্ধতি বদলে গিয়েছে। গল্পের ধারাবাহিকতা দিয়ে, উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে পাঠককে ধরে রাখবার চেষ্টাকে মনে হয় শিশুসুলভ। এখন লেখক চান পাঠককে ভাবাতে। বক্তব্যকে পাঠকের মনে ব্যঞ্জিত করতে। উপন্যাসের কাহিনীতে প্রতীকী ঘটনার অবতারণা তার ফল।

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে তার লক্ষণ আছে। সুবর্ণলতার জীবন কাহিনী তিনি বলে গিয়েছেন কিন্তু ঘটনা হিসাবেই কারো কোনো প্রতিক্রিয়া দেখান নি। সুবর্ণলতার জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি তার চরিত্রদ্যোতক, লেখিকার বক্তব্যের আভাস দেয়। সুবর্ণলতার কাহিনী মধ্যবিত্ত ঘরোয়া জীবনের কাহিনী, ইতিহাসে স্মরণীয় নয় কিংবা উপদেশ হিসাবে প্রথাগত বা বরণীয় নয়। তবু যে কন্যাটি সারা জীবন ব্যর্থ বাসনার মর্মদাহ বহন করে শ্বশুরঘর স্বামীর ঘর করে গেল, তার অকিঞ্চিৎকর সাধারণ কাহিনী লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে বক্তব্যের তীব্রতায় অসাধারণ হয়ে উঠেছে। সুবর্ণলতা নিজেই প্রতীকী চরিত্র, যে একটা সামাজিক মূল্যবোধের নিষ্ফল বিদ্রোহে আত্মক্ষয় করে গেল। সুবর্ণলতা দীর্ঘ উপন্যাস। এই উপন্যাসকে বলা যেতে পারে বাঙালি সংসারের সাগা।

উপন্যাস ও ছোট গল্পের আকৃতি-প্রকৃতি আলাদা হয়, সবাই জানেন। কিন্তু আশাপূর্ণার উপন্যাসে গল্পের পার্থক্য তাঁর জাতিগত পার্থক্যের সূচক নয়, লেখিকার উপকরণ ব্যবহার এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যেরও সূচক। আশাপূর্ণার গল্প পড়লে মনে হয় না সুবর্ণলতার দৃষ্টিভঙ্গি বক্তব্য এবং লেখকমানস কোনো দিক দিয়ে এই গল্পগুলি রচনা করেছে। সাধারণদৃষ্ট নিত্যকার ঘরোয়া ঘটনা নিয়ে এই গল্পগুলি লেখা নয়। গল্পগুলিতে এমন সব ঘটনা নেওয়া হয়েছে যা সচরাচর ঘটে না। কোন গল্পে দেখি স্বামীপ্রত্যাগত স্ত্রীর মনে জাগছে সংশয়ের কাঁটা, অসতর্ক মুহূর্তে বন্ধুর সৌজন্য কখনও বন্ধুর সঙ্গে পত্নীর নির্জন ভাবাবেগ বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়—একটা মৃদু দাম্পত্য সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তার ফলে। জমিদার পিনাক পাণি পুত্রশোকে নির্বিকার থেকে মিথ্যা সন্দেহের বশে বিধবা বধূ এবং তার একমাত্র ভাবী বংশধরকে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিলুপ্ত করে দেয়; কখনও দীর্ঘকাল নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে ফিরে পেয়েও অবস্থাগতিকে কলঙ্কের ভয়ে চলে যেতে অক্ষম হওয়াই হৈমন্তীর নিরুপায় নিয়তি, নিরাশ্রয় বিধবা নিরুপমার সম্পূর্ণ অচেনা মাসীর আশ্রয় গ্রহণের মর্মান্তিক ভাগ্য, দীর্ঘকাল পর সুরেশ্বর-চিত্রার সাক্ষাতের নাটকীয় পরিণাম, বৃদ্ধ শ্বশুরকে আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্য পুত্রবধূর স্বামীর মৃত্যু-সংবাদকেও গোপন রাখা—এমন অদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে আশাপূর্ণা দেবীর গল্প। একটি অসাধারণ গল্প 'পাখীর বাসা'। বেচারা শক্তিপদ তার আশ্রয়দাতার কাছে মামার কল্পিত ঐশ্বর্যের বর্ণনা করে নিজের মান বাঁচিয়ে এসেছে, আবার দরিদ্র মামার কাছে আশ্রয়দাতার অর্থবিত্তের বর্ণনা দিয়ে সম্ভ্রম কুড়িয়ে এসেছে। তারপর একদিন পাখীর বাসা কেমন করে ভেঙে গেল, তারই করুণ কাহিনী লেখিকার হাতে অসামান্য মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনায় ভরে উঠেছে।

আশাপূর্ণার গল্প ঘরোয়া বর্ণনা নয়। কিছু অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মানবজীবন এবং মানবচরিত্রের গভীর সংকেত ফুটিয়ে তুলতে তিনি ফরাসী লেখকদের সমতুল্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 'Life's little ironies.' যেমন আমাদের বাঙালি জীবনেও নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, তেমনি দুর্জ্ঞেয় মানবমনের বিচিত্র গতিও নানা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। আশাপূর্ণা ছোটগল্পে পরিচয় দিয়েছেন সেই গভীর জীবনদৃষ্টির যা একেবারে অস্তিত্বের রহস্য সূত্রে বাঁধা।

ভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্রভবন
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

আশাপূর্ণা দেবী

সুবর্ণলতা

(শেষ পর্ব)

॥ এক ॥

তারপর দিন গড়িয়ে যাচ্ছে।

অনেকগুলো বর্ষা, বসন্ত, শীত, গ্রীষ্মের আসা যাওয়ার সূত্র ধরে মানুষের চেহারাগুলোর পরিবর্তন ঘটেছে।

চেহারা ?

তা শুধু চেহারাই।

স্বভাব নামক বস্তুটার তো মৃত্যু নেই। ও নাকি মৃত্যুর ওপার পর্যন্ত ধাওয়া করে নিজের খাজনা আদায় করে নেয়।

তাই কাঁচা চুলে পাক ধরে, চোখ কান দাঁত আপন আপন ডিউটি সেরে বিদায় নিতে তৎপর হয়, শুধু স্বভাব তার আপন চেয়ারে বসে কাজ করে চলে।

দিন আর রাত্রির অজস্র আনাগোনায় অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, কেটে গেছে অনেক বিষণ্ণ প্রহর, অনেক দুঃসহ দণ্ড আর পল। সেদিন যারা জীবন নাটকের খাতাখানা খুলে ধরে মঞ্চে ঘোরাফেরা করছিল, অনেক অঙ্ক, অনেক গর্ভাঙ্ক পার হয়ে গেল তারা।

'স্বদেশী' নামের যে দুরন্ত ক্ষ্যাপামিটা তছনছ করে বেড়াচ্ছিল শৃঙ্খলা আর শৃঙ্খল, সেই ক্ষ্যাপামিটা যেন নিজেরাই তছনছ হয়ে গেল। গুলির বারুদে, ফাঁসির দড়িতে, অন্তহীন কারাগারের অন্ধকারে। হারিয়ে গেল অন্য শাসনের আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়ে, চালান হয়ে গেল কালাপানি পারের 'পুলি-পোলাও' নামের মজাদার দেশে!···শুরু হলো পাকা মাথার পাকামি। আলাপ আর আলোচনা, আবেদন আর নিবেদন। এই পথে আসবে স্বাধীনতা।

এঁরা বিজ্ঞ, এঁরা পণ্ডিত, এঁরা বুদ্ধিমান।

এঁরা ক্ষ্যাপার দলের ক্ষ্যাপা নন।

অনেক ক্ষ্যাপার মধ্যে একটা ক্ষ্যাপা অম্বিকা নামের সেই ছেলেটা নাকি কোথাকার কোন্ গারদে পচছে, কিন্তু তার জন্যে পৃথিবীর কোথাও কিছুই কি আটকে থাকলো ?

নাঃ, আটকে থাকলো না কিছুই!

শুধু অবহেলা আর অসতর্কতার অবসরে হারিয়ে গেল সুবর্ণলতার জীবনের অনেকগুলো অধ্যায়। ছড়ানো ছেঁড়া পৃষ্ঠাগুলো বার বার উল্টেপাল্টেও কোথাও সেই ইতিবৃত্তের সূত্রটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যেখানে সুবর্ণলতার 'ঘরভাঙা'র বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

অথচ দেখা যাচ্ছে, সুবর্ণলতা ঘর ভেঙে বেরিয়ে এসে আবার ঘর গড়েছে।

কিন্তু অধ্যায়গুলোতে কি নতুনত্ব ছিল কিছু ? চাঁপার পর চন্ননের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল,

উল্লেখযোগ্য শুধু এইটুকুই। কারণ মানুষের ইতিহাসের বিশেষ তিনটি ঘটনার মধ্যে ওটা নাকি অন্যতম।

তা শুধু ঐ চন্ননের বিয়ে!

তা ছাড়া আর কি?

সুবর্ণলতার বাকি ছেলেগুলোর গায়ের জামার মাপ বাড়তে বাড়তে প্রমাণ সাইজে গিয়ে ঠেকেছিল, এটাও যদি খবর হয় তো খবর। অথবা মুক্তকেশীর ছেলেদের চুলে পাক ধরেছিল, মুক্তকেশীর কোমরটা ভেঙে ধনুক হয়ে যাচ্ছিল, আর মুক্তকেশীর বৌরা আর শাশুড়ীর দরজায় গিয়ে 'মা, আজ কি কুটনো কুটবো?' এই গুরুতর প্রশ্নটা করতে মাঝে-মাঝেই ভুলে যাচ্ছিল—এসবকেও খবরের দলে ফেলতে চাইলে ছিল খবর!

কিন্তু সবচেয়ে বড় খবর তো 'স্বভাব' নামক জিনিসটা নাকি মরে গেলেও বদলায় না। তাই বাকি ঘটনাগুলোর ছাঁচ খুব বেশি বদলেছিল বলে মনে হয় না।

হয়তো সুবর্ণলতা তেমনিই অবিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক সব ঘটনা ঘটাচ্ছিল, হয়তো মুক্তকেশীর মেজ ছেলে তেমনিই সর্বসমক্ষে একবার করে তেড়ে উঠে বৌকে শাসন করছিল, আর একবার করে আড়ালে গিয়ে নাক-কান মলছিল, আর পায়ে ধরছিল।...

হয়তো সুবর্ণলতা সেই ঘৃণায় আর ধিক্কারে আবারও ভাবতে বসছিল কোন্‌টা সহজ? কোনটা বেশি কার্যকরী? বিষ না দড়ি? আগুন না জল? আর শেষ পর্যন্ত কোনোটাই সহজ নয় দেখে রান্নাঘরে নেমে গিয়ে বলছিল, 'বামুনদি, আমায় আগে চারটি দিয়ে দাও তো! শুয়ে পড়ি গিয়ে!'

আর কি হবে?

দর্জিপাড়ার ঐ গলিটার মধ্যে আর কোন্ স্বাদের বাতাস এসে ঢুকবে? আর কোন্ বৈচিত্র্যের বাণী উচ্চারিত হবে?

তবে বৈচিত্র্যের কথা যদি বলতে হয় তো বলা যায়—মুক্তকেশীর বড়জামাই কেদারনাথ মুক্তকেশীর মুখরক্ষার চিন্তা না করেই দেহরক্ষা করেছেন, আর পেটরোগা সুশীলা হঠাৎ আলোচাল মটরডাল বাটার খপ্পরে পড়ে গিয়ে রক্ত-অতিসারে ভুগছেন। আর বৈচিত্র্য—উনিশ বছরের মল্লিকা বিধবা হয়ে এসে ঠাকুরমার হেঁসেলে ভর্তি হয়ে ইস্তক শুদ্ধাচারের বহর বাড়াতে বাড়াতে হাতেপায়ে হাজা ধরিয়ে বসেছে।

মুক্তকেশী আক্ষেপ করে বলেন, 'মনে করেছিলাম পোড়াকপালী সর্বখাকী এসে তবু আমার একটু সুসার হলো, আমার হাত-নুড়কুৎ হবে, আমাকে এক ঘটি জল দেবে। তা নয়, আমি এই তিনঠেঙে বুড়ী ঐ দস্যির ভাত রেঁধে মরছি!'

বড় দুঃখেই বলেন অবশ্য।

বৌদের 'পিত্যেশ' জীবনে কখনো করেন নি, এখনও চান যে অহঙ্কারের মাথায় নিজের ভাত নিজে ফুটিয়ে খেতে খেতে চলে যাবেন, কিন্তু কোমরটা বড়ই বাদ সাধছে।

এখন টের পাচ্ছেন কেন বলে, 'কোমরের বল আসল বল!'

মল্লিকাটার কপাল পোড়ায় নিজের কপাল ছেঁচেছিলেন সত্যি, তবু ভেবেছিলেন, এ তো পরের মেয়ে নয়, ঘরের মেয়ে, এর কাছে একটু পিত্যেশ করলে অহঙ্কারটা খব হবে না। তা উল্টো বিপরীত। তার ভাত নিয়েই ডেকে ডেকে মরতে হয়, স্নান আর শেষ হয় না তার।

তা ছাড়া বৌরাই বা কে কোথায়?

সেই বাঁধানো সংসার তো আর নেই এখন! বড়বৌয়ের শরীর ভেঙেছে, মন ভেঙেছে, মেজবৌ বরের পয়সার দেমাকে এ বাড়ির ভাগ ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বাড়ি হাঁকড়েছেন। সেজ, ছোট, দুই বৌ একই রান্নাঘরে ভিন্ন হাঁড়ি।...মুক্তকেশী এখন ভাগের মা।

তবু মেজটারই চোখের চামড়া আছে, দূরে থেকেও মুক্তকেশীর ব্যয়ভার বহন করে সে, সময় অসময়ে দেখে, মুক্তকেশীর ইচ্ছেপূরণের খাতে যা খরচাপত্র হয় দায় পোহায়।

সুবোধের সামান্য ক'টি টাকা পেনসন, করবেই বা কি? আর দুটো তো কঞ্জুসের একশেষ।...নিজের সেই জমজমাট সংসার আর দাপটের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে নিঃশ্বাস পড়ে মুক্তকেশীর...নিতান্ত রাগের সময় ঘরে বসে আঙুল মটকানো আর গাল দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। এমন কি গলাটা সুদ্ধ বাদ সেধেছে, চেঁচিয়ে কাউকে বকতে গেলেই কাশতে কাশতে দম আটকে আসে।...মুক্তকেশী অতএব আঙুল মটকান, আর ভাঙাগলায় থেমে থেমে বলেন, 'মরছেন সব চক্ষুছরদের অহঙ্কারে মরছেন! আমিও মুক্তকেশী বামনী, এই বাসিমুখে বলে যাচ্ছি, যে দুগ্‌গতি আমার হচ্ছে, সে দুগ্‌গতি তোদেরও হোক।'

কিন্তু সেই 'ওরা' কারা?

শুধু কি মুক্তকেশীর বৌ ক'টা?

তা বললে অবিচার করা হবে। মুক্তকেশী অত একচোখো নন। মুক্তকেশী তাঁর নিজের মেয়েকেও বলেন। বিরাজ যখন বেড়াতে এসে ভাই-ভাজদের কাছে সারাক্ষণ কাটিয়ে চলে যাবার সময় একবার এ-ঘরে এসে ঢোকে, 'মা কেমন আছ গো?' তখন মুক্তকেশী ভারীমুখে বলেন, 'খুব হয়েছে! আর মা'র সোহাগে কাজ নেই বাছা। যাদের চক্ষুছরদ আছে, তাদের কাছেই বোসো গে!'

আর চলে গেলে, বিড় বিড় করেন।

কিন্তু সে তো শেষের দিকে।

সুবর্ণ যখন ঘর ভাঙলো তখন কি মুক্তকেশীর কোমর ভেঙেছিল?

নাঃ, তখনও মুক্তকেশীর কোমর ভাঙে নি!

তখনও মুক্তকেশী কিছুটা শক্ত ছিলেন।

তখন মুক্তকেশীর শাপ-শাপান্তের গলা আকাশে উঠেছে। তখন মুক্তকেশী বৌ 'ভেন্ন' হয়ে যাওয়ায় বুক চাপড়েছেন, নেচে বেড়িয়েছেন, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, 'আবার মাথা হেঁট করে ফিরে আসতে হবে! থোঁতামুখ ভোঁতা হবে!'

হবেই।

কারণ ভেন্ন হয়ে বুঝবে কত ধানে কত চাল। এখন পাঁচজনের ওপর দিয়ে সংসারের দায় উদ্ধার হচ্ছে।

কিন্তু মুক্তকেশীর সে বাণী' সফল হয়নি।

সুবর্ণ ফিরে আসেনি।

সুবর্ণ সেই 'ভাড়াটে বাড়ি' থেকে 'নিজের বাড়ি'তে উঠে গিয়েছিল।

এজমালি এই বাড়িটার নিজের অংশের ঘরখানা চাবিবন্ধ করে রেখে যায়নি সুবর্ণ, তার জন্যে টাকাও চায়নি। এমন কি ধীরে ধীরে যে দু-চারটে আসবাবপত্র জমে উঠেছিল 'কাঁচা-পয়সা'গুলো প্রবোধের, সে-সবেরও কিছু নিয়ে যায়নি।

নিয়ে যায়নি নিজের বাসনপত্র।

শুধু পরবার কাপড়-চোপড় আর শোবার বিছানা এই সম্বল করে বেরিয়ে পড়েছিল এই গলি থেকে। একদা যে গলিতে ঢুকে মর্মান্তিক রকমের ঠকেছিল সুবর্ণ। নতুন চুনের আর নতুন রঙের কাঁচা গন্ধে ভরা একখানা বাড়ির গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়িয়েছিল দক্ষিণের বারান্দা খুঁজতে।

অবশেষে দক্ষিণের বারান্দা হলো সুবর্ণলতার! বড় রাস্তার ধারে!

সবুজ রেলিং-ঘেরা, লাল পালিশ-করা মেঝে, চওড়া বারান্দা।

সেই বারান্দার কোলে টানা লম্বা বড় ঘর।

পুবে জানালা, দক্ষিণে দরজা।

ঐ পুবটাকে আচ্ছন্ন করে কোনো বাড়ি ওঠেনি। খোলা একখানা মাঠ পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে ভোরবেলায় সূর্য-ওঠা দেখতে পাওয়া যায়।

আর কি তবে চাইবার রইল সুবর্ণলতার?

আর কি রইল অসন্তোষ করবার? অভিযোগ করবার? উত্তাল হবার? বিষণ্ণ হবার?

সুখী, সন্তুষ্ট, সব আশা মিটে যাওয়ায় 'সম্পূর্ণ' আর পরিতৃপ্ত সুবর্ণলতার জীবনকাহিনীতে তবে এবার 'পূর্ণচ্ছেদ' টেনে দেওয়া যায়।

এরপর আর কি?

বাঙালী গেরস্তঘরের একটা মেয়ে এর বেশি আর কি আশা করতে পারে? আর কোন্ প্রাপ্যের স্বপ্ন দেখতে পারে?

চরম সার্থকতা আর পরম সুখের মধ্যে বসে একটির পর একটি ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ আনা, আর বাকি মেয়ে দুটোকে পার করা। এই তো!

তা তাতেই বা কোথায় ঠেক খেতে হবে?

তিনটে ছেলে তো মানুষ হয়ে উঠলই, ছোটটাও হবে নিশ্চিত। লেখাপড়ায় রীতিমত ভালো। শেষের দিকের মেয়ে দুটো পারুল আর বকুল, দেখতে-শুনতে তো দিব্বি সুন্দরী, কাজেই ওদের নিয়ে ঝামেলা নেই। যে দেখবে পছন্দ করবে। 'পণে'র টাকা দিতেও পিছপা হবে না প্রবোধ।

টাকা সে রোজগারও যেমন করে অগাধ, খরচেও তেমনি অকাতর এখনো। হয়তো এ নেশা ধরিয়ে দিয়েছে সুবর্ণই। খরচের নেশা!...কিন্তু হয়েছে নেশা।

অতএব?

অতএব সুবর্ণলতাকে নিয়ে লেখার আর কিছু নেই।

গৃহপ্রবেশের সময় কিছু হয়নি, তাই তার কাছাকাছি সময়ে এই উপলক্ষটা নিয়ে লোকজন খাইয়েছিল প্রবোধ।

কিন্তু এ ঘটনার মধ্যে সে প্রশ্নের উত্তর কোথা?

এ তো রীতিমত সুখাবহ ঘটনা!

তবে সুবর্ণলতার রীতি অনুযায়ী হয়তো দুঃখের। ওর তো সবই বিপরীত। যারা ওকে নিয়ে ঘর করেছে, আর জ্বলেপুড়ে মরেছে তারা সবাই বলেছে, 'বিপরীত! সব বিপরীত! বিপরীত বুদ্ধি, বিপরীত চিন্তা, বিপরীত আচার-আচরণ!'

অতএব ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করেই দেখা যাক।

প্রথমে নাকি প্রস্তাবটা তুলেছিল প্রবোধই! আর সেই প্রথমে নাকি সুবর্ণলতা বলেছিল, 'গুরু-মন্ত্রতন্ত্র নিচ্ছি না এখন। যদি কখনো তেমন ইচ্ছা হয়, যদি কাউকে এমন দেখি মাথা আপনি নত হতে চাইছে "গুরু" বলে, তখন দেখা যাবে।'

আলাদা হয়ে আসার পর কিছুটা দিন চক্ষুলজ্জায় 'ও-বাড়ি' যেতে পারেনি প্রবোধ, কিন্তু সুবর্ণলতার প্ররোচনাতেই যেতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। মায়ের 'হাত-খরচ' বলে মাসিক পঁচিশ টাকা করে দিয়ে পাঠিয়েছে সুবর্ণ একরকম জোর করে।

প্রবোধ বলেছে, 'অত ধাষ্টামো করতে আমি পারবো না। ও টাকা মা পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।'

সুবর্ণ বলেছিল, 'একবার ফেলে দেন, তুমি বার বার পায়ে ধরে নিইয়ে ছাড়বে। মায়ের পায়ে ধরায় তো লজ্জাও নেই, অমান্যিও নেই!'

তা শেষ পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।

যদিও ছোট ভাইরা বাঁকা হাসি হেসে 'তুমি যে হঠাৎ?' বলে উত্তরটা না নিয়েই চলে

গিয়েছিল, এবং সুবোধ গম্ভীর-গম্ভীর বিষন্ন-বিষন্ন মুখে বলেছিল, 'ভাল আছ তো? ছেলেপুলে সব ভালো?' আর বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো আশপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল, কথা বলে নি, আর মুক্তকেশী দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন, তথাপি টাকাটার সদ্‌গতি হয়েছিল।

পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেননি মুক্তকেশী। শুধু ভারী মুখে বলেছিলেন, 'তুমি যখন লজ্জার মাথা খেয়ে আগ্রহ করে দিতে এসেছ, তখন আর তোমার মুখটা ছোট করবো না। দিচ্ছ, রাখছি। তবে কেন আর ছেঁড়াচুলে খোঁপা বাঁধার চেষ্টা? তুমি তো সব সম্পর্ক তুলেই দিয়েছ!'

উঁচানো খাঁড়া ঘাড়ে পড়েনি। ঐ পর্যন্তই হয়েছে।

তা সেদিনের সেই নিশ্চিন্ততার পর থেকে প্রবোধ নিত্য ওপাড়ার যাত্রী। ওপাড়ার তাসের আড্ডাও 'প্রবোধহীন' হচ্ছে না।

আর মজা এই—বাড়িতে থাকাকালে দিনান্তে মায়ের সঙ্গে যতটুকু গল্প হতো, মায়ের কাছে যতটুকু বসা হতো, তার 'চতুর্গুণ' হচ্ছে এখন। আর সেই অবসরেই মুক্তকেশী তাঁর অন্য ছেলে-বৌদের সমালোচনা করে করে মনের ভার মুক্ত হয়ে একদিন ঐ গুরুমন্ত্রের কথা তুলেছিলেন।

ওটা না হলে তো আর 'হাতের জল' শুদ্ধ হবে না; এতখানি বয়েস হলো, অদীক্ষিত শরীর নিয়ে থাকা! ছিঃ!

তা ছাড়া মরণের তো ধরন ঠিক করা নেই। কাজেই হঠাৎ একদিন যদি দেহই রক্ষা করে বসে সুবর্ণলতা, তো সেই অদীক্ষিত দেহের গতি হবে?

সুবর্ণলতা বরের মুখে শুনে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'গতিটা কি দেহের? না আত্মার? তোমাদের ঐ কুলগুরুর বংশধর বলেই যে গাঁজাখোর শুঁটকো ছেলেটাকে গুরু বলে পা-পুজো করতে বসবো, সে আমার দ্বারা হবে না।'

এ কথা শুনলে, ঘরে পরে কে না ছি-ছিকার করবে সুবর্ণলতাকে? করেছিল তাই!

বলেছিল, 'এসব হচ্ছে টাকার গরম!'

এমন কি যার টাকার উত্তাপে এত গরম সুবর্ণলতার, সেই প্রবোধই বলেছিল, 'দুটো টাকা হয়েছে বলেই তার গরমে ধরাকে সরা দেখো না মেজবৌ! সেই যে মা বলে, "ভগবান বলে—দেব ধন, দেখবো মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ?" সেটাই হচ্ছে সার কথা। ভগবান মানুষকে দেন, দিয়ে পরীক্ষা করেন।'

সুবর্ণলতা হেসে ফেলেছিল।

'তোমার মুখে ভগবানের বাণী! এ যেন ভূতের মুখে রামনামের মত। কিন্তু কি করবো বল? যাকে গুরু বলে মন সায় না মানে—'

প্রবোধ রেগে উঠে বলেছিল, 'তা তোমার গুরু হতে হলে তো মাইকেল, নবীন সেন,

বঙ্কিমচন্দ্র কি রবিঠাকুরকে ধরতে হয়! তাঁরা আসবেন তোমার দেহশুদ্ধির ভার নিতে? দীক্ষাহীন দেহের হাতের জল শুদ্ধ হয় না, তা জানো?'

'এই কথা!'

কেন কে জানে, 'এই কথা!' বলে সুবর্ণ যেন একটু মাত্রা-ছাড়া হাসি হেসেছিল। তারপর হাসির চোখমুখ সামলে বলেছিল, 'শুধু দেহ? তার জন্যে এত দুশ্চিন্তা? তা নেব তাহলে "মন্তর"! ঐ তোমাদের গেঁজেল গুরুপুত্তুরের কাছেই নেব। দেহটার মালিক যখন তুমি, তখন তোমার মনের মতন কাজই হোক।'

প্রবোধ অবশ্য ঐ হাসি আর কথার মানেটা খুব একটা হৃদয়ঙ্গম করেনি, তবে চেষ্টাও করেনি হৃদয়ঙ্গম করতে। বোঝা যাচ্ছে রাজী হয়ে গেছে, আর ভয় নেই।

কারণ একবার যখন কথা দিয়েছেন মেজগিন্নী, আর সে কথার নড়চড় হবে না। এই বেলা লাগিয়ে দেওয়া যাক!

অতএব—

অতএব গুরুমন্ত্রে দীক্ষা হলো সুবর্ণলতার। এ উপলক্ষে সমারোহের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। বিস্তর খরচ করে ফেললো প্রবোধ, বিস্তর গুরুদক্ষিণা দিলো। বললো, 'এতটা কাল ধরে এত রোজগার করছি, সে রোজগারে ভূতভোজন ছাড়া কখনো সৎকাজ হয়নি। এ তবু একটা সৎকাজ, একটা মহৎ কাজে লাগলো।'

মুক্তকেশীই এসে "যজ্ঞে"র হাল ধরেছিলেন। যজ্ঞশেষে হৃষ্টচিত্তে সকলকে বলে বেড়াতে লাগলেন, 'জানি, আমার "পেবো" যা করণ কারণ করবে, মানুষের মতনই করবে! মেজ-বৌমারও স্বভাবটাই ক্ষ্যাপাটে, নজর উঁচু! আর চিরকালের ভক্তিমতী! দেখেছি তো বরাবর, গো-ব্রাহ্মণ, গুরু-পুরুত, কালীগঙ্গা, যখন যাতে খরচ করেছি, সব খরচ মেজবৌমাই যুগিয়েছে। যেচে যেচে সেধে সেধে। তা ভগবানও তেমনি বাড়বাড়ন্ত বাড়াচ্ছেন। মনের গুণে ধন!'

মেয়েদের বিয়ের সময় যখন ঐ পোবোই একটু খরচপত্তর বেশি করে ফেলেছিল, মুক্তকেশী 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' করেছিলেন। বলেছিলেন, 'চাল-চালিয়াতি দেখানো এসব!'

কিন্তু এখন অন্য কথা বললেন।

এখন কি তাঁর সেই একদার ভবিষ্যৎবাণীর পরাজয়ে লজ্জিত হয়েছেন মুক্তকেশী? নাকি ছেলের এই বাড়িঘর, ঐশ্বর্য, বিভূতি, সব দেখে অভিভূত হচ্ছেন?

তাই মুক্তকেশীর মুখ দিয়ে বেরোয়, 'কী খাসা ভাঁড়ার ঘর মেজবৌমার, দেখলে প্রাণ জুড়োয়!'

পেবো অবশ্য অনেকবার চুপি চুপি অনুরোধ জানিয়েছিল মাকে, এই থাকাতেই থেকে যেতে।

সুবর্ণলতাও তার স্বভাবগত উদারতায় বলে ফেলেছিল সে কথা।—'তা বেশ তো—এখানেই কেন থাকুন না! এটাও তো আপনারই বাড়ি।'

কিন্তু কেন কে জানে, মুক্তকেশী রাজী হননি।

মুক্তকেশী 'যজ্ঞি' তুলে দিয়েই চলে গিয়েছিলেন।

আর কখনো সেকথা নিয়ে কথা ওঠেনি।

শুধু সুবর্ণলতার বড় মেয়ে চাঁপা, যে নাকি এই উপলক্ষে এসেছিল, সে বলেছিল, 'ঢের ঢের বেহায়া মেয়েমানুষ দেখেছি বাবা, আমার মা'টির মতন এমন বেহায়া দুটি দেখিনি! আবার সাহস হলো ঠাকুমাকে এখানে থাকার কথা বলতে?'

কিন্তু সেটা একটা ধর্তব্য কথা নাকি?

চাঁপা তো চিরটা কালই তার মায়ের সমালোচনা করে। ওটা কিছু নয়।

তবে? তবে দুঃখটা কোথায়?

তবে কি সেই পারুর স্কুলে ভর্তি করার কথাটাতেই?

তা হতেও বা পারে!

চিরকালই তো তিলকে তাল করা সুবর্ণলতার স্বভাব।

॥ দুই ॥

'পারু বকুকে ইস্কুলে ভর্তি করার কি হলো? কতদিন ধরে বলছি যে—'

ভানুর কাছে এসে আবেদন জানিয়েছিল সুবর্ণলতা। বড় ছেলে, তার ওপর আস্থা এনেছিল। বলেছিল, 'তোদের বাপের দ্বারা তো হবে না, তোরা বড় হয়েছিস, তোরা নিবি ভার।'

ভানু 'আজ-কাল' করে এড়াচ্ছিল। একদিন ভুরু কোঁচকালো। ঠিক ওর সেজকাকা যেমন ভঙ্গীতে ভুরু কোঁচকায়।

ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'পারুকে এখনো ইস্কুলে ভর্তি করার সাধ তোমার? আশ্চর্য মা! অত বড় ধিঙ্গী মেয়ে ইস্কুলে যাবে?'

'যাবে।'

স্থির স্বরে বলেছিল সুবর্ণলতা।

ভানু তথাপি কথা কেটেছিল, 'গিয়ে তো ভর্তি হতে হবে সেই ক্ষুদে ক্ষুদে মেয়েদের সঙ্গে! লজ্জা করবে না?'

সুবর্ণলতা একবার ছেলের ঐ বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি হেনে বলেছিল 'লজ্জা তো ওর করবার কথা নয় বাবা, লজ্জা করবার কথা ওর বাপ-ভাইয়ের!

কিন্তু একের অপরাধের লজ্জা অপরকে বইতে হয়, এই হচ্ছে আমাদের দেশের রীতি। তাই হয়তো করবে লজ্জা। কিন্তু উপায় কি? একেবারে ঘরে বসে থাকলে তো সে লজ্জা আরো বেড়েই চলবে।'

ভানু যে মাকে ভয় করে না তা নয়।

ভিতরে ভিতরে যথেষ্টই করে।

কিন্তু অতটা ভয় করে বলেই হয়তো বাইরে 'নির্ভয়'এর ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে। তাই অগ্রাহ্যভরে বলে, 'লজ্জার কি আছে? দিদি, চন্নন, ও-বাড়ির সব মেয়েরা, সবাই লজ্জায় একেবারে মরে আছে! আর এই বুড়োবয়সে তোমার পারুলের ইস্কুলে ভর্তি হয়ে হবেটা কি? রাতদিন তো নাটক নভেল গেলা হচ্ছে মেয়ের, আবার শুনি পদ্য লেখেন, আর দরকার?'

সুবর্ণলতা আজকাল অনেক আত্মস্থ হয়েছে বৈকি। অনেক নিরুত্তাপ। তাই ফেটে না পড়ে সেই নিরুত্তাপ গলায় বলে, 'মনের অন্য কোনো খোরাক নেই বলেই নাটক-নভেল পড়ে। লেখাপড়ার চাপ থাকলে করবে না। যাক্, তুমি পারবে কিনা সেটাই বল!'

'পারা না-পারার কথা হচ্ছে না', ভানু বিরক্ত গলায় বলে, 'এরকম বিশ্রী কাজ করতে যে কী মুশকিল লাগে সে ধারণা নেই তোমাদের। তোমরা স্রেফ হুকুম করেই খালাস। তাল-গাছের মত এক মেয়ে নিয়ে ভর্তি করাতে যেতে হবে প্রাইমারী স্কুলে! মাথাটা কাটা যাবে না?'

সুবর্ণলতার বড় সাধ ছিল যে তার ছেলেরা বাড়ির ঐ অকালবৃদ্ধ কর্তাদের ভাষা থেকে অন্য কোনো পৃথক ভাষায় কথা বলবে। যে কথার ভাষা হবে মার্জিত, সভ্য, সুন্দর। যাতে থাকবে তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্য, কৈশোরের মাধুর্য, শৈশবের লাবণ্য।

সুবর্ণর সে সাধ মেটেনি।

পাগলের সব সাধ মেটাও শক্ত বৈকি।

তা ছাড়া কথা শেখার সমস্ত বয়েসটা পার করে ফেলে তবে তো ঐ অকালবৃদ্ধদের আবেষ্টন ছেড়ে আসতে পেরেছে সুবর্ণলতার ছেলেরা!

তা ছাড়া একখানি বড় রকমের 'আদর্শ' তো চোখের সামনেই আছে!

তাই ভানু কর্তাদের ভাষাতেই কথা বলে।

বলে, 'মাথাটা কাটা যাবে না?'

সুবর্ণলতা ঐ মাথা কাটার কথাটা নিয়ে আর কথা-কাটাকাটি করে না। সুবর্ণলতা শুধু ঠোঁটটা কামড়ে বলে, 'প্রাইমারী ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে কেন? বলেছি তো অনেকবার, পারু নিজের চেষ্টায় যতটা শিখেছে, তাতে চার-পাঁচটা ক্লাসের পড়া হয়ে গেছে। সেই বুঝে উঁচু ইস্কুলেই দেবে।'

ভানু অগ্রাহ্যের হাসি হেসে বলে, 'হ্যাঁ, মেয়েরা তোমার ঘরে বসে অরু দত্ত, তরু দত্ত হচ্ছে! তাই এখন থেকেই পথ্য!'

কথা শেষ করতে পারে না।

সুবর্ণলতা তীব্রস্বরে বলে ওঠে, 'চুপ চুপ। আর একটাও কথার দরকার নেই। মিথ্যেই আশা করে মরেছিলাম, চিনেছি তোদের সবাইকে। বুঝেছি জীবনের সর্বস্ব "সার" দিলেও আমড়াগাছে আম ফলানো যায় না।'

হ্যাঁ, সুবর্ণলতা বুঝেছে আমড়াগাছে আম ফলানো যায় না!

তিল তিল করে বুঝেছে!

বুঝে-বুঝেও চোখ বুজে অস্বীকার করতে চাইছিল এতদিন। যেমন অন্ধকারে ভূতের ভয়কে ঠেকিয়ে রাখতে চায় লোকে, খোলা চোখকে বন্ধ করে ফেলে।

কিন্তু ক্রমশই ধরা পড়ছে, আর মনের সঙ্গে মন-ভোলানো খেলা চলবে না। আর 'ছেলেমানুষের মুখের শেখা বুলি' বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

ভানুর বিদ্রূপব্যঞ্জক মুখভঙ্গিমায়, চোখের পেশীর আকুঞ্চনে, আর ঠোঁটের বঙ্কিম রেখায় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সুবর্ণলতা, এদের বংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট প্রভাসচন্দ্রকে। সুবর্ণলতাকে ব্যঙ্গ করাই ছিল যার প্রধানতম আনন্দ।

আর সব ভাজেদের আর বোনেদের এবং জানাশুনা সব মেয়েদেরই সুবর্ণলতার সেজ ভ্যাওর অবজ্ঞা করে এসেছে বার বার, কিন্তু সুবর্ণলতাকে অবজ্ঞা করে যেন সম্যক সুখ হতো না তার।

তাই অবজ্ঞার সঙ্গে মেশাতো বিদ্রূপ।

সেই বিদ্রূপ অহরহ প্রকাশ পেতো চোখের আকুঞ্চনে, ঠোঁটের বঙ্কিম রেখায়, আর ধারালো হাসির ছুরিতে।

ভানুর প্রকৃতিতে সেই বীজ।

সুবর্ণলতার সারা জীবনের সর্বস্ব 'সার' দেওয়া গাছ!

সুবর্ণলতার আর বুঝতে বাকি নেই, সে গাছ কোনো মহীরুহ হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি বহন করছে না। সে গাছ বাঁশঝাড় মাত্র।

যে বাঁশঝাড় বংশধারার অতুলন তুলনা!

আজ আর সন্দেহ নেই।

আজ শুধু নিশ্চিত জানার স্তব্ধ নিশ্চেষ্টতা।

আজ আর নতুন করে আতঙ্কের কিছু নেই।

হঠাৎ আতঙ্কিত হয়েছিল সেই একদিন। অনেকদিন আগে সেই যেদিন 'বড় হয়ে ওঠা' বড় ছেলের কাছে এসে হাসি-হাসি মুখে বলেছিল সুবর্ণ, 'ভানু, তুই তো বড় হয়েছিস, পাস

দিলি, কলেজে ঢুকলি, আমায় এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবি? একলা চুপি চুপি—'

একলা চুপি চুপি!

ভানু অবাক গলায় বলেছিল, 'তার মানে?'

'মানে পরে বোঝাবো, পারবি কি না বল্ আগে!'

ভানু এই রহস্য-অভিযানের আকর্ষণে উৎসাহিত হয়নি। ভানু নিরুত্তাপ গলায় বলেছিল, 'কোথায় যেতে হবে না জেনে কি করে বলবো?'

'আহা, আমি কি বাপু তোকে বিলেতে নিয়ে যেতে বলছি!' সুবর্ণর চোখ ভুরু নাক ঠোঁট সব যেন একটা কৌতুক-রহস্যে নেচে উঠেছিল, 'এখান থেকে এমন কিছুই দূর নয়, বলতে গেলে তোর কলেজেরই পাড়া—'

ভানুর বোধ করি হঠাৎ একটা সন্দেহ জেগেছিল, তাই ভানু ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেছিল, 'কি, তোমার সেই বাপের বাড়ি বুঝি? সে আমার দ্বারা হবে-টবে না।'

সুবর্ণর মুখের আলোটা দপ্ করে নিভে গিয়েছিল, সুবর্ণর চোখে জল এসে গিয়েছিল, সুবর্ণর ইচ্ছে হয়েছিল বলে, 'থাক্ দরকার নেই, কোথাও যেতে চাই না তোর সঙ্গে।'

কিন্তু সে কথা বললে পাছে ভানুর সন্দেহটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাই জোর করে গলায় সহজ সুর এনে বলেছিল, 'বাপেরবাড়ির কথা তোকে বলতে আসিনি আমি। তোদের মা হচ্ছে ভুঁইফোঁড়, বাপেরবাড়ি-টাড়ি কিছু নেই তার। বলছিলাম ছেলেবেলার সেই ইস্কুলটাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে। সেই যে গরমের ছুটিতে চলে এলাম, ইহজীবনে আর চক্ষে দেখলাম না—'

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল সুবর্ণ, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল।

কিন্তু ভানু মায়ের এই ভাব-বৈলক্ষণ্য বুঝতে পারেনি, অথবা বুঝতে চেষ্টাও করেনি। ভানু যেন ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠেছিল, 'তা আবার গিয়ে ভর্তি হবে!'

সুবর্ণ তখনো আতঙ্কিত হয়নি, সুবর্ণ মনে করেছিল সবটাই ছেলেমানুষের ছেলেমানুষি কৌতুক।

ষোলো বছরের ছেলেকে 'ছেলেমানুষ'ই ভেবেছিল সুবর্ণ।

তাই বলে উঠেছিল, 'হ্যাঁ, হবো ভর্তি! তুই জ্যাঠামশাই হয়ে আমাকে ঘাগরা পরিয়ে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিবি। আরে বাবা, রাস্তা থেকে একবার চোখের দেখাটা দেখবো।'

'রাস্তা থেকে!'

ভানু যেন পাগলের প্রলাপ শুনেছে।

তা তবুও সুবর্ণ প্রলাপ বকেছে, 'হ্যাঁ, রাস্তা থেকে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

ভয় নেই বাবা, গাড়ি থেকে নামতে চাইব না, শুধু গাড়িটা একবার সামনে দাঁড় করাবি, জানলা দিয়ে একটু দেখবো।'

বলেছিল আর ঠিক সেই সময় সেই হাসির আভাস ফুটে উঠেছিল ভানুর মুখে, যে হাসি এ বাড়ির প্রথম গ্র্যাজুয়েট প্রভাসচন্দ্রের একচেটে। আর তখনই ধরা পড়েছিল ওর মুখের গড়নটা ওর সেজ কাকার মত।

সুবর্ণ সহসা শিউরে উঠেছিল।

তথাপি সুবর্ণ যেন মনে মনে চোখ বুজেছিল। সুবর্ণ ভেবেছিল, কক্ষনো না, আমি ভুল দেখেছি।

তাই সুবর্ণ আবার তাড়াতাড়ি কথা বলে উঠেছিল, যেমন ভাবে ছোট ছেলেকে বকে মায়েরা, বলে 'এত বড় হলি, এটুকু আর পারবি না? তবে আর তুই বড় হয়ে আমার লাভটা কি হলো?'

ভানু নিরুত্তাপ গলায় বলেছিল, 'কারুর লাভের জন্যে কি আর কেউ বড় হয়। বয়েস বাড়লে বড় হওয়া নিয়ম, তাই হয়। ও তুমি বাবার সঙ্গে যেও, আমি বাবা মেয়েমানুষকে নিয়ে কোথাও যেতে-টেতে পারবো না। সাধে তোমায় পাগল বলে না লোকে! যত সব কিম্ভূতকিমাকার ইচ্ছে!'

সেই দিন।

সেই দিন ভয়ঙ্কর এক আতঙ্কে হাত-পা হিম হয়ে গিয়েছিল সুবর্ণর। সুবর্ণ তার ছেলের মুখে তার সেজ দ্যাওরের ছায়া দেখতে পেয়েছিল।

সুবর্ণ যে মনে মনে কল্পনা করে আসছে এযাবৎ, ভানু বড় হয়ে উঠলেই সে একটু স্বাধীন হবে, সে পৃথিবীর মুখ দেখতে পাবে, আর—সেই দেখার পরিধি বাড়াতে বাড়াতে একদিন ট্রেনে চেপে বসবে বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া একখানি মুখ দেখতে।

কারো কোনো মন্তব্য প্রকাশের সাহস হবে না, সুবর্ণ বড় গলায় বলবে, 'আমার ছেলের সঙ্গে যাচ্ছি আমি, বলুক দিকি কেউ কিছু। উপযুক্ত ছেলের মা আমি, আর তোমাদের কচি খুকী বৌ নই।'

এবং তার সেই উপযুক্ত ছেলেও বলে উঠবে, 'সত্যিই তো, আমি বড় হয়েছি, আর আমার মাকে তোমরা অমন জাঁতার তলায় রাখতে পারবে না।'

কিন্তু স্বপ্ন ভেস্তে গেল!

সুবর্ণলতার ছেলে বললো, 'মেয়েমানুষকে নিয়ে রাস্তায় যাওয়া আমার দ্বারা হবে না।'

মেয়েমানুষ!

মেয়েমানুষ!

প্রতিটি অক্ষরে যেন মুঠো মুঠো অবজ্ঞা ঝরে পড়ছে।

এই অবজ্ঞার উৎস কোথায়?

অশোধ্য ঋণের কুণ্ঠাময় অনুভূতি?

'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।'

একদা যে এই মেয়েমানুষের দেহদুর্গে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় তার সহায় ছাড়া গতি ছিল না, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, তাই অবজ্ঞা দিয়ে ঢাকা দিতে হবে সেই ঋণ।

অথবা আর এক উপায় আছে, 'অতিভক্তি'র জাঁকজমক। যেটা মুক্তকেশীর ছেলেদের, আরো অমন অনেক ছেলেদের।

সুবর্ণর ছেলে দ্বিতীয় পথে যায়নি।

সুবর্ণর ছেলে সহজ পথটা ধরেছে।

রক্ত-মাংসের এই ঋণটা অশোধ্য একথা স্বীকার না করে, সবটাই অবজ্ঞা দিয়ে ওড়াবে।

আর তারপর?

যখন বড় হবে?

যখন ওর নিজের রক্ত-মাংস ওর শত্রুতা করবে?

যখন সেই শত্রুর কাছে অসহায় হবে? দুর্বল হবে? চির অবজ্ঞেয় ওই জাতটার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া গতি থাকবে না?

তখন আরো আক্রোশে মরীয়া হবে, অন্ধকারের অসহায়তার সাক্ষীকে দিনের আলোয় পায়ে ছেঁচবে, অবজ্ঞা করবে, আর ব্যঙ্গে বিকৃত হয়ে বলবে, 'মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ!'

'বেথুন ইস্কুলের বাড়িখানা আর একবার দেখবার' বাসনাটা মেটেনি সেদিন সুবর্ণলতার, তবু সে তখনো একেবারে হতাশ হয়নি। তখনো খেয়াল করে নি, বংশধারার মূল উৎস থাকে অস্থিমজ্জার গভীরে, পরিবেশ বড় জোর পালিশ দিতে পারে, যেটা হয়তো বা আরো মারাত্মক। কখন কোন্ মুহূর্তে যে সেই পালিশের অন্তরাল থেকে বর্বরতার রূঢ় দাঁত উঁকি মারবে, ধারণা থাকবে না, দাঁতের তীক্ষ্ণতায় দিশেহারা হতে হবে।

সুবর্ণলতা তার ছেলেকে পরিবেশ-মুক্ত করে নিয়ে এসেছিল, তাই তার ছেলের গায়ে পালিশ পড়েছে, নিষ্প্রভ করে দিয়েছে সে তার এ বাড়ির প্রথম গ্র্যাজুয়েট কাকাকে।

তবে কি কানু, মানু আর সুবলও এই এক রকমই হবে? দর্জিপাড়ার সেই গলিটা এসে বাসা বাঁধবে সুবর্ণলতার এই হাল্কা ছিমছাম ছবির মত গোলাপী রঙা বাড়িটার মধ্যে?

॥ তিন ॥

কিন্তু সুবর্ণলতাই বা এমন অনমনীয় কেন ?

কিছুতেই ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না কেন ? ভেঙে পড়তে পড়তে আবার খাড়া হয়ে ওঠে কেন ? এত প্রতিবন্ধকতাতেও ধাড়ি মেয়ে পারুলকে সে স্কুলে ভর্তি করতে বদ্ধপরিকর কেন ?

প্রবোধচন্দ্র বাইরে থেকে ঘুরে এসে রাগে গনগন করতে করতে বললো, 'এসব কি শুনছি! পাশের বাড়ির পরিমলবাবুর ছেলেকে দিয়ে নাকি পারুকে ইস্কুলে ভর্তি করতে পাঠিয়েছিলে!'

'পাঠিয়েছিলাম তো'—সুবর্ণ সহজ গলায় বলে, 'পারু বকু দুজনকেই।'

'চুলোয় যাক বকুল! পারুকে পাঠিয়েছিলে কী বলে?'

'এ পর্যন্ত ওটা ওর হয়ে ওঠেনি বলে।'

'হয়ে ওঠেনি বলে!' প্রবোধ সহসা একটা কুৎসিত মুখভঙ্গী করে ওঠে, 'সেই ভয়ঙ্কর দরকারী কাজটা হয়ে ওঠেনি বলে রাজ্য রসাতলে গেছে ? পৃথিবী উল্টে গেছে ? চন্দ্র-সূর্য খসে পড়েছে ? তাই তুমি একটা ছোঁড়ার সঙ্গে ওই ধাড়ি ধিঙ্গী সোমত্ত মেয়েকে—'

'থামো! অসভ্যতা করো না।'

'ওঃ, বটে! অসভ্যতা হল আমার ? আর তোমার কাজটা হয়েছে খুব সুসভ্য ? পরের কাছে মুখাপেক্ষী হতেই বা গেলে কোন মুখে ? এদিকে তো মানের জ্ঞান টনটনে!'

'অভাবে স্বভাব নষ্ট চিরকেলে কথা—', সুবর্ণ বলে, 'যার নিজের তিন কুলে করবার কেউ না থাকে, পরের দরজায় হাত পাতবে এটাই স্বাভাবিক!'

'ওঃ! তোমার কেউ কিছু করে না ? আচ্ছা নেমকহারাম মেয়েমানুষ বটে! বলে সারাটা জীবন এই ভেড়াটাকে একতিল স্বস্তি দিলে না, শান্তি দিলে না, বিশ্রাম দিলে না, নাকে দড়ি দিয়ে ছুটিয়ে মারলে, তবুও বলতে বাধছে না, কেউ কিছু করে না ?'

সুবর্ণ স্থির স্বরে বলে, 'যা কিছু করেছ সব আমার জন্যে ?'

'তা না তো কি ? আমার জন্যে ? আমার কী এত দরকার ছিল ? মায়ের ছেলে মায়ের কাছে পড়ে থাকতাম—'

সুবর্ণ ওই অপরিসীম ধৃষ্টতার দিকে তাকিয়ে বলে, "শুধু মায়ের ছেলে ? আর তোমার নিজের জঞ্জালের স্তূপ ? তারা ? তাদের কথা কে ভাবতো ?'

'তারা তাদের বংশের ধারায় মানুষ হতো! এক-একটি সাহেব বিবি করে তোলার দরকার ছিল না কিছু। বলে দিচ্ছি, বকুল যায় যাক, পারুর কিছুতেই বিনুনি দুলিয়ে ইস্কুলে যাওয়া চলবে না, ব্যস!'

'পারু যাবে।'

'কী বললে? আমি বারণ করছি তবু পারু যাবে?'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আমি যা করেছি বুঝেই করেছি। আর সেটা হবে। এই হচ্ছে আমার শেষ কথা।'

শেষ কথা!

এই শেষ কথার উত্তরে আর কোন্ কথা বলতে পারতো সুবর্ণর স্বামী, কে জানে, কিন্তু সুবর্ণর ছেলে কথা কয়ে উঠল। পাশের ঘর থেকে।

পাশের ঘরে কানু বসে খবরের কাগজ পড়ছিল, এবং দু-ঘরের মাঝখানের দরজা খোলা থাকার দরুন মা-বাপের প্রেমালাপ শুনছিল, হঠাৎ অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলো, 'মা'র মুখে চিরদিনই ঠাকুমাদের সমালোচনা শুনে এসেছি, আর স্বভাবতই ভেবে এসেছি দোষ তাঁদের-ই। এখন বুঝতে পারছি গলদটা কোথায়!'

বললো।

এই কথা বললো সুবর্ণর মেজ ছেলে।

অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলো।

বাবা যখন মাকে 'নেমকহারাম মেয়েমানুষ' বিশেষণে বিভূষিত করেছিল, তখন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেনি সে, যখন বাবা নিজের মেয়ে সম্পর্কে শিথিল মন্তব্য করে রাগ প্রকাশ করেছিল, তখনও চুপ করে থেকেছিল, অসহিষ্ণু হয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে উঠল মায়ের দুঃসহ স্পর্ধায়।

বলে উঠলো, 'এখন বুঝতে পারছি গলদটা কোথায়?'

কিন্তু আশ্চর্য, সুবর্ণলতা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল না তাকে, চীৎকার করে প্রতিবাদ করে উঠলো না। সুবর্ণলতা যেন হঠাৎ চড় খাওয়া মুখে শিথিল স্খলিত গলায় প্রশ্ন করল, 'কি বললি? কি বললি তুই?'

বললো, আর মাটিতে বসে পড়লো।

কানু মায়ের সেই নিষ্প্রভ অসহায় মুখের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে ও-ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেল, খবরের কাগজখানা হাত থেকে আছড়ে ফেলে দিয়ে। কানুর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হল, 'আর-কি! জানো তো খালি মূর্ছা যেতে, ওইতেই সবাইকে জব্দ করে রাখতে চাও!'

আর কিছু করল না।

'জল জল, পাখা পাখা' বলে ব্যস্ত হলো মুক্তকেশীর ছেলে।

সুবর্ণলতার জীবনটা যার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, যে নাগপাশের বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায়নি সুবর্ণলতা।

সুবর্ণর সংসারত্যাগিনী মা নাকি সংসারত্যাগের প্রাক্কালে বলে গিয়েছিল, ওটা 'নাগপাশই', না লতাপাতার বন্ধন, তাই দেখবে বাকী জীবনটা।

কিন্তু তাতে সুবর্ণর কি হলো ?

সুবর্ণ কি পেল তা থেকে ?

পেল না কিছু।

পায় না।

এইটাই যে নিয়ম পৃথিবীর, অনেক দিনের সাধনা চাই। এক যুগের তপস্যা আর সাধনা পরবর্তী যুগকে এনে দেয় সাধনার সিদ্ধি, তপস্যার ফল ! অনেক 'কেন' আর অনেক বিদ্রোহ নিষ্ফল ক্ষোভে মাথা কুটে কুটে মরে, তলিয়ে যায় অন্ধকারে, তারপর আসে আলোর দিন।

তবু—

যারা অন্ধকারে হারিয়ে গেল, তাদের জন্যেও রাখতে হবে বৈকি একবিন্দু ভালবাসা, একবিন্দু শ্রদ্ধা, একবিন্দু সমীহ।

হয়তো সুবর্ণলতার জন্যেও আসবে তা একদিন।

হয়তো সুবর্ণলতার আত্মা সেই পরমপ্রাপ্তির দিকে তাকিয়ে একটু পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলবে।

বলবে, 'সারাজীবন যার জন্যে জ্বলেছি আর জ্বালিয়েছি, পুড়েছি আর পুড়িয়েছি, কোথাও কোনোখানে তবে সার্থক হয়েছে সে !'

কিন্তু কবে সেই পরিতৃপ্তির নিশ্বাসটুকু ফেলতে পাবে সুবর্ণলতার আত্মা ?

আজো কি অগণিত সুবর্ণলতা মাথা কুটে মরছে না এই 'আলোকোজ্জ্বল যুগের' চোরা-কুঠরীর ঘরে ? রুদ্ধ কণ্ঠে বলছে না, 'তোমরা শুধু সমাজের মলাটটুকু দেখেই 'বাহবা' দিচ্ছ, আত্মপ্রশংসায় বিগলিত হচ্ছ, আত্মপ্রচারের জৌলুসে নিজেকেই নিজে বিভ্রান্ত করছ, খুলে দেখছ না ওর ভিতরের পৃষ্ঠা ? দেখ সেই ভিতরের পৃষ্ঠায় কোন্ অক্ষর, কোন্ ভাষা, কোন্ লিপি ?

সেখানে যে অগণিত সুবর্ণলতা আজও অপেক্ষা করছে 'কবে পাপের শেষ হবে, তার প্রতীক্ষায়।'

বলছে না তারা—

'কবে অহঙ্কারী পুরুষসমাজ খোলা গলায় স্বীকার করতে পারবে, তুমি আর আমি দুজনেই ঈশ্বরসৃষ্ট ! তুমি আর আমি দুজনেই সমান প্রয়োজনীয় !'

কবে ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষসমাজ মুক্ত মনে বলতে পারবে, 'তোমাকে যে স্বীকৃতি দিতে পারিনি সেটা তোমার ত্রুটির ফল নয়, আমার ত্রুটির ফল ! তোমার মহিমাকে মর্যাদা দিতে বাধে সেটা আমার দুর্বলতা, তোমার শক্তিকে প্রণাম করতে পারি না সেটা আমার দৈন্য ! নিজেকে তোমার "প্রভু" ভাবার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে আমার অভিমান আহত হয়।

তাই দাস সেজে তোমায় "রাণী" করি। আজো তোমাকে মুগ্ধ করে মুঠোয় পুরে রাখতে চাই, তাই চাটুবাক্যে তোয়াজ করি। আর আমার শিল্পে সাহিত্যে কাব্যে সঙ্গীতে যে তোমার বন্দনাগান করি, সে শুধু নিজেকে বিকশিত করতে। তুমি আমার প্রদীপে আলোকিত হও, এই আমার সাধ, আপন মহিমায় ভাস্বর হও এতে আমার আপত্তি। তাই তুমি যখন গুণের পরিচয় দাও, তখন করুণার হাসি হেসে পিঠ চাপড়াই, যখন শক্তির পরিচয় দাও, তখন বিরক্তির ভ্রূকুটি নিয়ে বলি "ডেঁপোমি", আর যখন বুদ্ধির পরিচয় দাও, তখন তোমাকে খর্ব করবার জন্য উঠে পড়ে লাগি !......

'তোমার রূপবতী মূর্তির কাছে আমি মুগ্ধ ভক্ত, তোমার ভোগবতী মূর্তির কাছে আমি বশম্বদ, তোমার সেবাময়ী মূর্তির কাছে আমি আত্মবিক্রীত, তোমার মাতৃ-মূর্তির কাছে আমি শিশুমাত্র।..কিন্তু এগুলি একান্তই আমার জন্যে হওয়া আবশ্যক। হ্যাঁ, আমাকে অবলম্বন করে যে 'তুমি', সেই 'তুমি'টিকেই মাত্র বরদাস্ত করতে পারি আমি। তার বাইরের 'তুমি' হচ্ছ বিধাতার একটি হাস্যকর সৃষ্টি !'

কে জানে কবে এসব বলতে পাবে সুবর্ণলতার আত্মা !

হয়তো পাবেই না। এই তো পুরুষের হৃদয়রহস্য !

এই মনের ভাব খুলে বলতে পারবে কোনোদিন পুরুষসমাজ ? মনে হয় না। শুধু আধুনিকতার বুলি আউড়ে দেখাবে, 'দেখ, আমি কত উদার ! আমি কত মুক্ত !' যুগের রং লাগিয়ে লাগিয়ে বলবে, 'দেখ তোমাকে কত বর্ণাঢ্য করে তুলেছি !' কিন্তু সে রং পুতুলের রং ! প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার সাধনা নেই তার, পুতুলে রং লাগিয়েই খুশি ! সেই রংচঙে পুতুলগুলি তুলে ধরবে বিশ্বসমক্ষে, বলবে, 'দেখেছ ? দেখ দেখ আমাদের কত ঐশ্বর্য !'

'বিদ্যেবতীর আর বাড়ির বিদ্যেয় কুলোচ্ছে না ?'

খবরের কাগজখানা আছড়ে ফেলে দিয়ে কানু তীব্র বিরক্তিভরে এঘরে এসে পারুকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে ওই কথাটি।

কানুর এই গায়ে পড়ে ব্যঙ্গ করতে আসায় রাঙা-হয়ে উঠলো পারুর মুখ, ঠোঁটটা কামড়ে চুপ করে রইল। সুবর্ণলতার অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে হয়তো মিল আছে তার, মিল নেই বাইরের প্রকৃতির। 'চোপা' করবার দুরন্ত ইচ্ছেকে দমন করে চুপ করে থাকে সে।

এখন চুপ করেই থাকে হাতের খোলা বইখানা মুড়ে।

কানু একবার তার সেই বইখানার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে, 'নাটক নভেলের তো শ্রাদ্ধ করেছো, ওই মাথায় আর যোগবিয়োগ গুণভাগ ঢুকবে ?'

পারুল এবার কথা কইলো।

বললো, 'ঢুকবে কিনা সে পরীক্ষা তো করা হয়নি।'

'ইস! কথা শেখা হয়েছে যে দেখছি খুব! নভেলের যা ফল! লেখাপড়া শেখা তোর কর্ম নয় বুঝলি? আমার একটা বন্ধুর ছোট বোন, মানে তোর মতন একটা মেয়ে, আসছেবার এণ্টেন্স পরীক্ষা দেবে, বুঝলি? সে সব মাথাই আলাদা!'

'মাথাটা নিয়েই বোধ হয় জন্মেছিল তোমার বন্ধুর বোন?'

কানু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে, 'তা ছাড়া? তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না, বুঝলে? শুধু মাতৃদেবীর ম• বড় বড় কথা শিখবে তুমি!'

পারু তার প্রকৃতিটা লঙ্ঘন করতে চায় না, তবু সে বলে ফেলে, 'মা ভাগ্যিস ওই বড় বড় কথাগুলো শিখেছিলেন মেজদা, তাই তোমারও এত "বড় কথা" বলার সুযোগ হচ্ছে।

'সত্যি! বা', বেশ বুদ্ধি হয়েছে তো দেখছি খেঁদুর! নাঃ, ভাল দেখে একটা বর তোকে দিতে হচ্ছে?' বলে চলে যায়। কানু ভানুর মত অত সিরিয়াস নয়, তাই ব্যঙ্গই করে সে।

॥ চার ॥

পাল্‌কি সত্যিই এবার উঠে যাচ্ছে।

'যাই যাই' করছিল অনেক দিন, এবার মনে হচ্ছে একেবারেই যাবার পথে পা বাড়িয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে যখন তখন তো দূরস্থান, বলতে গেলে চোখেই পড়ে না।

পাল্‌কির সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কিছুই অবলুপ্তির পথ ধরবে তাতে আর সন্দেহ কি? পাল্‌কিই বলে যাবে—'মানুষের কাঁধের উপর মানুষ চড়া নির্লজ্জতা!...মরে গিয়ে 'শবদেহ' হয়ে যাবার পর চড়ো মানুষের কাঁধে, তার আগে নয়।'...বলে যাবে—'আস্ত একটা মানুষকে একটা বন্ধ বাক্সয় ঢুকিয়ে ফেলে ঘেরাটোপ ঘিরে নিয়ে যাওয়াটা হাস্যকর, আমি বিদায় নিচ্ছি ওই ঘেরাটোপ আর পর্দার জঞ্জালগুলো কুড়িয়ে নিয়ে। পথ যে পার হচ্ছে, পথটা সে যেন দেখতে পায়।'...বলে যাবে, 'দ্রুতযানের সন্ধান কর এবার তোমরা। পৃথিবীটা অনেক বড়, তাকে দেখো চোখ মেলে, ছোটো ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে, ছোটো হাওয়ার বেগে হাওয়াগাড়িতে, ওড়ো মাটি ছাড়িয়ে আকাশে।...তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আপন পরিমণ্ডলটিকেই সমগ্র পৃথিবীজ্ঞান করে আলবোলায় সুখটান দেবার দিন গত হলো।'

হাজার বছরের অভ্যাসের ঐতিহ্য আর ইতিহাসের ধারা মুছে নিয়ে যারা চলে যায়, তারা কিছু বলে যায় বৈকি। চলে যাবার মধ্যেই বলে যাওয়া।

কালস্রোত যে কাউকে কোথাও নোঙর ফেলতে দেয় না, দুর্নিবার বেগে ভাসিয়ে নিয়ে

যায়, এইটাই আর একবার বলে যায় সে। আজকের পরম প্রয়োজনীয়, পরবর্তীকালে জঞ্জালের কোঠায় ঠাঁই পায়, এই হলো পৃথিবীর পরমতম সত্য, আর চরমতম ট্র্যাজেডি।

তবু সহজে কেউ মানতে রাজী হয় না সে কথা। তারা সেই বিদায়ী পথিকের বসন-প্রান্তটুকু মুঠোয় চেপে ধরে রাখতে চায়, আর আলবোলায় শেষ সুখটানটুকু দিতে দিতে বলে, 'এসব হচ্ছে কী আজকাল? সব যে রসাতলে গেল!'

যারা দার্শনিক তারা উদাস হাস হেসে বলে, যাবেই তো, সবই যাবে।'

মুক্তকেশীও একটা তাঁর ছোট্ট নাতনীটার সঙ্গে বাক্যালাপ প্রসঙ্গে বলছিলেন একথা, 'পাল্‌কি আর কই? ক্রমেই কমে আসছে। যাবে, সবই উঠে যাবে।'

তবু দেখা যাচ্ছে এখনো মুক্তকেশী তাঁর বয়সের ভারে জীর্ণ দেহখানা নিয়ে চলেছেন পাল্‌কি চড়ে।

একাই চলেছেন।

খানিকটা গিয়ে একখানা গোলাপী রঙের দোতলা বাড়ির সামনে এসে মুক্তকেশী মুখ বাড়িয়ে বেহারাগুলোর উদ্দেশে আদেশ জারি করলেন, 'থাম্ মুখপোড়ারা, এই বাড়ি! চলেছে দেখো হুম্ হুম্ করে।'

যেন বাড়িখানা তাদের চিনে রাখার কথা।

নিমেষে বেহারাগুলোর 'হুম্ হুম্' শব্দ থেমে গেল, পাল্‌কিও থামলো। চার-চারটে জোয়ানমদ্দ লোক পালকিখানা নামিয়ে কোমরে বাঁধা গামছা খুলে গায়ের ঘাম মুছতে লাগলো।

চারটে দস্যিলোক, অথচ একটা বুড়ীকে বইতে হিমশিম খেয়ে গেছে। পদ্ধতিটা বুদ্ধিহীন বলেই। রিক্শাগাড়িরা তখনও আসরে নামেনি, দেখিয়ে দেয়নি—একটা লোকই টেনে নিয়ে যেতে পারে চারটেকে।

পাল্‌কির দরজা ঠেলে নামলেন মুক্তকেশী।

নড়বড়ে কোমরটা কষ্টে টান করে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মুহূর্তকাল, তারপর আঁচলের খুঁট থেকে দুটি ডবল পয়সা বার করে চারটে বেহারার মধ্যে একজনের হাতে দিয়ে বললেন, 'নে যা, ভাঙিয়ে ভাগ করে নেগে যা।'

কোমরটা দুমড়ে যাওয়া পর্যন্ত মুক্তকেশীর ধারণা হয়েছে, পূর্ব সম্মানের সবটুকু আর জুটছে না। তাই অপর পক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলেই প্রাণপণ চেষ্টায় সোজা হন। অনেক সময় হাড়ের খিল ছেড়ে যাওয়ার একটা শব্দ হয়, শিরদাঁড়াটা কনকনিয়ে ওঠে, তবু সাধ্যপক্ষে হেঁট হওয়ার অগৌরব বহন করতে রাজী নন মুক্তকেশী।

তথাপি অপরপক্ষ সম্মান রক্ষায় উদাসীন হল।

বলে উঠলো, 'কেতো দিঁউছি?'

'যা দেবার ঠিকই দিয়েছি—' বার্ধক্য-মলিন পুরনো চোখের তারায় একটি সম্রাজ্ঞীজনোচিত দৃপ্তভঙ্গী ফুটিয়ে তুলে মুক্তকেশী সদপে তাকালেন, 'আবার কিসের টঁ্যা ফোঁ? চাস কত? পুরো তঙ্কা?'

লোকগুলো মুখের প্রত্যেকটি রেখায় অসন্তোষ ফুটিয়ে বলে, 'আটো পয়সা দিয়।'

'কী বললি? আট পয়সা? গলায় ছুরি দিবি নাকি? পয়সা গাছের ফল?' মুক্তকেশী সদর্পে বলেন, 'আর এক আধলাও নয়। কার হাতে পড়েছিস তা জানিস? এখেন থেকে এখেন, আট পয়সা? হুঁঃ! যা বেরো।'

আশ্চর্য!

আশ্চর্য বৈকি যে লোকগুলো সত্যিই পাল্কি তুলে নিয়ে চলে যায় নিতান্ত ব্যাজার মুখে!

তারাও জানছে এ পেশার দিন শেষ হয়ে আসছে ওদের। মুক্তকেশীর মত দু-একটা বুড়ীটুড়ি ছাড়া এরকম শবযাত্রার ভঙ্গীতে মানুষের কাঁধে চড়ে শূন্যে দুলতে দুলতে আর যেতে চাইছে না মানুষ।

তাই বেত ছিঁড়ছে, ডাণ্ডা ভাঙছে, রং চটে দাঁত বেরিয়ে যাচ্ছে, তবু পাল্কি মেরামতের কথা ভাবছে না ওরা। দলের অনেকেই তো ক্রমশঃ গলায় একটা 'পৈতে' ঝুলিয়ে রাঁধুনী বামুনের চাকরি নিচ্ছে। তার চাহিদা বরং দ্রুতগতিতে বাড়ছে।

বাড়ছেই!

মেয়েরা ক্রমশই 'বাবু' হয়ে উঠছে, রান্নার ভারটা চাপাচ্ছে উড়িয়া কুলতিলকের হাতে।

বন্ধ দরজা খোলবার জন্যে কড়া নাড়া, অথবা দরজায় ধাক্কা দেবার যে একটা প্রচলিত রীতি আছে সে রীতিকে অগ্রাহ্য করে মুক্তকেশী, ভাঙা ভাঙা অথচ সতেজ গলায় ডাক্ দেন, 'পেবো পেবো—'

হ্যাঁ, এ পাড়ার প্রবোধবাবুকেই ডাক দেন তিনি। বাড়ির ছোট ছেলেপুলেদের নাম ধরে ডাক দেবার যে একটা রীতি প্রচলিত, সেটাকেও অস্বীকার করে থাকেন তিনি। এ বাড়ি তাঁর ছেলে 'পেবো'র, তাকেই ডাকবেন তিনি। সে বাড়িতে উপস্থিত থাক্ বা না থাক্।

অবশ্য যখনই আসেন, প্রবোধচন্দ্রের উপস্থিতির সম্ভাবনা অনুমান করেই আসেন।

তা এক ডাকেই কাজ হলো।

যদিও 'পেবো' বা সেই জাতীয় কেউ নয়, দরজা খুলে দিল বছর দশেকের একটি মেয়ে। মুক্তকেশী যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তীব্র গলায় বলে উঠলেন, 'কপাট খুলে দিতে তুই হুট্ করে বেরিয়ে এলি যে? বাড়িতে আর লোক নেই?'

মেয়েটা এই প্রশ্নবাণের সামনে থতমত খেয়ে বলে, 'সবাই আছে।'

'আছে তো তুই তাড়াতাড়ি আসতে গেলি কেন? আমি না হয়ে যদি অপর কোনো ব্যাটাছেলে হতো? "পারি"র বিয়ে হচ্ছে না বলে বুঝি তুই কচি খুকী আছিস?'

মেয়েটা তাড়াতাড়ি বলে, 'ছাদ থেকে দেখলাম তুমি এলে, তাই—'

'ছাদ থেকে?'

সেই পুরনো চোখ আবার ধারালো হয়ে ওঠে, 'ভরদুপুরে ছাদে কী করছিলি?'

'কাপড় শুকোচ্ছিল, মা বললেন, তুলে আন।'

'হুঁ, তা বলবেন বৈকি মা! চিরকেলে আয়েসী! নে চল। বাবা বাড়ি আছে?'

'আছেন। ঘুমোচ্ছেন।'

'তা তো ঘুমোবেই।' মুক্তকেশী ধিক্কারের স্বরে বলেন, 'সঙ্গগুণের মহিমা! বুকের ওপর পাহাড় মেয়ে, আরো একটা ধিঙ্গী হয়ে উঠলো, ছুটিছাটার দিন কোথায় মাথায় সাপ বেঁধে ছুটোছুটি করে বেড়াবে, তা নয় নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন! নে চল।'

মুক্তকেশী আজকাল মাঝে-মাঝেই আসেন।

ভেন্ন হওয়া রূপ দুরাচারের জন্যে অনেকগুলো দিন পুত্রবধূর মুখ দেখেননি মুক্তকেশী কিন্তু পুত্রের আকিঞ্চন ও তোষামোদে সে ভাবটা কেটে গিয়েছিল। তারপর সেই সুবর্ণলতার গুরুমন্ত্র নেওয়ার সময় বাঁধ ভাঙলো। রাগের, তেজের, লজ্জার!

সময়ে সবই সয়। সময় সর্বতাপ-হর!

সময় সবই সহজ করে আনে। এখন বরং মুক্তকেশী 'মেজবৌমা' 'মেজবৌমা'ই বেশি করেন। তার জন্যে ঘরে থাকা অন্য বৌদের হিংসেব অবধি নেই, কিন্তু এখন যে প্রবোধচন্দ্রের মাতৃভক্তিটা প্রায় ভরতের ভ্রাতৃভক্তির তুল্য মূল্যবান! আর মূল্যেই তো জগৎ বশ!

অতএব এখন মুক্তকেশী যখন তখন মেজ ছেলের বাড়িতে বেড়াতে আসেন, হুকুম আর শাসন চালিয়ে যান, এবং অপর ছেলে-বৌদের সমালোচনায় মুখর হন। হাত-খরচের টাকায় ঘাটতি পড়লেই সে কথা কোনো ছলে মেজবৌমার কর্ণগোচর করেন, এবং নিজের মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনী বাবদ অর্থঘটিত যা কিছু সদিচ্ছা, সেও মেজছেলের কাছে প্রকাশ করে যান।

বলেন, 'ওদের বলি না, জানি তো বোন বলে এতটুকু মন কারো নেই। তোর তবু সে মন একটু আছে, তাই বলা।'

প্রবোধ অবশ্য মায়ের ধারণা অনুযায়ী বোনেদের প্রতি মনের অভিনয়ই করে চলে তারপর। বলে উঠতে পারে না—'মন আমারও নেই মা! তারা ভিন্ন মাটিতে শিকড় নামিয়েছে, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায়? একদা তারা আর আমরা একই আধারে থেকেছি, শুধু এইটুকু সুবাদের জের আর কতকাল টানা যায়?'

বলে না।

বলে উঠতে পারে না।

অতএব সুবর্ণলতার এই গোলাপী রঙের দোতলাটির মধ্যেও মুক্তকেশী বেশ পুরো চেহারা নিয়েই অবস্থান করেন।

সুবর্ণলতা একবারই পেরেছিল অসাধ্য সাধন করতে। একবারই দেখিয়েছিল 'অসমসাহসিক' শব্দটার মানে আছে।

কিন্তু সে ওই একবারই। সে আওতা থেকে সরে এসে স্বামী-সন্তানদের নিয়ে নিজের ইচ্ছেমত সংসার গড়ে তোলবার বাসনা হয়েছিল, সে বাসনাটা ধূসর হয়ে যাচ্ছে। সেই আওতাটা রয়েই গেছে, হয়তো বা আরো নিরঙ্কুশ হয়েছে।

সুবর্ণলতার জীবনের এ এক অদ্ভুত ট্র্যাজেডি! কারণ নিজেও সে মুক্তকেশীর সংসারে বসে যত সহজে মুক্তকেশীর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারতো, আপন কেন্দ্রে বসে তা পারে না। ভদ্রতায় বাধে, চক্ষুলজ্জায় বাধে, আর সব চেয়ে আশ্চর্য—মমতায় বাধে!

অস্বীকার করে লাভ নেই, এখনকার ওই নখদন্তহীন মানুষটির প্রতি একটা মমতাবোধ সুবর্ণলতাকে নিরুপায় করে রেখেছে।

মৌজের দিবানিদ্রাটি ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে এসে প্রবোধ মায়ের চরণ বন্দনা করে, নিজ হাতে হাতপাখা তুলে নেয়।

মুক্তকেশী আসন পরিগ্রহ করে বলেন, 'থাক্ বাতাসে কাজ নেই, বলি নাকে তেল দিয়ে ঘুম দিলেই হবে? মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না?'

নখদন্তহীন মুক্তকেশীর কথার জোর কমেছে বলে যে কথার সুর বদলেছে তা নয়! সুরটা ঠিক আছে, ধরনটা ঠিক আছে, শুধু ভারটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবু—

তবু সুবর্ণলতা যেন আজকাল হঠাৎ হঠাৎ ওই মানুষটাকে ঈর্ষা করে বসে। মুক্তকেশী যখন তাঁর পঞ্চাশোত্তীর্ণ ছেলেকে বলে ওঠেন 'লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা, পোড়ারমুখো বাঁদর', তখন অদ্ভুত একটা ঈর্ষার জ্বালা যেন দাহ ধরায় সুবর্ণলতাকে।

অথচ নিজে কি সুবর্ণলতা কখনো অমন দরাজ ভাষায় ছেলেদের সম্বোধন করবার বাসনা পোষণ করেছে?

এই গ্রাম্যতা কি সুবর্ণলতার অসহ্য নয়?

তবু—

এই 'তবু'র উত্তর নেই, প্রশ্ন জমে ওঠে আরো।

সুবর্ণলতার ছেলেরা কি এই মাতৃভক্ত বংশের ছেলে নয়?

সুবর্ণলতা কি তার মাতৃকর্তব্যে কোনো ত্রুটি করেছে? সুবর্ণলতা তো বরং সেই কর্তব্যের দায়ের কাছেই নিজের সর্বশক্তি বিকিয়েছে বসে বসে।

তথাপি সুবর্ণলতার বিয়ে হওয়া মেয়েরা 'বাপেরবাড়ি' বলতে—সুবর্ণলতার প্রাণ দিয়ে গড়া এই গোলাপী রঙের দোতলাটাকে বোঝে না, বোঝে সেই দর্জিপাড়ার গলির বাড়িটা। তাদের প্রাণ পড়ে থাকে সেখানেই। সেখানে এসে তারা পুরনো দালানের তেলচিটে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে তাদের মায়ের চালচলনের ব্যাখ্যানা করে।

আর সুবর্ণলতার ছেলেরা?

তারা অবশ্য সেই দেয়ালে তেলধরা, জানলায় চুনের হাত মোছা এবং দরজার পিছনে পিছনে পানের পিক্ ফেলা বাড়িটাকে আদৌ পছন্দ করে না, তার প্রতি একবিন্দুও মমতা পোষণ করে না, তবু এই বাড়িটাকেও 'আমাদের' বলে পরম স্নেহে হৃদয়ে নেয় না।

সুবর্ণলতার ছেলেরা যেন বাধ্য হয়ে তাদের এক প্রবলপ্রতাপ প্রতিপক্ষের এক্তারে পড়ে আছে, তাই সুযোগ পেলেই ছোবল বসাতে আসে।

ছোটটাকে অবশ্য এখনো ঠিক বোঝা যায় না, সে যেন বড় বেশি নির্লিপ্ত। সেজটাও আমোদ-প্রমোদ বাবুয়ানা বিলাসিতাটুকু হাতের কাছে পেয়ে গেলে তেমন হিংস্র নয়, কিন্তু ভানু কানু?

যারা নাকি প্রমাণ সাইজের জামা পরে তবে এ বাড়িতে এসেছে!

তারা যেন ঠিক কাকাদের প্রতিমূর্তি!

বিশেষ করে ভানু!

হঠাৎ যখন পাশ দিয়ে চলে যায়, কি চান করে এসে গামছাখানাকে জোরে জোরে ঝাড়ে, অথবা মুখ নিচু করে ভাত খেতে খেতে কেমন একটা কঠিন ভঙ্গীতে চোয়ালটা নাড়ে, দেখে চমকে ওঠে সুবর্ণলতা!

মনে হয় সেজ দ্যাওর প্রভাসকেই দেখতে পেল বুঝি।

অপর পাঁচজনেও বলে, 'ভানুকে দেখো! যেন অবিকল ওর সেজকাকা!'

শুনে অন্ধ একটা রাগে হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে করে সুবর্ণলতার।

সুবর্ণর রক্তে-মাংসে গড়া, সুবর্ণর ইচ্ছে চেষ্টা সাধনা শক্তি দিয়ে লালিত সন্তান, সুবর্ণর পরম শত্রুর রূপ নিয়ে সুবর্ণর চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে, এ কী দুঃসহ নিরুপায়তা!

কী অস্বস্তিকর বড় হয়ে গেছে ভানু কানু!

কী বিশ্রী লম্বা-চওড়া!

গলার স্বরগুলোই বা কী রকম মোটা! আস্ত দুটো 'লোক' হয়ে গেছে ওরা!

অন্য লোক!

সুবর্ণলতার সঙ্গে যাদের জীবনের আর কোনো যোগ নেই, সুবর্ণলতাকে যাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই।

সুবর্ণলতার সাধ্য নেই আর ওদের নাগাল পাবার!

আস্তে আস্তে মানু, সুবলও হয়তো এই রকমই হয়ে যাবে। তাদের মুখের চেহারায় প্রকট হয়ে উঠবে মুক্তকেশীর ছেলেদের মুখের কাঠামো।

নিরুপায় সুবর্ণলতাকে বসে বসে দেখতে হবে এই পরিবর্তন!

মুক্তকেশীর ছেলেদের ঘৃণা করা যেত, অবজ্ঞা করা যেত, এদের বেলায় কোনো উপায় নেই।

আর এদের সম্পর্কে নালিশেরও কোনো পথ নেই। এরা সুবর্ণলতার ইচ্ছানুরূপ শিক্ষিত হয়েছে, সভ্য হয়েছে, চৌকস হয়েছে। সুবর্ণলতার জীবনের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুর ধ্বংসের মূল্যে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছে সুবর্ণলতার ছেলেরা, সেই সম্পদের অহঙ্কারেই তারা অহরহ সুবর্ণলতাকে অবজ্ঞা করছে।

হয়তো বা একা সুবর্ণলতার ক্ষেত্রেই নয়, অন্য সব ক্ষেত্রেও এমনিই হয়।

'বোধ' জন্মালেই 'ঋণবোধ'ও জন্মায়, আর সেই ঋণবোধের দাহই ফণা তুলে থাকে ছোবল হানতে। যেখানে ঋণের ঘর হালকা, সেখানে বুঝি আপন হওয়া যায়, সহজ হওয়া যায়!

নচেৎ নয়।

অথচ আজীবনের স্বপ্ন ছিল সুবর্ণলতার, তার সন্তানেরা তাকে বুঝবে, তার আপন হবে। কিন্তু তারা আপন হয় নি, তারা সুবর্ণলতাকে বোঝে নি।

হয়তো বুঝতে চায়ও নি।

কারণ সুবর্ণলতার ছেলেরা তার মায়ের সেই মধুর আশার স্বপ্নের সন্ধানটুকু পায়নি কখনো। তারা শুধু যোদ্ধা সুবর্ণলতাকেই দেখে এসেছে, 'দক্ষিণের বারান্দালোভী স্বপ্নাতুর' সুবর্ণলতাকে দেখেনি কখনো।

যুদ্ধবিক্ষত সুবর্ণলতার বিকৃত আর হিংস্র মূর্তিটা অতএব বিরক্তি আর ঘৃণারই উদ্রেক করেছে তাদের! সন্ধান করে দেখতে যায়নি সুবর্ণলতার ভিতরে 'বস্তু' ছিলো।

ভেবে দেখেনি—বস্তু ছিলো, স্বপ্ন ছিলো, ছিলো 'মানুষের মত' হয়ে বাঁচবার দুর্দমনীয় সাধ! ছিলো ভব্যতা, সভ্যতা, সৌকুমার্য। শুধু সে সম্পদ ক্ষয় হয়ে গেছে যুদ্ধের রসদ যোগাতে যোগাতে!

তবে ভেবে দেখবেই বা কখন তারা?

আজো কি যুদ্ধের শেষ হয়েছে সুবর্ণলতার?

হয়নি।

হয়তো যুদ্ধের কারণগুলো আর তত বেশি প্রখর নেই, হয়তো অস্ত্রগুলোও তত বেশি তীব্র নেই, তবু সুবর্ণলতা এক আপসহীন সংগ্রামের নায়িকা।

নোংরামি আর কুশ্রীতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে নিজে যে সে কত নোংরা আর কুশ্রী হয়ে গেছে, ভব্যতা সভ্যতা শালীনতা সৌন্দর্য বজায় রাখবার লড়াইয়ে যে নিজের চরিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য শালীনতা জবাই দিয়ে বসে আছে, সে খবর আর নিজেই টের পায় না সে।

সুবর্ণলতার সন্তানেরা মায়ের এই অপরিচ্ছন্ন মূর্তিটাই দেখতে পাচ্ছে।

অতএব তারা অসহিষ্ণু হচ্ছে।

অতএব তারা মাকে ঘৃণা করছে।

মা'র দিকে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

সারা জীবনের এই সঞ্চয় সুবর্ণলতার!

অথচ সুবর্ণলতার সন্তানদেরও দোষ দেওয়া যায় না। 'মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া' কেটে বিরাট পরিবারের মধ্যে থেকে সুবর্ণলতা তাদের শুধু উদ্ধার করেই এনেছে, 'আশ্রয়' দিতে পারে নি।

শুধু যেন ছড়িয়ে ফেলে রেখেছে!

তাদের সদ্য-উন্মেষিত জ্ঞানচক্ষুর সামনে অহরহ উদ্ঘাটিত হচ্ছে মা বাপের দাম্পত্যলীলার যুদ্ধ আর সন্ধির বহু কলঙ্কিত অধ্যায়।

তারা জানে, তারা সুবর্ণলতার স্বপ্ন-সাধনার বস্তু নয়, যুদ্ধের হাতিয়ার মাত্র।

এই অদ্ভুত যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে যত বেশি ধাক্কা খাচ্ছে তারা, তত বেশি বিতৃষ্ণ হচ্ছে, তত বেশি আঘাত হানছে।

পারু পড়তে চায়, কিন্তু পারুর পড়াকে কেন্দ্র করে সুবর্ণলতা যে ঘূর্ণিঝড় তোলে, সে ঝড়ের ধুলো-জঞ্জালের দিকে তাকিয়ে পারু পড়ায় বীতস্পৃহ হয়।

পারু নিজেই বেঁকে বসে।

পারু প্রতিজ্ঞা করে, 'লাঠালাঠি' করে আদায় করা বস্তুকে গ্রহণ করে কৃতার্থ হবে না সে! পারুর আত্মমর্যাদাজ্ঞান তীব্র গভীর!

কিন্তু প্রবোধের পক্ষে মেয়ের সেই প্রতিজ্ঞা জানার কথা নয়। তাই প্রবোধ মায়ের প্রশ্নে অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, 'তোমার মেজবৌ যে বলে গো, আজকাল আর অত সকাল সকাল বিয়ে নেই! বরং একটু লেখাপড়া—'

মুক্তকেশী অবশ্য এতে বিচলিত হয় না। মুক্তকেশী দৃপ্তগলায় বলেন, 'কী বললি লক্ষ্মীছাড়া বামুনের গরু! মেয়ের এখন বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া শেখাতে বসবি? তা বলবি বৈকি, তোর উপযুক্ত কথাই বলেছিস! চিরটাকাল তো হালকা বুদ্ধিতেই চললি!'

না, এখন আর 'বৌয়ের বুদ্ধিতে চললি' বললেন না বুদ্ধিমতী মুক্তকেশী। বললেন, 'হালকা বুদ্ধিতে চললি।'

প্রবোধ অবশ্য প্রতিবাদ করে না।

মুক্তকেশী বলেন, 'ওসব কথা বাদ দে, কোমরে কসি গুঁজে লেগে যা। গলার কাঁটা উদ্ধার না হলে তো ছেলেদের বিয়ে দিতে পারবি না? এদিকে মেয়ে নিয়ে লোকে আমায় সাধাসাধি করছে! আমি থাকতে ছেলের বিয়ে দিবি, এই আমার সাধ! সুবোটার তো প্রথম দিকে শুধু মেয়ের পাল।'

কথাটা শেষ হবার আগেই গলার কাঁটা ঘর থেকে বিদায় নেয়, আর সুবর্ণলতা একটু ক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলে, 'হুকুম তো একটা করে বসলেন। কিন্তু ছেলেদের এক্ষুনি বিয়ে কি? পাসই করেছে, রোজগার তো করতে শেখেনি। কানুর তো পড়াও শেষ হয়নি।'

কানু ডাক্তারী পড়ছে, কাজেই তার পাস করে বেরোতে দেরি। মুক্তকেশী সেই কথার উল্লেখ করে ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলেন, 'ছেলে ডাক্তার হয়ে বেরুলে তবে বিয়ে দেবে মেজবৌমা? তার থেকে বল না কেন, ছেলের এখনো চুল পাকেনি, বিয়ে দেব কি? ছেলেরা রোজগার না করলে বৌরা এসে তোমার সংসারে দুটি ভাত পাবে না?'

সুবর্ণলতা শান্ত গলায় বলে, 'ভাত কেন পাবে না? তবে ভাতটাই তো সব নয় মা!'

'আহা, হলো না হয় গহনা কাপড়ই সব', মুক্তকেশী জিদের গলায় বলেন, 'সে তুমি ছেলের বিয়ের সময় বেহাইয়ের গলায় গামছা দিয়ে দশ বছরের মতন আদায় করে নেবে। ততদিন তোমার ছেলে অবিশ্যিই উপায়ী হবে!'

সুবর্ণলতা আরো নম্র হয়। তবু দৃঢ়গলায় বলে, 'সে তো অনিশ্চিত। রোজগারপাতি না করলে—'

'দেখ মেজবৌমা, তক্কে তোমার সঙ্গে জিততে পারব না আমি, তবে গুরুজন হিসেবেই বলছি, বামুনের ছেলে, খেটে খেতে না পারে ভিক্ষে করে খাবে, তাতে লজ্জা নেই। বিয়ে একটা "সংস্কার", সেটা সময়ে দরকার! তবে সব আগে তোমার ওই তালগাছকে পার করো—'

সুবর্ণলতা উঠে দাঁড়ায়।

বলে, 'রোদ থেকে এসেছেন, ডাব আনি একটা—'

ডাবে ছোঁওয়া লাগে না, তাই মুক্তকেশীর আসার আশায় প্রায়শই ডাব মজুত থাকে। সুবর্ণলতারই ব্যবস্থা।

ডাব, গঙ্গাজল, আর তসরের থান।

কাপড় ছেড়ে হাতেমুখে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ডাবটি খেয়ে ছেলের সংসারের কল্যাণ করেন মুক্তকেশী।

আজ কিন্তু 'হাঁ-হাঁ' করে উঠলেন।

বললেন, 'থাক্ থাক্, আজ থাক্—'

সুবর্ণলতা তবু 'থাকবে কেন' বলে চলে গেল।

আর সুবর্ণলতা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সহসা গলা নামালেন মুক্তকেশী। ফিসফিস করে কী যেন বললেন ছেলেকে, ঈষৎ চমকে উঠলো ছেলে, মুখে যেন বিপন্নভাবের ছায়া পড়লো তার, বারকয়েক মাথা নাড়লো 'আচ্ছা' এবং 'না' বাচক, তার পর—সাবধান হয়ে সোজা হয়ে বসলো।

সুবর্ণলতার অঞ্চলপ্রান্তের আভাস দেখা গেছে।

প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যেই যেন গলাটা আবার তুললেন মুক্তকেশী, বললেন, 'আজ আর বসবো না বেশিক্ষণ, "বুদো"র জন্যে একটা কনে দেখতে যাবার কথা আছে সুবোর, দেখি গে! বললাম একা না ভ্যাকা, বাপ-কাকা যাক, তা পেকা ভেকা দুজনেই ঘাড় নাড়লো। ছেলের বিদ্যেবুদ্ধি কম, তার বিয়ের কথা কইতে ওনাদের মান্যে আঘাত লাগবে। সুবো আমার ভালমানুষ—'

হঠাৎ ওঘর থেকে পারু এসে উদয় হয়, একটু তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে, 'ঠাকুমা বুঝি এবার ঘটকালি পেশা ধরেছ?'

মুক্তকেশী থতমত খান।

মুক্তকেশী অবাক হন।

কারণ, এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মুক্তকেশী, তবে সামলাতে তিনি জানেন। সামলে নিয়ে বলেন, 'ওগো অ মেজবৌমা, এ মেয়েকে আরো বিদ্যেবতী করতে চাও? এখুনি তো উকিল ব্যারিস্টারের কান কাটতে পারে গো তোমার মেয়ে! কথার কি বাঁধুনি! আমি নয় ঠাকুমা, ঠাট্টার সম্পর্ক ঠাট্টা করেছে। তবে অন্যক্ষেত্রে এরকম বোলচাল নিন্দের।'

'তোমার কাছে কোন্‌টাই বা নিন্দের নয় ঠাকুমা—', পারুল হেসে ওঠে, 'তোমাদের সবই বাবা অনাছিষ্টি! ইস্কুলে পড়লে বাচাল হয়, ইংরিজি শিখলে বিধবা হয়—'

'হয়, চোখের ওপর দেখছি লো! তোর বাবার নলিন কাকার নাতনী পান্তির অবস্থা দেখলি না? ঘটা করে মেয়েকে মেম রেখে ইংরিজি শেখানো হয়েছিলো, বিয়ের বছর ঘুরল না, মেয়ে বিধবা হল না?'

পারু ফট করে বলে বসে, 'কিন্তু জ্যাঠামশাই তো বড়দির জন্যে মেম রাখেন নি ঠাকুমা—'

বড়দি অর্থে মল্লিকা। যার সর্বস্ব গেছে।

মুক্তকেশী মুখ কালি করে বলেন, 'কুতর্ক করার বিদ্যেয় তুই যে দেখছি মা'র ওপরে উঠলি পারু! তোর বাপেরই জীবন অন্ধকার! যাই আজ উঠি।'

ডাব খেলেন না।

বললেন, পেট ভার।

কিছু উৎকৃষ্ট গোবিন্দভোগ চাল, এক বোতল গাওয়া ঘি, পোয়াটাক সাগু, এক সের মিশ্রী, গোটাপাঁচেক টাকা, আর—একখানা নতুন গামছা নিয়ে আবার পালকিতে চড়ে বসলেন মুক্তকেশী। ছেলের বাড়িতে এলেই এসব জোটে তাঁর। ডাবটাও পালকিতে তুলে দিল সুবর্ণলতা।

পাল্‌কি বেয়ারাদের হাতে ছটা পয়সা দিতে যাচ্ছিলো প্রবোধ, মুক্তকেশী ছোঁ মেরে পয়সাটা কেড়ে নিলেন ছেলের হাত থেকে, খরখর ক'রে বলে উঠলেন, 'রেট্ বাড়াসনে পেবো বাপের পুণ্যে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছিস বলেই মা-লক্ষ্মীকে অবহেলা করিসনে। চার পয়সায় বরাবর যাচ্ছি-আসছি। দয়া-দাক্ষিণ্য করে তুমি দু পয়সা বেশি দিলে অন্যের তাতে ক্ষেতি করবে, তা মনে বুঝো! একবার বেশি পেলে আর কমে মন উঠবে?'

এবারে বেয়ারা চারটে কিন্তু প্রতিবাদ করে ওঠে, এবং প্রবোধও মায়ের দিকে করুণ মিনতি নিয়ে তাকায়, কিন্তু মুক্তকেশী অনমনীয়া!

সদর্পে বলেন, 'দুর হ! দূর হয়ে যা পালকি নিয়ে। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব? বলি পাল্‌কির বেত তো ছিঁড়ে ওয়ার হয়ে গেছে, পড়ে গিয়ে সোয়ারির হাড়গোড় না চূর্ণ হয়, ইদিকে পয়সার লালসটি তো খুব আছে? যাবি? না যাবি না?'

ওরা হাতের গামছাটা ঘাড়ে চাপাতে চাপাতে ব্যাজার মুখে বলে, 'যিবো না কাঁই?'

'বেশ। ওই চার পয়সাতেই যাবি।'

বীরদর্পে গিয়ে পাল্‌কিতে ওঠেন মুক্তকেশী।

পালকি বেয়ারাদের পরিচিত ধ্বনিটা শোনা যায় কাছ থেকে ক্রমশ দূরে।

আরো দূরে গিয়ে যেন একটা ক্ষুব্ধ হৃদয়ের চাপা আর্তনাদের মত শুনতে লাগে।

মুক্তকেশী যতক্ষণ ছিলেন, প্রবোধের প্রাণে যেন বল ছিল, মা চলে যেতেই মুখটা শুকিয়ে এল, কমে এল বুকের বল।

তবু কর্তব্য করতেই হবে।

তাই সুবর্ণলতার কাছে গিয়ে ইতস্তত করে বলে, 'মা তো একটা বার্তা দিয়ে গেলেন!'

সুবর্ণ অবশ্য এই 'বার্তা' সম্পর্কে বিশেষ উৎসুক হল না, শুধু মুখ তুলে তাকালো।

প্রবোধ "জয় মা কালী"র ভঙ্গীতে বলে ফেললো, 'তোমার বাবা যে ও বাড়িতে এক খবর পাঠিয়েছিলেন—'

সুবর্ণলতা চমকে ওঠে।

তোমার বাবা!

খবর পাঠানো।

এ আবার কি অভিনব কথা!

সুবর্ণলতার যে একজন বাবা এখনো অবস্থান করছেন এই পৃথিবীতে, সে কথা কে মনে রেখেছে?

সুবর্ণলতা চমকে ওঠে, কিন্তু প্রশ্ন করতে পারে না। প্রবোধই আবার বলে, 'মানে এ বাড়ির ঠিকানা তো জানেন না। তোমারও এক বগ্‌গা গোঁ, আমারও ইয়ে হয় না। বাপ বলে কথা! সে যাক, খবর পাঠিয়েছেন খুব নাকি অসুখ, তোমাকে একবার দেখতে চান—'

তোমাকে একবার দেখতে চান!

সুবর্ণর বাবা সুবর্ণকে একবার দেখতে চান?

এটা কি সন্ধ্যাবেলা?

এই একটু আগেই না দুপুর ছিল?

তবে এখন কেন চারিদিক ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আসছে?

সুবর্ণ সেই হঠাৎ অন্ধকার হয়ে আসা পারিপার্শ্বিকের দিকে অসহায়ের মত তাকায়।

এ দৃষ্টি বুঝি সুবর্ণলতার চোখে একেবারে নতুন। প্রবোধও তাই অসহায়তা বোধ করে। অতএব তাড়াতাড়ি বলে, 'আরে বেশি ভয় পাবার কিছু নেই, মানে বয়েস হয়েছে তো—মানে অসুখটা বেশি করেছে হঠাৎ, মানে আর কি—ইয়ে তোমার এখুনি একবার যাওয়া দরকার!'

সুবর্ণর চোখে জল নেই।

সুবর্ণর চোখ দুটো যেন ইস্পাতের।

সেই ইস্পাতের চোখ তুলে সুবর্ণ বলে, 'যাবার দরকার কি আছে এখনো?'

'বিলক্ষণ! নেই মানে?' প্রবোধ যেন ধিক্কার দিয়ে ওঠে, 'এই কি মান-অভিমানের সময়? যতই হোক জন্মদাতা পিতা—'

'সে কথা হচ্ছে না—', সুবর্ণ যেন কথাও কয় ইস্পাতের গলায়, 'বাবার মরা মুখ দেখতে যেতে চাই না আমি!'

বললো এই কথা সুবর্ণ!

কারণ সুবর্ণর সেই কথাটা মনে পড়লো। বহুবার মনে পড়া, আর ইদানীং ধূসর হয়ে যাওয়া, সেই কথাটা। সুবর্ণ যেদিন জলবিন্দুটি পর্যন্ত না খেয়ে চলে এসেছিল বাবার কাছ থেকে, বাবা বলেছিল, 'আচ্ছা, যেমন শাস্তি দিয়ে যাওয়া হলো, তেমন টের পাবে! এই বাপের মরামুখ দেখতে আসতে হবে।'

বলেছিল, বলে সুবর্ণকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠেছিল সুবর্ণর বাবা নবকুমার। আর একটাও কথা বলে নি।

সেই শেষ কথা!

সেই কথাটাই মনে পড়লো সুবর্ণর, তাই বলে ফেললো, 'মরা মুখ দেখতে যেতে চাই না আমি।'

প্রবোধ হাঁ-হাঁ করে ওঠে, 'কী আশ্চর্য, তা কেন ভাবছো? মানুষের অসুখ করে না?'

সুবর্ণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রবোধ বলে, 'কানু কলেজ থেকে—'

'কেন, কানু কেন?' সুবর্ণলতা বলে 'তুমি নিয়ে যেতে পারবে না?'

'আহা পারবো না কেন? তবে কথা হচ্ছে পারু একা থাকবে—'

'একা মানে?' সুবর্ণ সেই ঝকঝকে শুকনো চোখে চেয়ে বলে, 'পারু বকুল দুজনে নেই? মানু সুবল এরাও তো এসে যাবে এখুনি—'

'আহা ওরা আবার মানুষ! মানে—মা বলে গেলেন নেহাৎ খবরটা দিয়েছে, না গেলে ভালো দেখায় না—'

'থাক্, বেশি কথা ভালো লাগছে না, তুমি একখানা গাড়ি ডেকে দাও, আমি একাই যাবো—'

॥ পাঁচ ॥

'আমি নিজেই যাব!' এর চাইতে অসম্ভব কথা আর কি আছে?

সুবর্ণলতা পাগল তাই এমন একটা অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক কথা বলে বসেছিল। অস্বাভাবিক বৈকি। বিধবা বুড়ীরা কালীঘাট গঙ্গাঘাট করে বেড়ায়, সে আলাদা কথা। বলতে গেলে তারা বেওয়ারিশ। কমবয়সী বিধবারাও মাঝে মাঝে পথে বেরোবার ছাড়পত্র পায়, বুড়ীদের দলে মিশে যেতে পারলে।

'পথে' মানে অবশ্য তীর্থপথে।

অল্পবয়সে যারা সর্বস্ব হারিয়ে বসে আছে, সমাজের কাছে এটুকু কৃপা তারা পায়। অথবা সমাজের উপর এটুকু দাবি তারা রাখে। অবশ্য বুড়ীদের মধ্যে সপ্তরথী বেষ্টিত অবস্থায় তাদেব খিদমদগারী করতে করতেই যাওয়া।

তা হোক—তবু রাজরাস্তায় পা ফেলবার সৌভাগ্য!

কিন্তু সধবারা?

নৈব নৈব চ!

তারা তো আর বেওয়ারিশ নয় যে, যা খুশি করতে চাইলেই করতে পারে? তবে আর মেয়েতে পুরুষেতে তফাৎ কি? কাছাকোঁচা দিয়ে কাপড়ই বা পরবে না কেন তবে?

তবুও যদি সুবর্ণ বাইরের জগৎ থেকে নজীর এনে এনে দেখাতে চায়, যদি বলে, 'ওরা মেয়ে নয়? এই বাংলা দেশের মেয়ে?' তারও উত্তর আছে।

যারা বেহ্ম, যারা খ্রীষ্টান, যারা সনাতন ধর্মত্যাগী ইঙ্গবঙ্গ, যারা বাঙালী হয়েও 'সাহেব', তাদের ঘরের মেয়েরাই যা নয় তাই করছে। তাদের মেয়েরাই ডাক্তার হচ্ছে, মাস্টার হচ্ছে, দেশসেবিকা হচ্ছে, সমাজ-সংস্কারিকা হচ্ছে, হট-হট করে রাস্তায় বেরোচ্ছে, 'পিরিলি' করে শাড়ী পরছে, জুতো-মোজা পরছে। মেয়েদের মতন 'খেলাঘরে'র ছাতা হাতে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

তাদের মত হতে চাও তুমি? সেটাই আদর্শ?

গেরস্তঘরের মেয়েরা সবাই যদি বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে চায়, তাহলে সমাজ বলে আর রইল কি?

লাখ লাখ মেয়ের মধ্যে দু-পাঁচটা মেয়ে কি করছে, সেটাই দেখতে হবে? বাকি মেয়েরা কোথায় রয়েছে সেটা দেখ?

এই যে প্রবোধের ওপাড়ার বন্ধু শশীশেখরদের বাড়ি? সুবর্ণ জানে না তাদের কথা?… এখনো তাদের বাড়ির মেয়েরা চন্দ্র-সূর্য কেমন তা জানে না, ভাদ্রবৌরা কখনো ভাসুরের সামনে বেরোয় না। শশীশেখরের দাদা যখন বৈঠকখানার দিক থেকে অন্দরের দিকে আসেন বা তিনতলা থেকে একতলায় নামেন, ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পদক্ষেপ করেন না? ছোট একটা পেতলের ঘণ্টা থাকে না তাঁর হাতে?

কেন?

না, পাছে ভাদ্রবৌরা অনবহিত থাকে, পাছে অসতর্কতায় মুখ দেখা হয়ে যায়! তা ওরা না হয় একটু বেশী, কিন্তু প্রবোধের জানাশোনা আত্মীয় কুটুম্ব কাদের বাড়িতে সুবর্ণর ইচ্ছানুযায়ী বেহায়াপনা চালু আছে?

সকল বাড়িতেই ধোবানী, গয়লানী, মেছুনী, তাঁতিনী, নাপিতিনী। সব বাড়িতেই শাকওয়ালী, ঘুঁটেওয়ালী, চুড়িওয়ালী। অথচ সুবর্ণ নিজের বাড়িতে দুম্‌ করে একটা জোয়ানমর্দ গোয়ালা ঠিক করে বসলো সেবার! যুক্তি কি? না দুধ ভাল দেবে! নিকুচি করেছে ভাল দুধের! পত্রপাঠ বিদায় দিয়েছে তাকে প্রবোধ। পরিমলবাবুদের নজীর মানেনি!

নজীর দেওয়াই একটা রোগ সুবর্ণর।

আর নিজের গণ্ডীর নজীর ছেড়ে গণ্ডীর বাইরের নজীরে নজর।

তর্ক উঠলেই গড় গড় করে আউড়ে যাবে—বিধুমুখী, চন্দ্রমুখী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, সরোজিনী নাইডু, কামিনী রায়, জ্ঞানদানন্দিনী, লেডি অবলা বসু, আরো গাদাগুচ্ছির। মানবে না যে ওরা তোমার মত হিন্দু বাঙালীঘরের মেয়ে নয়। ঘরে বসে বসে এত খবর রাখেই বা কি করে কে জানে? মাঝে মাঝে তো তাজ্জব হয়ে যায় প্রবোধ। এই তো তার ঘরের মধ্যেই তো আছে চিরটাদিন, অথচ বাইরের খবর

প্রবোধের থেকে বেশী রাখে। পাড়া বেড়াতেও যায় না, পাঁচটা সখীসামন্তও আসে না, অথচ—

আশ্চর্য!

মেয়েমানুষের এত জানা, এত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর রাখা হচ্ছে অনর্থের মূল। ও থেকেই সন্তোষ নষ্ট, শান্তি নষ্ট, বাধ্যতা নষ্ট। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি বাপু? বিধাতাপুরুষ যখন গোঁফদাড়ি দিয়ে পাঠায়নি, তখন রাঁধোবাড়ো, খাওদাও, স্বামীপুত্তুরের সেবা কর, নিদেন না হয় হরিনাম কর কিংবা পরচর্চা কর। চুকে গেল ল্যাঠা। তা নয় লম্বা লম্বা বুলি, বড় বড় আম্বা!

তবে সেদিন সুবর্ণ এত কথা বলেনি। এসব ওর মতবাদ। যা মনে পড়ে' প্রবোধ একটা তর্কাতর্কির মুখোমুখি হবার ভয় করছিল।…কিন্তু তর্ক সুবর্ণ করেনি সেদিন, বেশী কথাও বলেনি, শুধু বলেছিল, 'আমি নিজেই যাব।'

প্রবোধ ভুরু কোঁচকালো।

আবার সোজা করলো সে ভুরু।

তারপর বললো, 'সে তো আর সম্ভব কথা নয়। তোমার যখন এতই ব্যস্ততা, তখন আমাকেই যেতে হবে পৌঁছতে।'

'না!'

'না? না মানে?'

'মানে নিজেই যাব, সেই কথাই হচ্ছে। ঠিকানা বলে দিলে গাড়োয়ান ঠিকই নিয়ে যেতে পারবে।'

'ঠিকানা?' প্রবোধ একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসে, 'শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা আর জানলাম কবে? জন্মের মধ্যে কর্ম, সেই তো একবার দরজা পর্যন্ত—আমি আবার ঠিকানা বলবো—'

সুবর্ণ উত্তাল অসহিষ্ণু চিত্তকে স্থির করে শান্তগলায় বলে, 'তোমায় বলে দিতে হবে না।'

প্রবোধ সুবর্ণর এই স্থিরতাকে ভয় করে।

প্রবোধ ভারী আবহাওয়াকে ভয় করে।

তাই প্রবোধ আবহাওয়াকে হাল্কা করে ফেলবার চেষ্টায় ছ্যাবলাগোছের হাসি হেসে বলে, 'তবে বলবেটা কে? তুমি? সেই মান্ধাতার আমলের স্মৃতি উট্‌কে? মাথা খারাপ! সে কি এখনো মনে আছে তোমার? কি বলতে কি বলবে—'

'এত কথা আমার খারাপ লাগছে। তোমায় গাড়ি ডেকে দিতেও হবে না, রাস্তায় বেরিয়ে আমি নিজেই—'

হঠাৎ থেমে গেল সুবর্ণ, গলাটা কি শত্রুতা সাধলো?

প্রবোধ বুঝলো একবার যখন ধরেছে, ঠেকানো যাবে না। বিশেষ করে পরিস্থিতিটা

গোলমেলে। তাই 'আচ্ছা আচ্ছা হচ্ছে' বলে বেরিয়ে পড়ে একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে এনে, সশব্দ সমারোহে বলে, 'পারু, দোরটা বন্ধ করে দিয়ে যা। ভাল করে দিবি, কেউ কড়া নাড়লে বারান্দা থেকে দেখে তবে—'

সুবর্ণ একখানা ফর্সা শাড়ি পরে নেমে এসেছিল ততক্ষণে, সুবর্ণর চোখ লালচে, মুখ লালচে, তবু সুবর্ণ দৃঢ়গলায় বলে, 'অত কথা হচ্ছে কেন ? বলেছি তো আমি নিজেই যাব।'

প্রবোধও অতএব দৃঢ় হয়, 'বললেই তো হল না ? কলকাতার রাস্তা বলে কথা তার ওপর মোছলমান গাড়োয়ান, কোন্ পথে নিয়ে যেতে কোন্ পথে টেনে ছুট দেবে—'

সুবর্ণ সহসা ঘুরে দাঁড়ায়, সিঁড়ির দিকে এগোয়, বলে 'ঠিক আছে, যাব না।'

'আরে বাবা হলটা কি ? বলছি তো নিয়ে যাচ্ছি—'

'না না না!'

সুবর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়।

'ধেত্তারি নিকুচি করেছে—,' প্রবোধ জেরবারের গলায় বলে, 'আমি শালা সবতাতেই চোরদায়ে ধরা পড়েছি। চুলোয় যাক, আমার কি ?'

তারপর গট গট করে বেরিয়ে গাড়োয়ানটার হাতে একটা এক আনি দিয়ে বলে, 'দরকার লাগবে না বাবা, যা!'

দোতলায় উঠে এসে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গলা তুলে বলতে থাকে, 'বুঝলাম মন খারাপ, তবু সবেরই একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার। মা-বাপ তো তোমার জ্যান্তে মরা, এখন যে "অসুখ" বলে খবর পাঠিয়েছে সেটাই আশ্চর্য!'

ঘরের মধ্যে থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, দেখাও যায় না কোণের দিকে কোথায় বসে আছে।

নিজেরই তো ঘর, তবু কেন কে জানে হঠাৎ ঢুকে পড়বারও সাহস হয় না। বাইরে থেকেই আরো কিছুক্ষণ স্বগতোক্তি করে আস্তে আস্তে নীচের তলায় নেমে গিয়ে বৈঠকখানা ঘরে বসে থাকে।

'বাবা—'

অনেকক্ষণ পরে বকুল এসে ঘরে ঢোকে।

যেন খুব একটা বিচলিত দেখায় তাকে।

বলে ওঠে, 'বাবা, মা কোথায় ?'

মা কোথায়!

এ আবার কেমন ভাষা!

প্রবোধ কাছা সামলাতে সামলাতে উঠে পড়ে, 'তার মানে ?'

বকুল শুকনো গলায় বলে, 'কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত হিমপ্রবাহ বয়ে যায়, তবু মেয়ের সামনে "অবিচলিত" ভাব দেখাতে চেষ্টা করে প্রবোধ, 'ছাতে উঠে বসে আছে বোধ হয়।'

'না। ছাতে দেখে এসেছি।'

হ্যাঁ, সর্বত্রই দেখেছে ওরা।

ছাতে, স্নানের ঘরে, ঘুঁটে-কয়লার ঘরে, এমন কি ঝিয়ের বাসনমাজার গলিতে পর্যন্ত।

কোথাও নেই সুবর্ণলতা!

॥ ছয় ॥

নবকুমার বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে আছেন।

নবকুমার হয়তো আশা ছেড়েই পড়ে আছেন।

ওদের বাড়িতে খবর দেবার পর থেকেই প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করছেন, আশা করছেন, দরজাটা বাতাসে নড়লেও চমকাচ্ছেন, আবার বারেবারেই হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলছেন, 'সে আর এসেছে!···আসবে না কক্ষনো। আসবে না।'

এমনি অনেক যন্ত্রণাময় মুহূর্ত পার করে, অনেক হতাশ নিশ্বাস ফেলে যখন নবকুমার প্রায় শেষ নিশ্বাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন সহসা শুনতে পেলেন, 'এসেছে!'

এসেছে সুবর্ণ!

নবকুমারের মেয়ে!

নবকুমারের জীবন থাকতে যে কোনোদিন এল না।

নবকুমারের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, নবকুমার ক্ষীণকণ্ঠে কি যে বললেন, বোঝা গেল না।

তারপর নবকুমার আর একটু সচেষ্ট হলেন, আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে কথা বললেন, বোঝা গেল।

নবকুমার বললেন, 'সেই এলে, শুধু সব যখন শেষ হয়ে গেল!'

সুবর্ণ ডুকরে কেঁদে উঠতে পারতো, কিন্তু সুবর্ণ তা করল না।

সুবর্ণ শুধু মাথাটা নিচু করলো।

সুবর্ণ কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরলো।

নবকুমার বললেন, 'আমি আর বেশিদিন নেই সুবর্ণ, বুঝতে পারছি ডাক এসেছে।'

সুবর্ণ মাথা তুলে একবার তাকালো, আবার মাথাটা নিচু করলো।

নবকুমার আস্তে থেমে থেমে বললেন, 'জানি ক্ষমা চাওয়ার কথা আমার মুখে আনা

উচিত নয়, তবু এই শেষকালে তোর কাছে একবার ক্ষমা না চেয়ে মরতেও তো পারছি না।'

'বাবা!' সুবর্ণ রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'ও কথা বলে আমায় শাস্তি দেবেন না বাবা।'

'শাস্তি নয় রে সুবর্ণ, এ একেবারে সত্যিকার অপরাধীর কথা! যে অপরাধ আমি তোর কাছে করেছি—'

সুবর্ণ আরো কাছে সরে আসে, আরো রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'তাই যদি হয়, তার শাস্তিও কম পাননি বাবা!'

'তা বটে!' নবকুমারের নিষ্প্রভ দুটি চোখ দিয়ে আর এক ঝলক জল গড়িয়ে পড়ে, 'সে কথা মিথ্যে নয়! এক-একসময় মনে হতো, বুঝি বা লঘু পাপে গুরু দণ্ডই হয়েছে আমার! আবার যখন তোর জীবনটা দেখেছি, তখন মনে হয়েছে, নাঃ, এ দণ্ড আমার ন্যায্য পাওনা! তবে একটা কথা বলে যাই যে, যা করেছি, না বুঝে করেছি! বুঝে জেনে অত্যাচার করতে করিনি! কিন্তু সেই একজন তা বুঝল না কোনোদিন—'

নবকুমার থামলেন, জলের গ্লাসের দিকে তাকালেন।

সুবর্ণ জল দিতে গেল, দিতে পেল না, সাধনের বৌ এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি মুখের কাছে গেলাসটা ধরে বলে উঠলো, 'এই যে বাবা, জল খান।'

নবকুমার মুখটা কোঁচকালেন।

নবকুমার আধ ঢোক জল খেয়ে সরিয়ে দিলেন, তারপর বললেন, 'ক্ষমা করতে যদি পারিস তো—'

'বাবা, আপনি চুপ করুন। আমি সব বুঝতে পারছি। আপনার কষ্ট, আপনার দুঃখ, সব বুঝেছি!'

নবকুমার একটা নিশ্বাস ফেললেন, তারপর বললেন, 'ক্ষমা চাইলাম, সারা জীবনে তো পারিনি, এখন এই মরণকালে—তবু, আমার নিজের জন্যে তোকে ডাকিনি সুবর্ণ, ডেকেছিলাম এইটা দিতে!...হাতটা তোশকের তলায় ঢুকিয়ে একটু বুলিয়ে নিয়ে টেনে বার করলেন একটা ভারী খাম। বললেন, 'এইটা আগলে নিয়ে বসে আছি, তোকে দেব বলে।'

সুবর্ণ হাত বাড়ায় না।

সুবর্ণ কি এক সন্দেহে আরক্ত হয়ে ওঠে।

সুবর্ণ অস্ফুটে বলে, 'কী এ?'

নবকুমার বোধ করি বুঝতে পারেন। তাই তার সন্দেহভঞ্জন করেন। সামান্য একটু হাসির গলায় বলেন, 'ভয় নেই, দলিল নয়, দানপত্র নয়। শুধু চিঠি।'

'চিঠি!'

'হ্যাঁ।'—নবকুমার কাঁপা গলায় বলেন, 'তোর মা'র চিঠি!'

মা'র চিঠি!

মা'র চিঠি!

সুবর্ণর মা'র চিঠি!

কাকে লেখা?

সুবর্ণকে নয় তো!

হুঁ, তাই আবার হয়? হতে পারে? সুবর্ণর এত ভাগ্য?

কি জানি কি!

সুবর্ণ তাই নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে। নবকুমার হাতের উল্টোপিঠে চোখটা মুছে নিয়ে বলেন, 'চিরদিনের একবগ্‌গা মানুষ, কি ভেবে কি করে কেউ বোঝে না। কখনো কোনো বার্তা করে না! তোর ছোড়দা যাই ওদিকে কাজ নিয়েছে, তাই জানতে পারি বেঁচে আছে। হঠাৎ একবার তার হাত দিয়েই দুটো চিঠি পাঠালো, একটা আমাকে লেখা, একটা তোকে লেখা—'

'বাবা, আপনার কষ্ট হচ্ছে, একসঙ্গে বেশি কথা বলবেন না।'

'না রে সুবর্ণ, আর আমার কোনো কষ্ট নেই, তুই ক্ষমা করিস আর নাই করিস, আমি যে তোর কাছে ক্ষমা চাইতে পারলাম, এতেই মনটা বড় হালকা লাগছে। এবার শান্তিতে মরতে পারবো।...হ্যাঁ সেই চিঠি—'

হ্যাঁ, সেই চিঠির একখানা নবকুমারের, একখানা সুবর্ণর।

'একবগ্‌গা' সত্যবতীর নাকি কড়া নিষেধ ছিল তার জীবৎকালে যেন এ চিঠি খোলা না হয়। মৃত্যুসংবাদটা অবশ্যই পাবে নবকুমার, তখন সুবর্ণরটা সুবর্ণকে পাঠিয়ে দেবে, নিজেরটা খুলে পড়বে।

সে সংবাদ এসেছে—

না, শেষরক্ষা হয় নি।

সুবর্ণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পারেনি। সুবর্ণ তীব্র তীক্ষ্ণ একটা ডাকের সঙ্গে ভেঙে পড়েছিল। ডাক নয় আর্তনাদ। 'বাবা!'

শুধু ওই!

শুধু 'বাবা' বলে একটা তীব্র আর্তনাদ! তারপর স্তব্ধতা।

পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধতা!

পাশের ঘরে প্রবোধ তখন তার শালাজকে প্রশ্ন করছে, 'কী হয়েছিল বললেন?...কিছু হয় নি? আশ্চর্য তো! একেই বলে পুণ্যের শরীর! তবে আপনাদেরও বলি—যতই যেমন হোক 'মা' বলে কথা! মরে গেল, আপনারা একটা খবর দিলেন না! বলি চতুর্থীটাও তো করতে হতো আপনার ননদকে!'

হ্যাঁ, প্রবোধ এসে পড়েছে বৈকি ! উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটে এসেছে, সুবর্ণলতার নিরুদ্দেশ সংবাদে।

শালাজ মৃদুস্বরে বলে, 'কি বলবো বলুন ? হাত-পা বাঁধা যে ! কড়া হুকুম দেওয়া ছিল তাঁর মৃত্যু-খবর না পাওয়া পর্যন্ত যেন বাবার চিঠিটা খোলা না হয়, আর ঠাকুরঝির চিঠি ঠাকুরঝিকে দেওয়া না হয়। আর চতুর্থী করার কথা বলছেন ? সেও তো কড়া হুকুম ছিল, তাঁর জন্যে কেউ যেন অশৌচ পালন না করে।'

প্রবোধ কৌতূহলী হয়ে বলে, 'সন্ন্যাস নিয়েছিলেন বুঝি ?'

'না না, তা তো কই শুনিনি। নাকি বলেছিলেন, বহুকাল সংসারকে ত্যাগ করে এসেছি, তার সুখ-দুঃখের কোনো দায়ই নিয়নি, এতকাল পরে মরে তাদের গলায় এত বড় একটা দুঃখের দায় দিতে যাব কেন ?'

'তা ভাল !' প্রবোধ বলে, 'ওই মানুষটির সৃষ্টিছাড়া বুদ্ধির জন্যেই দু-দুটো সংসার মজলো ! এই তো শ্বশুরমশায়েরও তো "গঙ্গাপানে পা" দেখতে পাচ্ছি—'

সাধনের বৌ বলে, 'তা সেও ওই একই কারণ ! যেই না খবর এল ওনার কাশীলাভ হয়েছে, শ্বশুরঠাকুর যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন। বলতে গেলে সেই যে শুয়ে পড়েছিলেন, সেই শোয়াই এই শেষ শোয়া ! কবরেজ তো বলেছে বড় জোর আর দু-চারটে দিন !'

প্রবোধ কখনো শালাজ রসের আস্বাদ পায়নি, তাই প্রবোধ কথা থামাতে চায় না, কথার পিঠে কথা গেঁথে গেঁথে চালিয়ে যায় আলাপ, আর সেই সূত্রেই জানতে পারে, রোগবালাই কিছুই ছিল না নবকুমারের, এখনো এই বয়সেও এতগুলি করে খেতে পারতেন, নিজে বাজারে না গিয়ে থাকতে পারতেন না, আর গিয়ে রাজ্যের শাক-পাতা কিনে এনে বলতেন, 'রাঁধো', আর সেইগুলো খেয়ে হজম করতেন। মেজাজটা অবিশ্যি তিরিক্ষি ছিল, তা সে তো বরাবরই ছিল। সুধীরবালা বিয়ে হয়ে পর্যন্তই তো দেখছে, সর্বদাই যেন মেজাজ 'টঙে' চড়ে বসে আছে। কিন্তু স্বাস্থ্য, শক্তি ছিল। অথচ স্ত্রী মারা যেতেই একেবারে গুঁড়ো হয়ে পড়লেন।

প্রবোধ এসব শুনে-টুনে মুচকি হেসে মন্তব্য করে, 'ভেতরে ভেতরে এখনো এত ছিল ?'

সাধনের বৌ মৃদু হাসে।

প্রবোধ আবার বলে, 'তবে উচিত ছিল পায়ে ধরে সেধে নিয়ে আসা।'

বৌ মাথা নাড়ে।

'মাথা খুঁড়লেও আসতেন না। শুনেছি তো প্রকৃতির কথা। তাঁর নিজের ছেলের কাছেই শুনেছি। একেবারে অন্য ধরনের—'

'হুঁ ! মেয়েটিও তাই হয়েছেন !' প্রবোধ আক্ষেপ করে বলে, 'আপনার কাছে বলেই বলছি—আপনার ননদটিও ঠিক তাই। একেবারে সৃষ্টিছাড়া ! আমি শালা চিরকাল চোর হয়ে আছি মহারাণীর মেজাজের কাছে। অথচ এই তো আপনি—দিব্বি সোজাসুজি !'

'কী করে জানলেন ?' শালাজ হাসে, 'জন্মে তো এই একবার দেখলেন ?'

'তাতে কি ? পাকা রাঁধুনীরা হাঁড়ির একটা ভাত দেখলেই বুঝতে পারে কেমন সেদ্ধ হয়েছে। যাক্, শ্বশুরমশাইয়ের অবস্থা তাহলে শেষাবস্থা ?'

'তাই তো বললে কবরেজ। তা বয়েসও তো হয়েছে—'

প্রবোধ কথাটা লুফে নেয়। হেসে ওঠে।

'তা বটে! তবে কিনা রোগবালাই হল না, পত্নীশোকে প্রাণটা গেল, এটাই যা দুঃখের কথা! ত্রেতাযুগে রাজা দশরথের পুত্রশোকে প্রাণ গিয়েছিল. আর কলিযুগে এই আমাদের শ্বশুরঠাকুরের পত্নীশোকে—' টেনে টেনে হাসতে থাকে প্রবোধ, যেন ভারী একটা রসিকতা করেছে।

'ঠাকুঝিকে কি রেখে যাবেন ?'

ঠাকুরজামাইকে জামাইজনোচিত জলখাবারে আপ্যায়ন করে শালাজ প্রশ্ন করেন।

প্রবোধ হাত উল্টে বলে, 'সে আপনার ঠাকুরঝির মনমর্জি। যদি বলেন "থাকবো", পৃথিবী উল্টে গেলেও রদ হবে না। যদি বলেন "থাকবো না". পায়ে মাথা খুঁড়লেও বদলাবে না—'

সুধীরবালা হাসে, 'আপনি তো তাহলে বেশ মজায় আছেন বলুন ?'

'হুঁ! সে কথা আর বলতে! মজা বলে মজা! তবে আপনার কি মনে হয় ? আজ রাত্তিরের মধ্যেই কিছু হয়ে-টয়ে যাবে ?'

সুধীরবালা মাথা নাড়ে।

বলে, 'আজ-কালের মধ্যেই কিছু হবে বলে অবিশ্যি মনে হয় না। কেন, একরাত্তিরও গিন্নীকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না বুঝি ?'

'কী যে বলেন ? এই বয়সে আবার অত—', প্রবোধ হা-হা করে হাসতে থাকে, 'তা ছাড়া আপনার ঠাকুরঝিটি তেমনি কিনা! একটি পুলিস সেপাই!'

প্রবোধেরও একটা দুঃখের দিক আছে বৈকি! প্রবোধ দেখে সংসারের সবাই দিব্বি সহজ স্বাভাবিক, শুধু বেচারা প্রবোধের বৌটাই সৃষ্টিছাড়া। আজীবন এই দুঃখেই জ্বলে মলো বেচারা।

এই তো একটা মেয়েমানুষ! সুবর্ণলতার মত অত রূপ না থাক, দিব্বি মেয়েলী লাবণ্য রয়েছে, মেয়েলী কথাবার্তা, প্রাণটা সহজ হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। আর সুবর্ণ ? তার দিকে যেতেই তো ভয় করছে! বাপ-বিটিতে তো কোনোকালেও মুখ দেখাদেখি নেই, অথচ মরছেন খবর শুনে দিশেহারা হয়ে একা ছুটে এলেন! কত বড় দুর্ভাবনা গলায় গেঁথে দিয়ে এলি তা ভাবলি না!

প্রবোধ যেন কেউ নয়!

প্রবোধকে যেন চিনতে পারছে না!

কে বলতে পারে নিয়ে যাওয়া যাবে কি, বাপের রোগশয্যে আঁকড়ে পড়ে থাকবে!

বিপদের ওপর বিপদ!

এই সময় আবার মাতৃশোক-সংবাদ!

মা'র সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না, অথচ ভেতরে ভেতরে তো ভক্তির সমুদ্দুর ভরা ছিল প্রাণে!

তা কপালই বলবো।

একই সঙ্গে মাতৃপিতৃ-বিয়োগ!

মা মরেছে আজ দশ-বিশ দিন, খবর নেই বার্তা নেই! এখন একেবারে—

প্রবোধেরই গেরো!

গেরো কি সোজা! তিনি যতই বলে যান, তাঁর মরণে কেউ যেন 'অশৌচ' না নেয়, সমাজ তা মানবে? এখুনি তো প্রবোধকে মায়ের কাছে ছুটতে হবে—নিয়মকানুন জানতে। তারপর পুরুতবাড়ি!

বেঁচে থেকে কোনোকালে উপকার করলেন না শ্বশুর-শাশুড়ী, এখন মরে যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছেন।

একেই বলে পূর্বজন্মের শত্রুতা।

প্রবোধের দিক থেকে এসব যুক্তি আছে বৈকি

কিন্তু সুবর্ণ!

সুবর্ণ কোন্ যুক্তি দিয়ে ক্ষমা করবে তার মাকে?

মরে গিয়ে তবে সুবর্ণকে উদ্দিশ করে গেল মা? চিঠিখানা পড়ে উত্তর দেবার পথটা পর্যন্ত না থাকে?

কেন? কেন? কেন মা আজন্ম এভাবে শত্রুতা করল সুবর্ণর সঙ্গে?

ত্যাগই তো করেছিলে, মরে গেল তবু জানতে পেল না সুবর্ণ, এখন তবে আবার কেন একখানা চিঠি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে যাওয়া?

•

প্রবোধের ভয় অমূলক!

সুবর্ণ থাকতে চাইল না।

সুবর্ণ বাপের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। বললো, 'এই শেষ দেখা দেখে গেলাম বাবা। শাপ দিয়েছিলে মরা মুখ দেখতে, সেটুকু থেকে যে অব্যাহতি পেলাম, সেই পরম ভাগ্যি।'

'আর আসবি না?'

সুবর্ণ তার সেই বড় বড় চোখ দুটো তুলে বললো, 'আর এসে কী করবো বাবা? আর আসতে ইচ্ছে নেই। মনে জানবো একই দিনে মা-বাপ হারিয়েছে হতভাগী সুবর্ণ।'

অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

যেন সেই পরলোকগতার পিছু পিছু ছুটে গিয়ে ফেটে পড়ে বলতে ইচ্ছে করছে—কেন? কেন? কী অপরাধ করেছিল তোমার কাছে সুবর্ণ যে এত বড় শাস্তি দিলে তাকে?

॥ সাত ॥

সুবর্ণলতা বলেছিল, 'মনে জানবো একই দিনে মা-বাপ হারালাম আমি!'

কিন্তু মা বাপ কি ছিল সুবর্ণর? তাই হারানোর প্রশ্ন?

কবে ছিল?

কবে পেয়েছে সেই থাকার প্রমাণ?

তবে?

যে বস্তু ছিল না, তার আর হারাবার প্রশ্ন কোথায়?

তবু নির্বোধ সুবর্ণলতা অসীম নক্ষত্রে ভরা আকাশের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে একটি নতুন নক্ষত্রের সন্ধান করতে করতে সেই বলে-আসা কথাটাই আবার মনে মনে উচ্চারণ করে, 'একই দিনে মা-বাপ-দুই-ই হারালাম আমি!'

কোনো এক নতুন নক্ষত্র কি শুনতে পাবে সে কথা? আর শুনতে পেয়ে হেসে উঠবে? বলবে, 'যা ছিল না তাই নিয়ে হারানোর দুঃখ উপভোগ করতে বসলি তুই? ছি, ছি!'

সুবর্ণলতা সে হাসি সে কথা শুনতে পাবে না হয়তো। তাই সুবর্ণলতা ওই আকাশটা থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

এ বাড়িতে আকাশ আছে।

সুবর্ণলতার এই গোলাপী-রঙা দোতলায়। কারণ এ বাড়িতে আছে ছাদে ওঠার সিঁড়ি। আছে দক্ষিণের বারান্দা। যে বারান্দায় বাতাসের অফুরন্ত দাক্ষিণ্য, যে ছাদে অন্তহীন অন্ধকারের নিবিড় গভীর প্রগাঢ় প্রশান্তি।

ছাদেই তো মুক্তি!

এখানে—ঊর্ধ্বসীমায় স্থির হয়ে আছে সেই অসংখ্য নক্ষত্রের মালা-পরানো নির্মল আকাশ।

সুবর্ণলতার কি তবে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নয়? যদি না দেয় তো সুবর্ণ অকৃতজ্ঞ।

কিন্তু সুবর্ণ অকৃতজ্ঞ নয়।

তাই সে যখন সেই অন্তহীন অন্ধকারের মাঝখানে উঠে এসে দাঁড়ায়, তার হৃদয়ের শান্ত ধন্যবাদ উঠে আসে একটি গভীর নিঃশ্বাসের অন্তরাল থেকে।

এখানে ছাদে উঠে আসতে পারে সুবর্ণলতা।

আর সেটা পারে বলেই দু'দণ্ডের জন্যেও অন্তত ভুলে থাকতে পারে—সুবর্ণলতা নামের মানুষটা হচ্ছে একটা কর্মে উত্তাল আর শব্দে মুখর স্থূল আর ক্ষুদ্র সংসারের গৃহিণী। ভুলে থাকতে পারে, সেই সংসার তার স্থূলতা আর ক্ষুদ্রতা নিয়ে অহরহ সুবর্ণলতাকে ডাক দিচ্ছে। তার দায় এড়াবার উপায় নেই সুবর্ণলতার।

তবু আজ বোধ হয় আর কেউ ডাক দিতে আসবে না।

আজ সুবর্ণলতাকে বোধ হয় কিছু কিঞ্চিৎ সমীহ করবে সুবর্ণলতার ছেলেমেয়েরা!

ডাক দেবে না, অতএব সুবর্ণলতা স্তব্ধ হয়ে বসে মনে ভাবতে পারে, মা ছিল তার! রাজরাজেশ্বরী মা!

ছিল সুবর্ণর সমস্ত চেতনার মধ্যে, সমস্ত ব্যাকুলতার মধ্যে, সমস্ত অনুভবের মধ্যে। মূর্খ সুবর্ণলতা শুধু একটা মূঢ় অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে সেই মায়ের দিক থেকে।

নইলে একবার কি সবদিকের সব মান অভিমান ধুলোয় বিকিয়ে দিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়া যেত না? বলা যেত না, 'মা, তোমায় একবার দেখবার জন্যে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল তাই চলে এলাম!'

সুবর্ণ তা করে নি।

সুবর্ণ তার অভিমানকেই বড় করেছে। সুবর্ণ ভেবেছে, 'মা তো কই একবারও ডাক দেননি।'

সুবর্ণ ভেবেছে, 'স্বামীর কাছে হেঁট হব না আমি!'

তাই সুবর্ণর মা 'ছিল না'।

এখন সুবর্ণলতা সব মান-অভিমান ধূলোয় লুটিয়ে দিলেও আছড়ে পড়ে বলতে পারবে না সেই কথাটি।

'মা, তোমাকে একবার দেখবার জন্যে মরে যাচ্ছিলাম আমি।'

কিন্তু অভিমান কি দূর হয়?

এখনো তো বাপের উপর একটা দুরন্ত অভিমানে পাথর হয়ে আছে সুবর্ণ। সেই পাথর যদি ফেটে পড়তো তো, হয়তো কপাল কুটে কুটে চীৎকার করে উঠতো, 'কেন? কেন তোমরা সবাই মিলে আমাকে ঠকাবে? কেন এমন করে নিষ্ঠুরতা করবে আমার সঙ্গে? কী ক্ষতি হতো যদি তোমরা সুবর্ণলতার মায়ের চিঠিটা সুবর্ণলতাকে চুপি চুপি পাঠিয়ে দিতে?'

যদি বলতে, 'সুবর্ণ রে, তোর মা বলেছে, সে মরে না গেলে চিঠিটা না দিতে, কিন্তু আমি পারলাম না অত নিষ্ঠুর হতে, আমি দিয়ে গেলাম তোকে। এখন তুই বোঝ, খুলবি কি খুলবি না!'

সুবর্ণ বুঝতো!

কিন্তু সুবর্ণর বাবা তা করে নি।

আর সুবর্ণর মা তার চিঠির জবাব চায় না বলে, বলে গেছে—'আমি মরলে তবে দিও সুবর্ণকে!'

কী দরকার ছিল এই মুষ্টিভিক্ষায়?

সারা শরীর তোলপাড়-করা একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন সেই পাথরকে ভাঙতে চাইছে।

হাতের মুঠোর মধ্যে বন্ধ রয়েছে সেই মুষ্টিভিক্ষার নমুনাটুকু।

বন্ধ খাম বন্ধই রয়েছে।

সুবর্ণলতা খুলবে না ও খাম, দেখবে না কী লেখা আছে ওতে।

নিরুচ্চার থাক্ সুবর্ণলতার নিষ্ঠুর মায়ের নিষ্ঠুরতার নমুনাটা!

মাকে বাদ দিয়েও যদি এত বড় জীবনটা কেটে গিয়ে থাকে সুবর্ণর, তো বাকী জীবনটাও যাবে।

সুবর্ণলতা ভাবুক, যে বস্তু ছিল না, তার আবার হারানো কি? সুবর্ণলতার মা নেই, মা ছিল না।

কিন্তু সত্যিই কি ছিল না?

কোনোদিনই না?

সুবর্ণলতার জীবনের ন'টা বছর একেবারে 'নয়' হয়ে যাবে?

সুবর্ণলতার সেই ন' বছরের জীবনের সমস্ত জীবনাকাশ জুড়ে নেই একখানি অনির্বাণ জ্যোতি? সেই জ্যোতির পরিমণ্ডলে ও কার মুখ?

সুবর্ণলতার মায়ের মুখ কি ভুলে গেছে সুবর্ণ?

সুবর্ণর জীবন-আকাশের সেই জ্যোতি চিরতরে মুছে গেছে? মুছেই যদি গেছে তো সুবর্ণলতা কোন্ আলোতে দেখতে পাচ্ছে ওই ফ্রক-পরা ছোট মেয়েটাকে?

যে মেয়েটা স্কুল থেকে ফিরেই হাতের বইখাতা নামিয়ে রেখে দুদ্দাড়িয়ে ছুটে এগিয়ে গেছে তার মায়ের কাছে দু হাত বাড়িয়ে?

'মা! মা! মা!'

মা অবশ্য হাঁ-হাঁ করে উঠেছে, 'ছুঁসনে, ছুঁসনে, ইস্কুলের জামা কাপড়—'

কিন্তু মায়ের চোখের কোণে প্রশ্রয়, মায়ের ঠোঁটের কোণে হাসি।

আর শোনে কেউ তাঁর মিথ্যে নিষেধের সাজানো বুলি! জড়িয়ে না ধরে ছাড়ে?

অন্ধকার, নিঃসীম অন্ধকার। এই অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে বুঝি ঐ ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে সুবর্ণ।

কিন্তু ওই অতল অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি তেমন চলে না। শুধু শব্দতরঙ্গ পড়ে আছড়ে আছড়ে।

সেই তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে সুবর্ণ।

শব্দ, শব্দ!

স্মৃতির কৌটোয় ভরা ছিল বুঝি স্তরে স্তরে? আজকের ধাক্কা লেগে তারা উঠে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে, নতুন করে ধ্বনিত হচ্ছে।

প্রথম ভোরে যে শব্দটা সেই ছোট মেয়েটার ঘুমের শেষ রেশকে সচকিত করে ধাক্কা দিয়ে যেত, সে হচ্ছে হাড়-পাঁজরা বার করা ঘোড়ায় টানা ময়লা-গাড়ির ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ।

অবিশ্রান্ত একটা জঞ্জালের স্তূপ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। আর শব্দ উঠছে ঝন্-ঝন্-ঝনাৎ। সেই শব্দের সঙ্গে আর এক শব্দ, 'সুবর্ণ এবার উঠে পড়।' সুবর্ণ অবশ্যই এক কথায় উঠে পড়ত না, তখন একটু মৃদু ধমক। কিন্তু সেই ধমকের অন্তরালে যেন প্রশ্রয়ের মাধুর্য। সুবর্ণ উঠে পড়তো, আর শব্দ শুনতে পেতো, মায়ের রান্নাঘরের বাসনপত্র নাড়ার শব্দ। সেই শব্দের মধ্যে মা মাখানো। দুপুরের নির্জনতায় আর একটা শব্দ উঠতো, 'ঠং, ঠং, ঠং।' বাসনওলা চলছে চড়া রোদ্দুরে, তার মাথার ওপর বাসনের ঝাঁকা, আর হাতে একটা কাঁসির সঙ্গে একটুকরো কাঠ। সেই কাঠটুকুতেই কাঁসির গা থেকে শব্দ উঠছে—'ঠং, ঠং, ঠং।'

সে শব্দ—

দুপুরের নির্জনতায় যেন একটা শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে যেত। মনটা হু-হু করে উঠতো। শেলেট পেনসিল রেখে মায়ের কাছে গিয়ে গা ঘেঁষে বসতে ইচ্ছে করতো।

মা বলতো, 'কি হল? লিখতে লিখতে উঠে এলি যে?'

মেয়েটা মায়ের গা ঘেঁষে বসে বলতো, 'এমনি।'

মা মেয়েটার ঝুমরো চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে স্নেহ-ভরা গলায় বলতো, 'এমনি মানে? এমনি কিছু হয় নাকি?'

মেয়েটা মায়ের গায়ে গাল ঘষে ঘষে বলতো, 'হয়, হয়! এই তো হলো!

তখন যদি দুপুরের সেই নির্জনতা ভেদ করে আবার হাঁক উঠতো, 'ট্যাপারি, টোপাকুল, নারকুলে কু—ল!'

অথবা হাঁক উঠতো—'চীনের সিঁদুর। চাই চীনে—র সিঁদুর—' কিছুই এসে যেত না মেয়েটার।

বুক গুরগুর করে উঠতো না, গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠতো না। যেন সব ভয় জয়ের ওষুধ মজুত আছে ঐ মিষ্টি গন্ধেভরা গা-টার মধ্যে।

কিসের সেই মিষ্টি গন্ধ ?

চুলের ? শাড়ির ? না শুধু মাতৃহৃদয়ের ?

শব্দ উঠতো—

'বেলোয়ারি চুড়ি চাই, কাচের পুতুল খেলনা চাই ! সাবান, তরল আলতা চাই।' শব্দ উঠতো, 'পাংখা বরো—ফ্‌ ! পাংখা বরো – ফ !'

তখন আর ভয় নয়, আহ্লাদ।

আহ্লাদ, আগ্রহ, উৎসাহ।

শুনতে পেলেই জানলার কাছে ছুটে যেত মেয়েটা, তারপর সরে এসে উতলা গলায় বলতো, 'মা, মাগো !'

মা হেসে হেসে বলতো, 'ভারী যে আদর দেখছি ! কী চাই শুনি ?'

'কাচের পুতুল একটা—'

'আর পুতুল কি হবে রে ? কত রয়েছে—'

মেয়েটা তীক্ষ্ণ গলায় বলতো, 'বা রে, আমার বুঝি কচি পুতুল আছে ?'

অতএব কচি পুতুল !

অথবা বরফ ! পাংখা বরফ ! তখন মা বলতো, 'দূর, দূর, ও বরফ বিচ্ছিরি জলে তৈরি হয়। ওসব কি খায় মানুষে ?'

'খায় না তো বিক্রি করে কেন ?' পরনে খাটো ফ্রক থাকলেও তর্কে খাটো ছিল না মেয়েটা। বলতো, 'খায় না তো বিক্রি করে কেন ?'

মা পয়সা বার করতো, আর বলতো, 'বিক্রি তো সাপের বিষও করে। খাবি তাই ?'

বলতো, আবার পয়সা দিতো।

বলতো, 'শুধু আজ, আর নয় কিন্তু।'

তাই, তাই, তাতেই সই।

'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক।' আর একদিনের কথা পরে ভাবা যাবে।

এক-একদিন আবার মা বকতো।

বলতো, 'কেবল কেবল পড়া ফেলে উঠে আসিস কেন বল্‌ তো ? মন নেই কেন পড়ায় ?'

মেয়েটা বলে ফেললেই পারতো ভরদুপুরে ওইরকম সব শব্দ শুনলে ভয় করে আমার। বললে অনেক কিছু সোজা হয়ে যেত। কিন্তু মেয়েটা তা বলতো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো।

মা বলতো, 'যাও, হাতের লেখা করে ফেল গে।'

মেয়েটা আস্তে আস্তে চলে যেত।

আর সময় মিনিট গুনতো কখন রাত্তির আসবে। রাত্তিরে তো আর মা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলতে পারবে না, 'যাও পড় গে!'

রাত্তিরে মায়ের বুকের কাছে ঘেঁষটে শুয়ে গায়ের ওপর হাত রেখে পরম সুখময় একটু আবেশ নিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া!

ছোট সেই মেয়েটার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে থাকে সুবর্ণলতা। তার মায়ের কাছে বসে চুল বাঁধে, ভাত খায়, পড়া মুখস্থ করে। বই-খাতা গুছিয়ে নিয়ে স্কুলে যায়!

যায় দুর্গাপূজার প্রতিমা দেখতে। যেখানে যায় তার নামগুলো যেন ভেসে ভেসে উঠছে চালচিত্র-ঘেরা জগজ্জননী মূর্তির ধারে ধারে।

রাণী রাসমণির বাড়ি, শোভাবাজারের রাজবাড়ি, শ্যামবাজারের মিত্তির বাড়ি!....কোথায় যেন নাগরদোলা চড়ে আসে, কোথায় যেন সঙের পুতুল দেখে।

তারপর ব্যথা-করা পা নিয়ে বাড়ি ফিরে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে, 'মা, মাগো, কতো ঠাকুর দেখেছি জানো? পাঁ-চ-খানা!'

মা হেসে হেসে বলতো, 'ঠাকুর তো দেখেছিস? নমস্কার করেছিস?'

'আহা রে, নমস্কার করবো না? আমি যেন পাগল!'

মা ওর কপালের চুলগুলো গুছিয়ে দিতে দিতে বলতো, 'করেছিস তাহলে? নমস্কার করে কি বর চাইলি?'

'বর? এই যাঃ, কিছু চাই নি তো?'

মা হেসে ফেলতো।

'চাস নি? তা ভালোই করেছিস! না চাওয়াই ভালো। তবে এইটুকু চাইতে হয়, মা, আমার যেন বিদ্যে হয়!'

বিদ্যে!

বিদ্যে!

উঠতে বসতে মা ওই কথাই বলতো।

'বিদ্যেই হচ্ছে আসল বুঝলি? মেয়েমানুষের বিদ্যে-সাধ্যি নেই বলেই তাদের এত দুর্দশা!... তাই তাদের সবাই হেনস্থা করে। আর যে-সব মেয়েমানুষরা বিদ্যে করেছে, করতে পেরেছে, বিদুষী হয়েছে? কত গৌরব তাদের—কত মান্য। সেই মান্য, সেই গৌরব তোরও হবে।'

সুবর্ণলতার সর্বশরীরে প্রবল একটা আলোড়ন ওঠে।

সুবর্ণলতা ছাদে ধুলোর ওপর শুয়ে পড়ে মুখটা ঘষটে বলে, 'শেষরক্ষা করতে পারিনি মা! শুধু তোমার দেওয়া সেই মন্ত্রের দাহে সারাজীবন জর্জরিত হয়েছে তোমার সুবর্ণর!'

অনেক চোখের জল ফেলে ফেলে দুঃসহ যন্ত্রণাটা স্তিমিত হয়ে আসে। সুবর্ণলতা আবার এখন তাই দেখতে পায়। শব্দের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে দৃশ্যের ঘাটে এসে ঠেক খায়।

তাই সুবর্ণলতা দেখতে পায়, সুবর্ণলতার মা রান্নাঘরে বসে রাঁধছে, মা ছাদে উঠে কাপড় শুকোতে দিচ্ছে, মা ঝেড়ে ঝেড়ে বিছানা পাতছে!···মা মাটিতে আরশি রেখে চুল বাঁধছে!

ধবধবে মুখখানি ঘিরে একরাশ কালো পশমের মত চুলের রাশি। কপালে ঘষে-যাওয়া সিঁদুর-টিপের আভাস!

প্রাণভরা, বুকভরা, চোখভরা!

আশ্চর্য!

এতখানি মা ছিল সুবর্ণর, আর সুবর্ণ কিনা তুচ্ছ একটু অভিমান নিয়ে নিজেকে ঘিরে প্রাচীর তুলে রেখে বসেছিল!

ঠিক হয়েছে সুবর্ণ, তোর উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে! মা একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে সুবর্ণকে, তাও আদেশ দিয়ে গেছে, 'আমি মরে গেলে তবে দিও।'

এ ছাড়া আর কি হবে তোর?

অভিমান আর আত্মধিক্কার এরা দুজন যেন ঠেলাঠেলি করে নিজের শিকড় পুঁততে চায়। আর শেষ পর্যন্ত আত্মধিক্কারই বুঝি জয়ী হয়।

মা, মাগো, ওই নির্মায়িক লোকটার পায়ে ধরেও কেন একবার দেখতে গেলাম না তোমায়? এখন যে আমার জীবনের সব গান থেমে গেল, সব আলো মুছে গেল!

টের পাইনি আমার জীবনের অন্তরালে তুমি ছিলে আলো হয়ে, গান হয়ে! যেন আমার একটা বিরাট ঐশ্বর্য নিজের লোহার সিন্দুকে ভরা ছিল। মনে হতো, ইচ্ছেমত ওটাকে খুলবো আমি। খুললেই দেখতে পাবো!

বুঝতে পারিনি হঠাৎ একদিন দেখবো শূন্য হয়ে গেছে সে সিন্দুক!···কেবল অন্যের দোষই দেখেছি আমি, আর অভিমানে পাথর হয়েছি। নিজের দোষ দেখিনি। মা না হয় দূরে ছিল আমার, কিন্তু বাবা?

বাবাকে অপরাধী করে রেখে ত্যাগ করেছিলাম আমি। আজও ত্যাগ করে এলাম। জীবন্ত মানুষটার মুখের উপর বলে এলাম, 'মনে জানবো আমি মা-বাপ দুই-ই হারিয়েছি।'

আমি কি!

আমি কি গো!

শুধু কঠোর কঠিন!

সারাটা জীবন শুধু সেই কাঠিন্যের তপস্যাই করলাম। আমার ছেলেমেয়েরা কি অনেক-

দিন পরে ভাবতে বসবে মায়ের কাছে এলেই কিসের সেই সৌরভ পেতাম? চুলের? শাড়ির? না শুধু মাতৃ-হৃদয়ের?

কিন্তু সুবর্ণলতা কবে কখন সময় পেয়েছে সেই স্নেহ-সৌরভে কোমল হতে? সুবর্ণলতাকে যে অবিরাম যুদ্ধ করে আসতে হচ্ছে। সুবর্ণলতা যদি কোমল হতো, মুক্তকেশীর সংসার থেকে মুক্তি পেত কোনোদিন? পেত না। মুক্তকেশীর ছেলে গ্রাস করে রেখে দিত তাকে। তার ইচ্ছায় উঠতে বসতে হতো, তার চোখরাঙানিতে জড়সড় হয়ে যেতে হতো, আর তার লুব্ধ ইচ্ছার দাসীত্ব করতে করতে আত্মাকে বিকিয়ে দিতে হতো।

কিন্তু আজো কি আছে সেই আত্মা?

'বিকিয়ে যেতে দেব না' পণ করে যুদ্ধ করতে করতে ধ্বংস হয়ে যায়নি?

সেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া আত্মাকে কি আবার গড়ে তুলতে পারা যায়?

চেষ্টায়, যত্নে সাধনায়?

হয় না!

হতে পারে না!

সুবর্ণ বলে ওঠে, অসুরের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হলে দেবীকেও চামুণ্ডা হতে হয়। বীণাবাদিনী সরস্বতীর, কড়ির ঝাঁপি হাতে লক্ষ্মীর সাধ্য নেই সে ভূমিকা পালনের।

সুবর্ণলতা কি তবে লড়াই থেকে অব্যাহতি নেবে এবার? তার সংসারকে নিজের ইচ্ছেয় চলতে দেবে?

নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একান্তে বসে সেই ধ্বংস-আত্মার ইতিহাস লিখবে বসে বসে? লিখে রাখবে?

লিখে রাখবে—শুধু একজন সুবর্ণলতাই নয়, এমন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সুবর্ণলতা এমনি করে দিনে দিনে তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছে! কেউ লড়াই করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে, কেউ ভীরুতায় অথবা সংসারের শান্তির আশায় আপন সত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে পুরুষসমাজের 'ইচ্ছের পুতুল' হয়ে বসে আছে।

'আগে আমি ওদের অবজ্ঞা করতাম—'সুবর্ণলতা ভাবে, যারা লড়াইয়ের পথ ধরে নি, নির্বিচারে বশ্যতা স্বীকার করে বসে আছে। এখন আর অবজ্ঞা করি না তাদের। বুঝতে পারি, এদের লড়াইয়ের শক্তি নেই, তাই নিরুপায় হয়ে ঐ দ্বিতীয় পথটা বেছে নিয়েছে। 'ওদের অনুভূতি নেই, ওরা ওতেই খুশি,'—এ কথা ভাবা আমাদের ভুল হয়েছে।

সত্তার বদলে শান্তি কিনেছে ওরা, আত্মার বদলে আশ্রয়। কারণ এ ছাড়া আর উপায় নেই ওদের!

সমাজ ওদের সহায় নয়, অভিভাবকরা ওদের অনুকূল নয়, প্রকৃতি পর্যন্ত ওদের প্রতিপক্ষ ! ওরা অন্ধকারের জীব !

খামে বন্ধ চিঠিটা একবার হাত দিয়ে অনুভব করলো সুবর্ণলতা। এই নিঃসীম অন্ধকারে বসে যদি পড়া যেত !

যদি দিনের আলোয় কি দীপের আলোয় এমন একটু নিঃসীম নির্জনতাও পেত সুবর্ণ, হয়তো খুলে ফেলতো রুদ্ধ কপাট। বিহ্বল দৃষ্টি মেলে দেখতো কোন্ কথা দিয়ে গেছে তাকে তার মা।

কিন্তু কোথায় সেই নির্জনতা ?

চারিদিকে চোখ।

বিদ্রূপে অথবা কৌতুকে, কৌতূহলে অথবা অনুসন্ধিৎসায় যে চোখেরা সর্বদা প্রখর হ'য়ে আছে। কত বেশি চোখ পৃথিবীতে ! সুবর্ণলতার এই নিজের গোলাপী-রঙা দোতলাটাতেও এত বেশী লোক জমে উঠেছে ? এত বেশি চোখ ? অথচ এদের জন্যে অসহিষ্ণু হওয়া চলে না, এরা সুবর্ণলতার। এদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহন করেই চলতে হবে শেষ দিনটি পর্যন্ত। এদের বিয়ে দিতে হবে, সংসারী করে দিতে হবে, অসুখ করলে দেখতে হবে, আঁতুড়ে ঢুকলে আঁতুড় তুলতে হবে, আর এদের মন-মেজাজ বুঝে বুঝে কথা বলতে হবে। এদের অবহেলা করা চলবে না, এড়ানো যাবে না, তুচ্ছ করা যাবে না ! তা করতে গেলে এরা তৎক্ষণাৎ ফোঁস করে উঠে তার শোধ নেবে। কারণ সুবর্ণলতাই এদের শিখিয়েছে সব মানুষই সমান। শিখিয়েছে—মানুষ মাত্রেরই স্বাধীনতার অধিকার আছে।

ওরা যদি সে শিক্ষার আলাদা একটা অর্থ বোঝে, নিশ্চয় সেটা ওদের দোষ নয়, দোষ সুবর্ণলতার শেখানোর।

নিজের হাতের তৈরি ড্রাগনের হাঁ থেকে পালাবে কি করে সুবর্ণ ?

সুবর্ণ উপায় খোঁজে !

পালাবার, অর্থাৎ পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চিরাচরিত পদ্ধতিগুলোয় আর রুচি নেই সুবর্ণর। অনেকবার চেষ্টা করেছে, যম তাকে ফেরত দিয়ে গেছে। একবার নয়, বার বার।

আহা, যদি অকারণ শুধু শুয়ে পড়ে থাকা যেত ! কোনোদিকে তাকাতে হতো না, শুধু দিনে-রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকা !

মৃত্যুর পরে যেমন করে সংসারের দিকে মুখ ফিরোয় মানুষ তেমনি !

আজ এই ভয়ঙ্কর একটা শূন্যতার মুহূর্তে সংসারটা যেন তার সমগ্র মূল্য হারিয়ে একটা মৃৎপিণ্ডের মত পড়ে থাকে। সুবর্ণলতা সেই মৃৎপিণ্ডটাকে ত্যাগ করবার উপায় খোঁজে। সুবর্ণলতা বুঝি ঐ মাটির বোঝার ভার আর বইতে পারবে না।

॥ আট ॥

'শুনেছ মা, তোমার ভাগ্নের বাড়ির খবর ?'

জগু বাজার থেকে ফেরে একজোড়া ডাব হাতে ঝুলিয়ে, পিছন পিছন নিতাই কাঁধে ধামা নিয়ে।

ভারি জিনিস-টিনিসগুলো নিজেই বয়ে আনে জগু, হাল্কাগুলো নিতাইয়ের ধামায় দেয়। দেয় নেহাতই মাতৃভয়ে। কুলকোঁচা দিয়ে ধুতি পরতে শিখেছে নিতাই, গায়ে টুইল শার্ট। খাওয়া-দাওয়ায় বাবুয়ানার শেষ নেই। এর ওপর যদি দেখা যায়, খালি হাত নাড়া দিয়ে বাজার থেকে ফিরছে নিতাই, আর জগু আসছে মোট বয়ে, রক্ষে রাখবে না মা।

অবশ্য মা'র চোখে পড়বার সুযোগ বড় একটা হয় না, কারণ বাজার থেকে যখনই বাড়ি ঢোকে জগু, চেঁচাতে চেঁচাতে আসে, 'বাজার-টাজার করা আর চলবে না, গলায় ছুরি-মারা দর হাঁকছে! ডবল পয়সা ভিন্ন একটা নারকোল দিতে চায় না, ডাবের জোড়া ছ পয়সা। আর মেছুনী মাগীগুলোর চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি শুনলে তো ইচ্ছে করে, ওরই ওই আঁশবঁটিটা তুলে দিই নাকটা উড়িয়ে......ভাবলাম, নিতাই ছোঁড়াটাসুদ্ধু আমাদের সঙ্গে জুটে নিরিমিষ্যি গিলে গিলে মরে, আজ নিয়ে যাই পোয়াটাক কাটা পোনা, তা বলে কিনা চার আনা সের! · গলায় ছুরি দেওয়া আর কাকে বলে! একটা আধলা ছাড়ল না, পুরো আনিটা নিল। গলায় ছুরি আর কাকে বলে!'

এমনি বহুবিধ ধুয়ো নিয়ে বাড়ি ঢোকে।

সেই ধুয়োর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যান শ্যামাসুন্দরী। ইত্যবসরে জগু হাতের মালপত্র নামিয়ে ফেলে।

তারপর নিতাইকে নিয়ে হাঁকডাক শুরু করে দেয়। ছেলেটা যে শ্যামাসুন্দরীর হৃদয়মধ্যস্থিত বাৎসল্য রস আদায় করে ফেলেছে, এটা টের পেয়ে গেছে জগু, যতই কেন না সেটা চাপতে চেষ্টা করুন শ্যামাসুন্দরী। তাই জগু এখন নিশ্চিন্ত এবং সেই নিশ্চিন্ততার বশেই ছেলেটাকে শাসন করার ভান করে।

'হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলি যে? সংসারে একটা কাজে লাগতে পার না? কী একেবারে কুইন ভিক্টোরিয়ার দৌত্তুর এসেছো তুমি? একেই বলে—কাজে কুড়ে আর ভোজনে দেড়ে!'

শ্যামাসুন্দরী এক-একসময় বলে ওঠেন, 'থাম্ জগা, আর ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করিস না। ওর উপকারের বদলে মাথাটাই খেলি ওর! গরীবের ছেলেকে লাটসাহেব করে তুললি—'

জগু আবার তখন অন্য মূর্তি ধরে।

বলে, 'লাটসাহেব হয়ে কেউ জন্মায় না। আর গরীবের ছেলে বলেই চোর দায়ে ধরা পড়ে না। লাটসাহেবী! লাটসাহেবীর কি দেখলে? একটা ফরসা জামাকাপড় পরে তাই? বলি ভগবানের জীব নয় ছোঁড়া?'

প্রত্যহ প্রায় একই ধরনের কথাবার্তা, শুধু আজকেই ব্যতিক্রম ঘটলো। আজ জগু তার মা'র কাছে অন্য কথা পাড়ে।

বলে, 'শুনেছ তোমার ভাগ্নের বাড়ির কাণ্ড?'

ছেলের কথায় কান দেওয়া শ্যামাসুন্দরীর স্বভাব নয়, দেনও না, আপন মনে হাতের কাজ করতে থাকেন। জগু ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'বড়লোকের মেয়ের যে দেখছি গরীবের ছেলের কথাটা কানেই গেল না! বেচারা বৌটা একসঙ্গে মা-বাপ হারালো, সেটা এমন তুচ্ছ কথা হলো'

একসঙ্গে মা-বাপ হারালো!

বেচারা বৌটা!

এ আবার কোন ধরনের খবর?

কাদের বৌ?

এবার আব ঔদাসীন্য দেখানো যায় না। মান খুইয়ে বলতেই হয় শ্যামাসুন্দরীকে, 'হলোটা কি?'

'হলো না-টা কি, তাই বল? মা গেল খবরটাও দিল না কেউ, তারপর পিঠ-পিঠ কদিন পরেই বাপ গেল, তখন খবর। নে এখন জোড়া চতুর্থী করে মর।'

শ্যামাসুন্দরীও এবার ক্রুদ্ধ হন।

বলেন, 'কার বৌ, কি বৃত্তান্ত বলবি তো সে কথা?'

'কার বৌ আবার? শ্রীমান প্রবোধবাবুর বৌয়ের কথাই হচ্ছে। বেচারা মেজবৌমার কথা। বাপ বুঝি মরণকালে একবার দেখতে চেয়েছিল, তাই গিয়েছিলেন মেজবৌমা। তখন বলেছে, "মা তোর মরেছে, তবে অশৌচ নেওয়া নিষেধ।" দুদিন বাদে নিজেও পটল তুললো।'

শ্যামাসুন্দরী যদিও বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু কথায় সতেজ আছেন। তাই সহজেই বলেন, 'তোর মতন মুখ্যুর সঙ্গে কথা কওয়াও আহাম্মুকি। বলি, খবরটা তুই পেলি কোথায়?'

'আরে বাবা, স্বয়ং তোমার ভাগ্নের কাছেই। আসছিল এখানেই, বাজারে দেখা। আসবে, এক্ষুনি আসবে। দু-দুটো চতুর্থী, ব্যাপার তো সোজা নয়, ঘটা-পটা হবে। তাই আমার কাছে আসবে পরামর্শ করতে। এই জগা শর্মা না হলে যজ্ঞি সুশৃঙ্খলে উঠক দেখি? হুঃ বাবা!'

শ্যামাসুন্দরী কিন্তু এ উৎসাহে যোগ দেন না। বলিরেখাঙ্কিত কপালে আরো রেখা পড়িয়ে বলেন, 'ঘটাপটাটা করছে কে?'

'কে আবার! তোমার ভাগ্নেই করছে। বললো, তোমার মেজবৌমার বড় ইচ্ছে—'

শ্যামাসুন্দরী অবাক গলায় বলেন, 'মেজবৌমার ইচ্ছে? মা-বাপের সঙ্গে তো কখনো—'

'ওই তো—এখন অনুতাপটি ধরেছে। সেই যে কথায় আছে না, "থাকতে দিলে না ভাত-কাপড়, মরলে করলো দানসাগর" তাই আর কি!'

শ্যামাসুন্দরী দৃঢ়গলায় বলেন, 'মেজবৌমা সে ধরনের মেয়ে নয়।'

জগু অবাক গলায় বলে, 'তাই নাকি? তবে যে পেবো বললে—'

কথা শেষ হয় না, স্বয়ং পেবোই ঢোকে দরজাটা ঠেলে।

বলে, 'এই যে মামী তুমি রয়েছ! পরামর্শ করতে এলাম। মায়ের তো শরীর খারাপ, এখন তুমিই ভরসা। দায়টা উদ্ধার করো তোমরা মায়েছেলেয়। সোজা দায় তো নয়, শ্বশুরদায় শাশুড়ীদায়। মাতৃদায় পিতৃদায়ের অধিক।'

আপন রসিকতাশক্তির পুলকে টেনে টেনে হাসতে থাকে প্রবোধ হ্যা-হ্যা করে!

॥ নয় ॥

অনেকগুলো বছর জেলের ভাত খেয়ে অবশেষে একদিন বাড়ি ফিরলে অম্বিকা। কালো রংটা আরও একটু কালো হয়ে গেছে, পাকসিটে চেহারাটা যেন আরো পাকসিটে আর জীর্ণ হয়ে গেছে, চুলের গোড়ায় গোড়ায় বিবর্ণ সাদাটে ছাপ! যেন পাকতে শুরু করেনি বটে, কিন্তু একসঙ্গে সবাই পাকবে বলে নোটিশ দিয়েছে।

তবু মোটামুটি যেন তেমন কিছু বদল হয়নি। মনে করা যায় এতগুলো বছর পরে সেই অম্বিকাই ফিরে এল।

ফিরে এল অম্বিকা তার দাদা-বৌদির কাছে। বলতে গেলে সুবালার কাছেই।

সুবালার চেহারায় অবশ্য অনেক পরিবতন হয়েছে। সুবালার চুলগুলো বেশ পেকেছে, ঠিক সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে, আর রংটা জলে-পুড়ে গেছে। দারিদ্র্যকে যে কেন অনলের সঙ্গে তুলনা করা হয় সেটা অনুভব করা যাচ্ছে তাকে দেখে।

তথাপি সুবালার প্রকৃতিতে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। সুবালা অম্বিকাকে দেখেই প্রথমে আহ্লাদে কেঁদে ফেললো। তারপর সুবালা শাশুড়ীর নাম করে কাঁদলো, কাঁদলো অম্বিকার বাড়িতে চোর পড়ে যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে বলে, আর অভাবের জ্বালায় যে সেই চোর-অধ্যুষিত বাড়িটার ভাঙা পাঁচিল আর ভাঙা জানলা মেরামত করে রাখতে পারেনি সুবালারা, তা নিয়ে কাঁদলো, এবং সর্বশেষে কাঁদলো অম্বিকাকে আর বিপদের পথে পা না বাড়াতে মাথার দিব্বি দিয়ে।

শেষ কথাটার শেষে অম্বিকা একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে, 'আর বিপদ কোথা? দেশ তো বেশ ঠাণ্ডা মেরে গেছে। "বিপদ" যারা বাধাচ্ছিল তাদের শায়েস্তা করা হয়েছে, এখন দেশের কেষ্ট-বিষ্টু নেতারা কথার জাল ফেলে স্বাধীনতারূপ বোয়াল মাছটি টেনে তোলবার

তাল করেছেন। এর মধ্যে আর আমরা কোথায় পা বাড়াতে যাব? আমরা এখন দাবার আড্ডায় বসে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকি, বাঘা যতীনের আলোচনায় উদ্দীপ্ত হবো, আর বসে বসে দিন গুনবো কবে কখন সেই "স্বাধীনতা" নামের রসালো ফলটি গাছ থেকে টপ করে খসে পড়ে।'

তা অম্বিকার যে একেবারেই পরিবর্তন হয়নি তা বলা যায় না। আগে অম্বিকা ব্যঙ্গের সুরে কথা জানত না, এখন সেটা শিখেছে।

কিন্তু সুবালা এসব প্রসঙ্গের ধারে-কাছে আসতে চায় না, কারণ সুবালা অত বোঝে না। হয়তো বা বুঝতে চায়ও না।

তাই সুবালা তাড়াতাড়ি বলে, 'যাক গে বাবা ওসব কথা। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি? আমার কথা হচ্ছে—এবার তোমার বিয়ে দেব!'

হ্যাঁ, এই সঙ্কল্পই স্থির করেছে এখন সুবালা, ওই বাউণ্ডুলে ছেলেটার বিয়ে দেবে; বয়সে একটু বেশি হয়ে গেছে, তা যাক্, দোজবরে তেজবরে তো নয়? কত কত দোজবরে তেজবরে যে ওর ডবলবয়সী হয়েও বিয়ে করতে ছোটে!

মেয়ের অভাব হবে না।

বাংলা দেশে আর যে কিছুরই অভাব থাক না কেন, কনের অভাব নেই। আর সুবালার মতে বিয়ে না করে বুড়িয়ে যাওয়ার মত দুঃখের আর কিছু নেই।

সুবালা ইতিমধ্যে তার দুই ছেলের বিয়ে দিয়ে কাজ সেরেছে। যদিও সংসারের অবস্থা সুবিধের নয়, কিন্তু সংসারের 'অবস্থা' বিয়ের প্রতিকূল হবে কেন, এ তর্ক করেছে সুবালা। আর শেষ অবধি তর্কে সেই-ই জিতেছে। তাই এখনও বললো, 'বিয়ে দেব।' জানে—জিতবো

কিন্তু অম্বিকা ছিটকে উঠলো, বললো, 'বিয়ে?'

অম্বিকা হেসে ফেলল।

কিন্তু আগের মত সেই হো হো হাসির প্রাণখোলা সুরটা যেন অনুপস্থিত রইল সে হাসিতে। এ হাসি কেমন একরকম নিরুত্তাপ হাসি।

তবু হাসি।

হেসেই উত্তর।

'বিয়ে! নাঃ, আপনি দেখছি চুলগুলো মিছিমিছিই পাকিয়েছেন, বয়েসে সামনে না হেঁটে পিছনে হাঁটছেন!'

সুবালা অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে?'

অমূল্য এতক্ষণ মিটিমিটি হাসছিল বসে বসে। এবার বলে, 'মানে আর কি, অম্বিকার মতে তোমার শুধু চুলই পেকেছে, বুদ্ধি পাকেনি।'

'কেন ? কাঁচা বুদ্ধির কি দেখলে শুনি ?'

অম্বিকা হাসে, 'পুরোপুরিই দেখলাম। এখনো আপনার ছাওরের বিয়ে দেওয়ার শখ !'

হ্যাঁ, এই রকম করেই বলে অম্বিকা।

হৈ-হৈ করে বলে ওঠে না, 'কাঁচা বুদ্ধি নয় ? শুধু বিয়ের মতলবটি এঁটেই বসে আছেন, কই কনে রেডি করে রাখেননি ? টোপর চেলি ঠিক করে রাখেননি ? কে বলতে পারে আবার কখন শ্রীঘর থেকে ডাক পড়ে ?'

আগেকার অম্বিকা হলে এইরকমই বলতো !

এখনকার অম্বিকা বলে, 'এখনো আপনার ছাওরের বিয়ে দেওয়ার শখ ?'

সুবালা ভাঙা দাঁতের হাস্যকর হাসি হেসে বলে, 'তা কখন আর শখ করবার সুবিধা পেলাম শুনি ? তুমি তো বসে আছ শ্রীঘরে, এদিকে কত ঘটনাই ঘটে গেল, ঘটে চলেছে। তোমার চার-চারটে ভাইপো-ভাইঝির তো বিয়ে হয়ে গেছে ইতিমধ্যে !'

চার-চারটে ভাইপো-ভাইঝি !

অম্বিকা অথই জলে পড়ে।

এতগুলো ছেলেমেয়ে বিয়ের যোগ্য হয়েছিল অমূল্যর ? তাছাড়া বিয়ের যোগ্যতা ! ওর মধ্যে কোন্‌টা মেয়ে, কোন্‌টা বা ছেলে ! হঠাৎ কারো নাম মনে পড়ছে না কেন ? বড় বড় ছেলে দুটোর নাম রাসু আর বঙ্কু ছিল না ? রাসবিহারী, বঙ্কুবিহারী, কিন্তু তারপর ? সারি সারি অনেকগুলো ছিল যে ?

কি আশ্চর্য।

এমন স্মৃতিভ্রংশ হল অম্বিকার ?

দাদার ছেলেমেয়েগুলোর নাম ভুলে গেল ? ভুলে গেল কোন্‌টা কত বয়সের ছিল ? মুখই বা মনে পড়ছে কই তেমন করে ?

পড়ছে আস্তে আস্তে।

নামও···ভাবতে ভাবতে ভেসে উঠেছে, রাসু বঙ্কু টিঙ্কু কুলু নেড়ু টেঁপু···আরো কি কি যেন। একটা দল হিসেবেই তাদের দেখেছে অম্বিকা, খুব যেন আলাদা করে নয়।

দাদার ছেলেমেয়েরা !

এই অনুভবের মধ্যে ছিল তারা।

কিন্তু সেই বালখিল্যের দল এত লায়েক হয়ে উঠল এর মধ্যে ?

উঠল।

তার মানে সময়ের সেই বিরাট অংশটা হারিয়ে ফেলেছে অম্বিকা তার জীবন থেকে। অম্বিকা বুড়ো হয়ে গেছে।

কিন্তু 'জীবনে'র ওপর কবে মোহ ছিল অম্বিকার? কবে ছিল লোভ? তাই হারিয়ে ফেলেছে বলে মনটা 'হায় হায়' করে উঠল?

হয়তো এমনিই হয়। শুধু অম্বিকার মত পাগলাদের নয়, সকলেরই!

যে মায়া-হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ, সেই হরিণটা যখন একটা 'ভুয়ো' দিয়ে দিগন্তের ধূসরতায় মিলিয়ে যায়, তখন মনটা এমনি 'হায় হায়' করেই ওঠে। মনে হয়, এতগুলো দিন-রাত্রি হারিয়ে গেল! কি করলাম? কি বা পেলাম?

হ্যাঁ, সেটাই হাহাকারের স্বর।

'কী পেলাম! কী পেলাম!'

যেন কে কোথায় অঙ্গীকার করে রেখেছিল পাইয়ে দেবে অনেক কিছু।

যেন বলে রেখেছিল, 'তোমার ওই দিনরাত্রিগুলো আমার কারবারে ফেল, তার বিনিময়ে পাওনার পাহাড় জমবে তোমার!'

কেউ দিয়েছিল সেই আশ্বাস?

কেউ করেছিল সেই অঙ্গীকার?

কেউ এমন একখানা মূল্য নির্ধারণ করে রেখেছিল, আমার ঐ দিনরাত্রিতে গড়া জীবনের?

জানি না।

দেখিনি তেমন কাউকে।

তবু ওই 'প্রাপ্তি'র ধারণাটা আছে বদ্ধমূল! নিশ্চিন্ত হয়ে আছি এই ভেবে এই যে আমার সোনার দিনগুলো বিকোচ্ছি বসে বসে, তার বদলে জমা হচ্ছে স্বর্গের সোনা। খানিকটা এগিয়ে গেলেই সেই স্বর্গীয় সোনার তালটাকে ধরে নেব খপ্ করে, ভরে নেব মুঠোর মধ্যে।

কিন্তু সে 'সোনা'র আশ্বাস মায়া-হরিণের মতোই অনেক ছুটিয়ে মেরে অকস্মাৎ কখন একসময় দিগন্তের ধূসরতায় মিলিয়ে যায়, তখন ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস মর্মরিত হয়ে ওঠে, 'পেলাম না, আমি আমার যথার্থ মূল্য পেলাম না। আমি ঠকে গেলাম। আমি কত দিলাম, কী বা পেলাম! যেন আমার মনিব আমায় সারা মাস খাটিয়ে নিয়ে মাসের শেষে মাইনে দিল না!'

আশ্চর্য!

কে বলেছে আমার এই জীবনটা ভারী এক দামী জিনিস? কে বলেছে আমার এই দিনরাত্রিগুলো সোনার দরের?

নিজেই নিজের দাম কষছি, মোটা অঙ্কের টিকিট মারছি তার গায়ে, ভেবে দেখছি না কেন তা করছি! করছি 'হায় হায়!' ভেবে দেখছি না আমি কেউ না, আমি এই নিখিল বিশ্বের অনাহত লীলার একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। বাড়তি কিছু পাওনা নেই আমার!

কেউ ভাবি না, কেউ ভাবে না।

অম্বিকাও তা ভাবল না।

অম্বিকা ভাবলো, 'এতগুলো "দিন" হারিয়ে ফেললাম!' ভাবলো. 'কী বা পেলাম তার বিনিময়ে?'

তাই কেমন যেন দিশেহারার মত বলে উঠলো, 'কাদের বিয়ে হয়ে গেল?'

'কেন রাম্নু, বঙ্কু, টেঁপি আর নিভার। নিভাটার অবিশ্যি একটু সকাল সকালই হয়ে গেল, ভাল পাত্তর পেয়ে যাওয়া গেল। আর দিতেই তো হবে। চারটের হিল্লে হয়েছে, বাকি ছটার হয়ে গেলেই আমাদের ছুটি। তারপর বুড়োবুড়ী কাশীবাস করবো।'

বাকী ছটার হয়ে গেলেই

অম্বিকা ওই দুঃসাহসী আশার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে। তারপর ভাবে, হয়তো সেই অসাধ্য সাধন করেই ফেলবে ওরা, হয়তো সত্যিই শেষ অবধি নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তীর্থবাস করতেও যাবে! আর সমস্ত কর্তব্য সমাধা করার যে একটা আত্মতৃপ্তি, সেটুকু রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করবে।'

অম্বিকা অন্তত তাই ভাবলো।

তাই অম্বিকা সহসা ওদের জীবনটাকে হিংসে করে বসলো।

অনেকদিন জেলের ভাত খেয়ে খেয়ে এ উন্নতিটুকু তা হলে হয়েছে অম্বিকার। অম্বিকা তার 'স্বপ্ন' থেকে স্খলিত হয়ে 'তুচ্ছ জীবনে'র দিকে তৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

অম্বিকা তাই কাঁচা-বুদ্ধি সুবালার কাঁচামি-টাকেই দীর্ঘ বিলম্বিত করে দেখতে চাইছে।

অতএব অম্বিকা বলে উঠছে, 'আরে ব্যস, সব ব্যবস্থা কমপ্লিট? তা আমিও তো তাহলে দিব্যি একখানি 'শ্বশুর" হয়ে বসে আছি! আমাকে নিয়ে তবে আবার ডাংগুলি খেলবার বাসনা কেন?'

সুবালা এ পরিহাসটুকুর অর্থ বোঝে।

সুবালা তাই হেসে উঠে বলে, 'তুমি যাতে আর ডাংগুলি খেলে বেড়াতে না পারো তার জন্যে। শক্ত শেকল এনে বাঁধতে হবে তোমায়! করছি তার যোগাড়।'

'কেন, আমার অপরাধ?'

'এই তো অপরাধ। জীবনটা মিছিমিছি বিকিয়ে দিলে।'

অম্বিকা সুবালার এই আক্ষেপে 'অবোধ' বলে অনুকম্পার হাসি হাসল না। অম্বিকা চমকে উঠল। অম্বিকা ভাবলো, 'আমি কি এই কথাই ভাবছিলাম না?'

তারপর অম্বিকা বললো, 'আপনি তো শেকল যোগাড়ে লাগবেন, বলি শেকল তো আর ভুঁইফোঁড় নয়? মা-বাপ থাকতে আর কে এই জেলখাটা আসামীকে মেয়ে দেবে শুনি?'

'শোনো কথা!' সুবালা গালে হাত দেয়। 'এ কী চুরি-জোচ্চুরি খুন-জখমের আসামী? লোকে যে তোমাদের এই "স্বদেশী জেলখাটা"দের পায়ে ফুলচন্দন দেয় গো!'

অম্বিকা এবার যেন পুরনো ধরনে হেসে ওঠে। বলে, 'পায়ে ফুলচন্দন দেয় বলেই যে হাতে মেয়ে দেবে, তার কোনো মানে নেই!'

'দেবে না?'

সুবালাই এবার অনুকম্পার হাসি হাসে, সুবালা যেন তার মূল্যবান খ্যাওরটির মূল্য সম্পর্কে আরো বেশি অবহিত হয়। বলে, 'আচ্ছা, দেয় কি না দেয় সে আমি বুঝবো! ব্যাটাছেলে বিয়ে করতে চাইলে আবার মেয়ের ভাবনা?'

এবার অম্বিকা অমূল্য দুজনেই হেসে ওঠে! অমূল্য বলে, 'আহা, এ আশ্বাস যদি কিছুদিন আগে পেতাম তো আর একবার 'চেয়ে' দেখতাম।'

'এখনও দেখ না।' সুবালা হাসে। তারপর গ্রামের কোন্ কোন্ ঘরে এমন কটা বুড়ো ঘরে গিন্নী থাকতেও দিব্বি আর একটা বিয়ে করে মজায় আছে, তার আলোচনা এসে পড়ে।

অম্বিকা নিথর হয়ে গিয়ে বলে, 'বল কি দাদা? দত্ত জ্যাঠামশাই?'

অমূল্য হাসে, 'সেই তো, সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে অসহ্য। গিয়েছিলেন ভাগ্নীর ছেলের জন্যে কনে দেখতে—'

'দেখে আর চোখ ফেরাতে পারলেন না, নাতির হাতে তুলে দিতে বুক ফাটলো—', সুবালা হেসে হেসে বলে, 'সম্পর্কটা অবিশ্যি খারাপ হল না! নাতবৌ হতো, বৌ হলো। তেরো আর তেষট্টি!'

অম্বিকা হাসে না, অম্বিকা হঠাৎ রূঢ়গলায় বলে ওঠে, 'লোকটাকে ধরে একদিন হাটতলায় দাঁড় করিয়ে চাবকাতে পারলে না কেউ?'

এরা চমকে উঠলো।

সুবালা আর অমূল্য।

অম্বিকার গলায় কখনো এমন রূঢ় স্বর শোনেনি ওরা আগে! তা যতই হোক, দত্ত জ্যাঠামশাই গুরুজন!

অম্বিকা সেটা বুঝতে পারলো।

অম্বিকা নিজেকে সামলে নিল, অপ্রতিভ গলায় বললো, 'জেলের ভাতের এই গুণ ধরেছে, রাগ চাপতে পারি না। অসভ্যতা দেখলেই মেজাজে আগুন জ্বলে ওঠে। বাস্তবিক, এদের শাস্তি হওয়া উচিত কিনা তোমরাই বল?'

'উচিত তো! কিন্তু শাস্তিটা দিচ্ছে কে?'

'আমি তুমি, এরা ওরা, সবাই। অম্বিকা দৃঢ়গলায় বলে, 'কিছুদিন স্রেফ ধোলাই চালালেই এ ধরনের পাজীরা শায়েস্তা হয়ে যাবে।'

সুবালা যেন অবাক হয়ে অম্বিকার মুখের দিকে তাকায়। বলে 'ধোলাই মানে?'

অম্বিকা আর একবার অপ্রতিভ হয়। বলে, 'ওই তো। সঙ্গগুণের সুফল। যত সব চাষাড়ে কথার চাষের মধ্যে তো বাস ছিল। ধোলাই মানে ধরে ঠ্যাঙানো! দু-পাঁচজন মার ধোর খাচ্ছে দেখলেই আর পাঁচজন সামলে যাবে'

অমূল্য ক্ষুব্ধ হাসি হাসে, 'তোর ওই "ধোলাই" তা হলে পাত্তরকে না দিয়ে পাত্রীর বাপকেই দেওয়া উচিত। তারা মেয়ে দেয় কেন?'

সুবালা বলে ওঠে, 'দেয়, ভাল ঘরে-বরে দিয়ে উঠতে পারে না বলে, নচেৎ টাকাকড়ির লোভে। এই তো তোমাদের দত্ত জ্যাঠামশাইয়ের ব্যাপারই তাই। মেয়ের বয়েস বেশি হয়ে গেছে, জাত যাবার ভয়ে কাতর বাপ হাতের সামনে একটা বড়লোক বুড়ো পেয়ে—'

'জাত! জাত যাবার ভয়! আশ্চর্য, এত অনাচারে জাত যাচ্ছে না, জাত যাবে শুধু মেয়েকে সাত-সকালে বিয়ে না দিলে!' অম্বিকা বলে, 'এ পাপের ফল একদিন পাবেই সমাজ!...তা দত্তজেঠিমা কোথায়?'

'কোথায় আবার?' সুবালা বলে, 'ঘর-সংসার ছেড়ে যাবেন কোথায়? আছেন। প্রথম প্রথম খুব গাল মন্দ করেছিলেন, সতীনটাকে ঝাঁটা মারতে যেতেন, ক্রমশঃ সয়ে গেছে। এখন তাকে রেঁধে ভাতও দিচ্ছেন! সেও মহা দুষ্টু মেয়ে! সংসারের কিছু করে না, কেবল সাজেগোজে আর কর্তার তামাক সাজে।'

'হুঁ। ওটাকেই আশ্রয় ভেবেছে। বুড়ো মরলে তখন? ছেলেরা কে-কোথায়?'

'বড় তো রাগ করে বাপের সঙ্গে পৃথক অন্ন হয়ে গেছে। আর সবাই আছে।'

'তা যিনি পৃথক অন্ন হলেন, মাকে ভাইদের নিয়ে হতে পারলেন না?'

'কি যে বল, তার কি ক্ষমতা? বাপ তো তাকে তেজ্যপুত্তুর করেছেন। আসল কথা, পয়সাওলা লোকেদের সব দরজা খোলা, বুঝলে ঠাকুরপো? মরণ শুধু গরীবদের। পৃথিবী জুড়েই এই।'

অম্বিকা বলে, 'হয়তো এর শাস্তিও আসবে একদিন পৃথিবীতে। তবে আমার মতে, কবে কি হবে না ভেবে, এখনই একটা বৌ বেঁচে থাকতে আর একটা বিয়ে করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

অমূল্য হাসে, 'আইনটা কে করবে শুনি?'

'করবো আমরা, তোমরা, সবাই। চিরদিন ধরে ভয়ঙ্কর একটা পাপ চলতে পারে না।'

সুবালার এসব কথায় অস্বস্তি।

সুবালা এবার প্রসঙ্গকে অন্য পথে পরিচালিত করে। সুবালা তার ছেলের বৌদের আর জামাইদের কথা তোলে, তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, বলে, 'আমার ভাগ্যে বাবা সবই খুব ভালো জুটেছে—'

অম্বিকা হেসে ফেলে।

অম্বিকা বলে, আপনার ভাগ্যে "মন্দ" হবার জো কি? আপনি কি কাউকে ভালো ছাড়া মন্দ দেখবেন?'

সুবালা লজ্জিত গলায় বলে, 'আহা!' বলে, 'নাও বাপু, বল এখন কি খাবে? কতকাল বাড়ির রান্না খাওনি—'

বলে, তবে মনে ভাবে, 'কিই বা জোটাতে পারবো! আহা, বেচারা এতদিন পরে এল! সজনে ডাঁটাটা ভালবাসে, মৌরলা মাছটাও খুব ভালবাসতো। আর অড়র ডাল। দেখি যাই—'

সুবালা চলে যায় রান্নার যোগাড়ে, এরা দুই ভাই কথা বলে, গ্রামের কথা, পড়শীর কথা।

আর এর মাঝখানেই হঠাৎ একসময় প্রশ্ন করে ওঠে অম্বিকা, 'তোমার শ্বশুরবাড়ির খবর কি?'

'আমার শ্বশুরবাড়ির!'

'হ্যাঁ, তোমার সেই—ইয়ে—মেজবৌদি, তাঁর ছেলেমেয়েরা—আর শ্রীযুক্তবাবু মেজদা?'

একটু ভয়ে-ভয়েই বলে।

মনকে প্রস্তুত করে দু-একটা দুঃসংবাদ শোনবার জন্যে।

কিন্তু আশ্চর্য, শুনতে হলো না তা।

বরং ভালো খবর।

মেজদার আয়ের আরো উন্নতি হয়েছে, ছেলেরা ভাল ভাল পাস করেছে, নতুন বাড়ি করেছে নিজস্ব, আলাদা হয়ে চলে গেছে। মোটের মাথায় হতাশার খবর নয়।

অথচ আশ্চর্য, অম্বিকা যেন খুব একটা হতাশ হয়।

অম্বিকা যেন এসব খবর শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু কী শোনবার আশাতেই বা ছিল তবে সে? অমূল্যর শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে খুব একটা দুঃসংবাদ? কে জানে কি! তার মনের কথা সে-ই জানে। তবু—মনে হলো, অম্বিকা যেন ওই খুশির খবরগুলোয় খুশি হলো না।

তবু অম্বিকা সুবর্ণর নতুন বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইল। বলল, 'যাবো তো কাল-পরশু কলকাতায়। একবার দেখা করে এলে তো হয়। অবশ্য চিনতে পারবেন কিনা জানি না।'

'শোনো কথা!' সুবালা হাসে, 'তোমায় পারবে না চিনতে? তোমাকে কত পছন্দ হয়েছিল তার! আমি তো ভাবছিলাম—'

হেসে চুপ করে যায় সুবালা।

'কী ভাবছিলেন?'

সুবালা মিটিমিটি হেসে বলে, 'ভাবছিলাম তোমাকে তারই জামাই করে দিই। মেয়েটা তো বেশ বড় হয়ে উঠেছে—'

'আমাকে—জামাই—'

অম্বিকা এবার নিজস্ব ভঙ্গীতে হেসে ওঠে সেই আগের মত। 'চমৎকার! এটা ঠিক আপনার উপযুক্ত কথা হয়েছে! বাঃ! বাঃ! বাঃ! তাহলে বৃথা আশ্বাস দিচ্ছিলেন না, কনে রেডি? কি যেন হলাম আমি মেয়েটির? মামা?'

'আহা, মামা আবার কি?' সুবালা সতেজে বলে, 'কিচ্ছুই নয়। জানো না, মামার শালা পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই! তুমি হচ্ছো পিসের ভাই—'

'ব্যস! ব্যস! শাস্ত্রবচনও মজুত!' অম্বিকা বলে, 'কিন্তু এত সব ছেলেমেয়ের বিয়ে হল, তাঁর মেয়েরই বা হয় নি কেন?'

সুবালা সন্দেহের গলায় বলে, 'তার কোন্ মেয়েটার কথা বলছো তুমি?'

'আহা, সেই তো সেই যে তোমার এখানে আসেনি। নবদ্বীপে না কোথায় যেন গিয়েছিল!'

আশ্চর্য যে এটা ভুলে যায়নি অম্বিকা।

অথচ অম্বিকা তার দাদার ছেলেমেয়েদের নাম ভুলে যাচ্ছিল।

কিন্তু সে কথা তুলে হাসে না সুবালা। হাসে অম্বিকার অজ্ঞানতায়।

'সেই মেয়ে? সেই মেয়ে এখনো বসে আছে, এই ভাবছো তুমি? হায় হায়! চাঁপা? তার কবে বিয়ে হয়ে গেছে, মেজ মেয়ে চন্দনেরও হয়েছে। এ হচ্ছে সেই পারুল! সব সময় যে ছোট্ট মেয়েটা চুপচাপ থাকতো—'

'পারুল! মানে সেই যে দোলাই গায়ে জড়িয়ে মাঠে-বাগানে ঘুরে বেড়াতো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! এই তো মনে পড়েছে বাপু! ওদের মত ফরসা না হলেও সেই মেয়েটাই তো সব চেয়ে সুচ্ছিরি মেজবৌয়ের—'

অম্বিকা আবার বলে, 'চমৎকার! দত্ত জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে একটু ইতর-বিশেষ এই যা!'

'শোনো কথা, তার সঙ্গে কিসের তুলনা? আমি বাপু ওর কথাই ভাবছিলাম—'

'আপনার ভাবনার দড়িটা একটু খাটো করুন বৌদি, বড্ড লম্বা হয়ে যাচ্ছে!'

অম্বিকা আবার হাসতে থাকে হা-হা করে।

সুবালা একসময় অমূল্যকে চুপিচুপি বলে, 'ঠাকুরপো কিন্তু ঠিক তেমনটিই আছে, একটুও বদলায় নি!'

অমূল্য আস্তে বলে, 'কে বললে, বদলায় নি? বদলেছে বৈকি। অনেক বদলেছে।'

॥ দশ ॥

তা বদলাবে এ আর বিচিত্র কি ?

পৃথিবীর খেলাই তো তাই।

না যদি বদলাতো অম্বিকা, সেটাই হতো অস্বাভাবিক।

বদলায় না শুধু অল্পবুদ্ধিরা।

বুদ্ধির চাকার অভাবে ওরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। সুবালা তাদের দলের, তাই সুবালা সুখী। সুবালার সুখ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সুবালা যদি দুঃসহ কোনো শোক পায়, সুবালা কেঁদে বলবে, 'ভগবান নিয়েছেন—'

অতএব সুবালা সুখী হবে।

যারা কার্য কারণের বিচার নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসে, যারা জগতের যত অনাচার অবিচার অত্যাচার, সব কিছুর বিরুদ্ধে তীব্র প্রশ্ন তুলতে বসে, তারাই জানে না সুখের সন্ধান।

কিন্তু সন্ধান কি তারা রাখতেই চায় ? সুখকে কি তারা আরাধনা করে ?

সুখেতে যে তাদের ঘৃণা !

নইলে সুবর্ণলতা—

হ্যাঁ, নইলে সুবর্ণলতার তো উচিত ছিল তার স্বামীর সুবিবেচনা আর পত্নী-প্রেমের পরিচয়ে আহ্লাদে ডগমগ হওয়া।

স্ত্রীকে আকস্মিক আনন্দ দেবার রোমাঞ্চময় পরিকল্পনায় সে যে তার স্ত্রীর বাপের চতুর্থী উপলক্ষে মস্ত একটা যজ্ঞির আয়োজন করে ফেলেছে চুপিচুপি—এটা কি কম কথা নাকি ? কম সুখের কথা ?

কিন্তু সুবর্ণলতা হচ্ছে বিধাতার সেই অদ্ভুত সৃষ্টি, সুখে যার বিতৃষ্ণা, সুখে যার ঘৃণা।

তাই কর্মবীর জগু যখন অকস্মাৎ গোটা "তিনেক" মুটের মাথায় রাশীকৃত বাজার, ফলমুল, কলাপাতার বোঝা, মাটির খুরি-গ্লাস ইত্যাদি নিয়ে তার পিসতুতো ছোট ভাইয়ের বাড়িতে এসে ঢুকে হাঁক পাড়লো, 'কই রে, কে কোথায় আছিস ? এসব কোথায় নামাবে দেখিয়ে দে—'

তখন সুবর্ণলতা পাথরের মত মুখে এসে দাঁড়িয়ে একটা ধাতব গলায় বলে ওঠে, 'এসব কি ? এর মানে ?'

দোভাষীর প্রয়োজন স্বীকার করে না।

গলা স্পষ্ট পরিষ্কার। শুধু মুখটা অন্য দিকে।

তবে জগুও অত নীতি-নিয়মের ধার ধারে না। তাই বলে ওঠে, 'এই মরেছে! এ যে সেই—"যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই! বলি তোমার বাপের ছেরাদ্দ, আর তুমি আকাশ থেকে পড়ছো ? চতুর্থীর যোগাড়, দ্বাদশ ব্রাহ্মণের ভোজের রসদ, আর

তোমার গিয়ে আত্মকুটুম্বও কোন্ না ষাট-সত্তরজন হবে। একা আমার পিসির ডালপালাই তো—', জগু একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে কথা শেষ করে, 'তাদের একটু ভালোমন্দ খ্যাটের যোগাড়—'

হঠাৎ থেমে যায় জগু।

ভাদ্রবৌয়ের মুখের দিকে তাকানো অশাস্ত্রীয় এটা জানা থাকলেও বোধ করি হঠাৎই তাকিয়ে ফেলেছিল সে। অথবা ভয়ঙ্কর একটা নীরবতা অনুভব করে তাকিয়ে ছিল কে জানে। তবে থেমে যাবার হেতুটা তাই। ওই মুখ।

মুখ দেখে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায় ওই বাজখাঁই লোকটার। তাড়াতাড়ি ডাক দেয়, 'পারু, পারু, দেখ্ তোর মার শরীর-টরীর খারাপ হলো নাকি?'

মুটেগুলো এতক্ষণ অপেক্ষান্তে রাগ-ভরে নিজেরাই স্থান নির্বাচন করে জিনিসগুলো নামাতে শুরু করে এবং সারাও করে আনে। ইতিমধ্যে পারু এসে দাঁড়ায়, সমস্ত দৃশ্যটার ওপর একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে সেও অবাক গলায় বলে, 'এসব কি বড় জ্যাঠা?'

এবার বিস্ময়-প্রশ্নের পালা জগুর।

'তোদের কথার আর আমি কি উত্তুর দেব রে পারু, আমিই যে তাজ্জব বনে যাচ্ছি। বলি তোদের বাবা কি আমার সঙ্গে ন্যাকরা করে এল? তোদের বাড়িতে কোনো কাজকর্ম নেই? দাদামশাই দিদিমা মরেনি তোদের? সব ভুল?'

পারু আস্তে বলে, 'ভুল নয়। তবে তার জন্যে এসব—' গলাটা একটু নামায়, আস্তে বলে, 'জানি একটা মরণকে উপলক্ষ করে মানুষ এমন ঘটা লাগায়, কিন্তু জানেনই তো মাকে! মা এসব একেবারেই ইয়ে করেন না। তা ছাড়া—'

পারুর কথা থেমে যায়।

সহসা পারুর মায়ের কণ্ঠ কথা কয়ে ওঠে, 'পারু, ভাসুরঠাকুরকে বল, যেন আমার অপরাধ না নেন। লোকে যা করে, আমার তার সঙ্গে মেলে না। আমি আমার জ্যান্ত মা-বাপকে কখনো এক ঘটি জল এগিয়ে দিইনি, আজ মরার পর আর তাঁদের ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে অপমান করতে পারব না। আমি—'

সহসা একটা অভাবিত ব্যাপার ঘটে।

অন্তত পারুর তাই মনে হয়।

মায়ের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়তে কবে দেখেছে পারু? সে চোখে তো শুধু আগুনই দেখে এসেছে জ্ঞানাবধি!

কিন্তু বেশিক্ষণ সে দৃশ্য দেখবার সুযোগ দেয় না পারুর মা, দ্রুতপায়ে চলে যায়। চলে যায় শুধু পারুকেই নয়, আরও একটা মানুষকে পাথর করে দিয়ে।

পাগল-ছাগল জগু আরও একবার শাস্ত্রীয়বিধি বিস্মৃত হয়ে ভাদ্রবৌয়ের মুখের দিকে

তাকিয়ে ফেলেছিল, এবং বলা বাহুল্য সে মুখে অবগুণ্ঠনের খুব একটা বাড়াবাড়ি ছিল না। কাজেই দেখায় অসম্পূর্ণতা ছিল না।

পাগল-ছাগল বলেই কি হঠাৎ এত আঘাত খেল জগু? নাকি এরকম একখানা ভয়ঙ্কর দুঃখ হতাশা গ্লানি ক্ষোভ বেদনা বিদ্রোহের সম্মিলিত ছবি সে জীবনে আর দেখে নি বলেই?

স্তব্ধ হয়ে দু-এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকেই দ্রুতকণ্ঠে, 'আমি এসব কিছু জানি না পারু, আমি এতসব কিছু জানি না। আমায় তোর বাবা গুচ্ছির টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলে এল—"তোমার বৌমার খুব ইচ্ছে," তাই আমি—' বলেই কোঁচার খুঁটে চোখ চেপে একরকম ছুটে বেরিয়ে যায় জগু বাড়ির সদর চৌকাঠ পার হয়ে। কে বলবে, তার দু চোখেও সহসা জলের ধারা ঠেলে আসে কেন?

মুটে কটা এতক্ষণ ঝাঁকা খালি করে ক্লান্তি অপনোদন করছিল, 'বাবু ভাগল্‌বা' দেখে তারাও ছুট দেয়। পারু তেমনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! পারু সহসা যেন আর এক জগতের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

জ্ঞানাবধি শুধু মা'র তীব্রতা আর রুক্ষতাই দেখে এসেছে পারু, মা'র জীবনের প্রচ্ছন্ন বেদনার দিকটা দেখে নি। আজ হঠাৎ মনে হলো তার, মা'র প্রতি তারা শুধু অবিচারই করে এসেছে।

কোনোদিনই সেই 'অকারণ' তীব্রতার কারণ অন্বেষণ করবার কথা ভাবেনি।

একথা ঠিক, বাবাকেও তারা ভাই-বোনেরা কেউ একতিলও শ্রদ্ধা করে না, তবু কদাচ কখনো একটু করুণা করে, অনুকম্পা করে। কিন্তু মাকে?

মা'র জন্যে কিসের নৈবেদ্য রাখা আছে তাদের অন্তরে?

ভাবলো সে কথা পারু।

কারণ সহসা পারু তার মা'র একটা নির্জন ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। যে ঘরের সন্ধান সে কখনো জানতো না, যে ঘরের দরজা কখনো খোলা দেখে নি।...অসতর্ক একটা বাতাসে একটিবার খুলে পড়েছে সে দরজা, তাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে পারুল।

ওই জনহীন শূন্যঘরটা এখানে ছিল চিরকাল?

অথচ ওরা—

'দিদি', বকুল এসে দাঁড়ালো, বললো, 'দাদা বললো, তোকে যে কামিজটায় বোতাম বসিয়ে রাখতে বলেছিল, সেটা কোথায়?'

পারুল চোখে অন্ধকার দেখলো!

পারুলের গলা শুকিয়ে এল।

আস্তে বললো, 'বোতাম বসানো হয় নি, ভুলে গেছি!'

'ভুলে গেছিস? সর্বনাশ! কোথায় সেটা?'

'মা'র ঘরে প্যাটরার ওপর।'

'সেরেছে, দাদা তো সেখানেই বসে!'

বকুলেরও যেন হাত-পা ছেড়ে যায়।

হ্যাঁ, এমনি ভয়ই করে তারা দাদাদের।

অথবা ভয় করে আত্মসম্মান-হানির। জানে যে এতটুকু ত্রুটি পেলেই খেঁচিয়ে উঠবে তারা, ঘৃণা ধিক্কার আর শ্লেষ দিয়ে বলবে, 'এটুকুও পার নি? সারাদিন কি রাজকার্য কর? নভেল পড়া, আর বাবার অন্নজল ধ্বংসানো ছাড়া আর কোনো মহৎ কর্ম তো করতে দেখি না।'

যেন অন্য অনেক 'মহৎ কর্মে'র দরজা চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের। যেন দাদাদের জামায় বোতাম বসানো, কি ঘর গোছানো, তাদের জুতো ঝেড়ে রাখা, কি ফতুয়া গেঞ্জি সাবান কেচে রাখাই ভারী একটা মহৎ কর্ম!

ওরা কি ওদের মহৎ পুরুষজীবনের শুল্ক আদায় করে নেবার পদ্ধতিটা রপ্ত করে রাখছে এই মেয়ে দুটোর ওপর দিয়ে?

এ কথা ভাবে পারুল।

তবু প্রতিবাদ করবার কথা ওঠে না।

প্রতিবাদের স্বর শুনলে খিঁচুনি বাড়বে বৈ তো কমবে না।

কিন্তু আজ পারুল সহসা কঠিন হলো।

বললো, 'অত ভয় পাবার কি আছে? বল্ গে যা হয় নি, ভুলে গেছি।'

'ও বাবা, আমি পারবো না।'

'ঠিক আছে আমি যাচ্ছি—'

যাচ্ছিল, যাওয়া হল না। প্রবোধ এসে ঢুকলো বাইরে থেকে এক বোতল ক্যাওড়ার জল হাতে করে।

প্রবোধের মুখ রাগে থমথমে।

এসেই কড়াগলায় বলে ওঠে, 'জগুদাকে কে কি বলেছে?'

বলেছে!

বলবে আবার কে কি?

পারুল বকুল দুজনেই অবাক হয়ে তাকায়। প্রবোধ আরো চড়া গলায় বলে, 'নিশ্চয়ই কিছু একটা বলা হয়েছে, নইলে বুড়োমদ্দ একটা লোক চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যেত না। আমাকে বলে গেল, "আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমি তোর বামুনভোজনের যজ্ঞিশালায় নেই"—শুধু শুধু এমন কথাটা বলবে অমন পরোপকারী মানুষটা? বলেছ, তোমরাই কেউ

কিছু বলেছ। মায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছ তো সবাই, গুরুলঘু জ্ঞান করতে জানো না, গুরুজনদের মান-অপমানের ধার ধার না। উদ্ধত অবিনয়ী এক-একটি রত্ন তৈরী হয়েছ তো!'

বকুল এর বিন্দুবিসর্গও জানে না, তাই বকুল হাঁ করে চেয়ে থাকে। তবে পারুলও উত্তর দেয় না কিছু। কারণ পারুল জানে, এসব কথার লক্ষ্যস্থল পারুল বকুল নয়, তাদের দাদারা।

এই স্বভাব বাবার, মুখোমুখি কিছু বলবার সাহস হয় না ছেলেদের, তাই এমন শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ।

ওরাও তাই শিখেছে।

'জবাব' দেয় না, ঠেস দিয়ে কথা বলে দেওয়ালকে শুনিয়ে।

ছেলে বলেই অবশ্য এতটা সাহস তাদের। মাকে (বোধ করি তুচ্ছ মেয়েমানুষ জাতটার একটা অংশ হিসেবে) তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কটু-কাটব্য করে, আর বাপকে অবজ্ঞা করে।

কিন্তু ওদেরই বা দোষ কি?

ওরা ওদের মা-বাপের মধ্যে শ্রদ্ধাযোগ্য কী দেখতে পাচ্ছে?

হয়তো শুধু 'মা-বাপ' এই হিসেবেই করতো ভয়-ভক্তি, যদি ওদের দৃষ্টিটা আচ্ছন্ন থাকতো অন্য অনেকের মত। কিন্তু তা হয়নি, সুবর্ণলতা অন্য পাঁচজনের থেকে পৃথক করে মানুষ করতে চেয়েছিল তার সন্তানদের। তাদের 'খোলা চোখে' দেখতে শেখাবার চেষ্টা করেছিল, ওরা সে চেষ্টা সফল করেছে। ওরা শুধু 'মা-বাপ' বলেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে—এমন নির্বোধের ভূমিকা অভিনয়ে রাজী নয়।

না করুক, সমতলেও নেমে আসুক।

প্রবোধ অন্তত তা চায়।

প্রবোধ ইচ্ছে করে, ছেলেমেয়েরা তার মুখে মুখে চোটপাট জবাব করুক, সেও তার সমুচিত জবাব দেবার সুযোগ পাক। কিন্তু তা হয় না। ছেলেরা তো দূরের কথা, মেয়েরা পর্যন্ত যেন কেমন অবজ্ঞার চোখে তাকায়।

সে দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে উঠবে না মাথার মধ্যে?

তাই এখনও আগুনজ্বালা কণ্ঠে চীৎকার করে প্রবোধ, 'কেউ কিছু বলে নি বললেই মানবো আমি? ওই অবোধ-অজ্ঞান মানুষটা কখনো মান-অভিমানের ধার ধারে না, সে হঠাৎ এতটা অভিমান করে—'

বাপের কণ্ঠ-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে ভায়েরা এসে দাঁড়ালো, একটু থমকে বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার? বাড়িতে ভোজ-টোজ নাকি? পারুর বিয়ে বুঝি?'

'পারুর বিয়ে!

হতবাক প্রবোধ বলে, 'পারুর বিয়ে? তোমরা জানবে না সেটা?'

'বাঃ এই তো জানছি। ভাঁড় খুরি এসে গেছে!'

বললো ভানু।

তার সেজকাকার ভঙ্গীতে।

প্রবোধ অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকালো। বললো, 'এইভাবে জানবে? বাঃ! কেন, আর কোনো ঘটনা ঘটে নি সংসারে? তোমাদের মা'র চতুর্থীর বামুন-ভোজন—'

'তাই নাকি? ওঃ!'

ভানু ভুরু কোঁচকায়।

ভানুর সেই ভুরুতে ব্যঙ্গের হাসি ছায়া ফেলে।

প্রবোধ হঠাৎ সেইদিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তা এতে হাসবার কি হলো? হাসবার কি হলো? যে মানুষটা তোমাদের সংসারে প্রাণপাত করছে, তার একটা পাওনা নেই সংসারের কাছ থেকে?'

কি উত্তর ভানু দিত কে জানে।

সহসা কোন ঘর থেকে যেন বেরিয়ে এল তার মা। খুব শান্ত আর স্থির গলায় বললো, 'তোমাদের এই সংসার থেকে আমার যা প্রাপ্য পাওনা, সেটা তাহলে শোধ হচ্ছে? অনেক ধন্যবাদ যে, শোধের কথাটা তবু মনে পড়েছে তোমার। কিন্তু ওতে আমার রুচি নেই, সেই কথাটাই জানিয়ে দিতে এলাম তোমায়। এসব আয়োজন করার দরকার নেই, করা হবে না।'

করা হবে না।

প্রবোধ যন্ত্রচালিতের মত বলে, 'আজ হবে না?'

'না। আজ না, কোনদিনও না।'

এরপরও যদি রেগে না ওঠে প্রবোধ, কিসে আর তবে রেগে উঠবে?

অতএব রেগেই বলে, 'হবে না বললেই হলো? রাজ্যিসুদ্ধ লোকজনকে নেমন্তন্ন করে এলাম—'

'নেমন্তন্ন করে এলে?' সুবর্ণলতা স্তব্ধ হয়ে তাকায়। কিন্তু প্রবোধ ভয় পায় না, প্রবোধ এমন স্তব্ধতা অনেক দেখেছে। তাই প্রবোধ বলে, 'এলাম তো! বিরাজ বলেছে, সে সক্কলের আগে চলে আসবে—আর ওবাড়ির সবাই একটু দেরি করবে, কারণ—'

'থাক্ কারণ শুনতে চাই না। লোকজন আসে ভালই, তোমরা থাকবে। আমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকবো।'

'তুমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে?'

প্রবোধ আর পারে না, খিঁচিয়ে উঠে বলে, 'বাপের ছেরাদ্দটা তাহলে আমিই করবো?'

হঠাৎ সুবর্ণ ঘুরে দাঁড়ায়। কাতর গলায় বলে, 'আমায় এবার তুমি ছুটি দাও। আর মন্দ কথা বলিও না আমায়। আর পারছি না আমি।'

চলে যাচ্ছিল দ্রুতপায়ে, ঠিক এই মহামুহূর্তে ঝি এসে খবর দেয়, 'বাবুর বোনের দেশ থেকে অম্বিকেবাবু না কে একজন এসেছে, খবর দিতে বললো।'

॥ এগার ॥

তারপর? তারপর সুবর্ণলতা—

কিন্তু সুবর্ণলতা কী বা এমন মানুষ যে, তার প্রতিদিনকার দিনলিপি বাঁধানো খাতায় তোলা থাকবে, আর পর পর মেলে ধরে দেখতে পাওয়া যাবে! আবাঁধা একখানা খাতার ঝুরো ঝুরো পাতা থেকে সুবর্ণলতাকে দেখতে পাওয়া।

সুবর্ণলতা যখন নিজেই হাতড়ে হাতড়ে খুঁজেছিল সেই ঝুরো খাতার প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলো, তখনই কি সবগুলোর সন্ধান মিলেছিল? কই আর?

শুধু ওর মাথা কুটে মরার দিনগুলোই—

হ্যাঁ, সাদাসিধে দিনগুলো সাদা কালিতে লেখার মত কখন যেন বাতাস লেগে মিলিয়ে গেছে, আর পৃষ্ঠাগুলো ঝরে পড়েছে অদরকারী বলে, শুধু ওই মাথা কোটার দিনগুলোই গাঢ় কালিতে লেখা হয়ে—

কিন্তু মুশকিল এই—কিসে যে সুবর্ণলতা মাথা কোটে বোঝা শক্ত।

কারো সঙ্গে মেলে না।

নইলে একটা জেলখাটা আসামী, কবে কোন্ দিনের একটু আলাপের সূত্র ধরে সুবর্ণলতার সঙ্গে দেখা করবার আবদার নিয়ে ওর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখে ওর স্বামী-পুত্তুর তাকে দরজা থেকেই বিদায় দিয়েছিল বলে মাথা কোটে ও?

বলে, 'ভগবান এ অপমানের মধ্যে আর কতদিন রাখবে আমায়! এবার ছুটি দাও, ছুটি দাও।'

অথচ সত্যের মুখ চাইলে বলতে হয়, আসলে অপদস্থ যদি কেউ হয়ে থাকে তো সে সুবর্ণলতার স্বামী-পুত্রই হয়েছিল!

ওরা সাধারণ সংসারী মানুষ। অতএব একটা জেলখাটা আসামী সম্পর্কে সহসা হৃদয়দ্বার খুলে দিতে পারে না। তাই ঘরের দ্বার খুলে দেয়নি। ওরা জেরা করছিল। বলেছিল, কি দরকার, কাকে চান, কতদিন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, সুবর্ণলতার সঙ্গে খুব কোন জরুরী প্রয়োজন যদি না থাকে এত কষ্ট করে এতদূর আসবার মানে কি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাড়ির কর্তা হিসাবে প্রবোধই করছিল প্রশ্ন, তবে ভানুও ছিল দাঁড়িয়ে। তা বাড়ির কর্তাকে বাড়ির নিরাপত্তা, পরিবারের সম্ভ্রম—এসব দেখতে হবে না? তাই দেখছিল

প্রবোধ। সহসা দেখল সুবর্ণলতা অন্তঃপুরের সভ্যতার গণ্ডি ভেঙে বাড়ির বাইরে সদর রাস্তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভাবা যায়? দেখেছে কেউ কখনো এমন দৃশ্য?

ওটা ওর স্বামীর পক্ষে লজ্জার নয়? অপমানের নয়?

তার উপর কিনা, প্রবোধ যখন রক্তবর্ণ মুখে বলছে, 'তুমি বেরিয়ে এলে যে? এর মানে? ভানু, তোর মাকে বল বাড়ির মধ্যে যেতে—'

তখন কিনা—সুবর্ণলতা, তুমি স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত না করে বলে উঠলে, 'কী সর্বনাশ! অম্বিকা ঠাকুরপো, তুমি এখানে? পালাও পালাও। এ যে ভূতের বাড়ি! মেজবৌদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? কী আশ্চর্য, কেউ তোমায় বলে দেয়নি সে কবে মরে ভূত হয়ে গেছে! এটা তার প্রেতাত্মার বাসভূমি!'

এতে অপদস্থ হলো না তোমার স্বামী-পুত্র?

পরে যদি তোমার ছেলে বলেই থাকে, 'বাবা, তুমি বৃথা রাগ করছো, মা তো বেশি কিছু করেন নি। যা চিরকালের স্বভাব, তাই শুধু করেছেন। অন্যকে অপদস্থ করা, গুরুজনকে অপমান করা—এটাই তো প্রকৃতি ওঁর, এতেই তো আনন্দ!'—সেও কিছু অন্যায় বলে নি।

তার দৃষ্টিতে তো আজীবন ওইটাই দেখেছে সে।

আর সুবর্ণ, তুমি তো অম্বিকার সামনে শুধু ওইটুকু বলেই ক্ষান্ত হও নি? আরও বলেছ। অম্বিকা যখন তৎসত্ত্বেও প্রেতাত্মাকেই হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিল, তুমি শশব্যস্তে পা সরিয়ে নিয়ে বলেছ, 'ছি ছি ভাই, প্রণাম করে আর পাপ বাড়িও না আমার, একেই তো পূর্বজন্মের কত মহাপাপে বাঙালীর মেয়ে হয়ে জন্মেছি, আর আরও কত শত মহাপাপে এই মহাপুরুষদের ঘরে পড়েছি। আর কেন? প্রণাম বরং তোমাদেরই করা উচিত। তোমরা—যারা নিজের সুখ দুঃখ তুচ্ছ করে দেশের গ্লানি ঘোচাতে চেষ্টা করছ।'

কী এ? প্রবোধ যা বলেছে তাছাড়া আর কি?

নাটক ছাড়া আর কী?

পুরো নাটক!

কিন্তু এই ঘরগেরস্ত লোকেদের সংসারটা থিয়েটারের স্টেজ নয়। অথচ সারাজীবনে তুমি তা বুঝলে না! এখনও বুড়ো বয়সেও না।

তোমার কথায় যখন অম্বিকা ম্লান হেসে বলেছিল, 'চেষ্টাই হয়েছে, কাজ আর কী হলো? সবটাই ব্যর্থতা!' তখনও তুমি নাটুকে ভাষাতেই উত্তর দিলে, 'কেন ব্যর্থতা জান ঠাকুরপো? তোমাদের সমাজের আধখানা অঙ্গ পাঁকে পোঁতা বলে। আধখানা অঙ্গ নিয়ে কে কবে এগোতে পারে বল? এই অযত্নে অবত্নে মেয়েমানুষ জাতটাকে যতদিন না শুধু 'মানুষ' বলে

স্বীকার করতে পারবে ততদিন তোমাদের মুক্তি নেই, মুক্তির আশা নেই। চাকরানীকে পাশে নিয়ে কি তোমরা রাজসিংহাসনে বসবে ?'

বললে।

একবার ভাবলে না, তোমার স্বামী-পুত্রের মাথাটা কতখানি হেঁট হলো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তোমার ওই নাটক করায়।

অগত্যাই ওদের কঠোর হতে হয়েছে।

অগত্যাই ধমকে উঠে বলতে হয়েছে, 'পাগলামি করবার আর জায়গা পাও নি ?' আর ওই পাগলামির দর্শককেও কটু গলায় বলতে হয়েছে, 'আপনিও তো আচ্ছা মশাই, ভদ্রলোকের ঘরের মান-ইজ্জত বোঝেন না! দেখছেন—একটা মাথাখারাপ মানুষ ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে—'

এরপরেও অবশ্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

অন্তত অম্বিকার মত শান্ত সভ্য মার্জিতস্বভাব লোকে নিশ্চয়ই পারে না! মাথা হেঁট করে চলে গিয়েছিল সে।

তবু স্বুবর্ণলতা, তুমি হেসে বলে উঠেছিলে, 'ঠিক হয়েছে! কেমন জব্দ ? ভূতের বাড়ির আসার ফল পেলে তো ?'

ভাবো নি, এরপরও তোমাকে তোমার স্বামী-পুত্রের সামনে মুখ দেখাতে হবে, পিছনের ওই চৌকাঠ পার হয়েই আবার ঢুকতে হবে।

কিন্তু ঢুকতে হলেই বা কি!

সুবর্ণলতার শরীরে কি লজ্জা আছে ? কতবারই তো বেরিয়ে পড়েছে সুবর্ণলতা বাড়ির বাইরে, আবার এসে ঢোকে নি ?

ঢুকেছে। আবার ঢুকেছে, আবার দাপট করেছে। মরমে মরে গিয়ে চুপ হয়ে যায় নি। এদিনও তা গেল না। যখন প্রবোধ গর্জে উঠলো, আর ভানু উপযুক্ত ধিক্কার দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে শুধু ঘৃণার দৃষ্টিতে দগ্ধ করা যায় কিনা তার চেষ্টা করলো, তখন কিনা সুবর্ণলতা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে অনায়াসে বলে উঠলো, 'কী আশ্চর্যি! এতে তোমাদের মুখ পোড়ানো হলো কোথায় ? মুখ উজ্জ্বলই হলো বরং। পাগল, পাগলের মতই আচরণ করলো, চুকে গেল ল্যাঠা! তোমার কথার মান বজায় রাখলাম, আর বলছো কিনা মুখ পোড়ালাম ?'

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছিল সেদিন একা সুবর্ণলতার বড় ছেলেই নয়, মেজ-সেজও অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলেছিল, 'চমৎকার!' মা'র শোক হয়েছে ভেবে আর মমতা আসে নি ওদের। ছোটছেলে সুবলের কথাই শুধু বোঝা যায় না, সে বরাবরই মুখচোরা। সে যে কোথা থেকে তার এই চাপা স্বভাব পেয়েছে!

কিন্তু সুবর্ণলতার মেয়েরা ?

যে মেয়ে দুটো এখনো পরের ঘরে যায় নি ? পারুল আর বকুল ?

তা ওদের কথাও বোঝা যায় নি।

মনে হচ্ছিল ওদের চোখে একটা দিশেহারা ভাব ফুটে উঠেছিল। যেন ওরা ঠিক করতে পারছিল না, মায়ের উপরে বরাবর যে ঘৃণা আর বিরক্তি পোষণ করে এসেছে, সেটাই আরো পুষ্ট করবে, না নতুন চিন্তা করবে ?

বকুল ছেলেমানুষ !

এত সব ভাববার বয়স হয় নি তার !

কিন্তু তাই কি ?

সুবর্ণলতার ছেলেমেয়েরা ছেলেমানুষ থাকবার অবকাশ পেল কবে ? জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত তো ওরা শুধু ওদের মাকে বিশ্লেষণ করেছে, আর তিক্ততা অর্জন করেছে। তাই করতে করতেই বড় হয়ে উঠেছে।

ওরা অনেক কিছু জেনে বুঝে পরিপক্ক।

বাপকে ওরা ঘৃণা করে না, করে অবহেলা। কিন্তু মাকে তা পারে না! মাকে অবহেলাও করতে পারে না, অস্বীকারও করতে পারে না, তাই ঘৃণা করে।

শুধু আজই যেন ওদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাচ্ছে। অম্বিকার ফিরে চলে যাওয়ার মধ্যে ওরা বুঝি সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটার দুঃসহ অসহায়তা টের পেয়ে গেছে। তাই দিশেহারা হয়ে ভাবছে, 'গৃহিণী' শব্দটা কি তাহলে একটা ছেলেভোলানো শব্দ ? নাকি 'দাসী' শব্দেরই আর একটা পরিভাষা ?

গৃহিণীর যদি তার গৃহের দরজায় এসে দাঁড়ানো একটা অতিথিকে 'এসো বসো' বলে ডাকবার অধিকারটুকু মাত্র না থাকে, তবে 'গৃহিণী' শব্দটা ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কি ? ওই ধোঁকায় ধোঁকায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়ে দাসত্ব করিয়ে নেওয়া !

সংসার করা মানে তা হলে শুধু সংসারের পরিচর্যা করা, আর কিছু না! আশ্চর্য, যেখানে এক কানাকড়াও অধিকার নেই, সেখানে কেন এই গালভরা নাম ?

খুব স্পষ্ট করে মনে না পড়লেও মেজপিসীর বাড়ি গিয়ে থাকার কথাটা পারুলের কিছু কিছু মনে আছে বৈকি! মনে আছে অম্বিকাকাকার নাম, তাছাড়া ছেলেবেলায় কতবারই না শুনেছে সে নাম মায়ের মুখে। কত শ্রদ্ধার সঙ্গে, কত প্রীতির সঙ্গে, কত স্নেহের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে সে নাম। অথচ সেই মানুষটাকে 'দূর দূর' করে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। আর হলো সুবর্ণলতারই সামনে !

গৃহিণীর সম্ভ্রম দিয়ে সুবর্ণলতার ক্ষমতা হলো না তাকে ডেকে এনে ঘরে বসাবার।

পারুল দেখেছে সেই অক্ষমতা। হয়তো বকুলও দেখেছে। আর অনুভব করেছে এ অক্ষমতা বুঝি একা সুবর্ণলতারই নয়।

তাই দৃষ্টিভঙ্গী পালটাচ্ছে ওদের।

কিন্তু সুবর্ণলতার বাপ-মায়ের সেই 'চতুর্থী শ্রাদ্ধের' কি হলো? খুব একটা সমারোহের আয়োজন করেছিল না তার স্বামী ওই উপলক্ষে? বলে বেড়াচ্ছিল,'না বাবা, এ হলো গিয়ে "শ্বশুরশাশুড়ী দায়", পিতৃমাতৃদায়ের চতুর্গুণ!

তা সেও একরকম ধাষ্টামো করেই হলো বৈকি! সহজ সাধারণ কিছু হলো না। হবে কোথা থেকে?

সহজে কিছু কি হতে দেয় সুবর্ণলতা? সব কিছুকেই তো বিকৃত করে ছাড়ে ও।

সুবর্ণলতা তাই বলে বসলো, 'আমি ওসব করবো না।'

'করবে না? ভুজ্যি উচ্ছুগ্যুও করবে না তুমি মা-বাপের?'

'না!'

না!

শব্দজগতের চরমতম কঠোর শব্দ!

নিষ্ঠুর অমোঘ!

আশ্চর্য, আশ্চর্য!

অত সব আয়োজন তাহলে?

নষ্ট গেল?

আবার কি!

পুরোহিত এসে শুনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাছাড়া আর করবেন কি? প্রবোধ যদি বা বলছিল—'ওর তো আবার জ্বর হয়ে গেছে রাত থেকে—কাজ করা হবে কি? জ্বর গায়ে তো—'কিন্তু সুবর্ণলতা তো সে কথাকে দাঁড়াতে দেয় নি। বলে উঠেছিল, 'উনি ঠিক জানেন না ঠাকুরমশাই, জ্বর-টর কিছু হয় নি আমার—'

'জ্বর-টর হয় নি? তবে?'

'কিছু না! ইচ্ছে নেই সেটাই কথা।'

পুরোহিত একবার প্রবোধের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন শালগ্রামশিলাকে উঠিয়ে নিয়ে।

'এ বাহাদুরিটুকুও কি না দেখালে চলতো না?' হেরে যাওয়া গলায় বলেছিল প্রবোধ, 'ও বাড়ির পুরুত উনি—'

সুবর্ণলতা চুপ করে তাকিয়ে ছিল।

প্রবোধ আবার বলেছিল, 'চিরকালের গুরুবংশের ছেলে—'

'জানি', সুবর্ণলতাও প্রায় তেমনি হেরে যাওয়া গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'গুরুবংশের ছেলে, পুরোহিতের কাজ করছেন, তাতে শালগ্রাম, তাঁর সঙ্গে আর জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা কইতে ইচ্ছে হলো না।'

হলো না।

হলো না তখন সে ইচ্ছে।

অথচ নিজেই সুবর্ণলতা ঘণ্টাকয়েক পরে 'শরীর খারাপ লাগছে, বোধ হয় জর আসছে—' বলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো গিয়ে।

মিছিমিছিই বলল বৈকি!

গা তো ঠাণ্ডা পাথর।

বললো কাদের? কেন, যত সব আত্মীয়-কুটুম্বদের। বাড়ি বাড়ি ঘুরে যাদের নেমন্তন্ন করে এসেছে প্রবোধ, তার স্ত্রীর মা-বাপ মরার উপলক্ষে।

তারা কি জানে, সুবর্ণলতা পিতৃ-কার্য করতে ইচ্ছে হয় নি বলে পুরোহিতকে বিদায় দিয়েছে, আর আত্মীয়দের মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় নি বলে চাদর ঢাকা দিয়ে পড়ে আছে?

তবে সুবর্ণলতার পড়ে থাকার জন্যে কি কিছু আটকেছিল?

কিছু না। কিছু না।

প্রবোধের গুষ্টির সবাই এল, ভোজ খেল, সুবর্ণলতার শুয়ে থাকার জন্যে হা-হুতাশ করলো, চলে গেল।

সুবর্ণলতাই শুধু চাদর মুড়ি দিয়ে গলদঘর্ম হতে থাকলো।

কিন্তু সুবর্ণলতার মায়ের সেই চিঠিটা?

সেটার কি হলো?

সে চিঠি কি খুললো না সুবর্ণলতা? কবরের নীচে চিরঘুমন্ত করে রেখে দিল তার মায়ের অন্তিম বাণী?

এত অভিমান সুবর্ণলতার?

এত তেজ?

এত কাঠিন্য?

তা প্রথমটা তাই ছিল বটে! কতদিন যেন সেই খাম মুখবন্ধ হয়ে পড়ে রইল সুবর্ণলতার ট্রাঙ্কের নীচে কাপড়চোপড়ের তলায়।

কিন্তু সেই গভীর অন্তরাল থেকে যে সেই অবরুদ্ধবাণী অনুক্ষণ সুবর্ণলতার সমগ্র চেতনাকে

ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বলেছে, 'সুবর্ণ, তুমি কি পাগল ? সুবর্ণ, এ তুমি কী করছো ?' আর তারপর হতাশ হতাশ গলায় বলেছে, 'সুবর্ণ, তোমার এই অভিমানের মর্ম কে বুঝবে ? কে দেবে তার মূল্য ?'

অবশেষে একদিন এই ধাক্কা অসহ্য হলো। সুবর্ণ ট্রাঙ্কের তলা থেকে ওর মায়ের সেই অন্তিমবাণী টেনে বার করলো।

দিনটা ছিল একটা রবিবারের দুপুর। যদিও জ্যৈষ্ঠ মাস, তবু কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মেঘলা দুপুর। আকাশটা যেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কোনো রকমে 'দিন সই' করেই সন্ধ্যার কুলায় আশ্রয় নেবো নেবো করছে। বাড়ি থেকে কারো বেরোবার কথা নয়, তবু আকস্মিক একটা যোগাযোগে আশ্চর্য রকমের নির্জন ছিল বাড়িটা।

গিরিবালার সাবিত্রীব্রতের উদ্‌যাপন সেদিন। সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মজন ভোজনেরও ব্যবস্থা করেছিল সে, তাই ভাসুরের বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছিল ছেলেকে দিয়ে।

কবে যেন ব্রতটা ধরেছিল গিরিবালা ?

সুবর্ণ ও-বাড়িতে থাকতেই না ?

উদ্‌যাপনের খবর মনে পড়েছিল বটে সুবর্ণর। কারণ ওই ব্রতটাকে উপলক্ষ করে অজস্রবারের মধ্যে আরো একবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল সুবর্ণকে!

মুক্তকেশী বলেছিলেন, 'বড়বৌমার কথা বাদ দিই, ওর না হয় ক্ষ্যামতা নেই, কিন্তু তোমার সোয়ামীর পয়সা তো ওর সোয়ামীর চেয়ে কম নয় মেজবৌমা, "খরুচে বস্তুটা"য় সেজবৌমা ব্রতী হলো, আর তুমি অক্ষমের মতন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখবে ?'

হয়তো ইদানীং গিরিবালার স্বাধীনতাও ভাল লাগছিল না মুক্তকেশীর, তাই এক প্রতিপক্ষকে দিয়ে আর এক প্রতিপক্ষকে খর্ব করবার বাসনাতেই এ উস্কানি দিচ্ছিলেন। কিন্তু সুবর্ণলতা তাঁর ইচ্ছে সফল করে নি, সে অম্লানবদনে বলেছিল, 'ও ধাষ্টামোতে আমার রুচি নেই।'

ধাষ্টামো !

সাবিত্রীব্রত ধাষ্টামো ! মুক্তকেশী স্তম্ভিত দৃষ্টি ফেলে বোবা হয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

গিরিবালাও মুখ লাল করে বলে উঠেছিল, 'এ, কথার মানে কি মেজদি ?'

মেজদি আরো অম্লানবদনে বলেছিল, 'মানে খুব সোজা। যার সবটাই ফাঁকা, তা নিয়ে আড়ম্বর করাটা ফাঁকি ছাড়া আর কি ? অন্যকে ধোঁকা দেওয়া, আর নিজেকে ফাঁকি দেওয়া, এই তো ? সেটাই ধাষ্টামো !'

• 'স্বামীভক্তিটা তাহলে হাসির বস্তু ?'

সুবর্ণলতা হেসে উঠে বলেছিল, 'ক্ষেত্রবিশেষে নিশ্চয় হাসির ! ফুল-চন্দন নিয়ে স্বামীর

"পা" পূজো করতে বসেছি আমরা, এ কথা ভাবতে গিয়েই যে হাসি উথলে উঠছে আমার !'

'নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার কোরো না মেজদি, ভক্তি যার আছে—'

মেজদি এ ধিক্কারকে নস্যাৎ করে দিয়ে আরো হেসে বলেছিল, 'ভক্তি ? ওই ভেবে মনকে চোখ ঠারা, এর মধ্যে ভক্তিও নেই, মুক্তিও নেই সেজবৌ ! আছে শুধু শখ আর অহমিকা !'

সেই অকথ্য উক্তির পর বাড়িতে কোর্ট-কাছারি বসে গিয়েছিল। যে ছাওর ডেকে কথা আর কইত না ইদানীং, সেও এসে ডেকে বলেছিল, 'বিষটা নিজের মধ্যে থাকলেই তো ভাল ছিল মেজবৌ, অন্যের সরল মনে গরল ঢেলে দেবার দরকার কি ? স্বামীকে সত্যবান হতে হবে তবে স্ত্রীরা সাবিত্রী হবে, নচেৎ নয়, এমন বিলিতি কথার চাষ আর নাই বা করলে বাড়িতে !'

আর প্রবোধ বাড়ি ফিরে ঘটনা শুনে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে গিয়েছিল, বলেছিল, 'হবে, বিদেয় হতেই হবে আমায় এ বাড়ি থেকে। এভাবে আর—'

সুবর্ণলতা বলেছিল, 'আহা এ সুমতি হবে তোমার ? তাহলে পায়ে না হোক, মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক তোমার !'

অবশ্য বিষমন্তর দেওয়া সত্ত্বেও ব্রত নেওয়া বন্ধ থাকেনি গিরিবালার, এবং দেখা যাচ্ছে চোদ্দ বছর ধরে নিষ্ঠা সহকারে পতিপূজা করে এখন সগৌরবে ব্রত উদ্‌যাপন করতে বসেছে সে।

সুবর্ণলতা কি ওর সুখী হবার ক্ষমতাকে ঈর্ষা করবে ?

না সুবর্ণলতা শুধু হাসবে ?

তা এখন আর হেসে ওঠেনি সুবর্ণ, শুধু ছেলেটাকে বলেছিল, 'যেতে পারবো না বাবা সুশীল, মাকে বলিস মেজজেঠির শরীর ভাল নেই। আর সবাই যাবে।'

সেই উৎসবে যোগ দিতে চলে গেছে সুবর্ণর স্বামী, সন্তানেরা। অবশ্য পারুল বাদে। পারুলের থেকে বয়সে ছোট খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে, পারুর হয় নি, এই অপরাধে প্রবোধ বলেছিল, 'ওর যাওয়ার দরকার নেই।'

পারু মনে মনে বলেছে, 'বাঁচলাম।'

কে জানে, হয়তো বাড়ির কোন্ কোণে একখানা বই নিয়ে পড়ে আছে পারুল, হয়তো বা তার কবিতার খাতাটা নিয়েও বসতে পারে, এই অকস্মাৎ পেয়ে যাওয়া একখণ্ড অবসরের সুযোগ। সুবর্ণ জানে, পারু তার নির্জনতায় ব্যাঘাত ঘটাবে না।

কিন্তু তখন কি ভেবেছিল সুবর্ণ, ওরা চলে গেলে মায়ের চিঠিখানা খুলবো আমি ?

তা ভাবেনি !

শুধু অনেকটা কলকোলাহলের পর হঠাৎ বাড়িটা ঠাণ্ডা মেরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক একটা মন উচাটন ভাব হয়েছিল সুবর্ণর !

আর তখনই মনে হয়েছিল ওর, 'আমি কি সেজবৌয়ের সুখী হওয়ার ক্ষমতাকে হিংসে করছি ?···তা নয়তো কেন আজই এত করে মনে আসছে সারাজীবন আমি কি করলাম !'

অবিশ্রান্ত একটা প্রাণপণ যুদ্ধ ছাড়া আর কোনোখানে যেন কিছু চোখে পড়ে না। কোথাও যে একটু সুশীতল ছায়া আছে, কোনোখানে যে একবিন্দু তৃষ্ণার জল মিলেছিল, সে কথা যেন ভুলেই যাচ্ছে সুবর্ণ। সুবর্ণ দেখতে পাচ্ছে অবিরত সে শুধু আক্রমণ ঠেকাচ্ছে, তবু এগিয়ে যাবার চেষ্টায় নিজেকে ছিন্নভিন্ন করেছে।

নিজের উপর করুণায় আর মমতায় চোখে জল এসে গেল সুবর্ণর, ভিতরটা যেন হাহাকার করে উঠলো, আর তখনই মনে হলো, দেখব আজ আমি দেখব—ভগবান আমাকে শেষ কি উপহার পাঠিয়েছেন !

খাম ছিঁড়তে হাত কাঁপছিল সুবর্ণর, আর বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল। যেন ওটা ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মস্ত একটা কিছু ফুরিয়ে যাবে ওর।

কী সে ?

পরম একটা আশা ?

নাকি ওই বন্ধ খামটার মধ্যে ওর মা এখনও জীবন্ত রয়েছে, খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ নিশ্বাস ফেলবে ?

তা তেমনি একটা কষ্টের মধ্যেই খামটা খুললো সুবর্ণলতা। আর তারপরই একটা জলের পর্দা যেন ঢেকে দিল সমস্ত বিশ্বচরাচর।···ঝাপ্‌সা হয়ে গেল কালো কালো অক্ষরের সারি, ঝাপ্‌সা হয়ে গেল বুঝি নিজের ওই কাগজ ধরা হাতখানাও। পর্দাটা পড়ে যাবার আগে শুধু একটা শব্দ ঝলসে উঠেছিল—সেই শব্দটাই বাজতে লাগলো মাথার মধ্যে।

"কল্যাণীয়াসু—

সুবর্ণ—'

কল্যাণীয়াসু···সুবর্ণ !

এ নাম তা হলে মনে রেখেছে সুবর্ণর মা ?

আজো কেউ তা হলে সুবর্ণ নামে ডাকে তাকে ?

না না, কোনোদিন ডাকেনি, কোনোদিনও আর ডাকবে না। শুধু নামটা মনে রেখেছিল, অথচ একদিনের জন্যে সেই মনে রাখার প্রমাণ দেয়নি সে।

জলের পর্দাটা মুছে ফেলবার কথা মনে পড়েনি সুবর্ণর। যতক্ষণ বাতাসে শুকিয়ে গেল, বুঝি বা বেশিই শুকিয়ে গেল, ততক্ষণে ওই কল্যাণ সম্বোধনের পরবর্তী কথাগুলো চোখে পড়লো।

"কল্যাণীয়াসু—

সুবর্ণ,

বহুদিন পূর্বে মরিয়া যাওয়া কোনও লোক চিতার তল হইতে উঠিয়া আসিয়া কথা কহিতেছে দেখিলে যেরূপ বিস্ময় হয়, বোধ হয় সেইরূপ বিস্ময় বোধ করিতেছ! আর নিশ্চয় ভাবিতেছ 'কেন আর? কি দরকার ছিল?'

কথাটা সত্য, আমিও সে কথা ভাবিতেছি। শুধু আজ নয়, দীর্ঘদিন ধরিয়া ভাবিতেছি। যেদিন তোমাকে ভাগ্যের কোলে সমর্পণ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি, সেইদিন হইতেই এই পত্র লেখার কথা ভাবিয়াছি, এবং দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছি। ভাবিয়াছি কেন আর? আমি তো তাহার আর কোনো উপকারে লাগিব না! (জলের পর্দাটা আবার দুলে উঠেছে, সেই সঙ্গে স্বর্ণর ব্যাকুল আবেগ।···মা, মা, সেটাই তো পরম উপকার হতো! তোমার হাতের অক্ষর, তোমার স্নেহ-সম্বোধন, তোমার 'স্বর্ণ' নামে ডেকে ওঠা, হয়তো জীবনের গতি বদলে দিতো তোমার স্বর্ণর!) তথাপি বরাবর ইচ্ছা হইত, তোমায় একটি পত্র দিই। তবু দেওয়া হয় নাই। কেন হয় নাই, সেটা এখন বুঝিতে পারি, দেওয়া হয় নাই কেবলমাত্র লজ্জায়। তোমার কাছে আমার অপরিসীম লজ্জা, তোমার কাছে আমার অপরাধের সীমা নাই। সে অপরাধের ক্ষমা নাই।

জীবনের এই শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছাইয়া মনের সঙ্গে যে শেষ বোঝাপড়া করিতেছি, তাহাতেই আজ এই সত্য নির্ধারণ করিতেছি, তোমাকে অমন করিয়া নিষ্ঠুর ভাগ্যের মুখে ফেলিয়া আসা আমার উচিত হয় নাই। হয়তো তোমার জন্য আমার কিছু করার ছিল!

তবু—ভগবানের দয়ায় তুমি হয়তো ভালই আছো। তোমার ছোড়দার কাছে জানিয়াছিলাম তোমার কয়েকটি সন্তান হইয়াছে ও খাইয়া পরিয়া একরকম সুখেই আছো। তবু এমনই আশ্চর্য, চিরদিনই মনে হইয়াছে তুমি বোধ হয় সুখে নাই!···(মা মা, তুমি কিন্তু অন্তর্যামী? সত্যই দুঃখী, বড় দুঃখী, তোমার স্বর্ণ চিরদুঃখী!) এই অদ্ভুত চিন্তা বোধ করি মাতৃহৃদয়ের চিররহস্য—যদিও মাতৃহৃদয়ের গৌরব করা আমার শোভা পায় না! কিন্তু স্বর্ণ, ভাবিতেছি তুমি কি আমার চিঠির ভাষা বুঝিতে পারিতেছ? জানি না তোমার জীবন কোন্ পথে প্রবাহিত হইয়াছে, জানি না তুমি সে জীবনে শিক্ষাদীক্ষার কোনো সুযোগ পাইয়াছ কিনা! আজ তুমিও আমার অপরিচিত, আমিও তোমার অপরিচিত।

কিন্তু সত্যই কি তাই?

সত্যই কি আমরা অপরিচিত?

তবে কেন সর্বদাই মনে হয় স্বর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, স্বর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে না। সে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে পারিবে। তোমার মধ্যে যে অঙ্কুর ছিল। যে কয়টি দিন তোমাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে উক্ত ধারণাই বদ্ধমূল ছিল।

তাই মনে হয়, তুমি হয়তো তোমার হৃদয়হীন মাকে কতকটা বুঝিতে পারো। হয়তো অবিরত ধিক্কার দিবার পরিবর্তে একবার একটু ভালবাসার মন নিয়ে চিন্তা করো!

একদা সংসারের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া সংসার হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। তুমি জানো, তোমাকে উপলক্ষ করিয়াই সেই ঝড়ের সৃষ্টি। বেশি বিশদ করিয়া সেসব কথা লিখিতে চাহি না। তবে এই সুদীর্ঘকাল সংসার হইতে দূরে থাকিয়া অবিরত মানুষকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে এইটা বুঝিয়াছি, এ সংসারে যাহাদের 'অন্যায়কারী' বলিয়া চিহ্নিত করা হয়, তাহারা সকলেই হয়তো শাস্তির যোগ্য নয়। তাহারা যা কিছু করে, তার সবটাই দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া করে না। অধিকাংশই করে না বুঝিয়া। তাহাদের বুদ্ধিহীনতাই তাহাদের অঘটন ঘটাইবার কারণ! কাজেই—তাহারা ক্রোধের যোগ্যও নয়। তাহারা বড় জোর বিরক্তির পাত্র, এবং করুণার পাত্র।

কিন্তু যখন এই বুদ্ধিহীনতার সঙ্গে একটা জীবনমরণের প্রশ্নের সংঘর্ষ লাগে, তখন মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া বিচার করা সহজ নয়। আর এও জানি, সেদিন আমার পক্ষে এছাড়া আর কিছু সম্ভব ছিল না।···তোমার পিতা ও ভ্রাতারা আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, পত্রে কোন কাজ না হওয়ায়, কাশীতে আসিয়াও অনুরোধ, উপরোধ ও তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাহা আর হাতে তুলিয়া লওয়া চলে না। সেই ফেলিয়া আসা সংসার-জীবনের সহিত আবার নিজেকে খাপ খাওয়ানোও অসম্ভব। তুমি জানো হয়তো, তোমার দাদামহাশয় তখন কাশীবাসী। তাঁহার কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তদানীন্তন বহু কাশীবাসী পণ্ডিতের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সন্ধান করিয়াছি হিন্দু বিবাহের মূল তাৎপর্য কি, মূল লক্ষ্য কি, এ বন্ধন যথার্থই জন্ম-জন্মান্তরের কিনা। কিন্তু যখনই প্রশ্ন তুলিয়াছি, এই বন্ধনের দৃঢ়তা পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমান নয় কেন, পুরুষের পক্ষে 'বিবাহ' একটি ঘটনা মাত্র, অথচ নারীর পক্ষে চির-অলঙ্ঘ্য কেন, সদুত্তর পাই নাই। উপরন্তু এই প্রশ্নের অপরাধে অনেক স্নেহশীল পণ্ডিতের স্নেহ হারাইয়াছি। ক্রমশ বুঝিয়াছি এর উত্তর পুরুষ দিতে পারিবে না, ভবিষ্যৎকালই দিবে। কারণ কোনো একটি সম্পত্তিতে ভোগ-দখলকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সহজে দানপত্র লিখিয়া দেয় না।·· স্ত্রীলোকের যাহা কিছুতে অনধিকার, তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে স্ত্রীজাতিকেই!

কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্যের।

ইহাই সার কথা, ধৈর্য ব্যতিরেকে কোনো কাজই সফল হয় না। এই কথাটি বুঝিতে আমার সমগ্র জীবনটি লাগিয়াছে, আর এই কথাই মনে হইয়াছে, একথা বলিয়া যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কে কান দিবে? তোমাকে বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে, সঙ্কোচে কুণ্ঠায় নীরব থাকিয়াছি। তাছাড়া এ ভয়ও ছিল, হয়তো আমার পত্র তোমার সাংসারিক জীবনে অশান্তির সৃষ্টি করিবে। তাই ইহা আমার মৃত্যুর পর তোমার হাতে পৌঁছাইবার নির্দেশ

দিয়াছি। হয়তো তখন তোমার এই সংসারত্যাগিনী মাকে, তোমার স্বামীর সংসার একটু সদয়চিত্তে বিচার করিবে। হয়তো ভাবিবে উহাকে দিয়া আর কী ক্ষতির সম্ভাবনা?

তোমাকে এত কথা লিখিতেছি কারণ বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা বুঝি, তুমি এখন একটি বয়স্থা গৃহিণী। কিন্তু মা সুবর্ণ, তোকে যখন দেখিতে চেষ্টা করি, তখন একটি ক্ষুদ্র বালিকা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। পরনে ঘাগরা, মাথায় চুল বেণী করিয়া বাঁধা, হাতে বই-খাতা-স্লেট, একটি স্কুল-পথযাত্রিণী বালিকা!

তোর এই মূর্তিটি ভিন্ন আর কোনো মূর্তিই আমার মনে পড়ে না। এই মূর্তিই আমার সুবর্ণ! সেই যে তোকে তোর স্কুলে পাঠাইয়া দিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, সেই মূর্তিটিই মনের মধ্যে আঁকা আছে।

কিন্তু তেমন ইচ্ছা করিলে কি আমি তোমায় আর একবার দেখিতে পাইতাম না? আর তেমন ইচ্ছা হওয়াই তো উচিত ছিল। কিন্তু সত্য কথা বলি, তোমার সেই মূর্তিটি ছাড়া আর কোনো মূর্তিই আমার দেখিতে ইচ্ছা ছিল না।....তোমাকে লইয়া আমার অনেক আশা ছিল, অনেক সাধ-স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সব আশাই চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তবু ওই মূর্তিটি আর চূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয় নাই!...তুমি হয়তো ভাবিতেছ এসব কথা এখন আর লিখিবার অর্থ কি? হয়তো কিছুই অর্থ নাই, তবু মানুষের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষাই বুঝি কেহ তাহাকে যথার্থ করিয়া বুঝুক।...আমাকে কেহ বুঝিল না--এর বড়ো আক্ষেপ বোধ হয় আর কিছুই নাই। পুরুষমানুষের একটা কর্মজীবন আছে, সেখানে তাহার গুণ কর্ম রুচি প্রকৃতির বিচার আছে। সেখানেই তাহার জীবনের সার্থকতা অসার্থকতা। মেয়েমানুষের তো সে জীবন নাই, তাই তাহার একান্ত ইচ্ছা হয়, আর কেহ না বুঝুক, তাহার সন্তান যেন তাহাকে বুঝে, যেন তাহার জন্য একটু শ্রদ্ধা রাখে, একটু মমতার নিশ্বাস ফেলে! সেইটুক তার জীবনের যথার্থ সার্থকতা। হয়তো মৃত্যুর পরেও এ ইচ্ছা মরে না, তাই এই পত্র।

হয়তো তুমি চিরদিনই তোমার মমতাহীন মাকে ধিক্কার দিয়াছ, কিন্তু মৃত্যুর পরও যদি সে ভাবের পরিবর্তন হয়, বুঝি বা আত্মা কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিবে। তাই মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া এই পত্র লিখিবার বাসনা।

সুবর্ণ, তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না।

তোমার ছোড়দাদা মোগলসরাইতে কাজ করে, মাঝে মাঝে আসে। নিষেধ শোনে না। মনে হয় সে হয় তো আমাকে কিছুটা বোঝে, তাই কখনো তোমার দাদার মত মায়ের অপরাধের বিচার করিতে বসে না। এখানে আসিয়াই আমি যে মেয়ে-স্কুলটি গড়িয়াছিলাম, তাহার পরিসর এখন যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। তোমার ছোড়দা স্বেচ্ছায় মাঝে মাঝে তাহার দেখাশুনা করে। মনে হয়, আমার মৃত্যুর পর স্কুলটি টিঁকিয়া থাকিতেও পারে। প্রথম প্রথম বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া ছাত্রী সংগ্রহ করিতে হইত। ক্রমশ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে,

পিতামাতারা স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসিতেছেন, এবং অনুধাবন করিতেছেন, দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন আছে।

আশা হয় এইভাবেই 'কালে'র চেহারার পরিবর্তন হইবে। মানুষের বুদ্ধি বা শুভবুদ্ধি সহজে যাহা করিয়া তুলিতে সক্ষম না হয়, 'প্রয়োজন' আর ঘটনাপ্রবাহই তাহাকে সম্ভব করিয়া তোলে।

কেবলমাত্র পুঁথিপত্রে বা কাব্যে-গানে নহে, ভবিষ্যতে জগতের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষমানুষকে একথা স্বীকার করিতেই হইবে—মেয়েমানুষও মানুষ। বিধাতা তাহাদেরও সেই মানুষের অধিকার ও কর্মক্ষমতা দিয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। একপক্ষের সুবিধা সম্পাদনের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি নয়।

মহাকালই পুরুষজাতিকে এ শিক্ষা দিবে।

তবে এই কথাই বলি—এর জন্য মেয়েদেরও তপস্যা চাই। ধৈর্যের, সহ্যের, ত্যাগের এবং ক্ষমার তপস্যা।

মনে করিও না উপদেশ দিতে বসিয়াছি।

সময়ে যাহা দিই নাই, এখন এই অসময়ে আর তাহা দিতে বসিব না। শুধু নিজের সমগ্র জীবন দিয়া যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, সেই কথাটি কাহাকেও বলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাহাকে বলিব? আর কেই বা কান দিয়া শুনিবে? স্ত্রীলোকেরা তো আজও অজ্ঞতার অহঙ্কার ও 'মিথ্যা স্বর্গে'র মোহে তমসাচ্ছন্ন। তাহারা যেন বিচারবুদ্ধির ধার ধারিতেই চাহে না। ভাবনা হয়—সহসা যেদিন তাহাদের চোখ ফুটিবে, যেদিন বুঝিতে শিখিবে ওই 'স্বর্গে'র স্বরূপ কি, সেদিন কি হইবে! বোধ করি সেদিনের পথনির্ণয় আরো শতগুণ কঠিন।

তবু এখানে বহু তীর্থবাসিনী ও নানান অবস্থার স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসিয়া, এবং আপন জীবন পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যদি সংসারের মধ্যে থাকিয়াই জীবনের সর্ববিধ উৎকর্ষ সাধন করিয়া পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়, তাহাই প্রকৃত পূর্ণতা।

কিন্তু তেমন 'সম্ভব' কয়জনের পক্ষেই বা সম্ভব? প্রতিকূল সংসার তো প্রতিনিয়তই আঘাত হানিয়া হানিয়া সে পূর্ণতার শক্তিকে খর্ব করিতে বদ্ধপরিকর।···'মেয়েমানুষ মমতার বন্ধনে বন্দী',···'মায়ের বাড়া নিরুপায় প্রাণী আর নাই,' এ তথ্য বুঝিয়া ফেলিয়াই না পুরুষের গড়া সমাজ এতো সুবিধা নেয়, এতো অত্যাচার করিতে সাহসী হয়! তবে এ বিশ্বাস রাখি, একদিন এ দিনের অবসান হইবেই। দেশের পরাধীনতা দূর হইবে, স্ত্রীজাতির পরাধীনতাও দূর হইবে।

শুধু আশা করিতে ইচ্ছা হয়, ভবিষ্যৎকালের সেই আলোকোজ্জ্বল দিনের মেয়েরা—আজকের এই অন্ধকার দিনের মেয়েদের অবস্থা চিন্তা করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে,

আজকের দিনের মেয়েদের মর্মজ্বালা অনুভব করিয়া একবিন্দু অশ্রুবিসর্জন করিতেছে, আজ যাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণপাত করিল, তাহাদের দিকে একটু সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেছে।

মা সুবর্ণ, এসব কথা না লিখিয়া যদি লিখিতাম—'সুবর্ণ, এযাবৎকাল প্রতিনিয়ত আমি তোমার জন্য কাঁদিয়াছি—' হয়তো তুমি আমার হৃদয়টা শীঘ্র বুঝিতে। কিন্তু সুবর্ণ, আমি তো শুধু আমার সুবর্ণর জন্যই কাঁদি নাই, দেশের সহস্র সহস্র সুবর্ণলতার জন্য কাঁদিয়াছি। তাই এই সব কথা।

তাছাড়া অবিরত শুষ্কজ্ঞানের চর্চায় কাটাইতে কাটাইতে ভাষাও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাই মাঝে মাঝেই মনে হইতেছে, তুমি কি এত কথা বুঝিতে পারিতেছ! ন' বছর বয়স হইতেই তো তোমার বিদ্যাশিক্ষায় ইতি হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, তুমিও নিশ্চয়ই এসব কথা ভাবো, তুমিও কেবলমাত্র নিজের কথাই নয়, আরো সহস্র মেয়ের কথা চিন্তা করো।

অধিক আর কি লিখিব, আমার শতকোটি আশীর্বাদ গ্রহণ করো। তোমার পরিজনবর্গকেও জানাইও। আর যদি সম্ভব হয়, তোমার এই চিরনিষ্ঠুর মাকে—অন্তত তার মৃত্যুর পরও ক্ষমা করিও। ইতি

তোমার নিত্য আঃ মা"

অনেকবার অনেক ঝলক জল গালের উপর গড়িয়ে পড়েছে, অনেকবার সে জল শুকিয়েছে, এখন শুধু গালটায় লোনাজল শুকিয়ে যাওয়ার একটা অস্বস্তির অনুভূতি।

নাকি শুধু গালেই নয়, অসাড় অনুভূতি দেহমনের সর্বত্র!

স্তব্ধ, মৃত্যুর মত স্তব্ধ!

যেন এ স্তব্ধতা আর ভাঙবে না কোনোদিন। এই স্তব্ধতার অন্তরালে বয়ে চলবে অন্তহীন একটা হাহাকার।

সুবর্ণর মা নিজেকে জানিয়ে গেল, সুবর্ণকে জেনে গেল না।

সুবর্ণর মা সন্দেহ করে গেল সুবর্ণ এত সব কথা নিয়ে ভাবে কিনা।

সুবর্ণর মা শুধু আশা করে গেল, হয়তো সুবর্ণ সহস্র মেয়ের কথা ভাবে। আর কিছু নয়। আর কিছু করার নেই।

॥ বারো ॥

'দেখলে পারুকে?'

সুবালা তার ভাঙা দাঁতের হাসি হেসে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে সকৌতুকে বলে, 'বল শুনি কেমন লাগলো?'

অম্বিকা অবাক হয়।

অম্বিকা যেন আর এক জগৎ থেকে এসে পড়ে।

'পারু মানে ? পারু কে ?'

'পারু কে কিগো ? মেজদার মেয়ে না ? এই সুবালাসুন্দরীর ভাইঝি ! তোমার সামনে বেরোয়নি বুঝি ? না বেরোনোই সম্ভব, বড় হয়েছে তো ! তা মেজবৌ কিছু বললো ?'

অম্বিকা বিচিত্র একটু হেসে বলে, 'বললেন।'

সুবালা আশ্বস্ত গলায় বলে, 'যাক, তাহলে সেজদা আমার চিঠিটার মান রেখেছে। মেজদার নতুন বাড়ির ঠিকানাটা ঠিক জানি না তো, কি জানি পৌঁছয়-না-পৌঁছয়, তাই সেজদার "কেয়ার অফে" মেজদাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম তোমার কথা উল্লেখ করে। তা এখন বল বাপু শুনি, কি সব কথা-টথা হলো ? আমার তো ইচ্ছে—এই মাসেই লাগিয়ে দিই।'

অম্বিকা একটু যেন গম্ভীর হয়।

বলে ওঠে, 'কী মুশকিল ! আপনি এসব কী যা-তা আরম্ভ করলেন ! এ রকম চালালে কিন্তু ফের পালাবো !'

সুবালা শঙ্কিত হয়।

সুবালা বোঝে অবস্থাটা আশাপ্রদ নয়। মেজবৌ বোধ হয় তেমন আগ্রহ দেখায়নি। তা হতে পারে, মানুষটা তো আছে একটু উল্টো-পাল্টা। অম্বিকাকে যতই ভালবাসুক, মেয়ের সঙ্গে বয়সের তফাৎটা মনে গেঁথে রেখেছে। ঠাকুরপোর একটু অপমান বোধ হয়েছে তা হলে। বলতে কি একটু আশায় আশায়ই তো গেল তাড়াতাড়ি ! বিয়ের মন হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছে সুবালা। ভাবে, যাক্ গে—পারু না হোক গে, আমি তোড়জোড় করছি। কনের আবার অভাব ? আবার ভাবে, তবে অত বয়সের মেয়ে সহসা পাওয়া যাবে না। মেজবৌ ডাকাবুকো, তাই মেয়েকে অতখানি বড় করছে বসে বসে।

কিন্তু সুবালা চট করে কিছু বলে না, আস্তে ছ্যাওরের মন-মেজাজ বুঝতে বলে, 'শোনো কথা, আমি আবার কী চালালাম ?'

'এইসব বাজে বাজে কথা ? বিয়ে-টিয়ের কথা শুরু করলেই কিন্তু জেনে রাখবেন আমি হাওয়া !'

সুবালা ভয়ে ভয়ে বলে, 'মেজদা—বুঝি—'

'দোহাই বৌদি, আপনার ওই মেজদাটির নাম আমার সামনে করবেন না।' বসেছিল, উঠে পড়লো। পায়চারি করতে করতে বললো, 'আপনার ওই মেজদা আর মেজবৌদিকে পাশাপাশি দেখলেই মনে হয় যেন বিধাতার একটি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের জ্বলন্ত নমুনা !'

সুবালা অবাক গলায় বলে, 'কিসের নমুনা ?'

'যাক্ গে, ও আপনাকে বোঝানো যাবে না। তবে আপনার পূজনীয় মেজদার বাড়িতে ঢোকবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, এইটাই জেনে রাখুন।'

সুবালা হতভম্ব গলায় বলে, 'তবে যে বললে মেজবৌ কথা বলেছে—'

'হ্যাঁ বলেছেন', অম্বিকা একটা জ্বালাভরা গলায় বলে 'রাস্তায় বেরিয়ে এসে বলেছেন। আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না আমায় বৌদি!'

'তার মানে, মেজদা তোমায় অপমান করেছে! জেলখাটা আসামী বলে বাড়ি ঢুকতে দেয় নি!' আস্তে বলে সুবালা, 'বুঝতে পারছি আসল কথা—'

অম্বিকা সহসা স্থির হয়। সামনে সরে আসে। বলে, 'আসল কথা বোঝবার ক্ষমতা আপনার ইহজীবনেও হবে না বৌদি! আপনি এতই ভালো যে, ওসব কথা আপনার মাথাতেই ঢুকবে না! শুধু বলে রাখি, যদি হঠাৎ কোনোদিন শোনেন আপনার মেজবৌদি পাগল হয়ে গেছেন, অবাক হবেন না। হয়তো শীগ্‌গিরই শুনতে হবে।···আশ্চর্য, আপনার ওই মেজদার মত একটি শয়তানের কোনো শাস্তি হয় না! না দেয় সমাজ, না দেন আপনাদের ওই ভগবান! কিছু মনে করবেন না বৌদি, না বলে পারলাম না। বড় যন্ত্রণা হলো দেখে! ছেলেও তো দেখলাম ঠিক বাপের মতন!'

সরে গেল সামনে থেকে, পায়চারি করতে লাগলো। একটা জ্বালাভরা গলার আক্ষেপ শোনা গেল, 'এইভাবে জীবনের অপচয় ঘটে, এইভাবে এই হতভাগ্য দেশের কত মহৎ বস্তু ধ্বংস হয়! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে একদিন সমাজকে।'

না, অম্বিকাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করবার সাধ আর মিটলো না সুবালার। অম্বিকা পায়ে হেঁটে ভারত ভ্রমণ করতে বেরোলো। সুবালা বুঝতে পারছে, মুখে ও যতই বলুক 'এই ভারতবর্ষটাকে একবার দেখতে চাই, দেখতে চাই বাংলা দেশের মত হতভাগা দেশ আর কোথাও আছে কিনা', তবু বুঝতে পারছে সুবালা, সেসব দেখেশুনে ফিরে আর আসছে না। ছন্নছাড়া ভবঘুরেই হয়ে যাবে!

'ওর মা-বাপ থাকলে জীবনটাকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলতে পারতো না ও।'

অমূল্যর কাছে কেঁদে পড়ে বলেছিল সুবালা।

অমূল্যর চোখটাও লালচে হয়ে উঠেছিল।

ভারী ভারী গলায় বলেছিল, 'ওটা তোমার ভুল ধারণা! ওর মা থাকলে যে তোমার থেকে বেশি ভালবাসতে পারতো, একথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তা তো নয়, মায়ার বাঁধন সবাইকে বাঁধতে পারে না! বুদ্ধদেবের কি মা-বাপ ছিল না? নদীয়ার নিমাইয়ের ছিল না মা, বৌ? আসলে এই জগতের অবিচার-অত্যোচার দুঃখ-দুর্দশা দেখে যাদের প্রাণ কাঁদে, তারা পাঁচজনের মতন খেয়ে শুয়ে দিন কাটাতে পারে না। ঘরে তিষ্ঠোনো দায় হয় তাদের। মা-বাপও বেঁধে রাখতে পারে না, স্ত্রী-পুত্রও বেঁধে রাখতে পারে না। তবু ভালই হল যে একটা পরের মেয়ে গলায় গেঁথে দেওয়া হয়নি ওর!'

'দেশ দেশ, স্বাধীন পরাধীন, এই সব করেই এইটি হলো ওর'—সুবালা চোখের জল মুছতে

মুছতে বলে, 'এই গাঁয়েই জন্মালো, এই তোমাদের বংশেই বড় হলো, কোথা থেকে যে ওসব চিন্তা মাথায় ঢুকলো, ভগবান জানেন।'

তাছাড়া আর কি বলবে সুবালা ?

মানুষের জানার সীমানা ছাড়ালেই বলে, 'ভগবান জানেন।' একা সুবালা কেন, সবাই বলে। আর খুব যখন কষ্ট হয়, তখন ভগবানের বিচারের দোষ দেয়। সুবালাও দিল।

আর তার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মুছতে মুছতে ওই ছন্নছাড়ার যাত্রাকালে জোর করে সঙ্গে দিয়ে দিল একগাদা চিঁড়ের নাড়ু, তিলপাটালী-নারকেলের গজা। যা সব একদা অম্বিকার বড় প্রিয় ছিল।

অম্বিকা মুখে খুব উৎসাহ দেখায়। বলে, 'বাঃ বাঃ! চমৎকার! পথে পথে ঘুরবো, কোথায় কি জুটবে কে জানে, যেদিন কোথাও কিছু না জুটবে, ওইগুলি বার করবো, আর আপনার জয়গান করতে করতে খাবো।'

'থাক্, আর আমার জয়গান করতে হবে না। আমার ওপর যে তোমার কত মায়া আছে তা বোঝাই গেছে।'

'বুঝে ফেলেছেন তো? বাঁচা গেল।' অম্বিকা হাসে। তারপর বলে, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের সব চেয়ে বড় ভক্ত বিবেকানন্দের নাম শুনেছেন? এক-সময় তিনি ঘুরছিলেন পথে পথে, হাতে এক কপর্দকও নেই, মনের জোর করে বললেন, "দেখি আমার চেষ্টা ছাড়াই খাদ্য আসে কিনা"! এসে গেল। আশ্চর্য উপায়ে এসে গেল! একটা মিষ্টির দোকানের দোকানী স্বপ্ন দেখলো অমুক জায়গায় এক উপবাসী সাধু এসে বসে আছেন, খাওয়াগে যা তাকে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়। কাজেই ঠিক করেছি, তেমন অসুবিধেয় পড়লে সাধু বনে যাব!'

জোর করে টেনে টেনে হাসে।

সুবালা রেগে উঠে বলে, 'আহা, সাধু বনে যাব! তুমিই না বল দেশের ওই গেরুয়াধারীরাই হচ্ছে সর্বনাশের গোড়া! ওরাই "জগৎ মিথ্যে" না কি বলে বলে দেশের লোকগুলোকে কুঁড়ের বাদশা করে রেখে দিয়েছে! সবাই পরকালের চিন্তাতেই ব্যস্ত, ইহকালের কথা ভাবে না!'

'বলি, বলবোও। তবে এক-একজনকে দেখলে ধারণা পালটে যায়। যাক্ আপনি মন খারাপ করবেন না। আমাদের ধর্মের দেশে "হরিবোল" বললেই অন্ন মেলে।'

'তাই তো, ভিক্ষে মেগেই যে খাবে তুমি', সুবালা রেগে বলে, 'তাই ভিটে জমি সর্বস্ব বিক্কিরী করে দিলে!'

ওই, ওইটাই হচ্ছে সব চেয়ে দুশ্চিন্তার। যে মানুষ ভিটেমাটি বেচে চলে যায় সে কি আবার ফিরে আসে?

অথচ কটা টাকাই বা পেলো?

সুবালার যদি টাকা থাকতো, নিশ্চয় দিয়ে দিতো। বলতো, 'দেশ বেড়াবার জন্যে ভিটে বেচবে তুমি, আর তাই আমি দেখবো বসে বসে?....' কিন্তু ভগবান মেরেছেন সুবালাকে।

অমূল্য সঙ্গে গেল, খানিকটা এগিয়ে দিতে।

সুবালাও এলো গরুর গাড়ির সঙ্গে যতটা যাওয়া যায়। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে লাগলো যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

অনেকক্ষণ পরে, যখন উড়ন্ত ধুলোও নিথর হয়ে গেল, তখন ফিরে এল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপনমনে বললো, 'বেটাছেলে, কোনো বন্ধন নেই। বিয়ে করবো না তো করবো না! ঘর ছেড়ে চলে যাবো তো চলে যাবো! ব্যস! নিন্দের কিছু নেই। পোড়া মেয়েমানুষের সকল পথ বন্ধ! আমাদের মেজবৌটা যদি বেটাছেলে হতো, সেও বোধ হয় এই রকম হতো। বিয়ে করতো না, সংসারে থাকতো না। মেয়েমানুষ, বন্দীজাত, খাঁচার মধ্যে ঝটপটানি সার!'

॥ তের ॥

কিন্তু ঝটপটানি কি আছে আর?

সমস্ত ঝটপটানি থামিয়ে ফেলে একেবারে তো নিথর হয়ে গেছে সুবালার মেজবৌ! ও যেন এইবার সহসা পণ করেছে, এবার ও 'সাধারণ' হবে। যেমন সাধারণ তার আর তিনটে জা, তার ননদেরা, পাড়াপড়শী আরো সবাই।

অপ্রতিবাদে 'কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম' মেনে নিয়ে করছে সংসার।

আর ইচ্ছা যদি প্রকাশই করে তো সেটা হবে 'সাধারণে'র ইচ্ছা! তাই সুবর্ণ তার স্বামীকে তাক লাগিয়ে দিয়ে একদিন ইচ্ছে প্রকাশ করলো, 'পারুলের জন্যে একটা পাত্র দেখো, এই শ্রাবণেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়। তারপর অঘ্রানে ভানু-কানু দুজনের একসঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা—'

প্রবোধ অবাক হয়ে তাকায়।

তারপর বলে, 'ভূতের মুখে রামনাম! তোমার মুখে ছেলেমেয়ের কথা?'

সুবর্ণ হাসে, 'তা ভূতও তো পরকালের চিন্তা করে!'

তারপর হাসি রেখে বলে, 'না ঠাট্টা নয়, এবার তাতাতাড়ি করা দরকার!'

সুবর্ণ কি ওর মা'র ওপর শোধ নিচ্ছে?

সুবর্ণ কি রাত্রির অন্ধকারে বিনিদ্র শয্যা ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে উদ্দেশ করে বলে, 'ঠিক হচ্ছে তো? বল! একেই "পূর্ণতা" বলে? বেশ তাই হোক! শুধু আমার সারাজীবনের অন্তর ইতিহাসের কথা লিখব

আমি বসে বসে।···লিখেছি কখনো কখনো, টুকরো টুকরো, বিচ্ছিন্ন।···আস্ত করে ভাল করে লিখবো। যারা আমার শুধু বাইরেটাই দেখেছে, আর ধিক্কার দিয়েছে, আমার সেই স্মৃতি-কথার ভিতর দিয়েই তাদের না, মুখের কথায় কখনো কাউকে কিছু বোঝাতে পারি নি আমি—আমার অভিমান, আমার আবেগ, আমার অসহিষ্ণুতা, আমার চেষ্টাকে পণ্ড করেছে। আমার খাতা-কলম এবার সহায় হোক আমার।'

কে জানে বলে কিনা, কি বলে আর না বলে।

'পাগল' মানুষটার কথা বাদ দাও। তবে দেখা গেল সুবর্ণলতার সেই গোলাপীরঙা দোতলার ছাতে বারে বারে তিনবার হোগলা ছাওয়া হল, সুবর্ণলতাদের বাড়ির কাছাকাছি ডাস্টবিনে কলাপাতা আর মাটির গেলাস খুরির সমারোহ লাগল— এক এক ক্ষেপে দু-তিনদিন ধরে।

তারপর আদি অন্তকাল যা হয়ে আসছে তারই পুনরাভিনয় দেখা গেল ও-বাড়ির দরজায়।

কনকাঞ্জলির একথালা চালে আজীবনের ভাত-কাপড়ের ঋণ শোধ করে দিয়ে মেয়ে বিদায় হলো আর এক সংসারের ভাত-কাপড়ে পুষ্ট হতে, আর জলের ধারা মাড়িয়ে এসে দুধে-আলতার পাথরে বৌ দাঁড়ালো এ সংসারের অন্নজলে দাবি জানাতে।

দুটো দৃশ্যেই অবশ্য শাঁখ বাজলো, উলু পড়লো, বরণডালা সাজানো হলো, শুধু ভিতরের সুরের পার্থক্যটুকু ধরা পড়লো সানাইয়ের সুরে। সানাইওলারা জানে কখন আবাহনের সুর বাজাতে হয়, আর কখন বিসর্জনের।

তা সুবর্ণলতা তো এবারে একটু ছুটি পেতে পারে? বৌরা সেকালের মত কচি মেয়ে নয়, ডাগর-ডোগর মেয়ে, তাই বৌরা ধুলো-পায়ে ঘরবসত করে দু মাস পরেই ঘুরে এসে শ্বশুর-ঘর করতে লেগেছে। পারুল চলে গেছে তার নতুন ঘরে, আর অবহেলিত বকুল কখন কোন্ ফাঁকে তার খেলাঘরের ধুলো ঝেড়ে নিঃশব্দে পারুলের জায়গায় ভর্তি হয়ে গেছে।

এখন সুবর্ণ না দেখলেও অনেক কাজ সুশৃঙ্খলে হয়ে যাচ্ছে। এখন বৌরা সব সময়েই বলছে, 'আপনি আবার কেন করতে এলেন মা, আমাদের বলুন না কি করতে হবে।'

অতএব সুবর্ণর তার খাতার পাতায় কলমের আঁকিবুকি কাটবার অবকাশ জুটেছে।

কিন্তু কোন্‌খান থেকে শুরু হবে সেই স্মৃতিকথা? আর সেটা কোন্ ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসবে সুবর্ণলতার জীবনের সমাপ্তি সমুদ্রে?···

প্রথম যেদিন মুক্তকেশীর শক্ত বেড়ার মধ্যে এসে পড়লো সুবর্ণ নামের একটা সর্বহারা বালিকা মেয়ে, সেই দিনটাই কি স্মৃতিকথার প্রথম পৃষ্ঠায় ঠাঁই পাবে?

• কিন্তু প্রতিটি দিনের ইতিহাস কি লেখা যায়? প্রতিটি অনুভূতির?

তাছাড়া—

মুক্তকেশী যে সেই ক্রন্দনাকুল মেয়েটার একটা "নড়া" ধরে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে যেতে বলেছিলেন, 'ঢের হয়েছে, আর ঠাট করে কাঁদতে হবে না, কান্না থামাও দিকি? মুখ-চোখের চেহারা হয়েছে দেখ না, মা তো তোমার মরেনি বাছা, এত ইয়ে কিসের?" এইটা দিয়েই শুরু করবে, না সেই যখন গিন্নীরা এদিক-ওদিক সরে গেলে একটি প্রায় কাছাকাছি বয়সের বৌ পা টিপে টিপে এসে ফিসফিস করে বলেছিল, 'আমি তোমার বড় জা হই বুঝলে? তোমার শাশুড়ীর ভাসুরপো-বৌ। উঠোনের মাঝখানে যে পাঁচিল দেখছো, তার ওদিকটা আমাদের। আসতে দেয় না, এই বিয়ে-বাড়ির ছুতোয় আসার হুকুম মিলেছে। তা একটা পথ আছে'—বলে হদিস দিয়েছিল সিঁড়ির ঘুলঘুলি দিয়ে কি ভাবে যোগাযোগ হতে পারে।

ছাদের সিঁড়ির সেই ঘুলঘুলি পর্যন্ত চোখ পৌঁছত না তখন সুবর্ণর, তাই ঠিক তার নীচেটায় দুখানা ইট এনে পেতেছিল। তার উপর দাড়িয়ে চার চোখের মিলন হতো: সেই ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে আদানপ্রদান হতো শুধু হৃদয়ের নয়, রীতিমত সারালো বস্তুরও।

কুলের আচার, আমের মোরব্বা, মাখা তেঁতুল, কয়েৎবেল, ফুলুরি, রসবড়া, অনেক কিছুই। বলা বাহুল্য নিজের ভাগের থেকে এবং প্রায়শই খেতে খেতে তুলে রাখা। সুপুরি মশলা পান পর্যন্ত।

সাবেকি বাড়ির সেই ভাঙা দেওয়ালের অন্তরালে যে বছরগুলো কাটিয়েছিল সুবর্ণ, তার মধ্যে মরুভূমিতে জলাশয়ের মত ছিল ওই সখীত্ব। আর একটু যখন বয়েস হয়েছে, তখন আদানপ্রদানের মাধ্যমটা আর কুলের আচারের মধ্যেই সীমিত থাকেনি, ঘুলঘুলির মাঝখানের একখানা ইট ঠুকে ঠুকে সরিয়ে ফেলে পথটাকে প্রশস্ত করে নিয়ে সেই পথে পাচার হতো বই।

না, সুবর্ণর দিক থেকে কিছু দেবার ছিল না। ওর কাজ শুধু ফেরত দেওয়া।

যোগান দিত জয়াবতী।

মুক্তকেশীর ভাসুরপো-বৌ।

তার বর মুক্তকেশীর ছেলেদের মত নয়। সে সভ্য, মার্জিত, উদার। তার বর বৌকে বই এনে এনে পড়াতো, যাতে বৌয়ের চোখ-কান একটু ফোটে।

বলেছিল তাই জয়াবতী।

বলেছিল, 'দিনের বেলা সবাইয়ের সামনে তো পড়তে পারি না, লুকিয়ে রাত্তিরে। তুই বই পড়তে ভালবাসিস শুনে, ও তো আর একটা লাইব্রেরীতেই ভর্তি হয়ে গেছে। হেসে বলেছে, তোমাদের সেই ঘুলঘুলি পথেই পাচার কোরো।'

জয়াবতীর বয়েস তখন তেরো-চোদ্দ, জয়াবতীর বিয়ে হয়েছে তিন বছর, তাই বরের গল্প আছে তার। আর সেই গল্পেই তার উৎসাহ।

জয়াবতীর মুখে বরের গল্প শুনে শুনে স্পন্দিত হতো সুবর্ণ, আর ভাবতো, আশ্চর্য! এরা একই বাড়ির!

বিয়ের পর একটা বছর অবশ্য কড়াকড়িতে রাখা হয়েছিল সুবর্ণকে, বৌকে নিজের কাছে নিয়ে শুতেন মুক্তকেশী। বাপেরবাড়ির বালাই তো নেই, কাজেই ঘরবসতের প্রশ্নও নেই। নচেৎ একটা বছর তো সেখানেই থাকার কথা। কিন্তু এক বছর পরে যখন সুবর্ণ সেই 'পরম অধিকার' পেল ?...'রাতের অধিকার!'

সুবর্ণ কি সেই পরম সৌভাগ্যকে পরম আনন্দে নিয়েছিল ?

সে ইতিহাস কি লেখার ?

লিখে প্রকাশ করবার ?

কলম হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছে সুবর্ণ, তারপর আস্তে কলম নামিয়ে রেখেছে।

তারপর জয়াবতীর কথা দিয়েই শুরু করেছে।

জয়াবতী বলতো, 'গোড়ায় গোড়ায় ভয় করে রে, তারপর সয়ে যায়। আর দেখ্ এ সংসারে ওই লোকটাই তো একমাত্র আপনার লোক, ওর জন্যেই তাই প্রাণটা পড়ে থাকে। দেখিস তোরও হবে।'

সুবর্ণ বলতো, 'আহা রে, তোমার বরটির মতন কিনা ?'

সুবর্ণর সেই ছেলেমানুষ ভাসুরের উপর শ্রদ্ধা ছিল, ভালবাসা ছিল, সমীহ ছিল, জয়াবতীর সঙ্গে সখীত্বের সূত্রে ঠিক 'ভাসুর'ও ভাবত না যেন, বান্ধবীর বর হিসেবেই ভাবতো!

সুবর্ণরা যতদিন সেই পুরানো বাড়িতে ছিল, জীবনের নীরেট দেওয়ালে এই একটা ঘুলঘুলি ছিল তার, কিন্তু সে ঘুলঘুলিও বন্ধ হয়ে গেল।

ভাসুরপো আর দ্যাওরদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি মামলাবাজি করে শেষ পর্যন্ত বাড়ির অংশের টাকা ধরে নিয়ে আলাদা বাড়ি ফাঁদলেন মুক্তকেশী।

জয়াবতীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল সুবর্ণলতার।

অনেক অনেক দিন পরে আবার সে পথ খুলেছিল সুবর্ণলতা, কিন্তু তখন আর সেই আনন্দময়ী জয়াবতীর দেখা মেলেনি।

জয়াবতী তখন তার সাদা সিঁথিটার লজ্জায় মুখ তুলতো না, মুখ খুলতো না।

তবু আজীবন যোগসূত্র আছে। বাইরের না হোক হৃদয়ের।

তাই সুবর্ণলতার স্মৃতিকথা শুরু হলো সেই 'ঘুলঘুলি' পথে আসা একমুঠো আলোর কাহিনী নিয়ে।

জয়াদি ঘুরে-ফিরে কেবল বরের কথা বলে। বর কি রকম দুষ্টুমি করে রাগায়, কেমন এক-একসময় বৌয়ের দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে বৌকে বড়দের বকুনি থেকে বাঁচায়, আবার

জয়াদির বাপেরবাড়ি যাবার কথা উঠলেই কেমন মুখভারী করে বেড়ায়, কথা বলে না, এই সব।

ওর সঙ্গে আমার কোনটাই মেলে না।

আমার জীবনে 'বাপেরবাড়ি' বলতে কিছু নেই। আর দোষ ঢাকা? বরং ঠিক উল্টো। মায়ের কাছে 'ভালো ছেলে' নাম নেবার তালে, আমার বর কেবল আমার দোষ জাহির করে বেড়ায়! দেখে তো, মা ওতেই সব থেকে সন্তুষ্ট হন।

তা বেশ, করো তাই!

মায়ের সুয়ো হও!

কিন্তু সেই মানুষই যখন আবার বৌকে আদর করতে আসে? রাগে সর্বশরীর জ্বলে যায় না? আদর! আদর না হাতি! ইচ্ছে হয় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে যাই! নয়তো চলে যাই ছাতে! ঠাণ্ডা হাওয়ায় পড়ে থাকি একলা!

উঃ কী শাস্তি, কী শাস্তি!

আচ্ছা জয়াদির বরও কি এই রকম?

তাই কখনো হতে পারে? হলে, জয়াদি অমন আহ্লাদে ভাসে কি করে? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ওর বর সভ্য ভদ্র ভালো!

হলদে হয়ে যাওয়া পুরনো খাতার একটা পাতায় এইটুকু লেখা ছিল, সেই লেখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিল সুবর্ণ, কী বয়েস ছিল ওই মেয়েটার? অথচ সে কথা কেউ ভাবেনি। বরং শাশুড়ীর বান্ধবীরা এসে ফিসফিস করে কথা কয়েছেন, আর তারপর গালে হাত দিয়ে বলেছেন, 'ও মা তাই নাকি? বৌ তা হলে হুড়কো? তা ছেলের বিয়ে দিয়ে হলো ভাল তোমার?'

মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু!

গৃহিণী মেয়েরা যদি এতটুকু সহানুভূতিশীল হতো, হতো এতটুকু মমতাময়ী, হয়তো সমাজের চেহারা এমন হতো না। তা হয় না, তারা ওই অত্যাচারী পুরুষসমাজের সাহায্যই করে। যে পুরুষেরা 'সমাজ-সৌধ' গঠনের কালে মেয়ে জাতটাকে ইঁট পাটকেল চুনসুরকি ছাড়া কিছু ভাবে না। হ্যাঁ, গাঁথুনির কাজে যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেই ভাবেই ব্যবহার!

বেওয়ারিশ বিধবা মেয়েগুলোর দায়দায়িত্ব কে নেয়, কে নেয় তাদের ভাত-কাপড়ের ভার! মারো তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে, মিটে যাক সমস্যা!

দেশে মেয়ের সংখ্যা বেশী, পুরুষের সংখ্যা কম। করুক এক-একটা পুরুষ গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে, ঘুচুক সমস্যা! হয়তো এই দেশেই আবার কালে-ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যে, বদলে যাবে পালা, তখন হয়তো ওই সমাজপতিরাই নির্দেশ দেবে—সব মেয়ে দ্রৌপদী হও, সেটাই মহাপুণ্য!

একদা বাল্যবিবাহের প্রয়োজন ছিল, তাই মেয়ের বাপের কাছে প্রলোভন বিছোনো ছিল, কন্যাদান করে নাকি তারা পৃথিবীদানের ফল পাবে, পাবে গৌরীদানের।....বিপরীত চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ!

অর্থসমস্যা আর অন্নসমস্যার চাপে কন্যাদানের পুণ্যলাভের স্পৃহা মুছে আসছে সমাজের। অতএব এখন আর চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হচ্ছে না! হয়তো বা এমন দিন আসবে, যেদিন এই সমাজই বলবে, 'বাল্যবিবাহ কদাচার, বাল্যবিবাহ মহাপাপ।'

কোথায় কোন্ দেশে নাকি খাদ্যসমস্যা সমাধান করতে মেয়ে জন্মালেই তাকে মেরে ফেলে, পাছে তারা দেশে মানুষ বাড়ায়। আবার এদেশে বাঁজা হওয়া এক মস্ত অপরাধ, 'শতপুত্রের জননী' হতে উৎসাহ দেওয়া হয় মেয়েদের। কে জানে আবার পালাবদল হলে এই দেশেই বলবে কিনা 'বহুপুত্রবতীকে ফাঁসিতে লটকাও'।

মেয়েদের নিয়েই যত ভাঙচুর।

অথচ এমন কথার কৌশল চতুর পুরুষজাতটার যে, মেয়েগুলো ভাববে, 'এই ঠিক, এই ধর্ম! এতেই আমার ইহ-পরকালের উন্নতি'!

পতি পরম গুরু!

স্বামীর বাড়া দেবতা নেই!

ধোঁকাবাজি! ধাপ্পাবাজি!

কিন্তু কতকাল আর চলবে এসব? চোখ কি ফুটবে না মেয়েমানুষের?

কে জানে, হয়তো ফুটবে না। অথবা ফুটলে ওই চতুর জাতটা নতুন আর এক চালের আশ্রয় নেবে। হয়তো 'দেহিপদপল্লবমুদারমের' বাণী শুনিয়ে শুনিয়েই মেয়েদের ওই ঘানিগাছেই ঘুরিয়ে নেবে।

বোকা, বোকা, নীরেট বোকা এই জাতটা, তাই টের পায় না অহরহ তাকে নিয়ে কী ভাঙচুর চলছে!

ভাবছে, আহা, আমি কী মূল্যবান! আমায় ভালবাসছে, আমায় পূজ্যি করছে, আমায় সাজাচ্ছে।

আমার দেহটা যে ওর সোনা মজুতের সিন্ধুক, তা ভাবি না, আমার সাজসজ্জা যে ওর ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন, তা খেয়াল করি না, আমি গহনা-কাপড়ে লুব্ধ হই, ভালবাসার প্রকাশে মোহিত হই। ছি ছি! সাধে বলছি একের নম্বরের বোকা!

॥ চৌদ্দ ॥

গিরি তাঁতিনী এসেছে তাঁতের শাড়ির বোঁচকা নিয়ে। ভালো ভালো সিমলে ফরাসডাঙার শাড়ি নিয়ে গেরস্তর বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো কাজ গিরির। উত্তর কলকাতা থেকে মধ্য কলকাতা পর্যন্ত সর্বত্র তার অবাধগতি। সকলের অন্তঃপুরের খবর তার জানা।

দর্জিপাড়ার অনেক বাড়িতেই তার যাতায়াত। মুক্তকেশীর সংসারেও শাড়ি যুগিয়ে এসেছে বরাবর—বিয়েথাওয়ায়, পূজোয়। গিরি যে বাজারের থেকে দাম বেশি নেয় সেকথা সকলের জানা, মুক্তকেশী তো মুখের উপরেই বলেন, 'গলায় ছুরি দিচ্ছিস যে গিরি! কাপড়খানা বড্ড পছন্দ হয়েছে বুঝেই বুঝি মোচড় দিচ্ছিস?' তবু সেই বেশি দামেই নেনও। কারণ আরও এক কারণে সর্বত্রই গিরির প্রশ্রয় আছে।

আরও একটা ব্যবসা আছে গিরির।

সেটা হচ্ছে ঘটকীগিরি!

কাপড় যোগানের সূত্রে গিরি বহু সংসারের নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখে বলেই কাজটা তার পক্ষে সহজ।

তবে ইদানীং যেন সে ব্যবসায় কিছু কিঞ্চিৎ ঢিমে পড়েছে।

ঘটকী দিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ করতে কেউ আর তেমন গা করে না। সবাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে নিজেরাই চেনাজানার সূত্র ধরে, কিংবা কাজকর্মের বাড়িতে দেখাশোনার সুযোগ ধরে, বিয়ের সম্বন্ধ গড়ে ফেলে, কারণ, ঘটকীরা নাকি মিছে কথা কয়।

শোনো কথা!

মিছে কথা নইলে বিয়ে হয়?

হয়কে নয়, নয়কে হয়, রাতকে দিন, দিনকে রাত, কানাকে পদ্মলোচন, 'অষ্টোভক্ষ্য'কে শাঁসালো, আর আবলুশ কাঠকে চাঁপাফুল বলতে না পারলে আবার ঘটকালির মাহাত্ম্য কি?

কথায় বলে 'লাখ কথা' নইলে বিয়ে হয় না। তা সেই লাখ কথার দশ-বিশ হাজার অন্তত মিছে কথা থাকবে না? যা সত্যি তাই যদি বলে, তা হলে ঘটক বিদায়টা কি মুখ দেখে দেবে লোকে? কিন্তু লোকে যেন আর বুঝছে না সে কথা। কাজেই গিরির দ্বিতীয় ব্যবসা কিছু ঢিমে!

ঢিমে পড়েছে, তবু শাড়ির বস্তা নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে দোক্তার কৌটো খুলতে খুলতে গিরি বলে, 'সেজবৌদিদি ছেলের বিয়ে দেবে না নাকি গো? তোমার বড় খোকার বয়েসে যে সেজবাবু দু ছেলের বাপ হয়েছিল গো!'

নামে নামে মিল আছে বলে গিরিবালার সঙ্গে গিরি তাঁতিনীর যেন রঙ্গরস বেশি।

তাছাড়া ইচ্ছেমত দু-পাঁচখানা শাড়ি কিনে ফেলার ক্ষমতা গিরিবালার যেমন আছে, ছোটবৌ বিন্দুর তেমন নেই, তাই গিরিবালার ঘরের সামনেই তাঁতিনী গিরির পা ছড়িয়ে বসার জায়গা।

বিন্দু যে এক-আধখানা নেয় না তা নয়, তবে সেও তো সেই 'বাকিতে'!

গিরিবালার অনেকটাই নগদ!

অতএব গিরি তাঁতিনীর রসের কথা এখানেই ঢেউ তোলে বেশি।

সেজবাবুর অতীত ইতিহাস তোলার সঙ্গে এমন একটি মুখভঙ্গী করে গিরি, যা নাকি নিতান্তই অর্থবহ।

গিরিবালাও তেমনি একটি অর্থবহ কটাক্ষ করে বলে, 'ওতে তো আর পয়সা লাগে না লো, হলেই হলো। একালে দিনকাল খারাপ, বৌ এসে কি খাবে সেটা আগে চিন্তা করতে হবে।'

'তা হবে বৈ কি!' গিরি একটিপ্ দোক্তা মুখে ফেলে বলে, 'বৌয়ের শাউড়ী যখন সব্বস্ব গ্রাস করে রেখেছে! তা তুমি বুঝি মেজবৌদিদির পাঠশালে পড়েছ? তিনিও তো ওই কথা বলে বলে এই অবধি ছেলে দুটোর বে তুলে রেখেছিল। কী সুমতি হলো, জোড়া বেটার বে দিল।'

গিরিবালা সহাস্যে বলে, 'ঘটকী বিদেয় মোটা পেয়েছো তো?'

গিরির ঘটকালিতে অবশ্য বিয়ে হয়নি, তবু বিয়ের বখশিশ বাবদ বেশ কিছু বাগিয়েছে গিরি, তাই সেও সহাস্যে বলে, 'তা হক কথা বলবো বাপু, মেজগিন্নীর হাতখানি দরাজ আছে।'

গিরিবালা সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে ওঠে, 'তা বোঁচকার গিঁট খোলো? দেখি কি এনেছ! নতুন ধরনের কিছু আছে?'

'গিরি কবে নতুন ছাড়া পুরনো মাল এনে ঢুকেছে গো—', বলে সগর্ব ভঙ্গীতে বোঁচকা খোলে গিরি।

মুক্তকেশীর আমলে মোটা তাঁতের শাড়ির চাহিদাই বেশি ছিল, এখন সিমলে শান্তিপুরে ফরাসডাঙার চাহিদা।

কিন্তু মুক্তকেশী?

তিনি কি গত হয়েছেন? তাই তাঁর আমলও বিগত?

না, দেহগত হিসাবে গত হয়নি অবশ্য মুক্তকেশী, তবে তাঁর আমলটা যে একেবারেই গত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নাস্তি।

গিরি ঢুকেই একবার চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'বুড়ী কোথায়?'

গিরিবালা ভ্রূভঙ্গীর সাহায্যে উত্তর দিয়েছিল, 'আছেন নিজের কোটরে।'

বোঁচকার গিঁট খোলে গিরি, কিন্তু আবরণ উন্মোচন সহজে করে না। তাতে সস্তা হয়ে যেতে হয়!

হাই তুলে বলে, 'এক ঘটি জল খাওয়ায় দিকি আগে! রোদে এসে শরীর জ্বলে যাচ্ছে।'

গিরিবালা তাড়াতাড়ি উঠে দালানের কুঁজো থেকে এক ঘটি জল গড়িয়ে দেয়।

গিরি এক নিশ্বাসে জলটা খেয়ে আঁচল দিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলে, 'বড়মানুষ হয়ে সেজবৌদিদি কেমন হয়ে গেছে। আমাকে জল দিলে পান দিতে হয় তা আর মনে নেই।'

গিরিবালা তাড়াতাড়ি মেয়েকে ডেকে পানের আদেশ দেয়, গিরি ধীরে সুস্থে বোঁচকা খোলে।

নয়নমনোহর শাড়ির গোছা—কল্কাপাড়, তাবিজপাড়, রেলপাড়, এলোকেশী পাড়, সিঁথেয়-সিঁদুরপাড়, পতিসোহাগপাড়, বসন্তবাহারপাড়। সাদা ছাড়া রঙিনের দিকেও আছে—কালাপানি, বৌপাগলা, ধূপছায়া, ময়ূরকণ্ঠী। শুধু লাল আর কালো সুতোর টানাপোড়েনেই নানান বর্ণের বাহার।

দাম বেশি দিয়েও এসব শাড়ি নিতে হয়। দোকান থেকে কেনা মানেই তো পুরুষের পছন্দর ওপর নির্ভর, আর সে পছন্দ যে কেমন তা তো মেয়েমানুষেরা হাড়ে হাড়ে জানে। তার ওপর ফেরা-ঘোরার কথা বললেই মারমুখী হয়ে ওঠেন বাবুরা। তা ছাড়া গিরি বাকিতে দেয় বলে লুকিয়েও কেনা যায় এক-আধখানা। এসব কি কম সুবিধে? পরমুখাপেক্ষী জাতের জ্বালা যে কত দিকে!

তা গিরি এসব খুব বোঝে, তাই জায়গা বুঝে মোচড় দেয়, জায়গা বুঝে উদারতা দেখায়।

ও খদ্দেরের কাছে অনায়াসে বলে, 'ও কাপড়ের দাম তোমায় দিতে হবে না দিদিমণি, আমি তোমায় এমনি দিলাম ' বলে, 'বৌদিদির ফরসা রঙে জেল্লা যা খুলবে, এ কাপড় তোমায় একখানা না পরাতে পেলে আমার জেবনই মিথ্যে। দামের কথা ভেবো না বৌদিদি, তোমার শাউড়ীকে বোলো, গিরি আমায় অমনি দিয়ে গেছে।'.... এইভাবেই গছায় সে।

গিরিবালা প্রসন্নমুখে বলে, 'কাপড় তো বেশ এনেছো, এখন দর করো দিকি?'

'দর! তোমার সঙ্গে আবার দরাদরি কি গো সেজবৌদিদি, আজ নতুন হলে নাকি?'

'না না ঠাকুরঝি, তুমি আমায় একটু আশ্বাস দাও। পছন্দ করতে ভরসা পাই।'

'শোনো কথা! তোমার আবার নির্ভরসা!' গিরি অবহেলায় বলে, 'বড় মানুষের গিন্নী ট্যাকার গোছা ফেলো, কাপড়ের গোছা পছন্দ করো! সাত-হাতি আট-হাতি সবরকমেই আছে, খুকীদের জন্যে ন্যাও দিকি দু-পাঁচখানা! কই গো খুকীরা—'

গিরিবালা তথাপি কাপড় নাড়তে নাড়তে দাম জিজ্ঞেস করে, এবং জবাব পাবার পর অপ্রসন্ন গলায় বলে, 'দেবে না তাই বল? দেবার ইচ্ছে থাকলে এমন দর হাঁকতে না। বলি ওবাড়ির তিন-তিনটে বিয়েতে তো বিস্তর লাভ করেছ। সে হল বড় মানুষের ব্যাপার, এই গরীবের সঙ্গে একটু দয়া-ধর্ম করে কাজ করো না!'

গিরি দরাজ গলায় বলে, 'তা মিথ্যে বলবো না, অনেক কাপড়-চোপড় নিয়েছে মেজ-বৌদিদি, তবে মানুষটার প্রাণে যেন সুখ নেই!'

গিরিবালা ভিতরের কথার আশায় গলা নামিয়ে চুপিচুপি বলে, 'ওমা যাঁর এত সুখ-সম্পত্তি, তাঁর আবার সুখের অভাব ?'

গিরি বলে, 'তা একো একো মানুষের অকারণ দুঃখ ডেকে আনা রোগ যে। মেজবৌদিদির তো সে রোগ আছেই। তাছাড়া—মনে হলো বৌরা সুবিধের হয়নি—'

গিরিবালা যেন জানে না, কথা সৃষ্টি করার এই লীলাই গিরি তাঁতিনীর পদ্ধতি, অথবা কারো ঘরে বৌ 'সুবিধে'র না হওয়াটা যেন অসম্ভব ঘটনা, তাই যেন আকাশ থেকে পড়লো।

'ওমা সে কি কথা ! তবে যে শুনলাম খুব ভালো বৌ হয়েছে !'

'ওগো দেখতেই ভালো ! ওপর ভালো, ভেতব কালো ! তা নইলে ঘরুনী গিন্নী দস্যি মাগী এক্ষুণি বৌদের হাতে সংসার ছেড়ে দেয় ?'

'ওমা বল কি ? তাই বুঝি ?'

'তাই তো—', গিরি দুই হাত উল্টে বলে, 'তবে আর বলছি কি ! মাগী নাকি এখন রাতদিন খাতা-কলম নিয়ে সেরেস্তার মতন লেখা লিখছে !'

'তা এসব কথা বললো কে তোমাকে ?'

'কে আর ? মেজদাদাবাবুই রাস্তায় এল সঙ্গে সঙ্গে, নানান দুঃখের গাথা গাইল। বৌরা শ্বশুর বলে তেমন মান্যিমান করছে না, শাউড়ীকে দেখে না, আরো একটা মেয়ে ডাগর হয়ে উঠলো, এই সব !'

কথা ক্রমশই গভীর হয়ে আসে, গিরিবালা ইত্যবসরে খানতিনেক শাড়ি পছন্দ করে ফেলে, এবং বাকির প্রশ্নও ওঠে না। তবে ও-বাড়ির মেজবৌদিদির কাছেও যে ধারে কারবার করতে হয় না, সেই হুলটুকু ফুটিয়ে বোঁচকা গোটায় গিরি।

এই সময় ঘর থেকে মুক্তকেশীর ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'গিরি এসেছিস নাকি ? অ গিরি !···সেই থেকে গলা পাচ্ছি মনে হচ্ছে, এদিক পানে উঁকিও দিচ্ছিস না দেখছি !'

'ওই হলো জ্বালা'—গিরি খাদের গলায় বিরক্তিটা প্রকাশ করে গলা তোলে, 'এই যাই গো খুড়ি, এখানে সেজবৌদিদি কাপড় কিনলো পাঁচখানা, তাই—'

'পাঁচখানা ! পাঁচখানা কাপড় কিনলো সেজবৌমা ! তা কিনবে বৈ কি ! সোয়ামীর পয়সা হয়েছে—'

'মরণ বুড়ী !' বলে গিরি ও-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, আর তৎক্ষণাৎ তার কাংস্যকণ্ঠ ধ্বনিত হয়, 'কী সব্বোনাশ, এ কী হাল হয়েছে তোমার খুড়ি ! এঁ্যা, এ যে মড়িপোড়ার ঘাটে যাবার চ্যাহারা ! বলি কবরেজ বদ্যি দেখ্যাচ্ছে বেটা বেটার বৌ ?'

এই !

এই হচ্ছে গিরির নিজস্ব ভঙ্গী ! আর তাই সবাই গিরিকে ভয় করে !

গিরি যে অন্তঃপুরের বার্তা রাখে ! তার বাড়া ভয়ঙ্কর আর কি আছে ?

মুক্তকেশীর ছেলে, ছেলের বৌরা যে তেমন দেখছে না, এ খবর রটিয়ে বেড়াবে না সে? তাই গিরিবালাও তাড়াতাড়ি শাশুড়ীর ঘরে এসে ঢোকে।

মুক্তকেশী নীচু গলায় কিছু একটা বলছিলেন, বৌকে ঢুকতে দেখে বেজার মুখে চুপ করেন। শুধু চোখের ইশারায় কি যেন বুঝিয়ে বিদায় সম্ভাষণ করেন।

তা গিরি তাঁতিনী ইশারার মান রাখে।

পরদিনই এ বাড়িতে এসে হাজির হয়।

এবং সাড়ম্বরে ঘোষণা করে, 'কাপড় গছাতে আসিনি গো মেজবৌদিদি, এসেছি একটা বাত্রা নিয়ে।'

সুবর্ণলতা বেরিয়ে আসে, প্রশ্ন করে না, শুধু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

গিরি বলে ওঠে, 'বলি বুড়ী শাউড়ীর খবর নাওনি কতদিন?'

সুবর্ণ অবাক গলায় বলে, 'কেন? ইনি তো মাঝে মাঝেই···'

'হ্যাঁ তা শুনলাম!' গিরি টিপে টিপে বলে, 'মেজদাদাবাবু পেরায় পেরায় যায়। তবে বেটাছেলের চোখ কি তেমন টের পায়? বুড়ীর তো দেখলাম শেষ অবস্থা!'

'তার মানে?'

'মানে আর কি রক্ত অতিসার!' গিরি যেন যুদ্ধজয়ের ভঙ্গী নেয়, 'ও আর বেশিদিন নয়। আর মরতে তো একদিন হবে গা? চেরকাল কি থাকবে? বয়সের তো গাছ-পাথর নেই, কোন্ না চার কুড়ি পেরিয়েছে। তা আমায় মিনুতি করে বললে, মেজবৌমাকে একবার আসতে বলিস গিরি, আর আসবার সময় লুকিয়ে পাকা দেখে দুটো কাশীর প্যায়রা আনতে বলিস।'

'পেয়ারা!' সুবর্ণ বলে, 'রক্ত-অতিসার বললে না?'

'আরে বাবা, হলো তো বয়েই গেল। বলি খাওয়ার সাবধান করে শাউড়ীকে আরো বাঁচিয়ে রাখতে সাধ? না তাই পারবে? মহাপ্রাণীর খেতে ইচ্ছে হয়েছে, দেওয়াই দরকার! বাঁচবার হলে ওতেই বেঁচে থাকবে।'

সুবর্ণ অবাক হয়ে তাকায়।

সুবর্ণ ভাবে, এরা কত সহজে সমস্যার সমাধান করে ফেলতে সক্ষম! রাখে কেষ্ট আর মারে কেষ্টর তথ্যে এরাই প্রকৃত বিশ্বাসী।

সুবর্ণর ভাবার অবসরে গিরি আর একবার বলে, 'তা প্যায়রা নে যাও আর না যাও, যেও একবার! বুড়ী "মেজবৌমা মেজবৌমা" করে হামলাচ্ছে।'

'যাবো, কালই যাবো।'

গিরি হৃষ্টচিত্তে বলে, 'অবিশ্যি আজই একটা কিছু ঘটে যাবে, তা বলছি না। তবে এযাত্রা যে আর উঠবে না বুড়ী, তা মালুম হচ্ছে!'

গিরি চলে যায়, সুবর্ণ কেমন অপরাধীর মত বসে থাকে। বাস্তবিক, বড় অন্যায় হয়ে গেছে। বহুদিন যাওয়া হয়নি বটে। সেই কতদিন যেন আগে নিজেই এসেছিলেন মুক্তকেশী, সেই শেষ দেখা।

মেজবৌমাকে দেখতে চেয়েছেন মুক্তকেশী, আর সে খবর জানিয়েছেন। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই ঘটে।

মুক্তকেশী সুবর্ণলতার প্রতিপক্ষ।

মুক্তকেশী সুবর্ণলতাকে বহুবিধ যন্ত্রণার স্বাদ যুগিয়ে এসেছেন চিরদিন, তবু মুক্তকেশী সুবর্ণকে দেখতে চেয়েছেন শুনে যেন মনটা বিষণ্ন বেদনাবিধুর হয়ে উঠলো।

হয়তো ব্যাপারটা হাস্যকর, তবু নির্ভেজাল।

শত্রু যদি শক্তিমান হয়, তার জন্যেও বুঝি মনের কোনোখানে একটা বড় ঠাঁই থাকে। রাবণের মৃত্যুকালে রামের মনস্তত্ত্ব এ সাক্ষ্য দেয়।

বহুকাল হলো এ বাড়িতে আসেনি সুবর্ণ।

আগে মাঝে মাঝে ভাসুরঝি-দ্যাওরঝিদের বিয়ে উপলক্ষে আসা হতো, ইদানীং যেন বিয়ের হুল্লোড়টাও কমে গেছে। তাই আর হয় না।

কিন্তু এসে যে মুক্তকেশীকে সত্যিই একেবারে মৃত্যুশয্যায় দেখতে হবে, একথা কে ভেবেছিল? সংবাদদাত্রী তো আশ্বাস দিয়েছিলো—'আজ-কালই আর কিছু হচ্ছে না।'

কিন্তু হঠাৎ গত রাত্রেই নাকি অকস্মাৎ কেমন বিকল হয়ে গেছেন মুক্তকেশী। মুখ দিয়ে ফেনা কাটছিল, গোঁ গোঁ শব্দ শুনে মল্লিকা তাড়াতাড়ি সবাইকে ডেকেছে। রাত্রে তার হেফাজতেই তো থাকেন মুক্তকেশী।

ডাক শুনে সবাই এসেছে, ছেলেরা শত-সহস্রবার 'মা মা' ডাক দিয়েছে, মুক্তকেশী শুধু ক্যালফ্যাল করে তাকিয়েছেন, সাড়া দিতে পারেননি। সকাল হয়েছে, দুপুর গড়ালো, একই অবস্থা, কবরেজ এসে দরাজ গলায় সুবোধকে বলে গেছেন, 'আর কি, এবার কোমরে গামছা বাঁধুন!'

সুবর্ণ এসব জানতো না, সুবর্ণ এমনিই এসেছিল।

গাড়ি থেকে নেমে গলিটুকু হেঁটে আসতেই হাঁপাচ্ছিল সুবর্ণ, এসে বসতেই বিরাজ চোখ বড় বড় করে বলে উঠলো, 'ও মা এ কী, তোমার এমন চোহারা হয়েছে কেন মেজবৌ?'

সুবর্ণলতা হাঁপ ছেড়ে ওর কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলো, 'মা কেমন আছেন?'

'আর থাকাথাকি —', বিরাজ আবার কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'কবরেজ তো বলে গেল রাত কাটে কিনা।'

'তা আমাদের ওখানে তো একটা খবর'ও—'

হঠাৎ গলাটা বুজে এল সুবর্ণর।

চুপ করে গেল।

ঘরে যারা ছিল তারা কি একবার ভাবল না, 'মাছের মায়ের পুত্রশোক।' অথবা 'মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে—'

তা ভাবলে অসঙ্গতও হবে না।

তবে মুখে কেউ কিছু বলে না।

বিরাজই আবার বলে, 'দিত খবর, আমায় তো দিয়েছে। কিন্তু মার না হয় যাবার বয়েস, চার ছেলের কাঁধে চড়ে চলে যাবেন, বলি তোমারও যে যাবার দাখিল চেহারা! অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছে নাকি?'

'না, অসুখ আর কি!'

বলে সুবর্ণ এগিয়ে যায় মুক্তকেশীর দিকে। খুব ধীরে বলে, 'মা আমায় ডেকেছিলেন?'

মুক্তকেশীর চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

এই সময় হেমাঙ্গিনী এসে ঢুকলেন থরথর করতে করতে, চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'মুক্ত চললি? আমায় ফেলে রেখে চলে যাবি?'

মুক্তকেশী ফ্যালফেলিয়ে তাকালেন।

হেমাঙ্গিনীর কান্নায় উপস্থিত সকলের ও যেন কান্না উথলে এল।

এসময় শ্যামাসুন্দরীও এলেন একটি পিতলের ঘটি হাতে। খুব কাছে এসে বললেন, 'চন্নামেত্তর খাও ঠাকুরঝি। মা কালীর চন্নামেত্তর।'

বোঝা গেল সবাইকেই খবর দেওয়া হয়েছে, শুধু প্রবোধচন্দ্র বাদে।

সুবর্ণলতা নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে।

বোধ করি মনকে মানাতে চেষ্টা করে, এ অবহেলা তার প্রাপ্য পাওনা।

... ...

মুক্তকেশীর ভিতরের জ্ঞান লুপ্ত হয়নি। চোখের ইশারায় বোঝালেন বুঝতে পেরেছেন, হাঁ করবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না।

সুবর্ণ আর একবার কাছে ঝুঁকে বললো, 'মা আমায় কেন ডেকেছিলেন?'

মুক্তকেশীর চোখ দিয়ে আবার দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। চেয়ে রইলেন সুবর্ণলতার মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে ডান হাতটা তুললেন, সুবর্ণলতার মাথা অবধি উঠল না হাতটা, স্খলিত হয়ে পড়ে গেল তারই কোলের উপর···চোখটা বুজে গেল।

উনআশী বছরের তীক্ষ্ণ তীব্র খোলা চোখ দুটো চিরদিনের জন্যে ছুটি পেলো।

কিন্তু ছুটি নেবার আগে কোন্ কথা জানিয়ে গেল তারা ?

আশীর্বাদ ? ক্ষমাপ্রার্থনা ?

॥ পনেরো ॥

'বৃষোৎসর্গ ?' সুবোধচন্দ্র হাসলেন, 'অত বড় ফর্দ করে বসবেন না ভট্‌চায মশাই! তেমন রেস্তওলা যজমান যে আপনার আমি নই, সে কথা আপনিও ভালই জানেন। আমার ওই ষোড়শ পর্যন্তই, ব্যস।'

ভট্‌চায ক্ষুণ্ণভাবে বলেন, 'বহু প্রাচীন হয়েছিলেন তিনি, চারকুড়ির কাছে বয়েস হয়েছিল, তাই বলা! তাছাড়া তুমি তেমন উপায়ী না হলেও তাঁর আরও তিন ছেলে রয়েছে রোজগারী, নাতিরাও সব কৃতী হয়ে উঠেছে—'

সুবোধচন্দ্র বাধা দিলেন, 'ওর সবই আমি জানি ভট্‌চায মশাই, তবু আমার যা ক্ষমতা, আমি সেই মতই চলবো।'

'তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রাদ্ধাধিকারী—'

'সে নিয়মকানুন তো সবই পালন করছি—'

'তা জানি, তোমার নিষ্ঠাকাষ্ঠা সবই শুনলাম তোমার কন্যার কাছে। এ যুগে এতটা আবার সবাই পারে না!'

'ওকথা থাক্ ভট্‌চায মশাই, আপনি ওই একটা ষোড়শের ফর্দ দিন।'

'একটা ?' ভট্‌চায আহত গলায় বলে ওঠেন, 'চার ভাই চারটে ষোড়শও করবে না ? আর নাতিরা এক-একটা ভুজ্যি—'

'আমি আমার কথাই বলছি ভট্‌চায মশাই, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন তাই আশ্চর্য!'

ভট্‌চায তবু নাছোড়বান্দা গলায় বলেন, 'জানি তোমাদের হাঁড়ি ভিন্ন, তৎসত্ত্বেও মাতৃ-শ্রাদ্ধের সময় একত্র হয়ে করাই শাস্ত্রীয় বিধি। যার যা সাধ্য, তুমি বড় তোমার হাতে তুলে দেবে, তুমি সৌষ্ঠব করে—'

সুবোধচন্দ্র এবার হেসে ওঠেন।

হেসেই বলেন, 'শাস্ত্রীয় বিধিটাই জানেন ভট্‌চায মশাই, আর একথা জানেন না, "ভাগের মা গঙ্গা পায় না"! কেন আর বৃথা সময় নষ্ট করছেন ? আমার ফর্দটা ঠিক করে দিন, সময় থাকতে—'

ভট্‌চায বিদায় নিলে সুবল এসে দাঁড়ায়।

বলে, 'জ্যাঠামশাই, মা একটা কথা বলছেন।'

'মা!'

সুবোধচন্দ্র একটু নড়েচড়ে বসলেন। সুবলের মার আবার বক্তব্য কি।

'ঘাটকামান' না হওয়া পর্যন্ত প্রবোধকে আর সুবর্ণলতাকে এ বাড়িতেই থাকতে হয়েছে, পাড়া-প্রতিবেশী জ্ঞাতিগোত্রের এই নির্দেশ।

তাই বকুলকে নিয়ে এ বাড়িতেই রয়েছে সুবর্ণ, ছেলেরা যাওয়া-আসা করছে। এদিকে তো চাঁপা এসেই গেছে, চন্নন পারুল ওরাও আসবে শ্রাদ্ধের দিন।

সে যাক্, ওসব ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুবোধ নেই। সুবর্ণ যে রয়েছে এ বাড়িতে, তাও ঠিকমত জানে কিনা সন্দেহ। কাজেই "মা আপনাকে একটা কথা বলবেন" শুনে সন্দিগ্ধ গলায় বলেন, 'কি কথা?'

সুবল মাঝখানে শিখণ্ডিস্বরূপ থাকলেও সুবর্ণলতার কণ্ঠটাই স্পষ্ট শোনা গেল, 'মার চার ছেলে বর্তমান, নাতিরাও অনেকেই কৃতী হয়ে উঠেছে, মার তো বৃষোৎসর্গ হওয়াই উচিত।'

সুবোধচন্দ্র অবশ্য তাঁদের বাড়ির মেজবৌকে কোনদিনই লজ্জাশীলা মনে করেন না, কাজেই এই স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে খুব একটা অবাক হন না। তবে বোধ করি একটু বিচলিত হন। গম্ভীর গলায় আস্তে বলেন, 'উচিত, সে কথা জানি মেজবৌমা, কিন্তু ক্ষমতা বুঝে কথা। আমার ক্ষমতা কম!'

এবারে সুবলের মাধ্যমেই কথা হয়, 'মা বলছেন, তা হোক আপনি এগোন, আপনার পেছনে সবাই আছে।'

'আমার পিছনে—', সুবোধচন্দ্রের গলাটা যেন কাঁপা কাঁপা আর ভাঙা ভাঙা শোনায়, 'আমার পিছনে কেউ নেই সুবল, শুধু সামনে ভগবান আছেন, এইটুকুই তোর মাকে বলে দে বাবা! গতকাল এসব আলোচনা হয়ে গেছে, আমার তিন ভাই-ই সাফ জবাব দিয়ে গেছে, তিরিশ টাকা করে দেবে, তার বেশি দিতে পারবে না। আমার অবস্থাও তো তদ্রূপ। কাজেই ও নিয়ে আর—তোর মাকে বাড়ির মধ্যে যেতে বল সুবল।'

এটা অবশ্যই বাক্যে যবনিকা পাতের ইশারা।

তত্রাচ সুবর্ণলতা যবনিকা পাত করতে দেয় না।

হয়তো প্রবোধের এই নীচতার খবরে এখনো নতুন করে বিস্ময়বোধ করে, তাই কথা বলতে একটু সময় যায়, আর বলে যখন, তখন গলার স্বরটা প্রায় বুজে আসার মত লাগে, তবু বলে, 'সুবল, বল —জ্যাঠামশাই, মার একটা মিনতি রাখতেই হবে।'

মিনতি!

রাখতেই হবে!

সুবোধচন্দ্র বিব্রত বোধ করেন।

চিরকেলে পাগলা মানুষটা কি-না-কি আবদার করে বসে!

কে জানে কি সঙ্কল্প নিয়ে এমন তোড়জোড় করে তাঁর দরবারে এসে হাজির হয়েছে! মুহূর্তের মধ্যেই অবশ্য এসব চিন্তা খেলে যায়। পরমুহূর্তে সুবোধের কণ্ঠ থেকে প্রায় হাসির সঙ্গে উচ্চারিত হয়, 'রাখতেই হবে? তোর মার যে এটা সাদা কাগজে সই করিয়ে নেবার মত হচ্ছে রে সুবল? কি বল শুনি?'

'মা নিজেই বলছেন—'

বলে সুবল সরে দাঁড়ায়।

গুণ্ঠনবতী সুবর্ণলতা তার পাশ দিয়ে এসে দাঁড়ায়, আর ছেলেকে এবং ভাসুরকে প্রায় তাজ্জব করে দিয়ে মৃদু চাপা স্বরে বলে ওঠে, 'সুবল, তুই একটু অন্যত্র যা তো বাবা—'

সুবল তুই অন্যত্র যা!

তার মানে ভাসুরের সঙ্গে একা নির্জনে কথা বলতে চায়!

এর চাইতে অসম্ভব অসমসাহসিকতা আর কি হতে পারে?

সুবোধচন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, কি যেন বলতে যান। সুবল চলে যায় আস্তে আস্তে, আর সুবর্ণ এগিয়ে এসে ভাসুরের পায়ের কাছে কিছু জিনিস ফেলে দিয়ে মৃদু দৃঢ়স্বরে বলে, 'এগুলো নিতে হবে আপনাকে, এই মিনতি। আপনার নিজের বলে মনে করে বেচে দিয়ে ইচ্ছেমতভাবে খরচ করে মার কাজ করুন।'

সুবোধ যেন সাপের ছোবল খেয়েছেন।

সুবোধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই উজ্জ্বল স্বর্ণখণ্ডগুলির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'এ তো মিনতি নয় মেজবৌমা, হুকুম! কিন্তু সে হুকুম পালন করবার ক্ষমতা আমার নেই মা। তুমি আমায় মাপ কর।'

গলার মোটা হেলে হার!

হাতের চুড়ির গোছা!

সুবর্ণ সেই বস্তুগুলোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বলে, 'এ তো শুনেছি স্ত্রীধন, এতে নাকি স্বামী-পুত্তুরের কোনো দাবি থাকে না। তবে আপত্তি কিসের?'

সুবোধ এবার আরো ভারী গলায় বলেন, 'এ তুমি কি বলছো মেজবৌমা! তোমার গায়ের গয়না বেচে মাতৃশ্রাদ্ধ করবো আমি? গরীব বলে কি—'

মেজবৌমা মৃদুস্বরে বলে, 'মায়ের কাজে ত্রুটি থেকে যাবে, আর মায়ের বৌরা গায়ে সোনাদানা চড়িয়ে ঘুরে বেড়াবে, এটাও তো অনিয়ম!'

অনিয়ম!

সুবোধচন্দ্র যেন একটু চমকান, তারপর একটু হেসে বলেন, 'অনিয়ম তো জগৎ জুড়ে মা, চন্দ্র-সূর্যের নিয়মটা আছে বলেই আজো পৃথিবীটা টিকে আছে। কিন্তু সেকথা থাক,

তুমি এগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাও মা। তুমি যে দিতে এসেছিলে, এতেই তাঁর আত্মার তৃপ্তি হয়ে গেছে।'

'তাঁর হতে পারে, কিন্তু আমাদেরও তো তৃপ্তি শান্তি হওয়া চাই? আপনার পায়ে পড়ছি, এটুকু আপনাকে করতেই হবে। মনে করুন এ টাকা আপনার, তা হলেই তো সব চিন্তা মুছে যাবে। মার কুপুত্র ছেলেরা টাকা হাতে থাকতেও "নেই" বলেছে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তরও তো দরকার। আমি যাচ্ছি, এ আর আপনি অমত করবেন না। যদি অমত করেন, যদি না নেন, তাহলে বুঝবো আমি "পতিত" তাই—', গলার স্বরটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় সুবর্ণর। 'আমি যাই' বলে নীচু হয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে একটি প্রণাম রেখে তাড়াতাড়ি উঠে চলে যায় সুবর্ণ, সুবোধকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে।

সুবোধ হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন।

সুবোধ এখন এই সোনার তালগুলোকে নিয়ে কি করবেন?

তা শেষ পর্যন্ত সেগুলো নিলেন সুবোধচন্দ্র।

সুবর্ণলতার ওই 'রুদ্ধকণ্ঠ' হয়ে চলে যাওয়ার মধ্যে তিনি একটা পরম সত্য উপলব্ধি করলেন যেন।

সেই সত্য সব দ্বিধা মুছে দিল বুঝি।

সমারোহ করেই বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হলো মুক্তকেশীর।

কে জানে তাঁর আত্মা সত্যই পরিতৃপ্ত হলো কিনা! তবু সুবোধ মনে করলেন 'হলো'। সুবোধের মুখে রইল সেই পরিতৃপ্তির ছাপ।

যদিও—আড়ালে আবডালে সবাই বলাবলি করতে লাগলো, সুবোধ কি রকম 'ভেতর চাপা'! এই যে খরচটি করলো, টাকা তোলা ছিল বলেই তো? অথচ কেউ বুঝতে পেরেছে?

সে কথা প্রবোধ এসেও মহোৎসাহে বলে, 'দেখলে তো? চিরটাকাল দেখিয়ে এসেছেন যেন হাতে কিছু নেই!'

সুবর্ণ একবার স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'বেশ তো, হাতের টাকা তো মন্দ কাজে ব্যয় করেননি, সদ্ব্যয়ই করেছেন! তা তোমার তো হাতে টাকার অভাব নেই, তুমি একটা সৎকাজ কর না? তোমার মায়ের একটা ইচ্ছে পালন কর না? অনেক কাঙালী খাওয়াও না? মার খুব ইচ্ছে ছিল।'

প্রবোধ সচকিত হয়ে বলে, 'এ ইচ্ছে আবার কখন তোমার কানে ধরে বলতে গেলেন মা? তুমি যখন গিয়ে পড়েছিলে, তখন তো বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল।'

ক্ষীণ একটু হাসলো সুবর্ণ।

বহুকাল পরে হাসলো।

বললো, 'না, এ ইচ্ছে প্রকাশ তখন করেননি। যখন পুরোদস্তুর বাক্যস্রোত ছিল, এ

তখনকার কথা। তোমাদের ওখানের জগন্নাথ ঘোষের মা যখন মারা গেলেন, তখন কাঙালী খেয়েছিল মনে আছে? দেখে মা বলেছিলেন, আমি যখন মরবো, আমার ছেলেরা কি এমন করে কাঙালী ভোজন করাবে?'

'ওঃ এই কথা!' প্রবোধ ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। বলে, 'জ্যান্ত থাকতে জন্মভোর অমন কত কথা বলে মানুষ! সে সব ইচ্ছে পালন করতে গেলেই হয়েছে আর কি!'

'তা বেশ! ধরো যদি আমারই ইচ্ছে হয়ে থাকে?'

প্রবোধ বিশ্বাস করে সেকথা। এটাই ঠিক কথা। তাই বলে, 'তোমার তো চিরদিনই এই রকম সব আজগুবী ইচ্ছে! শ্রাদ্ধ হয়ে গেল সেখানে, এখন কাঙালী ভোজন হবে এখানে! ওসব ফ্যাচাং তুলো না। অত বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই।'

'তবে থাক্।' সুবর্ণ বলে, 'দরকার যখন নেই, ভালই হলো, তোমার ছেলেদের সুবিধে হলো। ভবিষ্যতে তাদেরও আর মেলাই বাজে খরচ করতে হবে না। মনে জানবে মা-বাপের শ্রাদ্ধয় বেশি বাড়াবাড়ির দরকার নেই!'

প্রবোধ এ ব্যঙ্গে জ্বলে উঠে বলে, 'ওঃ ঠাট্টা! ভারী একেবারে! আমার মার মরণ-কালের ইচ্ছে নিয়ে আমি কাতর হলাম না, উনি হচ্ছেন! বলি—শাশুড়ীর ওপর ভক্তি উথলে উঠলো যে? এ ভক্তি ছিল কোথায়? চিরটা কাল তো মানুষটাকে হাড়ে-নাড়ে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছ!'

সুবর্ণ এ অপমানে রেগে ওঠে না, বরং হঠাৎ হেসে উঠে বলে, 'সত্যি বটে! স্মরণশক্তিটা আমার বড় কম! মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করলে!'

তারপর উঠে গেল।

সেই ওর ছাতের ঘরের কোটরে গিয়ে বসলো খাতাখানা নিয়ে।

কিন্তু খাতাখানা কি শুধু সুবর্ণর অপচয়ের হিসেবের খাতা?

সুবর্ণলতার জীবনের খাতাখানার মতই?

নইলে সুবর্ণর সেই খাতাখানার পাতা উল্টোলেই এই সব কথা চোখে পড়ে কেন?…

…'মেয়েমানুষ হয়েও এমন বায়না কেন তোমার সুবর্ণ, তুমি সৎ হবে, সুন্দর হবে, মহৎ হবে! ভুলে যাও কেন, মেয়েমানুষ হচ্ছে একটা হাত-পা-বাঁধা প্রাণী! মানুষ নয়, প্রাণী! হাত-পায়ের বাঁধনটা যদি ছিঁড়তে যায় সে, তো হাত-পাগুলো কেটে বাদ দিয়ে দিয়ে ছিঁড়তে হবে সে বাঁধন।'…

কেন লেখা থাকে…'তবু বাঁধন ছেঁড়ার সাধনটা চালিয়ে যেতে হবে তাকে। কারণ তার বিধাতা ভারী কৌতুকপ্রিয়। তাই ওই হাত-পা-বাঁধা প্রাণীমাত্রগুলোর মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকেন বুদ্ধি, চেতনা, আত্মা।'

॥ ষোল ॥

বহুদিন পরে মামাশ্বশুর-বাড়িতে বেড়াতে এল সুবর্ণ।

বড় ছেলে ভানু সম্প্রতি একটা গাড়ি কিনেছে, বড়বৌ বললো, 'আপনার ছেলে আসুন না মা, তখন বরং যাবেন—'

সুবর্ণ তবু ভাড়াটে গাড়ি করেই গেল। বললো, 'ও বাড়িতে বরাবর ভাড়াটে গাড়ি করেই গেছি বৌমা, জুড়িগাড়ি থাক।'

বৌ বিড়বিড় করে বললো, 'যত্ন-আদর না নিলে আর কে দেবে?'

সুবর্ণ গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

শ্যামাসুন্দরী সমাদর করে ডাকলেন, 'এসো মা, এসো।'

বয়েস কম হয়নি, মুক্তকেশীর থেকে কম হলেও তাঁর দাদার স্ত্রী। তবু শক্ত আছেন দিব্যি। এখনো নিজে রেঁধে খাচ্ছেন, হেঁটে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন।

অনেকদিন দেখেনি সুবর্ণ, দেখে আশ্চর্য হলো।

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল, হয়তো দু অর্থে।

শ্যামাসুন্দরী কুশল প্রশ্ন করতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

'ছেলেপুলেরা কেমন আছে? চাঁপা, চন্নন, পারুল, সব ভাল আছে তো? সেই যা তোমার শাশুড়ীর কাজের সময় সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলো।'

এটা ওটা উত্তর দিতে দিতে হঠাৎ একসময় বলে বসে সুবর্ণ, 'ভাসুরঠাকুর বাড়ি আছেন?'

'কে? জগা?' শ্যামাসুন্দরী মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'থাকবে না তো যাবে আর কোথায়? এখন তো সর্বক্ষণ বাড়িতেই স্থিতি।···আমার কানের মাথা খেতে যে বাড়ির মধ্যে এক ছাপখানা খুলে বসে আছেন!'

সুবর্ণলতা এ খবরে অবাক হয় না।

সুবর্ণলতা যেন এ খবর জানে।

শুধু সুবর্ণলতার মুখটা একটু উজ্জ্বল দেখায়।

বলে, 'বেশ চলছে ছাপাখানা? ভাল ছাপা হয়?'

'জানিনে বাছা—', শ্যামাসুন্দরী অগ্রাহ্যভরে বলেন, 'রাতদিন শব্দ তো হচ্ছে। বলে নাকি খুব লাভ হচ্ছে। বলে বয়েসকালে এ বুদ্ধি হলে লাল হয়ে যেতাম।···সাতজন্মে তো রোজগারের চেষ্টা দেখিনি। ওই ফোঁটা কাটতো আর মালা ঘুরাতো। তা ছাড়া পাড়ার লোকের জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, রোগ, শোক, দুর্গোৎসব, এইসব নিয়েই ছিল, হঠাৎ এই খেয়াল। মাথায় ঢুকিয়েছে ওই নিতাই। নিজের আখের গোছাতেই বোধ হয় এ প্ররোচনা দিয়েছে। বলে বাড়িখানা থেকে কিছু উসুল করি···তা তোমার সঙ্গের ওই ঝিয়ের হাতে আবার অত সব কি বৌমা?'

সুবর্ণ কুণ্ঠিতভাবে বলে, 'কিছু না, চারটি ফল, আপনি একটু মুখে দেবেন, ভাসুরঠাকুর একটু—ইয়ে, আপনাকে আজ একটা কথা বলতে এসেছি মামীমা—'

শ্যামাসুন্দরী সুবর্ণর কুণ্ঠিত ভাব দেখে আশ্চর্য হন। বলেন, 'কি গো বাছা?'

'বলছিলাম কি—ইয়ে—'

থেমে যায় সুবর্ণ।

শ্যামাসুন্দরী সমধিক অবাক হন। সুবর্ণলতার এমন কুণ্ঠিত মূর্তি! ও তো সপ্রতিভ। তা ছাড়া কুণ্ঠার মধ্যে কেমন যেন প্রার্থী ভাব! টাকা ধার চাওয়ার ক্ষেত্রেই এমনটা দেখা যায়। কিন্তু সুবর্ণলতার ক্ষেত্রে তো সে আশঙ্কা ওঠে না!

তবে?

শ্যামাসুন্দরীর প্রশ্নমুখর দৃষ্টির সামনে একটু অপ্রতিভ হাসি হাসে সুবর্ণ। তারপর আঁচলের তলা থেকে একখানা মলাট বাঁধানো মোটা খাতা বার করে বলে ফেলে, 'ভাসুরঠাকুর ছাপাখানা খুলেছেন শুনেছিলাম, তাই একটু শখ হয়েছে, সেই ইয়েতেই আসা। আমি তো আর নিজে মুখে বলতে পারবো না, আপনি যদি একটু বলে দেন!'

শ্যামাসুন্দরী বার্ধক্যের চোখে কৌতূহল ফুটিয়ে বলেন, 'কি জন্যে কি বলবো, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না বৌমা!'

সুবর্ণলতা মৃদু হাসে, 'বুঝতে পারবেনও না। তাহলে বলি শুনুন, ছেলেবেলা থেকে আমার একটু লেখার শখ আছে, জীবনভোর সকলের অসাক্ষাতে একটু-আধটু লিখেছি, এই পদ্যটদ্য আর কি। এদানীং গল্পটল্পর ধরনেও কিছু লেখা হয়েছে, তবে ছাপাবার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। ভাসুরঠাকুর ছাপাখানা খুলেছেন শুনে অবধি মনে উদয় হয়েছে, একখানা বই মতো করে যদি ছাপানো যায়। যা খরচা লাগে আমি দেব, শুধু আগে কেউ যেন জানতে না পারে। একেবারে বই হলে, জানবে দেখবে। তা আপনি একটু বলে দেখুন না মামীমা, যদি একটু দেখেন এখন ভাসুরঠাকুর!'

প্রৌঢ়া সুবর্ণলতার চোখে যেন ভাবাকুল অবোধ কিশোরীর দৃষ্টি।

যে সুবর্ণলতা সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতো—সে সুবর্ণলতা কি আজও মরেনি? কোথাও কোনখানে এতটুকু প্রাণ আহরণ করে বেঁচে আছে?…কোথায় আছে সেই অফুরন্ত অগ্নি, যা আজীবন বরফজল নিক্ষেপেও নিভে যায় না?

শ্যামাসুন্দরী তবুও বিস্মিত প্রশ্ন করেন, 'বই ছাপা হবে? কোথায় সেই বই?'

সুবর্ণ মৃদু হেসে বলে, 'বই তো পরে। ছাপা হবে এই খাতাটা। এইটা না হয় নিয়ে যান ভাসুরঠাকুরের কাছে, উনি ঠিক বুঝতে পারবেন।'

খাতাখানা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে শ্যামাসুন্দরী হতভম্ব গলায় বলেন, 'এসব লেখা তুমি লিখেছ? এই খাতা ভর্তি?'

'ওই তো পাগলামি—', হাসে সুবর্ণ।

'নিজের মন থেকে? না কিছু দেখে?'

সুবর্ণলতা ছেলেমানুষের মত শব্দ করে হেসে ওঠে, নাঃ, দেখে লিখবো কি? তা হলে আর নিজের লেখা হলো কোথায়?'

শ্যামাসুন্দরীর বিস্ময় ভাঙ্গে না, বলেন, 'তা হ্যাঁ গা মেজবৌমা, এত কথা তোমার মনে মাথায় এলো কি করে?'

সুবর্ণলতার মুখে আসে, মনে মাথায় যত আসে, তা লিখতে পারলে এ রকম সহস্রখানা খাতাতেও কুলোতো না মামীমা। তবে বলে না সে কথা।

শ্যামাসুন্দরী উঠে যান।

কিছুক্ষণ পরে প্রেসমালিক জগন্নাথচন্দ্র এসে অদূরে দাঁড়ান।

চেহারা প্রায় একই রকম আছে, তেমনি আঁট-সাঁট খাটমুগুরে গড়ন, তেমনি হত্তেলের মত রং, বদলের মধ্যে কিছু চুল পেকেছে।

আগের মতই পরনে একটা লাল ছালটি, গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা।

তার মানে এই বেশেই ছাপাখানায় বসেন তিনি।

এসে দাঁড়িয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে বলেন, 'মা, জিজ্ঞেস করো তো বৌমাকে, এ হাতের লেখা কার?'

ইশারায় উত্তর পেয়ে শ্যামাসুন্দরী মহোৎসাহে বলেন, 'বললাম তো সবই বৌমার লেখা!'

'চমৎকার হাতের লেখা তো!'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে খাতার পৃষ্ঠাগুলো উল্টোতে উল্টোতে জগু বলেন, 'মেয়েছেলেদের হাতের লেখা এমন পাকা! সচরাচর দেখা যায় না। কিসে থেকে নকল করেছেন?'

শ্যামসুন্দরী বলে ওঠেন, 'এই দেখো ভূতুড়ে কথা! বললাম যে, এ সমস্ত বৌমা নিজের মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে লিখেছে! বই-লিখিয়েরা যেমন লেখে আর কি!'

'বল কি? এই গদ্য-পদ্য সব?'

'সব।' এখন আবার শ্যামাসুন্দরী জ্ঞানদাত্রী।

জগন্নাথ মহোৎসাহে বলেন, 'তুমি যে তাজ্জব করে দিলে মা! এতকাল দেখছি, কই এসব তো শুনিনি!'

শ্যামাসুন্দরী বলেন, 'শুনবি কোথা থেকে? মেজবৌমা তো নিজের গুণ জাহির করে বেড়ানো মেয়ে নয়? তোর ছাপাখানার বার্তা শুনে সাধ হয়েছে, তাই বলছে যা খরচা পড়বে দেবে, তুই শুধু দেখে শুনে—'

'খরচের কথা আসছে কোথা থেকে? খরচের কথা?' জগু হৈ-হৈ করে ওঠেন, 'আমার প্রেসে আবার খরচ কি? রেখে দিয়ে যান বৌমা, কালই প্রেসে চড়িয়ে দেব। কিন্তু অবাক

হয়ে যাচ্ছি বৌমার গুণ দেখে। নাঃ, পিসির সংসারে এই মেজবৌমাটি এসেছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ভগবান দিয়েছেনও তাই ঢেলে মেপে। মনের গুণেই ধন। বহু ভাগ্যে এমন লক্ষ্মী পেয়েছিল পেবো।'

॥ সতেরো ॥

কানায় কানায় পূর্ণ মন নিয়ে বাড়ি ফিরলো সুবর্ণলতা।

ভাবতে লাগলো ভগবানের উপর অবিশ্বাস এসে গেলেই বুঝি তিনি এইভাবে আপন করুণা প্রকাশ করেন।

মানুষের উপর প্রত্যাশা হারালেই ভগবানের উপর আসে অবিশ্বাস। তবু কোথাও বুঝি কিছু একটু আশা ছিল, তাই দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত নিয়ে সেই আশার দরজায় একটুকু করাঘাত করতে গিয়েছিল সুবর্ণলতা, রুদ্ধ কপাট খোলে কিনা দেখতে। দেখলো দু'হাট হয়ে খুলে গেল। ভিতরের মালিক সহাস্য অভ্যর্থনায় বললো, 'এসো এসো! বোসো, জল খাও!'

হ্যাঁ, সেই কথাই মনে হয়েছিল সুবর্ণলতার।

একথা সেকথার পর আবার মামীমার মাধ্যমে ছাপার খরচার কথাটা তুলেছিল সুবর্ণ, সুবর্ণলতার জগু-বট্‌ঠাকুর সে প্রস্তাব তুড়ি দিয়ে ওড়ালেন। বললেন, 'দূর! কাগজের আবার দাম! বস্তা বস্তা কাগজ কেনা আছে আমার। এই তো এখনই তো দু হাজার বর্ণপরিচয় ছাপা হচ্ছে। বৌমা বই লিখেছেন, এটা কি কম আহ্লাদের কথা! ছেপে বার করে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াবো লোককে। কী গুণবতী বৌ আমাদের! বুকটা দশ হাত হয়ে উঠবে।'

শুনে তখন সহসা ভূমিকম্পের মতো প্রবল একটা বাষ্পোচ্ছ্বাসে সুবর্ণলতার সমস্ত শরীর দুলে উঠেছিল। জীবনের তিন ভাগ কাটিয়ে এসে সুবর্ণলতা এই প্রথম শুনলো সে গুণবতী! শুনলো তার কোনো গুণ নিয়ে কেউ গৌরব করতে পারে!

অথচ এই গুণই—

হ্যাঁ, এই গুণই দোষ হয়েছে চিরকাল।

আজীবনই তো একটু-আধটু লেখার সাধ ছিল। কিন্তু সে সাধ মেটাতে অনেক দাম দিতে হয়েছে। কত সঙ্গোপনে, কত সাবধানে, হয়তো রাত্রে যখন ওদিকে তাসের আড্ডা জমজমাট, অথচ এদিকে ছেলেরা ঘুমিয়েছে, তখন বসেছে একটু খাতা-কলম নিয়ে, প্রবোধ কোনো কারণে ঘরে এসে পড়ে দেখে ফেললো, ব্যস্, শুরু হলো ব্যঙ্গ তিরস্কার!

আর তার জের চলতে লাগলো বেশ কিছুকাল। যে সংসারে মেয়েমানুষ 'বিদ্যেবতী' হয়ে উঠে কলম নাড়ে, তাদের যে লক্ষ্মী ছেড়ে যাওয়া অনিবার্য এ-কথাও ওঠে। তা ছাড়া কলম ধরা হাত যে আর হাতাবেড়ি ধরতে চাইবে না, তাতে আর সন্দেহ কি!

অনেক সময় অনেক কটূক্তি হজম করেছে সুবর্ণলতা তার 'খাতা' নিয়ে। আর এখনই কি হয় না ? কটূক্তি না হোক বক্রোক্তি ?

কানে আসে বৈ কি !

আর সে উক্তি আজকাল অনেক সময়ই আসে ছেলেদের ঘর থেকে। সুবর্ণলতার রক্তে-মাংসে গঠিত ছেলেদের !

'ব্যাপারটা কি ? কোনো "থিসিস্-টিসিস্" লেখা হচ্ছে নাকি ? মা কি রান্নাঘরটা একদম ছেড়ে দিলেন নাকি রে বকুল ? দেখতেই পাওয়া যায় না।···সুবল, তুই তো অনেক জানিস, মহাভারত লিখতে বেদব্যাসের কতদিন লেগেছিল জানিস সে খবর ?'

অথবা প্রবোধের আক্ষেপ-উক্তি শোনা যায়, 'কী রান্না-বান্না হচ্ছে আজকাল ? বকুল, এ মাছের তরকারি রেঁধেছে কে ? তুই বুঝি ? মুখে করা যাচ্ছে না যে—'

জানে বকুল নয়, ছেলের বৌরা রেঁধেছে। তত্রাচ ওইভাবেই বলে। বোধ করি সেই চিরাচরিত মেয়েলি প্রথাটাই বজায় রাখে। ঝিকে মেরে বৌকে শেখায়।

আবার এ আক্ষেপও করে ওঠে, 'হবেই তো। বাড়ির গিন্নী যদি সংসার ভাসিয়ে দিয়ে খাতা-কলম নিয়ে পড়ে থাকে, হবেই নষ্ট-অপচয়, অবিলি, বে-বন্দোবস্ত !'

সুবর্ণের কানে আসে।

কিন্তু সুবর্ণ কানে নেয় না। সব কিছু কানে নেওয়া থেকে বিরত হয়েছে সুবর্ণ, অভিমান-শূন্য হবার সাধনা করছে।

অতএব জবাব দেয় না।

সুবর্ণলতা তার সংসারের সব প্রশ্নের 'জবাব' তৈরী করছে বসে শেষ আদালতে পেশ করার জন্যে। হয়তো সেই 'জবাবী বিবৃতি'র মধ্য থেকে সেই সংসার সুবর্ণলতাকে বুঝতে পারবে।

আর সেই বোঝা বুঝতে পারলেই, বুঝতে পারবে নিজের ভুল, নিজের বোকামি, নিজের নির্লজ্জতা।

সুবর্ণলতার 'স্মৃতিকথা' সুবর্ণলতার জবানবন্দী।

সেই জবানবন্দীকে মুক্তি দিতে পারছে সুবর্ণলতা, মুক্তি দিতে পারছে খাতার কারাগার থেকে আলোভরা রাজরাস্তায়।

ঈশ্বরের করুণা নেমে এসেছে মানুষের মধ্য দিয়ে।

আজীবনের কল্পনা সফল হতে চললো এবার, আজীবনের স্বপ্ন সফল। এ যেন একটা অলৌকিক কাহিনী। যে কাহিনীতে মন্ত্রবলের মহিমা কীর্তিত হয়। নইলে চিরকালের বাউণ্ডুলে জগু-বট্‌ঠাকুরের হঠাৎ ছাপাখানা খোলার শখ হবে কেন ?

ভগবানই সুবর্ণলতার জন্যে—

পৃথিবীটাকে হঠাৎ ভারি সুন্দর লাগে সুবর্ণর, ভারি উজ্জ্বল। খুশি-ঝলমলে সকালের আলোয় এই বিবর্ণ হয়ে আসা গোলাপী-রঙা বাড়িটা যেন সোনালী হয়ে ওঠে। নিজের সংসারটাকেও যেন হঠাৎ ভাল লেগে যায়।

এই তো, এই সমস্তই তো সুবর্ণলতার নিজের সৃষ্টি, এদের উপর কি বীতশ্রদ্ধ হওয়া যায়? এদের উপর বিরূপ হওয়া সাজে?

এরা যে সুবর্ণলতাকে ভালবাসে না, সে ধারণাটা ভুল ধারণা সুবর্ণলতার। বাসে বৈ কি, শুধু ওদের নিজেদের ধরনে বাসে। তা—তাই বাসুক। সুবর্ণলতাও চেষ্টা করবে ওদের বুঝতে।

হয়তো জীবনের এই শেষপ্রান্তে এসে জীবনের মানে খুঁজে পাবে সুবর্ণ, আর তার মধ্যেই খুঁজে পাবে জীবনের পূর্ণতা।

ক্রমশই যেন প্রত্যাশার দিগন্ত উদ্ভাসিত হতে থাকে নতুন সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়।

শুধুই বা ওই জবানবন্দী কেন?

আরও তো লিখছে সুবর্ণলতা, যা শিল্প, যা সৃষ্টি!

যেখানে সুবর্ণলতা একক, যেখানে তার ওপর কোনো ওপরওয়ালা নেই। যেখানে থাকবে—সুবর্ণলতার অস্তিত্বের সম্মান! যেখানে সে বিধাতা।

আঃ, এ কল্পনায় কী অপূর্ব মাদকতা!

এ যেন কিশোরী মেয়ের প্রথম প্রেমে পড়ার অনুভূতি! অনুক্ষণ মনের মধ্যে মোহময় এক সুর গুঞ্জরণ করে। সে সুর রাত্রির তন্দ্রার মধ্যেও আনাগোনা করে।

নিত্য নূতন বই লেখা হচ্ছে, নিত্য নিত্য ছাপা হয়ে বেরোচ্ছে সে সব, অবাক হয়ে যাচ্ছে সবাই সুবর্ণলতার মহিমা দেখে, আর ভাবছে 'তাই তো'!

আশ্চর্য! আশ্চর্য! কী হাস্যকর ছেলেমানুষিই করে এসেছে এতদিন সুবর্ণ!

এই তুচ্ছ সংসারের বিরূপতা আর প্রসন্নতার মধ্যে নিজের মূল্য খুঁজে এসেছে! হিসেব কষেছে লাভ আর ক্ষতির!

অথচ সুবর্ণলতার নিজের মুঠোর মধ্যে রয়েছে রাজার ঐশ্বর্য!

সুবর্ণলতার ওই হলুদ পাঁচফোড়নের সংসারখানা নিক্ না যার খুশি, নিয়ে বরং রেহাই দিক সুবর্ণলতাকে। সুবর্ণলতার জন্যে থাক্ এক অনির্বচনীয় মাধুর্যলোক।

কী আনন্দ!

কী অনাস্বাদিত সুখস্বাদ!

সুবর্ণলতার জীবনখাতার এই অধ্যায়খানি যেন জ্যোতির কণা দিয়ে লেখা।

সুবর্ণলতা রান্নাঘরে এসে বলে, 'ও বড়বৌমা, বল বাছা কী কুটনো হবে? কুটি বসে!'

বড়বৌমা শাশুড়ীর এই আলো-ঝলসানো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়। তবে

প্রকাশ করে না সে বিস্ময়। নরম গলায় বলে, 'আমি আবার কি বলবো? আপনার যা ইচ্ছে—'

'বাঃ তা কেন? তুমি রাঁধবে—তোমার মনের মত রান্নাটি হওয়াই তো ভাল।' বলে বঁটিটা টেনে নেয় সুবর্ণ।

আবার হয়তো বা একথাও বলে, 'তোমরা তো রোজই খেটে সারা হচ্ছ বৌমা, আমার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কি রান্না হবে বল, আমি রাঁধি।'

বৌরা বলে, 'আপনার শরীর খারাপ—'

সুবর্ণ মিষ্টি হাসি হাসে, 'খারাপ আবার কি বাপু? খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুরছি ফিরছি। তোমাদের শাশুড়ী চালাক মেয়ে বুঝলে? কাজের বেলাতেই তার শরীর খারাপ!'

ওরা অবাক হয়।

ওরা শাশুড়ীর এমন মধুর মূর্তি দেখেনি এসে পর্যন্ত। ওরা ভাবে ব্যাপারটা কি?

সুবর্ণ ওদের বিস্ময়টা ধরতে পারে না, সুবর্ণ আর এক জগৎ থেকে আহরণ করা আলোর কণিকা মুঠো মুঠো ছড়ায়।

'ভানু মাছের মুড়ো দিয়ে ছোলার ডাল ভালবাসে, তাই বরং হোক আজ। কানুটা বড়া দিয়ে মোচারঘণ্টর ভক্ত, হয়নি অনেকদিন, দুটো ডাল ভিজোও তো মেজবৌমা!··· ওগো আজ মোচা এনো তো—'

বাজার করার ভার প্রবোধের।

এই মহান্ কর্মভার অবশ্য সে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। ছেলেরা চক্ষুলজ্জার দায়ে কখনো কখনো বলে বটে, 'আমাদের বললেই পারেন। নিজে এত কষ্ট করার কি দরকার!' তবে সে কথা গায়ে মাখে না প্রবোধ।

কিন্তু সেই বাজার-বেলায় সুবর্ণলতা তাকে ডেকে হেঁকে বিশেষ কোনো জিনিস আনতে হুকুম দিয়েছে, এ ঘটনা প্রায় অভূতপূর্ব। অন্তত বহুকালের মধ্যে মনে পড়ে না।

বোধ করি ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছোট, তখন তাদের প্রয়োজনে বিস্কুট কি লজেন্স, বার্লি কি মেলিন্স ফুড্ ইত্যাদির অর্ডার দিতে এসেছে বেরোবার মুখে। কিন্তু মুখের রেখায় রেখায় ওই যে আহ্লাদের জ্যোতি?

এ বস্তু কি দেখা গিয়েছে কোনোদিন?

দেখা যেত, ওই আলোর আভা দেখা যেত কখনো কখনো সুবর্ণর মুখে, কিন্তু সে আভা আগুন হয়ে প্রবোধের গাত্রদাহ ঘটাতো।

স্বদেশী হুজুগের সময় যখনই কোনো বিদ্‌ঘুটে খবর বেরোতো, তখনই সুবর্ণর মুখে আলো জ্বলতো। আলো জ্বলতো, যখন নতুন কোনো বই হাতে পেত—আলো জ্বলতো, যখন বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে একত্রে বসিয়ে 'পাঠশালা পাঠশালা' খেলা ফেঁদে

তারস্বরে তাদের দিয়ে পছ্য মুখস্থ করাতো—আলো জ্বলতো, যদি কেউ কোনখান থেকে বেড়িয়ে বা তীর্থ করে এসে গল্প জুড়তো।

তা ছাড়া আর এক ধরনের আলো আর আবেগ ফুটে উঠেছিল সুবর্ণলতার মুখে, ইংরেজ জার্মান যুদ্ধের সময়। সে এক ধরন! যেন সুবর্ণলতারই জীবন-মরণ নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে। দেশের রাজা বৃটিশ, অথচ সুবর্ণর ইচ্ছে জার্মানরা জিতুক। তাই তর্ক, উত্তেজনা, রাগারাগি। মেয়েমানুষ, তাও রোজ খবরের কাগজ না হলে ভাত হজম হবে না!

তা সে প্রকৃতিটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে।

এই তো ইদানীং আবার যে 'স্বরাজ-স্বরাজ' হুজুগ উঠেছে, তাতে তো কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। বরং যেন অগ্রাহ্য। বলে, 'অহিংসা করে শত্রু তাড়ানো যাবে এ আমার বিশ্বাস হয় না।'···বলে, 'দেশসুদ্ধ লোক বসে বসে চরকা কাটলে "স্বরাজ" আসবে? তাহলে আর পৃথিবীতে আদি-অন্তকাল এত অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতো না।' উত্তেজিত হয়ে তর্কটা করে না, শুধু বলে।

শক্তি-সামর্থ্যটা কমে গেছে, ঝিমিয়ে গেছে।

তাই মুখের সেই ঔজ্জ্বল্যটাও বিদায় নিয়েছিল। বিশেষ করে সেই অদেখা মায়ের, আর চকিতে দেখা বাপের মৃত্যুশোকের পর থেকে তো—

হঠাৎ যেন সেই ঝিমিয়ে পড়া ভাবটার খোলস ছেড়ে আবার 'নতুন' হয়ে ওঠার মত দেখাচ্ছে সুবর্ণকে।

কেন?

মাথার দোষ-টোষ হচ্ছে না তো?

পাগলরাই তো কখনো হাসে কখনো কাঁদে।

তা যাক্, এখন যখন হাসছে, তাতেই কৃতার্থ হওয়া ভালো।

কৃতার্থই হয় প্রবোধ।

বিগলিত গলায় বলে, 'মোচা? মোচা আনা মানেই তো তোমার খাটুনি গো, ও কি আর বৌমারা বাগিয়ে কুটতে-ফুটতে পারবেন?'

সুবর্ণ বলে, 'শোনো কথা! সব করছে ওরা। কিসে হারছে? তবে আমারই ইচ্ছে হয়েছে, রান্নাবান্না ভুলে যাব শেষটা?'

কৃতার্থমন্য প্রবোধ ভাবতে ভাবতে বাজার ছোটে, 'আহা, এমন দিনটি কি চিরদিন থাকে না?'

এই জীবনটাই তো কাম্য!

গিন্নী ফাইফরমাশ করবে, এটা আনো ওটা আনো বলবে, কর্তা সেইসব বরাতি বস্তু এনে সাতবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাবে, বাহবা নেবে, গিন্নী গুছিয়ে-গাছিয়ে রাঁধবে বাড়বে, বেলা

গড়িয়ে পরিপাটী করে খাওয়া-দাওয়া হবে, আর অবসরকালে কর্তা-গিন্নী পানের বাটা নিয়ে বসে ছেলে বৌ বেয়াই বেয়ানের নিন্দাবাদ করবে, এযুগের ফ্যাশান নিয়ে সমালোচনা করবে—এই তো এই বয়সের সংসারের ছবি! প্রবোধের সমসাময়িক বন্ধুবান্ধবরা তো এই ধরণের সুখেই নিমগ্ন।

প্রবোধের ভাগ্যেই ব্যতিক্রম। এই সামান্য সাধারণ সুখটুকুও ইহজীবনে জুটলো না।

গিন্নী যেন সিংহবাহিনী।

তাসের আড্ডাটা যাই আছে প্রবোধের, তাই টিঁকে আছে বেচারা।

তা এতদিনে কি ভগবান মুখ তুলে চাইছেন?

'পাগল-ছাগল' হয়ে সহজ হয়ে যাচ্ছে সুবর্ণ?

নাকি এতদিনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে?

তা সে যে কারণে যাই হোক, সুবর্ণ যে সহজ প্রসন্নমুখে ডেকে বলেছে, 'ওগো বাজার যাচ্ছ, মোচা এনো তো'—এই পরম সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে বাজারে যায় প্রবোধ, আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ-তরকারি এনে জড়ো করে।

সুবর্ণ তখন হয়তো অনুমান করতে চেষ্টা করছে, তার এই খাতাটা ছাপতে কতদিন লাগতে পারে, কতদিন লাগা সম্ভব! ধারণা অবশ্য নেই কিছুই, তবু—কতই আর হবে? বড় জোর মাস দুই, কমও হতে পারে। তারপর—

আচ্ছা, জগু-বট্‌ঠাকুর আমার নামটা জানেন তো? কে জানে! কিন্তু জানবেনই বা কোথা থেকে? কবে আর কে আমার নাম উচ্চারণ করেছে ওঁর সামনে?

তাহলে?

বিনা নামেই বই ছাপা হবে?

নাকি মামীমার কাছ থেকে জেনে নেবেন উনি?

তা মামীমাই কি ঠিক জানেন?

'মেজবৌমা' ডাকটাতেই তো অভ্যস্ত।

হঠাৎ নিজমনে হেসে ওঠে সুবর্ণলতা।

কী আশ্চর্য! খাতাটার প্রথম পৃষ্ঠাতেই তো তার নাম রয়েছে। যে হাতের লেখার প্রশংসা করেছেন জগু-বট্‌ঠাকুর, সেই হাতের লেখাটিকে আরো সুছাঁদ সুন্দর করে ধরে ধরে নামটি লেখেনি একবার সুবর্ণ?

হ্যাঁ, পরম যত্নে পরম সোহাগে কলমটিকে ধরে ধরে লিখে রেখেছিল সুবর্ণ—শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবী।

সেই লেখা চোখ এড়িয়ে যাবে?

এড়িয়ে যাবে না।

চোখ এড়িয়ে যাবে না।

নামতা মুখস্থ করার মত বার বার মনে মনে এই কথা উচ্চারণ করতে থাকে সুবর্ণ, চোখ এড়িয়ে যাবে না। বইয়ের উপর লেখা থাকবে শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবী!

সুবর্ণলতার মা জেনে গেল না এ খবর!

এত আনন্দের মধ্যেও সেই বিষণ্ণ বিষাদের সুর যেন একটা অস্পষ্ট মূর্ছনায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

মা থাকতে এই পরম আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটলে, মাকে অন্তত একখণ্ড বই পার্শেল করে পাঠিয়ে দিত সুবর্ণ! এ বাড়ির কাউকে দিয়ে নয় অবশ্য, মামীমাকে দিয়ে ওই জগু-বট্‌ঠাকুরকে বলেই করিয়ে দিতো কাজটা!

মা প্রথমটায় পার্শেল পেয়ে হকচকিয়ে যেত, ভাবতো, কী এ? তারপর বাঁধন খুলে দেখতো। দেখ তো! দেখ তো বইয়ের লেখিকা শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবী!

তারপর?

তারপর কি মা'র চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তো না?

সুবর্ণলতার মনটা যেন ইহলোক পরলোকের প্রাচীর ভেঙে দিতে চায়। যেন তার সেই অদেখা বইটা সেই ভাঙা প্রাচীরের ওধারে নিয়ে গিয়ে ধরে দিতে চায়। সুবর্ণ দেখতে পায়, সুবর্ণর মা সুবর্ণর স্মৃতিকথা পড়ছেন!

পড়ার পর?

শুধুই কি সেই দু ফোঁটা আনন্দাশ্রুই ঝরে পড়ে শুকিয়ে যাবে? সেই শুকনো রেখার উপর দিয়ে ঝরণাধারার মত ঝরে পড়বে না আরো অজস্র ফোঁটা? মা দেখতে পাচ্ছেন, কীভাবে কাঁটাবনের উপর দিয়ে রক্তাক্ত হতে হতে জীবনের এতটা পথ পার হয়ে এসেছে সুবর্ণ!

মা বুঝতে পারছেন সুবর্ণ অসার নয়।

কোন্ কোন্ অংশটা পড়তে পড়তে মা বিচলিত হতেন আর কোন্ কোন্ অংশটা পড়ে বিগলিত, ভাবতে চেষ্টা করে সুবর্ণ।

নিজের হাতের সেই লেখাগুলো যেন 'দৃশ্য' হয়ে হয়ে ভেসে ওঠে।

পর পর নয়, এলোমেলো।

যেন দৃশ্যগুলো হুড়োহুড়ি করে সামনে আসতে চায়। যেন এক প্যাকেট তাসকে কে ছড়িয়ে দিয়েছে।

অনেক বয়সের অনেকগুলো সুবর্ণ ছড়িয়ে পড়ে সেই অসংখ্য দৃশ্যের মধ্যে। মাথায় খাটো, পায়ে মল, একগলা-ঘোমটা বালিকা সুবর্ণ, হঠাৎ লম্বা হয়ে যাওয়া সদ্য কিশোরী সুবর্ণ, নতুন মা হয়ে ওঠা আবেশবিহ্বল সুবর্ণ, তারপর—

আচ্ছা, ওই ঘোমটা দেওয়া ছোট মাপের সুবর্ণর ঘোমটাটা হঠাৎ খুলে গেল যে?

কি বলছে, ও ?

কী বলছে, সে কথা শুনতে পাচ্ছে সুবর্ণলতা !

'তাড়িয়ে দিলে ? তোমরা আমার বাবাকে তাড়িয়ে দিলে ? আমাকে নিয়ে যেতে দিলে না ? কেন ? কেন ? কী করেছি আমি তোমাদের, তাই এত কষ্ট দেবে আমাকে ?··· ···কে বলেছিল, আমাকে তোমাদের বৌ করতে ? শুধু শুধু ঠকিয়ে ঠকিয়ে বিয়ে দিয়ে··· চলে যাব, আমি তোমাদের বাড়ি থেকে চলে যাব—তোমাদের মতন নিষ্ঠুরদের বাড়িতে থাকলে মরে যাব আমি।'

সুবর্ণলতা অন্য আর এক গলার উচ্চ নিনাদও শুনতে পাচ্ছে, ওর নিজের কলমের অক্ষরগুলোই যেন সশব্দ হয়ে ফেটে পড়ছে, 'ওমা, আমি কোথায় যাব ! এ কী কালকেউটের ছানা ঘরে আনলাম গো আমি ! চলে যাবি ? দেখ্ না একবার চলে গিয়ে ! খুন্তি নেই আমার ? পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিতে জানি না ?·· "বাপকে তাড়িয়ে দিলে !" দেব না তো কি, ওই বাপের সঙ্গে নাচতে নাচতে যেতে দেব তোকে ?···সইমা আমার পূর্বজন্মের শত্রু ছিল, তাই তোকে আমার গলায় গছিয়ে পরকাল খেয়েছে আমার। তার মুখোও হতে দিচ্ছি না তোকে।······ইহজীবনে কেমন আর বাপেরবাড়ির নাম মুখে আনিস, দেখবো ! বাপেরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তোর যদি না ঘোচাই তো আমি মুক্তবামনী নই ! বাপ চলে যাচ্ছে বলে ঘোমটা খুলে রাস্তায় ছুটে আসা বার করছি !'

সেই ঘোমটা খোলা বালিকা সুবর্ণকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে এনে পুরে শেকল তুলে দিয়ে গেল ওরা, বলে গেল, 'মুখ থেকে আর টুঁশব্দ বার করবি না।'

সুবর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল।

এই অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতায় যেন নিথর হয়ে গেল !···তবু তখনো সত্যি বিশ্বাস হয়নি তার, সেই নিষ্ঠুরতার কারাগারেই চিরদিনের মত থাকতে হবে তাকে।······মনে করেছিল, কোনমতে একবার এদের কবল থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই সব সোজা হয়ে যাবে।

তাই পালাবার মতলবই ভেঁজেছিল বসে বসে।

রাস্তা চেনে না ? তাতে কি ? রাস্তায় বেরোলেই রাস্তা চেনা যায়। রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করলেই হবে।····সুবর্ণদের বাড়িটা রাস্তার লোক যদি না চেনে তো, সুবর্ণ তার ইস্কুলটার নাম করবে। ইস্কুলটাকে নিশ্চয় সবাই চেনে, বেথুন ইস্কুল তো নামকরা জায়গা !··· ···হে ঠাকুর, একবার সুবর্ণকে সুযোগ দাও পালিয়ে যাবার !···সুবর্ণ রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে করে একবার ইস্কুলে গিয়ে পৌঁছে যাক ! তারপর আর বাড়ি চেনা আটকায় কে ? ···রোজ যেমন করে চলে যেতো তেমনি করেই চলে যাবে।

চলে গিয়ে ?

চলে গিয়ে বাবাকে বলবে, 'দেখলে তো বাবা, তুমি আনতে পারলে না, আমি নিজে নিজেই চলে এলাম।' আর মাকে বলবে, মা! মা কোথায়? এরা তো কেবলই বলে তার মা চলে গেছে! কোথায় চলে গেছে মা? এতদিনেও আসে নি? ঠিক আছে, সুবর্ণ গিয়ে পড়ে দেখবে কেমন না আসে মা? দাদার বিয়ে হবে কত মজা, আর কত কাজ মা'র, কোথায় গিয়ে বসে থাকবে শুনি? ...

ইস্ ভগবান, একবার এদের বাড়ির লোকগুলোর দৃষ্টি হরে নাও, সুবর্ণকে পালাতে দাও। কে জানে সুবর্ণর দাদার বিয়ের সময়েও হয়তো যেতে দেবে না এরা সুবর্ণকে!

আচ্ছা, ইস্কুলের মেয়েরা যদি জিজ্ঞেস করে, 'এতদিন আসিসনি কেন?' যদি সুবর্ণর মাথায় সিঁদুর দেখে হেসে উঠে বলে, 'এ মা, তোর বিয়ে হয়ে গেছে!' কী উত্তর দেব?

বলব কি—আমার ঠাকুমা আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে?...নাঃ, সে কথা শুনলে ওরা আরো হাসবে।.. তার চাইতে সিঁদুরটা আচ্ছা করে মুছে নেব রাস্তায় বেরিয়ে। রাস্তার কলে ধুয়ে ঘষে সাদা করে ফেলবো। ...ও-বাড়ির দিদি - জয়াবতীদিদি, ওকেই শুধু বলে যাব আমি চলে যাচ্ছি।......ও আমায় যা ভালবাসে, ঠিক মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ওর শ্বশুরবাড়ি এমন বিচ্ছিরি নয়, ও কত বাপের বাড়ি যায়!

'পালাবো পালাবো' এই ছিল ধ্যান-জ্ঞান।

কিন্তু পালাতে পারেনি সুবর্ণ। জীবনভোর পারল না।...দেখেছে, পালানোটাকে যত সোজা ভেবেছিল, তত কঠিন।

একদণ্ডের জন্যে পাহারা সরায় না এরা।

ক্রমশই তাই বেথুন ইস্কুল, ঠনঠনে কালীতলা, মুক্তারামবাবুর স্ট্রীট, আঠারো-হাত কালীর মন্দির, সব কিছুই ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে...স্পষ্ট আর প্রখর হয়ে উঠছে সিঁথির ওই সিঁদুরটা। ওটাকে ঘষে ঘষে মুছে ফেলার কথা যেন অবাস্তব মনে হচ্ছে।...সেই তার নিজের জীবনে, সত্যিকার জীবনে যে আর ফিরে যাওয়া যাবে না, সেটা যেন স্থিরীকৃত হয়ে যাচ্ছে।

সুবর্ণর বই খাতা শ্লেট পেন্সিল সব যে তাদের কুলুঙ্গিটার মধ্যে পড়ে রইল, সে কথা তো কেউ ভাবলো না? সামনেই যে সুবর্ণর হাফ-ইয়ার্লির একজামিন, সে কথা মা'রও তো কই মনে পড়ল না?

সুবর্ণর সমস্ত প্রাণটা যেন ওই কুলুঙ্গিটার উপর আছড়ে পড়তে যায়!

এতদিন না পড়ে পড়ে সুবর্ণ যে সব ভুলে যাচ্ছে!

ভাগবান, সুবর্ণ তোমার কাছে কি দোষ করেছিল যে এত কষ্ট দিচ্ছ তাকে? রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে কি তোমাকে নমস্কার করেনি? রোজ ইস্কুলে গিয়ে 'প্রার্থনা' করেনি?...রাত্তিরে শুতে যাবার সময় কি বলেনি, 'ঠাকুর, বিদ্যে দিও, বুদ্ধি দিও, সুমতি দিও'!

যা যা শিখিয়েছিল মা, সবই তো করেছে সুবর্ণ, তবে কেন এত শাস্তি দিচ্ছ সুবর্ণকে ?

কেন ? কেন ? কেন ?

ওই 'কেন'র ঝড় থেকে বালিকা সুবর্ণ হারিয়ে যাচ্ছে, তার খোলস থেকে যুবতী সুবর্ণ জন্ম নিচ্ছে, তবু সেই 'কেন'টা ধূসর হয়ে যাচ্ছে না। সে যেন আরো তীব্র হয়ে উঠছে।

আমি কি এত পাজী হতে চাই ?···আমি কি গুরুজনদের মুখের উপর চোপা করতে ভালবাসি ? আমি কি বুঝতে পারি না, আমি চোপা করি বলেই আমার ওপর আক্রোশ করে করেই ওরা আমাকে আরো বেশি বেশি কষ্ট দেয় ?

কিন্তু কি করবো ?

এত নিষ্ঠুরতা আমি সহ্য করতে পারি না, সহ্য করতে পারি না এত অসভ্যতা। আমার ওই বর, ও কেন এত বিচ্ছিরি ? এর থেকে ও যদি খুব কালো আর কুচ্ছিত দেখতে হতো, তাও আমার ছিল ভালো। কিন্তু তা হয়নি। ওর বাইরের চেহারাটা দিব্যি সুন্দর, অথচ মনের ভেতরটা কালো কুচ্ছিত বিচ্ছিরি!···ও মিছিমিছি করে আমাকে বলেছিল, লুকিয়ে আমাকে আমার বাপেরবাড়ি নিয়ে যাবে। সেই কথা বিশ্বাস করে ওকে ভালবেসেছিলাম আমি, ভক্তি করেছিলাম, ওর সব কথা রেখেছিলাম।—খারাপ বিচ্ছিরি সব কথা!—কিন্তু ওর কথা ও রাখেনি। রোজ ভুলিয়ে ভুলিয়ে শেষ অবধি একদিন হা-হা করে হেসে বলেছিল, 'ও বাবা, একবার গিয়ে পড়লে কি আর তুমি আসতে চাইবে ? নির্ঘাত সেখানে থেকে যাবে। এমন পরীর মতন বৌটি আমি হারাতে চাই না বাবা!'

কত দিব্যি গাললাম যে আবার ফিরে আসবো, তবু বিশ্বাস করল না।

ও আমায় বিশ্বাস করে না, আমিও ওকে বিশ্বাস করি না। ও নাকি আমায় ভালবাসে' বলে তো তাই সব সময়, কিন্তু—ভগবান, আমার অপরাধ নিও না, আমি ওকে ভালবাসি না। ওকে ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর সঙ্গে একবিন্দু মিল নেই আমার।

তবু চিরদিন ওর সঙ্গে ঘর করতে হবে আমায়!

•

···আজ আবার সেই হলো!

আজ আবার ওরা ছোড়দাকে তাড়িয়ে দিল!

আমার সঙ্গে দেখা করতে দিল না।

দাদার বিয়েতে নাকি ঘটা করেনি বাবা, মা চলে গেছে বলে নমো নমো করে সেরেছে। দাদার মেয়ের 'মুখেভাতে' একটু ঘটা করবে। তাই ছোড়দা আমায় নিতে এসেছিল। বাবা নাকি অনেক মিনতি করে চিঠি লিখে দিয়েছিল ওর হাতে। ওরা সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছে, ছোড়দাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি।

বলেছে, 'ছেলের বিয়ে শুনলাম না, নাতনীর ভাত! এমন উনচুটে বাড়িতে আমাদের ঘরের বৌ যাবে না।'

ছোড়দা নাকি ভয় করেনি, ছোড়দা নাকি এ বাড়ির সেজ ছেলের মুখের ওপর চোটপাট শুনিয়ে দিয়ে গেছে। নাকি বলেছে, 'আপনাদের মত লোকের জেল হওয়া উচিত।'

এ বাড়ির সেজ ছেলে সেই অপমান সহ্য করবে?

উল্টো অপমান করবে না? করবে না গালমন্দ?

তবু তো এ বাড়ির মেজ ছেলে তখন বাড়ি ছিল না, থাকলে ছোড়দার কপালে আরো কি ঘটতো কে জানে।

বাড়ি ফিরে শুনে তো অদৃশ্য লোকটাকেই—এই মারে তো সেই মারে। বলে কি, 'শুধু চলে যেতে বললি? ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে পারলি না শালাকে?'

আমি যখন রাগে ঘেন্নায় কথা বলিনি ওর সঙ্গে, তখন হ্যা-হ্যা করে হেসে বললো, 'শালাকে শালা বলবো না তো কি বেয়াই বলবো?' হ্যাঁ, আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'তোমার ভাইদের মান আছে, আমার ভাইয়ের মান নেই?'

সেই শুনে এমনি হাসি হেসেছিল ও, আমি কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সবাইকে ডেকে বলেছিল, 'আরে শুনেছ, শালাকে নাকি সম্মান করা উচিত ছিল আমার! পাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া উচিত ছিল!'

ঠিক আছে, ভগবান যখন আমাকে এই নিষ্ঠুর আর অসভ্যদের কাছেই রেখে দিয়েছে, তখন তাই থাকবো। আর যেতে চাইব না এ বাড়ির বাইরে। ভুলে যাব আমারও মা ছিল, বাপ ছিল, ভাই ছিল, বাড়ি ছিল। ওদের বাড়ি থেকে বেরোবো একেবারে নিমতলাঘাটের উদ্দেশ্যে।

তাই, তাই হোক।

মরেই দেখিয়ে দেব, আটকে রাখবে বললেই আটকে রাখা যায় না।

কিন্তু শুধু কি এইসব কথাই লিখেছে সুবর্ণ তার স্মৃতিকথায়?

সুবর্ণ যেন ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেওয়া খাতাখানার পাতাগুলোর মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে!···

সুবর্ণ দেখতে পাচ্ছে, সিঁড়ির ঘুলঘুলি থেকে বেরিয়ে আসছে একটা বই, তার সঙ্গে মিষ্টি একটু কথা। মানুষটাকে দেখা যায় না, শোনা যায় শুধু কথা! হাসি-হাসি গলার ঝঙ্কার।

'এই নে, এ বইটা আর তোকে ফেরত দিতে হবে না। তুই পদ্য পড়তে ভালবাসিস শুনে তোর ভাসুর তো মোহিত। বলেছে, এটা তুমি উপহার দিও বন্ধুকে।'

পৃথিবীতে এই মানুষও আছে ভগবান !

তবে তোমার উপর রাগ করে কি করবো ?

'আমার ভাগ্য।' এ ছাড়া বলার কিছু নেই।

কিন্তু কী বই দিল জয়াদি ?

এ কী জিনিস !

মানুষে এমন লিখতে পারে ?

এ যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়বার, লোককে ডেকে ডেকে শোনাবার।

এ কি সেই কবির কথা ? না আমার কথা ?

এ যে আমি মনে মনে পড়ে মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারছি না গো—

'আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান।
না জানি কেমনে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।'

এর কোন্ লাইনটাকে বেশি ভাল বলবো আমি, কোন্ লাইনটাকে নয় ?

'জাগিয়া উঠিছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠিছে বারি।
প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর—'

এ পদ্য আমি সবটা মুখস্থ করবো।

আমি ওদের সংসারের জ্বালায় আর কষ্টবোধ করবো না। ওরা যা চায় তাই করে দিয়ে নিজের মনে এই বই নিয়ে বসবো। আরো যে সব পদ্য আছে, সব শিখে ফেলবো।

জয়াদি দেবী, তাই এই স্বর্গের স্বাদ এনে দিল আমায়। জয়াদির স্বামী দেবতা, তাই তাঁর মনে পড়েছে আমি পদ্য ভালবাসি। ভগবান, ওঁদের বাঁচিয়ে রাখো, সুখে রাখো।

'আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর—'

এর সব কথা আমার, সব কথা আমার জন্যে লেখা !

'কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন
চারিদিকে তার বাঁধন কেন ?
ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন···
সাধ রে আজিকে প্রাণের সাধন—'

উঃ কী চমৎকার, কী অপূর্ব! আমি কি করবো!

'স্বর্গ' বলে কি সত্যিই কোন রাজ্যপাট আছে? সত্যিই মাটি থেকে অনেক উঁচুতে মেঘেরও ওপরে সেই জগৎ, যেখানে দুঃখ নেই, শোক নেই, অভাব নেই, নিরাশা নেই, খলতা-কপটতা নেই, এক কথায় বলতে গেলে এই পৃথিবীর ধুলো-ময়লার কোন কিছুই নেই?

নাকি ওটা শুধুই কবিকল্পনা? আমাদের এই মনের মধ্যেই স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল! এই মনের 'অনুভব'ই পৃথিবীর ধুলোমাটি থেকে অনেক উঁচুতে, মনের যত মেঘ তারও ওপরে উঠে গিয়ে স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছয়?

কে জানে কি! আমার তো মনে হয়, শেষের কথাটাই বুঝি ঠিক। আর উঁচুদরের কবিরা পারেন সেই অনুভবের উঁচুস্বর্গে নিয়ে যেতে। যেখানে গিয়ে পৌঁছলে মনেই পড়ে না পৃথিবীতে দুঃখ আছে, জ্বালা আছে, ধুলো-ময়লা আছে।

শুধু আনন্দ, শুধু আনন্দ!

চোখে জল এসে যাওয়া অন্য এক রকমের আনন্দ।

কিন্তু সব মানুষকে কেন নিয়ে যেতে পারেন না কবিরা? পারেন না বলেই না সেই আনন্দের দেশ থেকে হঠাৎ আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়তে হয়।

অন্তত সেদিনের সেই সংসারবুদ্ধিহীনা বালিকা সুবর্ণলতা তাই পড়েছিল। সেই আছাড খাওয়ার দুঃখে তার বিশ্বাসের মূল যেন আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল। মানুষের ওপর বিশ্বাস, ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস, ভগবানের ওপর বিশ্বাস। সব বিশ্বাস বুঝি শিথিল হয়ে গেল।

সুবর্ণর স্বামী রূঢ় রুক্ষ, সুবর্ণ জানে সে কথা, কিন্তু সে যে এত বেশি নীরেট নির্বোধ, এত বেশি ক্রূর, সে কথা বুঝি জানতো না তখনো।

জানলো, আছাড় খেয়ে জানলো।

এই বহুদূরে এসে সেই সংসারবুদ্ধিহীন আবেগপ্রবণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে করুণা হয় সুবর্ণর, ওর আশাভঙ্গের আর বিশ্বাসভঙ্গের দুঃখে চোখে জল আসে। মেয়েটা যে একদার 'আমি' ভেবে ভেবেও মনে আনতে পারে না।

কিন্তু, ওই 'আমি'টার মত এত ভয়ঙ্কর পরিবর্তনশীল .আর কি আছে? 'আমি'তে 'আমি'তে কী অমিল!

তবু তাকে আমরা 'আমি'ই বলি—

অবোধ সুবর্ণও ভেবেছিল, এই আনন্দের স্বাদ ওকেও বোঝাই। আমার স্বামীকে। তখনো তার ওপর আশা সুবর্ণর।

আশা করেছিল ওরও হয়তো মনের দরজা খুলে যাবে। তাই বলেছিল, 'তোমার খালি "শুয়ে পড়া যাক, শুয়ে পড়া যাক!" বোসো তো একটু, শোনো, কী চমৎকার!—'

হ্যাঁ, প্রদীপটা উস্কে দিয়েছিল, সুবর্ণ তার সামনে ঝুঁকে পড়ে পড়েছিল—

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,
ধরায় আছে যত, মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মম, হাসিছে গলাগলি।'

ও সেই সুবর্ণকে থামিয়ে দিলো, বেজার গলায় বললো, 'জগৎসুদ্ধ সবাই এসে কোলাকুলি করছে? তাই এত ভাল লাগছে? বাঃ বাঃ, বেড়ে চিন্তাটি তো! শত শত মানুষ এসে প্রাণে পড়ছে? তোফা! এমন রসের কাবিতাটি লিখেছেন কোন্ মহাজন?'

সুবর্ণ বলল, 'আঃ থামো না! শেষ অবধি শুনলে বুঝবে—'

আবার পড়তে শুরু করে। পড়ছে,—হঠাৎ ও ফস্ করে বইটা কেড়ে নিল, বলে উঠলো, 'তোফা তোফা! এ যে দেখছি রসের সাগর! কি বললে, "এসেছে সখাসখি, বসেছে চোখাচোখি"? আর যেন কি, "দাঁড়িয়ে মুখোমুখি?"—বলি এসব মাল আমদানি হচ্ছে কোথা থেকে?'···ব্যঙ্গের সুর গেল, ধমক দিয়ে বলে উঠলো, 'কোথা থেকে এল এ বই?'

চোখে জল এসে গেল মেয়েটার, সেটা দেখতে দেবে না, তাই কথার উত্তর দেয় না।

ও বইটা নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল। তারপর সাপের মত হিসহিসিয়ে বলে উঠলো, 'এই যে প্রমাণ-পত্তর তো হাতেই! "প্রাণাধিকা ভগিনী শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবীকে স্নেহোপহার—", বলি এই প্রাণাধিক ভ্রাতাটি কে? কোথা থেকে যোটানো হয়েছে এটিকে?'

লেখাটা যে মেয়েমানুষের হাতের, তা কি ও বুঝতে পারেনি? নিশ্চয় পেরেছিল। সত্যি বেটাছেলে ভাবলে বইটাকে কি আস্ত রাখতো? কুচি কুচি করে ছিঁড়তো, পা দিয়ে মাড়াতো! এ শুধু সুবর্ণকে চারটি বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলে নেবে বলেই ছল করে—

চোখ দিয়ে খুব জল আসছিল, তবু সুবর্ণ জোর করে চোখটা শুকনো রেখেছিল, শক্ত গলায় বলেছিল, 'দেখতেপাচ্ছো না মেয়েমানুষের হাতের লেখা? ও-বাড়ির জয়াদি দিয়েছেন।'

ওর মুখটা শক্ত হয়ে উঠলো, 'ও-বাড়ির জয়াদি মানে? জয়াদিটি কে?'

'জানো না, তোমাদের নতুনদার বৌ! জয়াবতী দেবী।'

'বটে! নতুনদার বৌ! বলি তিনি কি আসা-যাওয়া করছেন নাকি?' আশ্চর্য বেহায়া মানুষ তো! এদিকে জোর তলবে মামলা চলছে, আর ওদিকে তিনি প্রাণাধিকা ভগিনীকে স্নেহ-উপহার ঘুষ দিতে আসছেন!'

আমি সুবর্ণলতা দেবী রেগে গিয়েছিলাম।

আমি বলেছিলাম, 'মামলা ওরা করেনি, তোমরাই করেছ। জানতে বাকি নেই আমার। আর—"ভালবাসা" জিনিসটা জানো না বলেই ঘুষ বলতে ইচ্ছে করছে তোমার!'

'ভালবাসা? ওঃ!' ও বইখানা পাকিয়ে মোচড় দিতে দিতে বললো, 'তুমি যে

জিনিসটা খুব জানো তা আর আমারও জানতে বাকি নেই। যারা আমাদের শত্রুপক্ষ, উনি ঘর-জালানে পর-ভোলানে মেয়ে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে ভালবাসা জমাতে! মাকে বলে দিতে হচ্ছে, ও-বাড়ি থেকে লোকের আসা বন্ধ করছি।'

বলে বইটা নিয়ে নিল ও।

বললো, 'যাক্, আর কাব্যিতে দরকার নেই। এমনিতেই তো সংসারে মন নেই। এসো দিকি এখন—'

বলে প্রদীপটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ঘরটাকে অন্ধকার করে দিল ও।

কিন্তু শুধু কি ঘরটাই অন্ধকার করে দিল?

ন'বছর বয়সে এদের বাড়িতে এসেছিলাম, আর এই তেরো বছর পার করতে চললাম, অনবরত শুনছি 'সংসারে মন নেই'! শাশুড়ী বলেন, তাঁর ছেলে বলেন। দ্যাওররাও তো বলতে ছাড়ে না। কি জানি 'সংসারে মন' কাকে বলে! কাজকর্ম সবই তো করি। আমার গায়ে জোর বেশি বলে তো বেশি বেশিই করি। আর কি করতে হয়? আমার ওই বড়জায়ের মত—সব সময়ে রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে থাকতে পারি না, এই দোষ! তা আর কি করবো?

ও আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু দিদিরই কি সত্যি ভাল লাগে? ওর ইচ্ছে করে না, দোতলায় উঠে আসে, নিজের ঘরে এসে বসে, মেয়েকে দেখে?

করে ইচ্ছে। বুঝতে পারি।

তবু দিদি সুখ্যাতির আশায় ওইরকম রাতদিন নিচের তলায় পড়ে থাকে। কিনা, লোকে বলবে, 'কী লক্ষ্মী বৌ! সংসারে কী মন'!

আচ্ছা, কী লাভ তাতে?

ওই সব স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর লোকেদের মুখের একটু সুখ্যাতি পেয়ে লাভ কি? আর—চিরকালই কি ওরা সুখ্যাতি করে? দিনের পর দিন 'ভাল' হয়ে হয়ে আর খেটে খেটে যে সুনামটুকু হয়, তা তো একদণ্ডেই মুছে যায়। দেখিনি কি? এত কন্না করে দিদি, একদিন দ্বাদশীতে ভোরবেলা উঠে এসে শাশুড়ীকে তেল মাখিয়ে দিতে দেরি করে ফেলেছিল বলে কী লাঞ্ছনাই খেলো! দ্বাদশীতে নাকি নিজে হাতে তেল মাখতে নেই। জানি না, এইসব 'এই করতে নেই, আর ওই করতে নেই'-এর মালা কে গেঁথেছিল বসে বসে।

মাও বলতেন বটে 'করতে নেই'!

সে আর কি, 'বেলা অবধি ঘুমোতে নেই, ইস্কুলের মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই, বড়দের সামনে বেশি কথা বলতে নেই, গরীব মানুষকে তুচ্ছ করতে নেই, ভিখিরিদের তাড়িয়ে দিতে নেই', এইসব। মিষ্টি করে বুঝিয়ে দিতেন মা সেসব।

তার তো তবু মানে আছে।

আর ওদের বাড়িতে?

এদের বাড়িতে যে কী অনাছিষ্টি সব কথা! মানে নেই। শুধু করতে নেই সেটাই জানা। আর বৌ-মানুষদের যে কত-ই নেই!

বৌ-মানুষের তেষ্টা পেতে নেই, খিদে পেতে নেই, ঘুম পেতে নেই, আবার হাসিও পেতে নেই! 'লক্ষ্মী বৌ' নাম নিতে হলে কথাও বলতে নেই। এত সাধনার শেষ মূল্য অথচ শেষ পর্যন্ত ওই। একদিন একটু দোষ করে ফেললেই সেই ছুতোয় চিরদিনের সব নম্বর কাটা!

কী লাভ তবে ওই বৃথা কষ্টে?

আর ওই ভাল হওয়াটা তো মিথ্যে বানানো, বলতে গেলে একরকম ছলনা, হ্যাঁ ছলনাই। আমি যত ভাল নই, ততটা 'ভাল' দেখানো মানেই তো ছলনা। তবে তা দেখাবো কেন আমাকে?

ওসব মিথ্যে আমার ভাল লাগে না।

দিদি অবিশ্যি সত্যিই ভাল মেয়ে। তবু আরো দেখাতে চেষ্টা করে। তাই সেদিন শাশুড়ীর পায়ে ধরে আবার তেল মাখাবার অধিকার অর্জন করে নিয়েছিল।

ওই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত ঘটা দেখলে আমার হাসি পায়। দিদি কেঁদে মরছে দেখে হেসে মরছিলাম আমি। কিন্তু সেদিন?

যেদিন সেই স্বর্গ থেকে আছাড় খেয়ে পড়েছিলাম?

যেদিন নিশ্চিত জেনেছিলাম, আমার স্বামীর সঙ্গে কোনোদিনই মনের মিল হবে না আমার! সেদিন কি হাসতে পেরেছিলাম? ওর বোকামি দেখে, ওর নীরেটত্ব দেখে? পারিনি। রাত্তিরে লুকিয়ে কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছিলাম।

অবশ্য জীবনের এই দীর্ঘপথ পার হয়ে এ জেনেছি, 'মনের মিল' শব্দটা একটা হাস্যকর অর্থহীন শব্দ।

ও হয় না।

মনের মিল হয় না, মনের মত হয় না।

নিজের রক্তে-মাংসে গড়া, নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় গড়া সন্তান, তাই কি মনের মত হয়? হয় না, হয়নি। আমার ছেলেমেয়েরা?

ওরা আমার অচেনা।

শুধু আমার শেষের দিকের তিনটে ছেলেমেয়ে, পারুল, বকুল আর সুবল, যাদের দিকে আমি কোনোদিন ভাল করে তাকাইনি, যাদের 'গড়বার' জন্যে বৃথা চেষ্টা করতে যাইনি, তারাই যেন মাঝে মাঝে আশার আলো দেখায়। মনে হয় ওই দর্জিপাড়ার গলিতে বোধ হয় ওদের শেকড় বসেনি, ওরা স্বতন্ত্র। ওরা নিজের মনে ভাবতে জানে।

তবু ওদের সঙ্গেই কি আমার পরিচয় আছে?

ওরা কি আমার অন্তরঙ্গ?

নাঃ, বরং মনে হয়, ওরা আমাকে এড়ায়, হয়তো বা—হয়তো বা আমাকে ঘেন্না করে।

আর ভয় তো করেই, আমাকে নয়, আমার আচরণকে। ওরা হয়তো আমাকে বুঝতে চেষ্টা করলে বুঝতে পারতো। কিন্তু তা করেনি।

ওরা অনেক দূরের।

তবু ওরা যে ওদের দাদা-দিদির মতন নয়, সেইটুকুই আমার সান্ত্বনা, আমার সুখ।

পারুর মুখে আমি মাঝে মাঝেই আর এক জগতের আলো দেখছি, পারু লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখে এ আমি বুঝতে পারতাম। কিন্তু পারুর জন্যে আমার দুঃখ হয়, পারুর জন্য আমার ভাবনা হয়। বড় বেশি অভিমানী ও। ওর ওই অভিমানের মূল্য কি এই সংসার দেবে? বুঝবে ওর স্বার্থবুদ্ধিহীন কবিমনের মূল্য?

হয়তো আমার মতই যন্ত্রণা পাবে ও। অভিমানের জ্বালাতেই আমি জীর্ণ হলাম।

তবু আমি চিরদিনই প্রতিবাদ করেছি, চেঁচামেচি করেছি, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।

ও তা করবে না।

ও ওর মায়ের মত অসভ্য হবে না, রূঢ় হবে না, সকলের অপ্রিয় হবে না। কারণ ও শান্ত, ও মৃদু, ও সভ্য। ও শুধু অভিমানীই নয়, আত্মাভিমানী। ও ওর প্রাপ্য পাওনা না পেলে নীরবে সে দাবি ত্যাগ করবে, ও অন্যায় দেখলে নিঃশব্দে নিজেকে নির্লিপ্ত করে নেবে। ও অপরকে 'ভালো' করে তোলবার বৃথা চেষ্টা করবে না।

জানি না—পারুকে যার হাতে তুলে দিয়েছি, সে পারুকে বুঝতে চেষ্টা করছে কিনা। ওকে বোঝা শক্ত। নিজের সম্পর্কে ওর ধারণা খুব উঁচু। ও আমার এই শেষদিকের অবহেলার মেয়ে। চাঁপা-চন্নদের মত অত রূপও নেই, বিদুষী হবার সুযোগও পায়নি, তবু নিজেকে ও 'তুচ্ছ' ভাবতে পারে না। ওর এই মনের 'দায়' কে পোহাবে? হয়তো সেই দায় ওকে নিজেকেই পোহাতে হবে। আর সেই ভার পোহাতে পোহাতেই ওর সব সুখ-শান্তি যাবে। নিজেকে বইবার কষ্ট যে কী, সে তো আমি জানি! 'পারুকে আমরা রীতিমত সুপাত্রের হাতে দিতে পেরেছি' এই আমার স্বামীর গর্ব। আরও দু জামাইয়ের থেকে অনেক বিদ্বান আর রোজগারী পারুর বর।

বিদ্বান আর রোজগারী, কুলীন আর বনেদী ঘর, এই তো 'সুপাত্রে'র হিসেব, এই দেখেই তো বিয়ে দেওয়া। কে কবে দেখতে যায়, তার রুচি কি, চিন্তা কি, জীবনের লক্ষ্য কি?

দেখতে যায় না বলেই এত অমিল।

তলায় তলায় এত কান্না!

শুধু যে মেয়েমানুষই কাঁদে তাও তো নয়। পুরুষেও কাঁদে বৈকি। তার অন্তরাত্মা কাঁদে।

সবাই তো সমান নয়, কেউ হয়তো ছোট সুখ, ছোট স্বস্তি, ছোট গণ্ডি, এইতেই পরম সন্তুষ্ট, কারো বা অনেক আশা নিয়ে ছুটোছুটি।

দোষ কাউকেই দেওয়া যায় না।

শুধু ভাগ্যদেবী যখন দুটো দু প্রকৃতির মানুষকে এক ঘানিতে জুড়ে দিয়ে মজা দেখেন, তখনই অশেষ কষ্ট!

আমার স্বামীকে স্বামী পেয়ে সুখী হবার মত মেয়েই কি জগতে ছিল না!

অথচ তারা হয়তো উদার, হৃদয়বান, পণ্ডিত স্বামীর হাতে পড়ে, সে স্বামীকে অতিষ্ঠ করে মারছে।

বিরাজের কথাই ধরি না।

বিরাজ তো তার ভাইদের মতই স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচিত্ত, পরশ্রীকাতর' আর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, অথচ তার স্বামী কত ভাল, কত উদার, কত ভদ্র!

বিরাজ মৃতবৎসা।

ডাক্তারে বলেছে এটা বিরাজেরই দেহের ত্রুটি, 'বু বিরাজ তার স্বামীকেই দোষ দেয়, স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করে। বিরাজকে নিয়ে ঠাকুরজামাই চিরদিন দগ্ধাচ্ছে।

প্রকৃতির পার্থক্য! এর বাড়া দুঃখ নেই।

তাই মনে হয়, হয়তো পারুর কপালেও দুঃখ আছে।

কিন্তু বকুল?

বকুল একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির।

বকুল নিজের তুচ্ছতার লজ্জাতেই সদা কুণ্ঠিত। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি ও যেন নিজের জন্মানোর অপরাধেই মরমে মরে আছে। ও যে ওর মায়ের বুড়ো বয়সের মেয়ে, ও যে অনাকাঙ্ক্ষিত, ও যে অবহেলার, ও যে অবান্তর, এই দুঃখময় সত্যটি বুঝে ফেলে, সংসারের কাছে ওর না আছে দাবি, না আছে আশা। তাই এতটুকু পেলেই ও যেন বর্তে যায়। পারুর ঠিক উল্টো।

পারুও মুখ ফুটে কোনদিনই কিছু চায় না, কিন্তু পারুর মুখের ভাবে ফুটে ওঠে, ওর প্রাপ্য ছিল অনেক, শুধু খেলোমি করার রুচি নেই বলেই ও তা নিয়ে কথা বলে না।

আশ্চর্য! একই রক্তমাংসে তৈরি হয়ে, একই ঘরে মানুষ হয়ে, এমন সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি কি করে হয়?

কোথা থেকে আসে নিজস্ব চিন্তা ভাব ইচ্ছে পছন্দ?

অথচ দুই বোনে মনান্তরও নেই কখনো। বেচারী বকুলের যা কিছু কথা, সবই তো তার সেজদির সঙ্গে। আবার পারুলের যা কিছু স্নেহ-মমতা, তা বকুলের ওপর।

মা-বাপের কাছে কোনদিন আশ্রয় পায়নি ওরা, বড় ভাইবোনের কাছে পায়নি প্রশ্রয়, তাই ওরা যেন নিজেদের একটা 'কোটর' তৈরি করে নিয়ে তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল।

সে কোটর থেকে চলে যেতে হয়েছে পারুকে, বকুল একাই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে তার মধ্যে।

তবে পারুর মত নিজের মধ্যেই নিজে মগ্ন নয় বকুল, সকলের সুখবিধানের জন্যে যেন সদা তৎপর।

সংসার জায়গাটা যে নিষ্ঠুর, তা জেনে বুঝেও ও যেন সংসারের ওপর মমতাময়ী। ওর মধ্যে ওর বিধাতা একটি হৃদয় ভরে দিয়েছেন, ছোটবেলা থেকে তার প্রকাশ বোঝা গেছে। ভীতু-ভীতু নীরব প্রকাশ।

ওকে কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলোতে ইচ্ছে হয় আমার। কিন্তু চিরদিনের অনভ্যাসের লজ্জায় পারি না। যদি ও অবাক হয়, যদি ও আড়ষ্ট হয়?

আর সুবল?

সুবলকে ঘিরে পাথরের পাঁচিল!

সুবলের মধ্যে 'বস্তু' আছে, সুবলের মধ্যে হৃদয় আছে, কিন্তু সুবল যেন সেই 'থাকাটুকু' ধরা পড়ে যাবার ভয়ে একটা পাথরের দুর্গ গড়ে তার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে চায়।

হয়তো—

এদের বাড়িতে 'হৃদয়' জিনিসটার চাষ নেই বলেই সেটাকে নিয়ে এত সঙ্কোচ আমার ছোট ছেলের।

কিন্তু সুবল কি এই পৃথিবীর ঝড়-ঝাপটা সয়ে বেশিদিন টিঁকবে? দুর্বল স্বাস্থ্য ক্ষীণ-জীবী এই ছেলেটার দিকে তাকাই আর ভয় বুক কাঁপে আমার। কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা করবো সে উপায় আমার হাতে নেই।

যদি বলি 'সুবল তোর মুখটা লাল লাল দেখাচ্ছে কেন, জ্বর হয়নি তো? দেখি—'

সুবল মুখটা আরো লাল করে বলবে, 'আঃ দেখবার কি আছে? শুধু শুধু জ্বর হতে যাবে কেন?'

যদি বলি, 'বড্ড কাশছিস সুবল, গায়ে একটা মোটা জামা দে!'

সুবল গায়ে পরা পাতলা কামিজটাও খুলে ফেলে শুধু গেঞ্জি পরে বসে থাকবে।

রোগা বলে সুবলের জন্যে একটু বেশি দুধের বরাদ্দ করেছিলাম, তদবধি দুধ একেবারে ত্যাগ করেছে সে। সেবার ভানুকে দিয়ে এক বোতল টনিক আনিয়েছিলাম, বোতলটার

মুখ পর্যন্ত না খুলে যেমনকে তেমন লেপের চালিতে তুলে রেখে দিল সুবল, বললো, 'থাক্, দামী জিনিস উঁচু জায়গায় তোলা থাক্।'

অদ্ভুত এই অকারণ অভিমানের সঙ্গে লড়াই করতে পারি, এমন অস্ত্র আমার হাতে নেই।

আমার বড়জা হলে পারতো হয়তো।

হাউ হাউ করে কাঁদতো, মাথার দিব্যি দিতো, নিজে 'না খেয়ে মরবো'—বলে ভয় দেখাতো! সেই সহজ কৌশলের কাছে প্রতিপক্ষ হার মানতো।

কিন্তু আমি তো আমার বড়জায়ের মত হতে পারলাম না কোনদিন।

সহজ, আর সস্তা।

তা যদি পারতাম, তাহলে জয়াদির ভালবাসার উপহার সেই বইটাকে চিরকালের জন্যে হারাতাম না। চেয়ে-চিন্তে, কেঁদে-কেটে, যেভাবেই হোক আদায় করে নিতাম। কিন্তু আমি তা পারিনি। সেই যে ও কেড়ে নিল, কোথায় লুকিয়ে রাখলো, আমি আর তার কথা উচ্চারণও করলাম না। বুক ফেটে যেতে লাগলো, তবু শক্ত হয়ে থাকলাম। পাছে ও বুঝতে পারে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে আমার বইটার জন্যে, তাই সহজভাবে কথা কইতে লাগলাম। কাজেই ও বাঁচলো।

বইটাই চিরতরে গেল।

চিরটাদিন এই জেদেই অনেক কিছু হারিয়েছি আমি। অনেক অসহ্য কষ্ট সহ্য করেছি। ও আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আমি অগ্রাহ্য করেছি। অন্তত অগ্রাহ্য ভাব দেখিয়েছি।

ভেবেছি গ্রাহ্য করলেই তো ওর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। আমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্য। ও কি আমার মনোভাব বুঝতে পারেনি?

পেরেছে, তাই আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য, আশ্চর্য!

দুই পরম শত্রু বছরের পর বছর একই ঘরে কাটিয়েছি, এক শয্যায় শুয়েছি, এক ডিবেয় পান খেয়েছি, কথা কয়েছি, গল্প করেছি, হেসেওছি।

ওর বেশি অসুখ করলে আমি না খেয়ে না ঘুমিয়ে সেবা করেছি, আমার কোনো অসুখ করলে ও ছটফটিয়ে বেরিয়েছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ও আমাকে, আর আমি ওকে ছোবল দেবার চেষ্টা করে ফিরেছি!

অদ্ভুত এই সম্পর্ক, অদ্ভুত এই জীবন!

দর্জিপাড়ার সেই বাড়িতে আরো তিন-তিন জোড়া স্বামী-স্ত্রী ছিল, জানি না তাদের ভিতরের রহস্য কি?

বাইরে থেকে দেখে তো মনে হতো, ওদের স্ত্রীরা স্বামীদের একান্ত বশীভূত ক্রীতদাসীর মত। স্বামীদের ভয়ে তটস্থ, তাদের কথার প্রতিবাদ করবার কথা ভাবতেও পারে না।

আমার ভাসুর অবশ্য এদের মত নয়, সরল মানুষ, মায়ামমতাওলা মানুষ, কিন্তু দিদির প্রকৃতিই যে ভয় করে মরা! ও জানে শ্বশুরবাড়ির বেড়াল কুকুরটাকে পর্যন্ত ভয় করে চলতে হয়। স্বামীকেও করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!

কিন্তু এদের? সেজ আর ছোটর?

এদের মধ্যে সম্পর্ক যেন প্রভু-ভৃত্যের।

তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, বাইরে থেকে যা দেখতে পাওয়া যায়, সেটাই কি সত্যি? আমার স্বামীকেও তো বাইরে থেকে দেখে লোকে বলে স্ত্রীর 'দাসানুদাস', বলে 'কেনা গোলাম', বলে 'বশংবদ'!

গিরিবালা সাবিত্রীব্রত উদযাপন করলো, গিরিবালা স্বামীর সঙ্গে একত্রে গুরুদীক্ষা নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরোলো। গিরিবালা সেই যাত্রাকালে মেজভাসুরের বাড়ি বেড়াতে এসে গল্প করে গেল, কাশীতে কদিন থাকবে, কদিন বা বৃন্দাবনে, মথুরায়।

গিরিবালার মুখে সৌভাগ্যের গর্ব ঝলসাচ্ছিল।

আমি মূঢ়ের মত তাকিয়ে ছিলাম সেই মুখের দিকে। ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না, এ কী করে সম্ভব! আমার সেজ দ্যাওরকে তো আমি জানি!

চরিত্রদোষের জন্যে খারাপ অসুখ হয়েছিল ওর। এ কথা লুকোছাপা করেও লুকোনো থাকেনি! তাছাড়াও মানুষের শরীরে যত অসৎ বৃত্তি থাকা সম্ভব, যত নীচতা, যত ক্রূরতা, তার কোন্‌টা নেই ওর মধ্যে?

তবু গিরিবালা আহ্লাদে ডগমগ করছে, লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে সৌভাগ্যকে ভোগ করছে।

একে কি 'সত্যি' বলবো?

না এ শুধু মনকে চোখ ঠারা?

কে জানে মন-ঠকানো, না লোক-ঠকানো!

বিন্দু আবার আর এক ধরনের।

ওর রাতদিন কেবল হা-হুতাশ আর আক্ষেপ। ও প্রতিপন্ন করতে চায়, জগতের সেরা দুঃখী ও। যেমন করতে চায় আমার বড়মেয়ে আর মেজমেয়ে, চাঁপা আর চন্নন।

কিন্তু সত্যিই কি ওরা আমার মেয়ে?

ওই চাঁপা আর চন্নন?

আমার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় নিতান্তই দৈব-দুর্ঘটনায় ওরা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার আগে কিছুদিনের জন্যে আমার গর্ভে আশ্রয় নিয়েছিল। ওদের থেকে বুঝি আমার ননদরা আমার অনেক বেশি নিকট।

কিন্তু তার জন্যে আর আক্ষেপ নেই আমার, আক্ষেপ শুধু এই পোড়া বাংলা দেশের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মেয়ের জন্যে। আজও যারা চোখে ঠুলি এঁটে অন্ধ নিয়মের দাসত্ব করে চলেছে।

আজও যারা জানে, তারা শুধু 'মানুষ' নয়, 'মেয়েমানুষ'।

কিন্তু সুবর্ণলতার স্মৃতিকথায় স্থানকালের ধারাবাহিকতা নেই কেন? অতীতে আর বর্তমানে এমন ঘেঁষাঘেঁষি কেন?

অনেক 'সুবর্ণলতা' একসঙ্গে মুখর হয়ে উঠতে চেয়েছে বলে? যে যখন পারছে কথা কয়ে উঠছে?…তাই সূত্র নেই?

গোড়ার দিকে পাতাগুলো তবু ভরাট ভরাট, তারপর সবই যেন খাপছাড়া ভাঙাচোরা!

হঠাৎ লিখে রেখেছে, 'মানুষের ওপর শ্রদ্ধা হারাবো কেন? জগু-বট্‌ঠাকুরকে তো দেখেছি, দেখেছি বড় ননদাইকে, দেখলাম অম্বিকা ঠাকুরপোকে।' আবার তার পরের পাতায় এ কোন্ জনের কথা?

বাবাকে…অপমান করে চলে এলাম! · বাবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু কি করবো? ও ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ছিল না আমার।…

'নিকট জনদের দুঃখের কারণ হবো', এই হয়তো আমার বিধিলিপি।

আমার নিষ্ঠুরতাই দেখতে পাবে সবাই, আমার ফেটে যাওয়া বুকটা কেউ দেখবে না। শুধু জানবে সুবর্ণ কঠোর, সুবর্ণ কঠিন।

জানুক। তাই জানুক।...

ভেবেছিলাম এই অপমানিত জীবনটার শেষ করে দিয়ে এ জন্মের দেনা শোধ করে চলে যাব।

হল না।

ভগবানও আমাকে অপমান করে মজা দেখলেন, যমও আমাকে ঠাট্টা করে গেল! দেখি তবে এর শেষ কোথায়? নিজের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে দেখছি চারদিকে, দেখতে পাচ্ছি শুধু আমি একা নয়, সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটাই একটা অপমানের পঙ্ককুণ্ডে পড়ে ছটফটাচ্ছে! কেউ টের পাচ্ছে, কেউ টের পাচ্ছে না।

কারণ?

কারণ তারা রোজগার করে না, অপরের ভাত খায়। হ্যাঁ, এই একমাত্র কারণ।

আর স্বার্থপর পুরুষজাত সেই অবস্থাকেই কায়েমী রাখতে মেয়েমানুষকে শিক্ষার সুযোগ দেয় না, চোখ-কান ফুটতে দেয় না। দেবে কেন? বিনিমাইনের এমন একটা দিনরাতের চাকরানী পাওয়া যাচ্ছে এমন সুযোগ ছাড়ে কখনো?

পা বেঁধে রেখে বলবো, 'ছি ছি, হাঁটতে পারে না'! চোখ বেঁধে রেখে বলবো, 'রাম রাম, দেখতে পায় না'। আর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে বলবো 'ঠুঁটো, ঠুঁটো'! এ কী কম মজা?

চিরদিন এইরকমই তো করে আসছে পুরুষসমাজ আর সমাজপতিরা।

'মেয়েমানুষ পরচর্চা করে, মেয়েমানুষ কোঁদল করে, আর মেয়েমানুষ ভাত সেদ্ধ করে', এই হলো তোমাদের ভাষায় মেয়েমানুষের বিবরণ। ভেবে দেখ না, আর কোন্ মহৎ কাজ করতে দিয়েছ তোমরা মেয়েমানুষকে?

দেবে না, দিতে পারবে না।

দুবেলা দুমুঠো ভাতের বদলে আস্ত একটা মানুষকে নিয়ে যা খুশি করতে পারার অধিকার, এ কি সোজা সুখ? ওই দুমুঠোর বিনিময়ে সেই মানুষটার দেহ থেকে, মন থেকে, আত্মা থেকে, সব কিছু থেকে খাজনা আদায় করা যাচ্ছে—তার ওপর উপরি পাওনা নিজের নীচতা আর ক্ষুদ্রতা বিস্তার করবার একটা অবারিত ক্ষেত্র।

মেয়েমানুষ যে পুরুষের 'পায়ের বেড়ি' 'গলগ্রহ' 'পিঠের বোঝা', উঠতে বসতে এসব কথা শোনাবার সুখ কোথায় পাবে পুরুষ, মেয়েমানুষ যদি লেখাপড়া শিখে ফেলে নিজের অন্নসংস্থান করতে সক্ষম হয়?

তাই পাঁকের ভরা পূর্ণ আছে।

মুখ্যু, মুখ্যু, বুঝছে না ওই পাঁকে নিজেরাও ডুবছে!

তবু—

বুঝতে একদিন হবেই।

তীব্রদৃষ্টি তীক্ষ্ণকণ্ঠ এক জলন্তদৃষ্টি মেয়ে যেন আঙুল তুলে বলছে, 'এই মেয়েমানুষদের অভিসম্পাত একদিন লাগবে তোমাদের। সেদিন বুঝতে পারবে চিরদিন কারুর চোখ বেঁধে রাখা যায় না। "পতি পরম গুরু"র মন্তর চিরদিন আর চলবে না'।

আরো কত কি যেন বলছে সেই মেয়ে, আগুনঝরা চোখে, রূঢ়কঠিন গলায়, 'প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অত্যাচার অবিচার, এর মাপ হয় না।'

কিন্তু দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর হচ্ছে। সেই অগ্নিমূর্তি মেয়ের এ আবার কোন্ রূপ।

উদাস বিহ্বল স্বপ্নাচ্ছন্ন!

কী বলছে ও?

অদ্ভুত অসম্ভব!

ও না তিন-তিনটে ছেলেমেয়ের মা?

ও কি ভুলে গেছে তাদের কথা? তাই ওই মেঘলা দুপুরে হাতের বইখানা মুড়ে রেখে

স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে ভাবছে, প্রেম, প্রেম! কি জানি কেমন সেই জিনিস, কেমন স্বাদ? সে কি শুধুই নাটক-নভেলের জিনিস? মানুষের জীবনে তার ঠাঁই নেই? প্রেম-ভালবাসা সবই মিথ্যে, অসার?

আমার ইচ্ছে হয় কেউ আমায় ভালবাসুক, আমি কাউকে ভালবাসি।

জানি এসব কথা খুব নিন্দের কথা, তবু চুপি চুপি না বলে পারছি না—

প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হয় আমার।

যে প্রেমের মধ্যে কবিরা জগতের সমস্ত সৌন্দর্য দেখতে পান, যে প্রেমকে নিয়ে জগতের এত কাব্য গান নাটক···

একটা শিশুকে ধরে জোর করে বিয়ে দিলে, আর একটা বালিকাকে ধরে জোর করে 'মা' করে দিলেই তার মনের সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে? যেতে বাধ্য?

॥ আঠারো ॥

বড় ইচ্ছা হচ্ছিল সুবর্ণর, আর একবার জগু-বট্‌ঠাকুরের বাড়িতে বেড়াতে যায়। নিজের চোখে একবার দেখে কেমন করে ছাপা হয়। কেমন করেই বা সেই ছাপা কাগজগুলো মলাট বাঁধাই হয়ে বই আকারে বেরিয়ে আসে আঁট-সাঁট হয়ে।

বই বাঁধাইয়ের কাজও নাকি বাড়িতেই হয় ওঁর, বাড়িতে দপ্তরী বসিয়ে। ঘুঁটে-কয়লা রেখে নিচের তলার যে ঘরখানাকে বাতিলের দরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেটাই জগুর দপ্তরীখানা।

সবই সেদিন মামীশাশুড়ীর কাছে শুনে এসেছে সুবর্ণ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে। কোন কিছু খুঁটিয়ে তো দূরস্থান, জিজ্ঞেস করাই স্বভাব নয় সুবর্ণর, তাই আশ্চর্যই হয়েছিলেন বোধ হয় শ্যামাসুন্দরী, তবু বলেও ছিলেন গুছিয়ে গুছিয়ে কোন্‌খানে কি হয়।

সুবর্ণর প্রাণটা যেন সর্বদাই শতবাহু বাড়িয়ে ছুটে যেতে চায় সেই জায়গাগুলোয়। কি পরম বিস্ময়কর ঘটনাই ঘটছে এখন সেই চিরকালের পরিচিত জীর্ণ বাড়িখানার ভাঙা নোনাধরা বালিখসা দেওয়ালের অন্তরালে! টানবেই তো সেই অলৌকিক স্বর্গলোক সুবর্ণকে, তার সহস্র আকর্ষণ দিয়ে।

তাছাড়া শুধুই যে কেবলমাত্র একবার দেখবার বাসনাতেই তাও ঠিক নয়, কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে ওই 'স্মৃতিকথা'র খাঁজে খাঁজে আরও দু-চার পাতা 'কথা' গুঁজে দিয়ে আসে।

সুখস্মৃতিও আছে বৈকি কিছু কিছু। লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে সেটা।

যেবার সেই প্রথম থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল সুবর্ণ প্রবোধের সঙ্গে—

হ্যাঁ, তেমন অঘটনও ঘটেছিল একবার। সেই যেবার সুরাজ এসে কতদিন যেন ছিল

বাপেরবাড়ি সেবার। বিরাজ বেড়াতে এসে ধরে পড়লো, থিয়েটার দেখাও দিকি মেজদা! সেজদি সেই কোথায় না কোথায় পড়ে থাকে—'

মেজদাকে ধরার উদ্দেশ্য, মেজবৌদির কলকাঠি নাড়ার গুণে ঘটবেই ব্যাপারটা। নচেৎ আর কে এই 'খরচে'র আবদার বহন করবে?

সুবোধের তো সংসার টানতে টানতেই সব যাচ্ছে, সেজদাটি কিপটের রাজা, ছোড়দা তো নিজেই রাতদিন নিজেকে 'গরীব' বলে বাজিয়ে বাজিয়ে সংসার থেকে সব কিছু সুখ-সুবিধে আদায় করে নিচ্ছে। অতএব মেজদা! কর্তব্যপরায়ণা আর চক্ষুলজ্জাবতী মেজবৌদি যার কর্ণধার।

বিরাজের শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল, যাত্রা-থিয়েটার এসব তারা দেখে, বলা বাহুল্য, বৌদেরও দেখায়। কিন্তু কথাটা তো তা নয়। বাপের বাড়িতে এলাম, ভাইয়েরা আদর করলো, এসব দেখানোর সঙ্গে একটা মহৎ সুখ নেই? 'যা করছো, তোমরাই করছো', এমন দৈন্য ভাবটা তা গৌরবের নয়।

তা বোনের সেই আবদার রেখেছিল প্রবোধ, নিয়ে গিয়েছিল দুই বোনকে, আর তার সঙ্গে বৌগুলোকেও। এমন কি উমাশশীও তার হাঁড়ির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্পন্দিত হয়েছিল। দুপুরবেলাই রান্নাবান্না সেরে নিয়েছিল সে—লুচি আলুরদম বেগুনভাজা করে। সুরাজ রাবড়ী আর রসগোল্লা আনিয়েছিল।

অতএব ব্যাপারটায় যেন একটা উৎসবের সমারোহ লেগেছিল।

আর সেদিন যেন প্রবোধকে একটু সভ্য আর ভদ্র মনে হয়েছিল সুবর্ণর। হয়েছিল ভদ্র সেদিন প্রবোধ।

কেন?

কে জানে!

কে জানে সুবর্ণরই ভাগ্যে, না প্রবোধেরই ভাগ্যে! মোট কথা, প্রভাস যখন ওদের বেরোবার প্রাক্কালে বলে উঠেছিল, 'থিয়েটার দেখতে যাওয়া হচ্ছে না থিয়েটার করতে যাওয়া হচ্ছে'? এবং প্রকাশ তাতে 'দোয়ার' দিয়ে আর একটু ব্যাখ্যানা করেছিল, 'যা বললে সেজদা মাইরি, থিয়েটারউলিদের বেহদ্দ হয়ে বেরুচ্ছেন দেখছি বিবিরা—' তখন প্রবোধই ভদ্রকথা বলেছিল। বলেছিল, 'যা মুখে আসে বললেই হল নাকি রে পেকা? গুরু-লঘু জ্ঞান নেই তোদের? এ বা কি, আরো কত কত সেজে আসে মেয়েরা! আর কত বেহায়াপনাই করে! দোতলার জালগুলো তো কেটে 'ওয়ার' করে দিয়েছে ছুঁড়ীরা! এ বাড়ির বৌ-ঝির মতন সভ্য তুই কটা পাবি?'

• সুবর্ণ বিগলিত হয়েছিল সেদিন সেই মহান কথা শুনে। বিনিময়ে তার খাটো ঘোমটার ফাঁক থেকে একটি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিক্ষেপ করেছিল ওই সহসা ভদ্র হয়ে ওঠা স্বামীর

চোখে চোখে। আর সেইদিনই যেন প্রথম মনে পড়েছিল সুবর্ণর, তার স্বামীর রূপ আছে।

রূপ ছিল প্রবোধের, বয়সের তুলনায় এখনও আছে। আর আছে এবং ছিল সাজসজ্জার শৌখিনতা। ঢিলেহাতা গিলেকরা পাঞ্জাবি পরেছিল সেদিন প্রবোধ, পরেছিল চুনট-করা ফরাসডাঙা ধুতি, কানে আতরমাখা তুলো, মাথায় পরিপাটি টেরি। যদিও পুরুষমানুষের এত সাজ হাসির চোখেই দেখতো সুবর্ণ, তবু সেদিন যখন সুরাজ বলেছিল, 'বাবাঃ, মেজদার কী বাহার গো, যেন বিয়ে করতে যাচ্ছে!' আর তার মেজদা হেসে বলে উঠেছিল, 'থাম্ তো পোড়ারমুখী, ভারি ফক্কড় হয়েছিস', তখন সত্যি বলতে বেশ ভালই লেগেছিল সুবর্ণর সেই হাসিটুকু।

হয়তো প্রবোধের সেদিন মেজাজ শরীফ ছিল ওই নারীবাহিনীতে দ্বিতীয় আর কোনো পুরুষ ছিল না বলে, আর কোনো 'লোভী চক্ষু' তার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তিটির ওপর দৃষ্টি দিচ্ছিল না, অতএব—

তাছাড়া নিজে খরচখরচা করে গাড়িভাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে এদের, এর মধ্যে একটা আত্মপ্রসাদের সুখও ছিল। তাই সেদিন উদার হয়েছিল প্রবোধ, সভ্য হয়েছিল, সুন্দর হয়েছিল।

তাই সুবর্ণর সেদিনের স্মৃতিকথা পরিচ্ছন্ন করে মাজা একটি গ্লাসে এক গ্লাস জলের মত স্নিগ্ধ শীতল।

তা সেই জলের কথাটাও না হয় থাকুক সুবর্ণর আগুনের অক্ষরের পাশে পাশে। নইলে হয়তো বিধাতার কাছে অকৃতজ্ঞতা হবে। একটি সন্ধ্যাও তো তিনি সুধায় ভরে দিয়েছিলেন!

মূল বইটা ছিল 'বিল্বমঙ্গল', তার আগে কি যেন একটা হাসির নাটক ছিল ছোট্ট একটুখানি। নাম মনে নেই, কিন্তু পাঁচ ননদ-ভাজে মিলে যে হাসতে হাসতে গড়িয়েছিল তা মনে আছে।

তারপর 'বিল্বমঙ্গল'! প্রেম আর ভক্তির যুগপৎ আবেগে গড়া সেই নাটক অশ্রুর মালা ঝরিয়েছিল চোখ দিয়ে। হাসি ও অশ্রুতে গড়া সেই সন্ধ্যাটির প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রতিটি শব্দও যেন জীবন্ত হয়ে আছে।

শ্বশুরবাড়ি থেকে একটা কায়দা শিখেছিল বিরাজ, থিয়েটারে আসতে কৌটো ভর্তি-ভর্তি পান সেজে আনতে হয়। পান খাবে মুঠো মুঠো, আর 'ড্রপসিন' পড়ার অবকাশকালে লেমনেড খাবে, কুলপি খাবে, ঠোঙা ঠোঙা খাবার খাবে, তবে না থিয়েটার দেখা?

তা করেছিল এসব প্রবোধ।

একদিনের রাজা হয়ে মেজাজটাই রাজসই হয়ে গিয়েছিল তার।

নিচে থেকে ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল শালপাতার ঠোঙা ভর্তি হিঙের কচুরি, আলুর দম, খাস্তা গজা আর অমৃতি এবং পাঁচ বোতল লেমনেড।

উমাশশী বার বার বলেছিল, 'ওমা, বাড়িতে যে ছিষ্টি রেঁধে বেড়ে রেখে আসা হয়েছে গো—এখন এইসব এত খাওয়া!'

বিরাজ বলেছিল, 'ভয় নেই গো বড়গিন্নী, সে সবও উঠবে। ফুর্তির চোটে পেটে ডবল খিদে।'

আশ্চর্য, সুবর্ণরও সেদিন ওই নেহাৎ মোটা কৌতুকের কথাগুলোও দিব্যি উপভোগ্য মনে হয়েছিল, খেয়েছিল। সকলের সঙ্গে, আর কখনো যা করেনি তাই করেছিল, মুঠোভর্তি পান খেয়েছিল।

প্রথমে খেতে চায়নি, সুরাজই জোর করেছিল, 'খাও না বাবা একটা, জাত যাবে না।' কেয়া খয়ের, জৈত্রি-জায়ফল, অনেক কিছু দিয়ে নবাবী পান বানিয়ে এনেছে বিরাজবালা—

'তবে দাও তোমাদের নবাবী পান একটা, দেখি খেয়ে বেগম বনে যাই কি না—', বলে হেসে একটা পান নিয়েছিল সুবর্ণ। তার পরই কেমন ভাল লেগে গেল, পর পর খেয়ে নিল অনেকগুলো। তারপর ঝাঁক ঝাঁক লেমনেড্। তার স্বাদটা কি লেগে আছে গলায়?

থিয়েটারের সেই ঝিটার ভাঙা কাঁসরের মত গলার স্বরটা যেন হঠাৎ সেই দূর অতীত থেকে এসে আছড়ে পড়ল—'দর্জিপাড়ার সুবোধবাবুর বাড়ি গো'—'দর্জিপাড়ার সুবোধবাবুর পেবোবাবুর বাড়ি গো'!

অভ্যাসবশত প্রথমে দাদার নামটা বলে ফেলে শেষে আবার নিজের নামটাও গুঁজে দিতে সাধ হয়েছিল প্রবোধের।

....

থিয়েটার দেখা হলো, খাওয়া-দাওয়া হলো, শেষ অবধি আবার ঘোড়ার গাড়িতে উঠে ও হাতে হাতে একটা 'অবাক জলপানে'র খিলি গুঁজে দিয়ে, গাড়ির মাথায় উঠে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসলো প্রবোধ, নেহাৎই উমাশশী গাড়িতে আসীন বলে। তবু বিরাজ যখন বলে উঠলো, 'যাই বল বাপু, মেজদার সঙ্গে বেরিয়ে সুখ আছে,' তখন বড়-ভাজের উপস্থিতি ভুলে বলেই ফেলল প্রবোধ, 'সুখ না দিয়ে রক্ষে আছে? মহারাণীর মেজাজ তা হলে সপ্তমে উঠবে না?'

থিয়েটার কি আর কখনো দেখেনি তারপর সুবর্ণ?

দেখেছে বৈকি। দেখেনি বললে পাতক। কিন্তু সে আস্বাদ আর আসেনি। দেখেছে মানে 'দেখিয়েছে'। যখনই ননদরা এসেছে, গেছে, অথবা কাউকে আদর জানানোর প্রয়োজন পড়েছে, 'থিয়েটার দেখানো' হয়েছে। আর কে সেই দায় নেবে সুবর্ণ ছাড়া?

অতএব মাঝে মাঝে নিজেকেও যেতে হয়েছে তাদের সঙ্গে।

একবার তো 'প্রহ্লাদ চরিত' দেখাতে মুক্তকেশী এবং তস্য সখী হেমাঙ্গিনীকে নিয়েও যেতে হয়েছিল! আর সঙ্গে ছিল সুশীলা এবং প্রবোধ।

মা, মাসী, দিদির সঙ্গে বৌকে নিয়েছিল প্রবোধ। এ বেহায়াপনাটুকু করেছিল সে। সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে অতক্ষণের জন্যে রেখে যেতে যেন মন সায় দেয় না! তাস খেলতে খেলতে তবু এক-আধবার ছুতো করে উঠে এসে দেখে যাওয়া যায়, এতে তো সে উপায়ও নেই। অতএব চক্ষুলজ্জার দায়মুক্ত হওয়াই শ্রেয়।

পাঁচজনকে অবশ্য শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে হয়েছে, 'মা তো জানেই না কোথায় বসতে হয়, কখন উঠে আসতে হয়। মেজবৌ তবু ওতে পোক্ত।'

সুবর্ণ অবশ্য এই একা সুযোগ নেওয়ার পক্ষপাতী নয়, কিন্তু ইদানীং সেজবাবু ছোটবাবু তাঁদের বৌদের হ্যাংলার মত অপরের পয়সায় থিয়েটার দেখতে যাওয়ায় মানের হানি বোধ করছিলেন, তাই নানা অজুহাত দেখিয়েছেন তাঁরা। আর উমাশশীর তো 'সংসারের অসুবিধে' ভাবলেই মাথায় আকাশ ভাঙে।

তাই ইদানীং যা যাওয়া হয়েছে, যেন কর্তব্য করতে। সেই প্রথমদিনের উচ্ছল আনন্দ অনুপস্থিত থেকেছে। সেদিনটি আছে সোনার অক্ষরে লেখা।···

কারণ—কারণ সে সন্ধ্যার রাত্রিটাও হয়েছিল বড় সুন্দর। সুরাজ বলেছিল, 'আজ রাতটা আমরা ননদ-ভাজে গল্প করে কাটাবো ঠিক করেছি মেজদা, তোমার ঘরেই আমাদের স্থিতি। তুমি বাপু কেটে পড়। শুয়ে পড়গে ও-ঘরে।'

আর আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রবোধ জ্বলে ওঠেনি, কটু কিছু বলে ওঠেনি, এবং কলে-কৌশলে শেষ অবধি সুবর্ণকে কবলিত করবার চেষ্টা করেনি। বরং একটা হাই তুলে বলেছিল, 'গল্প করে রাত জাগবি কি বল? এতক্ষণ থিয়েটার দেখে এসে? আমার তো ঘুমে শরীর ভেঙে আসছে।'

আর তারপর হঠাৎ একটু হেসে উঠে বলেছিল, 'আর যা নাটক দেখে এলাম বাবা, মনে হচ্ছে স্ত্রী-পুত্রের ওপর এতটা আসক্তি না রেখে ভগবান-টগবানের কথাই ভাবা উচিত।'

'ওরে বাস্, একেবারে কা তব কান্তা কস্তে পুত্র?' অনুচ্চ হাসি হেসে বলে উঠেছিল সুবর্ণ, আর প্রবোধ অলক্ষ্যে তার পিঠে একটা চিমটি কেটে সত্যই চলে গিয়েছিল শয়নকক্ষের দুরন্ত আকর্ষণ ত্যাগ করে।······

কী মুক্তি!

কী মুক্তির আস্বাদ!

সুবর্ণর বিবাহিত জীবনের মধ্যে সে মুক্তির স্বাদ আর কবে এসেছে তার আগে অথবা পরে?

কবে এমন স্বেচ্ছায় দাবি ত্যাগ করে ঘুমোতে চলে গেছে প্রবোধ? কাজের বাড়িটাড়িতে অসুবিধেয় পড়ে ঘরের অকুলান হলে গজরেছে, ছুতো করে এসে আগে-ভাগে শুয়ে থেকেছে।

যারা গল্প করে রাত কাটাবে বলে আহ্লাদ জানিয়েছিল, তারা তো তখুনি গড়াগড়ি। সুবর্ণ ঘুমোয়নি সে রাতে। এই মধুর অবকাশটুকু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছিল। আর অদ্ভুত একটা কাজ করে বসেছিল সে সেই রাতে।

সেই প্রথম।

হ্যাঁ, সেই প্রথম একটা পদ্য লিখে ফেলেছিল সুবর্ণ।

এখন অবশ্য সে পদ্য ভাবলে হাসি পায়, তবু সেই তো প্রথম! পুরনো পচা একখানা খাতার হলদে হয়ে যাওয়া পৃষ্ঠায় আজও আছে সেটা। ছিঁড়ে ফেলে দিতে মায়া হয়েছে।......

এবং আশ্চর্য, আজও মুখস্থ আছে সেটা!

কালটা তো আগের, ভাষাটাও অতএব তদ্রূপ! কিন্তু সেদিন সেই কবিতা লিখে ফেলে কী অপূর্ব পুলক স্বাদে ভরে গিয়েছিল মন! মনে হয়েছিল কবিদের মতই তো হয়েছে ঠিক। ওঁরাও কি এই রকমেরই লেখেন না?

অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশেতে থাকি,
পৃথিবীর পানে কি গো মেলে থাকে আঁখি?
দেখিলে দেখিতে পাবে তারই দিকে চেয়ে,
জাগিয়া কাটায় এক পৃথিবীর মেয়ে।
পিঞ্জরের পাখীসম বন্দী তার প্রাণ,
ঊর্ধ্ব আকাশেতে যেন কি করে সন্ধান!
কিন্তু হায় কাটে সুর, ভেঙে যায় মন,
রুদ্ধ করি দিতে হয় মুক্ত বাতায়ন।
নিষ্ঠুরা পৃথিবী আর প্রভাত নিষ্ঠুর।
নিশীথের সব স্বপ্ন করে দেয় চুর।
জেগে ওঠে শত চক্ষু, আসে দুঃখ গ্লানি,
নীরবে ঘোরাতে হয় নিত্যকার ঘানি।

তা এই সেকেলে ভাষার পদ্যকে আর একালের খাতায় স্থান দেবার বাসনা নেই, কিন্তু সেই দিনটাকে ঠাঁই দিতে ইচ্ছে করে।

জীবনের প্রথম পদ্য লেখার দিন।

সেই দিনটির পুলক-স্বাদ নিয়ে খানিকটা লিখে ফেলে।

আর একবার মামী-শাশুড়ীর বাড়ি যাবার সংকল্প স্থির করেছিলো সুবর্ণ, তবু হচ্ছেও না যেন।

কারুরই কিছু মনে করবার কথা নয়, মা একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়ির ঝিয়ের

সঙ্গে কোথাও যাচ্ছে, এতে আর এখন অবাক হয় না সুবর্ণর ছেলেমেয়েরা। মুক্তকেশীর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধকার্যের ব্যাপারে ওটা হঠাৎ কেমন চালু হয়ে গেছে। কিন্তু সুবর্ণলতার কেন মনে হচ্ছে ওরা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ভাববে, হঠাৎ মামীশাশুড়ীর ওপর এত ভক্তির হেতু? এই তো সেদিন গেলেন!

যাই যাই করেও তাই দিন গড়ায়।

॥ উনিশ ॥

কিন্তু সুবর্ণলতার স্মৃতির পৃষ্ঠায় 'কবিতা লেখার দিনে'র স্মৃতি আর কই? তার পাতায় পাতায় খাঁচার পাখীর ডানা ঝটপটানির শব্দটাই তো প্রখর!

তবে তাকে তার সেই স্মৃতির জানলা থেকে—কবিতা পড়তে দেখতে পাওয়া যায়। কে জানে কোথা থেকে সংগ্রহ করে, আর কেমন করেই বা পায় ছাড়পত্র, তবু দেখা যায়, যে বাড়িতে ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক আর 'নূতন পঞ্জিকা' ছাড়া আর কোনো বই আসত না, সে বাড়িতে কোণের দিকের একটা ঘরে খাটের তলায়, দেয়াল-আলমারিতে, জানলা-দরজার মাথার তাকে তাকে থাকে-থাকে জমে ওঠে বই, কাগজ, পত্রপত্রিকা।

হয়তো ঘরের প্রকৃত মালিক শাসন করে করে 'এলে' গিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। নইলে কিশোরী সুবর্ণলতার স্মৃতির ইতিহাসে তার বই কেড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়া, ছিঁড়ে ফেলা, পুড়িয়ে দেওয়া, সব কিছুর নজিরই তো আছে! শাসনকর্তা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়েছে। অথবা হয়তো দেখেছে, এতেই পাখীটা ঝটপটায় কম।

আরও পাখী তো আছে এ-বাড়ির খাঁচায়, কই তারা তো এমন করে না! বরং তারা আড়ালে বলাবলি করে, 'ধন্যি বেহায়া মেয়েমানুষ বাবা, এত অপমানের পরও আবার সেই কাজ! আমরা হলে বোধ হয় জীবনে আর ও বস্তু আঙুলের আগা দিয়েও ছুঁতাম না। আর মেজবাবুরও হচ্ছে মুখেই মর্দানী। বজ্রআঁটুনি ফস্কা গেরো!'

সুবর্ণলতা তার 'আড়ালে'র কথা টের পায় না। সুবর্ণলতা তার আপন আবেগ আর অনুভূতির পরিমণ্ডলে বিরাজ করে। তাকে বেহায়া বল বেহায়া, অবোধ বল অবোধ।

তা হয়তো এক হিসেবে অবোধই।

নইলে উমাশশীদের কাছেও এক-একসময় ছুটে যায় সে এক-একটা নতুন অনুভূতির আবেগ নিয়ে! হয়তো শীতের দুপুরে উমাশশী রোদে বসে বড়ি দিচ্ছে, গিরিবালা পশমের রং মিলিয়ে 'খুঞ্চেপোষ' বুনছে, আর বিন্দু রোদেই একটু গড়িয়ে নেবে বলে মাদুর বিছোচ্ছে, সুবর্ণ সেখানে যেন আছড়ে এসে পড়ে। উত্তেজিত আরক্ত মুখ আরো লালচে করে বলে, 'দিদি, জীবনভোর শুধু বড়িই দিলে, জানলে না এ জগতের কোথায় কি আছে।

শোনো, শোনো একবার, পুরুষ কবি কেমন করে ফুটিয়ে তুলেছেন মেয়েমনের কষ্ট-দুঃখু।' বলে, কিন্তু চেয়ে দেখে না, ওরা "জগতের কোথায় কি আছে" জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাচ্ছে, না পরস্পর কৌতুকদৃষ্টির বিনিময় করছে। কৌতুক তো করেই তারা সুবর্ণকে নিয়ে। ওটি যে একদিকে যেমন তেজী অহঙ্কারী আস্পদ্দাবাজ, আর একদিকে তেমনি বদ্ধ পাগল! হাসবে না ওকে নিয়ে?

ওরা সুবর্ণর ওই ছেলেদের পড়া মুখস্থর মতন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পদ্য পড়া দেখলে হাসে। বদ্ধ পাগলটা অবশ্য ততক্ষণে শুরু করে দিয়েছে—

'বেলা যে পড়ে এল জল্‌কে চল্!
পুরনো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে—'

আবেগে থরথর করে গলা, চোখ দিয়ে অসতর্কে কখন জল গড়িয়ে পড়ে। আর ভাবে, পদ্য না বুঝুক, প্রাণ নিংড়ানো ওই মর্মকথাটুকু তো ওদের মর্মে গিয়ে পৌঁচচ্ছে।....বেচারীরা চোখ বুজে দিন কাটাচ্ছে, হঠাৎ হয়তো এতেই চোখ ফুটে যাবে। বুঝতে পারবে 'এই প্রাণপাত করে সংসার করা, ওই ভয়ে সশঙ্কিত হয়ে থাকা' সব বৃথা, এখানে আমাদের কেউ 'আপন' ভাবে না। এখানে সবাই আমরা—

'ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি
পরখ্ করে সবে করে না স্নেহ।'

আর এও বুঝুক, জগতে এমন হৃদয়বান মহৎ পুরুষও আছেন, যিনি নিরুপায় মেয়েমানুষের এই যন্ত্রণা অনুভব করেন, তাকে ব্যক্ত করবার ভাষা যোগান। আশ্চর্য, আশ্চর্য! কি করে জানলেন রবিঠাকুর—

'এখানে মিছে কাঁদা
দেওয়ালে পেয়ে বাধা,
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।'

কি করে টের পেলেন—

'সবার মাঝে আমি
ফিরি একেলা,
কেমন করে কাটে
সারাটি বেলা,
ইটের পরে ইট,
মাঝে মানুষ-কীট,
নাহিক ভালবাসা
নাহিক খেলা।'

এমন স্পষ্ট করে বলাও বুঝতে পারবে না চিরবন্দিনী উমাশশী? বুঝতে পেরে ভাববে না—'আমাদের এই যে অবস্থা, তা তো কই আগে জানতাম না? কি অন্ধই ছিলাম!'

ওদের চোখ খুলতে বসে সুবর্ণ, আর হঠাৎ একসময় নিজেরই চোখ খুলে যায় ওর। গিরিবালা সহসা শশব্যস্তে বলে ওঠে, 'গল্পটাকে একটু খাটো করো মেজদি, নিচে যেন কার চটির শব্দ পেলাম, ছোট্‌ঠাকুরপো এলেন বোধ হয়!'

আর সেই বলে ওঠার ঢিল খেয়ে চমকে তাকিয়ে উঠে দেখে সুবর্ণ, উমাশশীর ইত্যবসরে ঢু'কুলো বড়ি দেওয়া হয়ে গেছে, আর বিন্দু ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছে।

'মর, চটির শব্দে কান খাড়া করেই মর তোমরা! জেলখানাই সুখের সাগর তোমাদের—', বলে রাগ করে উঠে যায় সুবর্ণ, আর নিজের ঘরে বসে বইটা মুড়ে রেখে মৃদু আবেগে বলে, 'কোথায় আছিস তুই কোথায় মা গো, কেমনে ভুলিয়া আছিস হাঁ গো– '

ফোঁটা ফোঁটা করে জল গড়িয়ে পড়ে বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে।

এমন ঘটনা কতদিনই ঘটে।

প্রবোধ প্রায়ই ভারী থমথমে অন্য জগতে হারিয়ে-যাওয়া-মন স্ত্রীকেই কাছে পায়।

কাজেই দোষ দেওয়া যায় না তাকে যদি সে বলে, 'এই এক রবিঠাকুর হয়েছেন দেশের মাথাটা খাবার জন্যে! মেয়েমানুষগুলো যাবে এবার উচ্ছন্নে! সেই যে বলে না—

"পদ্ম গেল পটল গেল গুগ্‌লি হল আঁখি,
আর শালিক গেল ফিঙে গেল আরশোলা হল পাখী!"

হেম বাঁড়ুয্যে, ঈশ্বর গুপ্ত তো ছার—তোমার মতে বোধ হয় তোমার ওই রবিঠাকুর মাইকেলের চেয়েও বড় কবি?'

সুবর্ণ মাথা তুলে ওই বিদ্রূপমাখা মুখের দিকে তাকায়, আর তারপর হিন্দু নারীর ঐতিহ্য সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'তোমাদের মত মুখ্যুদের কাছে আমি কিছুই বলতে চাই না।'

কিন্তু এসব কবেকার কথা?

খাঁচার পাখীর এই ডানা ঝটপটানির কাহিনী!

এসব তো সুবর্ণলতার বহু পুরনো কথা।

যেসব কথা খাতায় লিখতে গেলে মূল্যহীন, বিবর্ণ, একঘেয়ে। তাই খাতায় তোলা হয় না, শুধু স্মৃতির ঘরের চাবিটা খুললেই একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায় অনেকে, হুড়মুড়িয়ে একাকার হয়ে।

কিন্তু খাঁচার পাখীর ডানা ঝটপটানোর বাইরের বৃহৎ পৃথিবী তো স্থির হয়ে থাকে না।

খাঁচার পাখী আকাশের দিকে চোখ মেলে আর্তনাদ করে, পাখীর মালিক খাঁচার শিক শক্ত করতে চেষ্টা করে, বৃহৎ পৃথিবী তাকে উপহাস করে এগিয়ে যায়, আকাশকে হাতের মুঠোয় ভরে ফেলবার দুঃসাহসে হাত বাড়ায় ···কবিরা শিল্পীরা নিঃশব্দে আপন মনে অচলায়তন ভাঙার কাজ করে চলে, বিচারকের মন সশব্দ প্রতিবাদ তোলে, শিকলদেবীর পূজার বেদীতে শাবল গাঁইতির ঘা পড়ে, তার মধ্য দিয়ে সমাজ-মন অবিরাম ভাঙা-গড়ার পথে দ্রুত ধাবিত হতে থাকে।

তাই সহসা একদিন সচকিত হয়ে দেখা যায় কখন কোন্ ফাঁকে অবরোধের বজ্রমুষ্টি যেন শিথিল হয়ে এসেছে, অবগুণ্ঠন হ্রস্ব হয়ে গেছে, রাজরাস্তাটা যে একা পুরুষের কেনা জায়গা নয়, সেটা ওই স্বল্লাবগুণ্ঠিতারা যে বুঝে ফেলেছে, ওদের চোখে-মুখে আচারে-আচরণে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

আর কতকগুলো দুঃসাহসী মেয়ে, ইতিমধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই রাস্তায়। তারা পিকেটিং করছে, মার খাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে। আসমুদ্রহিমাচল একটি নামে স্পন্দিত হচ্ছে, একটি কণ্ঠের ডাকে ছুটে আসছে।

সে নাম 'গান্ধীজী'।

সে ডাক 'একলা চল রে'।

কবির ভাষা প্রেমিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে!

দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক!'

দর্জিপাড়ার গলিও বুঝি আর চোখে ঠুলি এঁটে থাকছে না। সেখানেও নাকি ছেলেরা বলছে 'বিলিতি সাবান মাখা হবে না আর' এবং বিন্দু আর গিরিবালা নাকি বিলিতি নুন আর চিনি বাতিল করে 'কর্কচ' আর 'দোলো' খাচ্ছে, এবং বাজার থেকে বিলিতি কুমড়ো, বিলিতি আমড়া, আর বিলিতি বেগুন আনা নিষেধ করে দিয়েছে।

আবাল-বৃদ্ধ বনিতা, ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষর সবাই এক কথা কইছে, কেউ আর এখন বলছে না 'রাজত্বটা বৃটিশের'। সবাই বুঝে ফেলেছে ওরা অন্যায় করে দখল করে আছে, অতএব ন্যায়ের দখল নিতে হবে। সবাই জেনে গেছে মহাত্মা গান্ধী 'স্বরাজ' এনে দেবেন।

'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান'—এ হয়তো তাদেরই রক্তে-ভেজা মাটির ফসল। তারা বীজ পুঁতে রেখে গেছে। এখন এসেছে আর এক মালী তাতে জল দিতে।

ফল?

খাবে দেশের লোক। খেলো বলে!

সন্ত ফল যে হাতে হাতেই মিলবে। যারা পুলিসের গুঁতো খাচ্ছে, বুটের ঠোক্কর খাচ্ছে, জেলের ভাত খাচ্ছে, তারা কষ্টের শেষের পুরস্কার খাবে সেই ফল।

কিন্তু সুবর্ণলতার মনের মধ্যে কেন তেমন সাড়া নেই? যে সুবর্ণলতা স্বদেশীর নামে টগবগিয়ে ফুটতো, সে কেন স্বরাজের ব্যাপারে এমন মিইয়ে আছে?

দেশে যখন নিত্য-নতুন ঢেউ আসছে, যখন কুলভাঙা প্লাবন আসছে, প্রবোধের তো তখন সর্বদা সশঙ্কিত অবস্থা। আর বুঝি রাখা যাবে না ওকে গৃহ-কোটরে। হঠাৎ কোনদিন শুনবে, মেয়ে দুটোকে নিয়ে পিকেটিং করতে বেরিয়ে গেছে সুবর্ণলতা লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে।

কিন্তু কই? তেমন উন্মাদনা কই?

কানু যেদিন একটা চরকা কিনে বললো 'মা, বাজে গাল-গল্পে দিন না কাটিয়ে এবার প্রতিটি মিনিট সুতো কাটতে হবে, এই চরকা-কাটা সুতোয় কাপড় বুনিয়ে পরতে হবে সবাইকে', সেদিন তো কই সুবর্ণ ওই নতুন জিনিসটার ওপর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল না? বলল না, তোকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করি কানু, আমার মনের মত কাজ করলি তুই!'

না, সে কথা বলল না সুবর্ণ, শুধু একটু হেসে বললো, 'গাল-গল্প আবার কে করছে রে এত?'

'আহা, গাল-গল্প না হোক, নাটক-নভেল পাঠ। একই কথা! মোট কথা সময়ের অপচয়। আর অপচয় করা চলবে না।'

'চলবে না বুঝি?' আরও একটু হেসেছিল সুবর্ণ, 'তবে চরকাটাই চালা। তোদেরই এখন সামনে সময়। আমার তো এখন সময়ের সম্বল সব পেছনে ফেলে চলে আসা জীবন।'

'চমৎকার! কত কত আশী-নব্বুই বছরের বুড়ো-বুড়ী চরকা কাটছে তা জানো? রাস্তায়-চলা-মানুষ পর্যন্ত তকলি কাটতে কাটতে চলেছে।'

'তা চলতেই পারে। যখন যা ফ্যাশান ওঠে!'

'ফ্যাশান। একে ফ্যাশান বলছো তুমি?'

কানু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল!

এমন কি কানুর বাবাও।

সুবর্ণর মুখে একথা অভাবনীয় বৈকি।

সাধে কি প্রবোধ এই অদ্ভুত 'উল্টো-পাল্টা' কে নিয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরলো চিরদিন?

কানু মাকে অনেক ধিক্কার দিয়েছিল।

বলেছিল, 'স্বরাজ অমনি আসবে না। তার জন্যে ক্লেশ চাই, দুঃখ চাই!'

মুক্তকেশীর নাতি, প্রবোধের বংশধর, বলেছিল একথা উত্তেজিত গলায়।

অতএব বলতেই হবে, দেশের মজা নদীতে বান ডেকেছিল। তথাপি সুবর্ণ উত্তেজিত হয়নি। সুবর্ণ আবার হেসে উঠে বলেছিল, 'তা তোর এই সুতো কাটার মধ্যে ক্লেশই বা কই? দুঃখই বা কই? আর গেরস্তঘরের মেয়ে-মানুষের অবসরই বা কই?'

কানু আরও জ্বলেছিল।

আর একবার নাটক-নভেলের খোঁটা দিয়েছিল, সুবর্ণলতার দু-দুটো বড় হয়ে ওঠা মেয়ে কি রাজকার্য করে তার হিসেব চেয়েছিল। হ্যাঁ, দুটো মেয়ের কথাই তুলেছিল কানু— তখনো পারুর ঘরবসত হয়নি, আর কানুর বিয়ে হয়নি।

কানুর বিয়ে লাগলো ওই চরকার ঢেউটা একটু কমলে। অনেকের বাড়িতেই তখন আধভাঙা চরকাটা ছাতের সিঁড়িতে কি চিলেকোঠায় আশ্রয় পেয়েছে। শুধু কারুর কারুর দেওয়ালে চরকা-কাটা-রত গৃহিণীর বা বধূর ফটোটি ঝুলছে উজ্জ্বল মহিমায়।

তা সে যাই হোক—পারুল বকুলের কথা তুলেও মাকে নোয়াতে পারেনি কানু। সুবর্ণ বলেছিল, 'সে ওদের নিজের থেকে ইচ্ছে হয়, প্রেরণা আসে, করবে ওরা। আমি হুকুম দিতে যাব কেন? বিশেষ করে আমার যাতে বিশ্বাস আসছে না!'

তা হলেই বল উল্টোপাল্টা কিনা?

দু-পাঁচটা ছেলে ঘরে বসে দুটো হাতবোমা বানিয়ে আর পুলিস মেরে দুর্ধর্ষ বৃটিশের গোলা-বারুদের শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলবে এ বিশ্বাস তোমার ছিল, আর এতে তোমার বিশ্বাস নেই?

তা কানুর রাগের মানে অবশ্যই আছে।

সুবর্ণর ভুল।

কোনোটাই নিরর্থক নয়। কোনো প্রাপ্তিই হঠাৎ আসে না। কাজ চলে নানা চিন্তায়, নানা হাতে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই তো পরমকে পাওয়া যায়।

কিন্তু একবগ্গা সুবর্ণ বলে, 'পরমকে পেতে হলে চরম মূল্য দিতে হয়।'

অথচ ওই চরমটা যে কি সেকথা বলে না। হয়তো সে ধারণাও ওর নেই। শুধু একটি 'বড় বড় কথা বলনেওয়ালা ভাবের ফানুস' বৈ তো নয়!

তবে মোটের মাথায় দেখা গিয়েছে, সুবর্ণ এতখানি সুবর্ণ-সুযোগেও রাজপথে নামেনি। রাজপথের কলকোলাহলের দিকে দর্শকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছে শুধু।

তবে বিদেশী জিনিস বর্জন?

সে তো বহুকাল আগে থেকেই হয়ে আসছে। ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় মেনেই নিয়েছে সবাই সুবর্ণলতার এই জবরদস্তি। হয়তো বা রাগারাগি কেলেঙ্কারির ভয়েই। ঘরে পরে কাউকেই তো রেয়াৎ করে না সুবর্ণ!

এ পাড়ায় বাড়ি করবার সময় থেকেই পাশের বাড়ির পরিমলবাবুদের সঙ্গে ভাব। পরিমলবাবুর স্ত্রী সর্বদা আগবাড়িয়ে এসে নতুন-আসা পড়শীদের সুবিধে-অসুবিধে দেখেছেন। বলতে গেলে, আত্মীয়ের মতন হয়ে গেছেন। তবু একদিন পরিমলবাবুর স্ত্রী যখন বেড়াতে এসে বলেছিলেন, 'দিশী দেশলাই দেখেছ বকুলের মা? দেখে আর হেসে বাঁচি না। জ্বলবার

আগেই নিভছে। একটা উনুন জ্বালতে একটা দেশলাই লাগবে। বিলিতির সঙ্গে আর পাল্লা দিতে হয় না বাবা কিছুর।'

তখন সুবর্ণ ফস্ করে বিলিতি দেশলাই কাঠির মত জ্বলে উঠে বলেছিল, 'এসব গল্প আমার কাছে করবেন না দিদি, আমার শুনতে খারাপ লাগে।'

পরিমলবাবুর স্ত্রী মানুষ ভাল, তবে মাটির মানুষ তো নয়? অতএব হয়ে গিয়েছিল বিচ্ছেদ।

অনেকদিন লেগেছিল মনের সেই মালিন্য ঘুচতে। বোধ করি ছেলেমেয়েদের কারো বিয়ে উপলক্ষেই আবার আসা-যাওয়ার পথে পুনর্মিলন। তাছাড়া পরিমলবাবুর ছেলে সুনির্মল তো কোনোদিনই ওসব মনোমালিন্যের ধার ধারে নি। ঘরের ছেলের মত এসেছে, বসেছে, খেয়েছে।

সেই আসা-যাওয়ার অন্তরালে—

কিন্তু সেকথা থাক।

॥ কুড়ি ॥

সুবর্ণর অগাধ সমুদ্রের এক অঞ্জলি জল, অগাধ স্মৃতিকথার একমুঠো কথা, এবার আলোর মুখ দেখবে। তাই সুবর্ণলতা মর্মরিত হচ্ছে। তাই সুবর্ণ তাকিয়ে দেখছে না তার অন্তঃপুরে লোকাচারবিধির সমস্ত অনুশাসনগুলি নির্ভুল পালিত হচ্ছে কিনা।

এখন সুবর্ণ অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তার সেই 'প্রথম কবিতার দিনটি'র কাহিনীখানি অক্ষরের বন্ধনে বন্দী করে নিয়ে একবার মামীশাশুড়ীর বাড়ি যাবার জন্যে স্পন্দিত হচ্ছিল।……

তাই ছেলেকে ডেকে বলছিল, 'সুবল, একখানা গাড়ি ডেকে এনে দিতে পারবে?'

তা এই রকমই কথা সুবর্ণর।

'সুবল, একটা গাড়ি ডেকে এনে দে' না বলে 'এনে দিতে পারবে'?

মা-ছেলের সহজ সম্বন্ধের ধারার মধ্যে যেন দূরত্বের পাথর পড়ে আছে চাঁই চাঁই, তাই জলটা বয়ে যায় ঘোরা পথে।

কে জানে এই পাথরটা কার রাখা?

মায়ের না ছেলের?

সুবলও তো বলল না, 'কী আশ্চর্য, পারব না কেন? যাবে কোথায়? চল পৌঁছে দিচ্ছি গিয়ে।'

সুবল শুধু যান্ত্রিক গলায় উচ্চারণ করলো, 'কখন দরকার?'

সুবর্ণলতা আহত দৃষ্টিতে তাকায়।

সুবর্ণলতা যেন বড় অপমান বোধ করে।

সুবর্ণলতা তো জানে, ওর এই ছোট ছেলেটার ভিতরে হৃদয় আছে। তবে সুবর্ণলতার বেলায় কেন সে হৃদয়ের এতটা কার্পণ্য ? যেন চেষ্টা করে হৃদয়টাকে শক্ত মুঠোয় আটকে রাখে সুবর্ণলতার ছোট ছেলে। কিছুতেই যাতে না অসতর্কে একটু স্খলিত হয়ে পড়ে।

আশ্চর্য।

'মা' বলে কতদিন ডাকেনি সুবল ?

ইচ্ছে করে না এই কাঠিন্যের সামনে এসে কোনো আবেদন করতে। তবু এক-আধসময় উপায়ও তো থাকে না। একা একটা ভাড়াটে গাড়ি করে এবাড়ি-ওবাড়ি করার সাহসটাই তো অসমসাহসিকতা। তবু সে সাহস দেখায় সুবর্ণ, দুটো শ্বশুরবাড়ি একাই যাওয়া-আসা করে। তাই বলে পথে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে গাড়ি ধরে নিয়ে যাওয়া তো চলে না ? সেটা যেন সাহস নয়, অসভ্যতা। অন্তত সুবর্ণর মাপকাঠিতে।

সুবল না হোক, অন্য ছেলেরা এই নিয়ে শোনাতে ছাড়ে না। বলে, 'আর গাড়ি ডেকে দেওয়ার "ফার্স" কেন বাবা ? বেশ তো স্বাধীন হয়েছ, যাও না, বেরিয়ে পড়ে ডেকে নাওগে না একখানা।'

বলে আরো বৌদের কাছে তীক্ষ্ণ হুল খেয়ে।

বৌদের একা এক পা বেরোবার হুকুম নেই, অথচ শাশুড়ী দিব্বি—

তা সুবল কিছু শোনাল না। শুধু বললো' 'কখন দরকার ?'

সুবর্ণও অতএব সেই যান্ত্রিক গলাতেই উত্তর দেয়, 'এখনই দরকার। তা নইলে বলতে আসবো কেন ? ঝি আসেনি এখনো—'

কথা শেষ হয় না, হঠাৎ বুকটা ধড়াস করে ওঠে সুবর্ণর।

নিচে ও কার গলা ?

জগু-বট্‌ঠাকুরের না ?

কেন ?

এমন অসময়ে কেন উনি ?

তবে কি বলতে এসেছেন ও বই উনি ছাপতে পারবেন না ?

পড়ে কি বিরক্ত হয়েছেন ?

অবাক হয়েছেন সুবর্ণর নির্লজ্জতায় ?

কিন্তু সেই নির্লজ্জতার বিস্ময়ে অমন গলা ছেড়ে বাদ-বিতণ্ডা করবেন ?

কার সঙ্গে করছেন ?

একটা হিন্দুস্থানীর গলা না ?

গাড়োয়ান ? পয়সা নিয়ে কচকচি করছেন ?

আর বেশিক্ষণ ভাবতে হয় না।

ছাপাখানার মালিক জগন্নাথচন্দ্রের হেঁড়ে গলা আকাশে ওঠে, 'সুবল, কই রে সুবল? এই যে বৌমা, তুমিই এসে গেছ! তোমার বই এনে দিলাম। পাঁচশ' কপি ছাপিয়েছি বুঝেছ? প্রথম বই, বিয়ের পত্তর মত বিলোবে তো চাট্টি? বেশি থাকাই ভাল। মুটে ব্যাটা কি কম শয়তান? ওই কখানা বই এপাড়া-ওপাড়া করতে কিনা ছ পয়সা চায়। চার পয়সার বেশি হওয়া উচিত? বল তো বৌমা? রাগ করে দু আনিটাই ছুঁড়ে দিলাম। বলি "নে ব্যাটা, পান খেগে যা"।'

এই বাক্যস্রোতের মাঝখানে বকুল এসে নীরবে জ্যাঠাকে প্রণাম করে, তাদের জগু-জ্যাঠামশাইয়ের এমন অসময়ে আবির্ভাবের কারণ ঠিক অনুধাবন করতে পারে না। সঙ্গে ওগুলোই বা কি?

তা জগু কাউকে বেশিক্ষণ অন্ধকারে ফেলে রাখেন না। সহর্ষে বলেন, 'এই যে তোমাদের মা'র বই হয়ে গেছে। নাও এখন বন্ধুবান্ধবকে বিলোও। সার্থক মা তোমাদের, লোকের কাছে বলতে কইতে মুখ উজ্জ্বল! ছাপাখানার লোকেরা তো শুনে তাজ্জব।'

বলা বাহুল্য, বকুল এর বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারে না।

মা'র বই! সেটা আবার কি জিনিস!

তাই অবাক হয়ে মা'র মুখের দিকে তাকায়।

বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সুবর্ণও!

বই ছাপা হয়ে গেছে!

ছাপা এত শীগ্‌গির হয়!

নতুন পরিচ্ছেদটা আর দেওয়া গেল না তাহলে? না যাক্! কিন্তু কোথায় বই? ওই ঝুড়িটায়? যে ঝুড়িটা সিঁড়ির তলায় বসানো রয়েছে?

পুরনো খবরের কাগজে মোড়া দড়িবাঁধা স্তূপীকৃত কতকগুলো প্যাকেটভর্তি মস্ত ঝুড়িটা জগন্নাথচন্দ্র এবার টেনে সামনে নিয়ে আসেন।

একটা অপ্রত্যাশিত স্তব্ধতায় আবহাওয়াটা যেন নিথর হয়ে গেছে।

মোটাবুদ্ধি জগন্নাথও যেন টের পান, কোথায় একটা সুর কেটে গেছে। ভাদ্রবৌ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে পুলক প্রকাশ করবে না সত্যি, তবু ভাবে-ভঙ্গীতে তো বোঝা যাবে!

যেদিন সুবর্ণ খাতাখানা নিয়ে ছাপার কথা বলতে গিয়েছিল, সেদিনও কিছু আর ভাদ্রবৌয়ের রীতি পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। আহ্লাদের একটি প্রতিমূর্তি দেখিয়েছিল মানুষটাকে।

আর এখন?

যেন হঠাৎ সাপে কেটেছে!

ঘোমটা তো দীর্ঘ নয় ও-বাড়ির বৌদের মত, মুখ দেখতেই পাওয়া যায়।

অপ্রতিভের মত এদিক-ওদিক তাকান জগন্নাথ, তারপর শুকনো-শুকনো গলায় বলেন, 'বাবা বাড়ি নেই ?'

বকুল আস্তে বলে, 'না, পাশের বাড়ি দাবা খেলতে গেছেন।'

অন্যদিন হলে নির্ঘাত জগন্নাথ সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে বলে উঠতেন, 'গেছে তো জানি। চিরকেলে নেশা। কথায় আছে, তাস দাবা পাশা, তিন সর্বনাশা! আর ভায়া আমার ওই তিনটিতেই ডুবে আছেন।'

কিন্তু আজ আর জগন্নাথের বাক্‌স্ফূর্তি হয় না, 'আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি, আমি এখন যাচ্ছি।' চটিটা পায়ে গলান।

আর এতক্ষণে সুবর্ণ মাথায় ঘোমটা টানে। আঁচলটা গলায় দিয়ে আস্তে পায়ের কাছে একটি প্রণাম করে।

'থাক্ থাক্, হয়েছে হয়েছে—', বলে চলে যান জগু।

আর পথে বেরিয়ে ভাবতে ভাবতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছান—আর কিছু নয়, অতি আহ্লাদ! কথাতেই আছে, 'অল্প সুখে হাস্যমুখে নানা কথা কয়, বেশি সুখে চোখে জল—চুপ করে রয়'।

আর বকুলটা ?

ও বেচারা হক্‌চকিয়ে গেছে আর কি!

বোঝাই যাচ্ছে বাড়িতে কিছু জানাননি বৌমা।

আহ্লাদে নিশ্চিন্ততায় এবার জোরে জোরে পা ফেলেন জগু 'ওঃ, প্রবোধচন্দ্র এসে চোখ কপালে তুলবেন! সাতপুরুষে কেউ কখনো বই লেখেনি, লিখল কিনা ঘরের বৌ!'

মাকে গিয়ে বলতে হবে, 'বুঝলে মা, আহ্লাদে তোমার মেজবৌমার আর মুখ দিয়ে কথা সরে না!'

তা প্রবোধচন্দ্রের প্রথমটা চোখ কপালে উঠেছিল বৈকি।

তারপরই বাড়িতে উঠলো হাসির হুল্লোড়।

ছেলেরা বোধ করি এমন হৈ-চৈ করে হাসাহাসি করেনি বহুকাল। 'বাবা' বলে ডেকে কথাই বা কয় করে ?

'বাবা, মা'র বই। জগু-জ্যাঠামশাইয়ের ছাপাখানার মাল। দেখো দেখো। উঃ!'

প্রবোধ আকাশ থেকে পড়ে, 'মা'র বই! তার মানে ?'

'তার মানে ? মানে হচ্ছে, আমরা তো কেউ কখনো মা'র কিছু করলাম না, তাই মা নিজেই হাল ধরেছিলেন, চুপি চুপি জগু-জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি গিয়ে ছাপতে দিয়ে এসেছিলেন। সেই "বই" ছেপে এসেছে।'

প্রবোধ মেয়েদের মত গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে, 'বলিস কি রে ভানু, এ যে সত্যি সেই কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থ লেখা সাধ! তোদের গর্ভধারিণীর একেবারে গ্রন্থকার হবার বাসনা!'

'হুঁ!' ভানু হেসে হেসে ফর ফর করে বইয়ের পাতাগুলো উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আহা! গ্রন্থই বটে! গ্রন্থের নমুনাটি লোককে দেখাবার মত!'

তা হাসাটা নেহাৎ অপরাধ নয় ভানুর, 'সুবর্ণলতার স্মৃতিকথা'র নমুনা দেখলে কে-ই বা না হেসে থাকতে পারতো?

মোটাবুদ্ধি জগন্নাথচন্দ্র 'পয়সায় দুখানা বর্ণপরিচয়ে'র কাগজে বই ছেপে দিয়েছেন সুবর্ণলতার, ভাঙা টাইপ আর পুরু কালি দিয়ে। অবশ্য সেটা ঠিক জগুর দোষ নয়, জগুর ছাপাখানার দোষ। অথবা সুবর্ণলতার ভাগ্যেরই দোষ।

বই দেখে পর্যন্ত বুঝি সুবর্ণ তার ভাগ্যের স্বরূপটা স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে। নাঃ, আর কোনো সংশয় নেই, আর কারো দোষ নেই, সবটাই সুবর্ণলতার ভাগ্যের দোষ।

শুধুই কাগজ? শুধুই মুদ্রাযন্ত্রের প্রমাদ?

মুদ্রাকরের প্রমাদ নেই?

যা নাকি ছুরির মত বুকে এসে বিঁধছে!

রসিয়ে রসিয়ে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আগেই পড়া হয়ে গিয়েছিল, আর একবার পড়া হতে থাকে বাপের সামনে, 'শুনুন বাবা, শুনে যান। এই অপূর্ব প্রেস, আর এই অপূর্ব প্রুফরীডার নিয়ে ব্যবসা চালান জগু-জ্যাঠামশাই! নামধাম কিছু নেই বইয়ের, বই ছাপা হয়েছে নাম হয়নি! প্রথমেই শুরু শুনুন, ভূমিকা—"আমি একটি নিপুরায় বঙ্গনাড়ি, আমার একমাত্র পরিচয় আমি একটি অপ্তপুরির মেজবৌ। আমার—"

প্রবোধ হঠাৎ প্রায় ধমকে ওঠে, 'ও আবার কি রকম পড়া হচ্ছে? কী ভাষা ওসব?'

'বাংলা ভাষাই। যা লেখা আছে তাই পড়ছি। আরো নমুনা আছে দেখুন না।' কৌতুকের হাসিতে চঞ্চল দ্রুতকণ্ঠে পড়তে থাকে ভানু, 'আমার মন আচে, বুদ্দি আচে, মস্তিষ্ক আচে, আত্মা আচে, কিন্তু কেহ আমার সত্মাকে শীকার করে না। আমি যে—'

খুক খুক করে একটু হাসির শব্দ শোনা যায়। বৌয়েরা হাসছে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে। ভানুর ভঙ্গীতেও যে হাসির খোরাক!

কিন্তু হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটে যায়।

একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।

কোথায় ছিল সুবর্ণলতা, অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বিয়ে-হয়ে-যাওয়া মস্ত বড় ছেলের ওপর।

ব্যাঘ্রীর মতই একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যায় সুবর্ণলতার গলা থেকে। বইখানা কেড়ে নিয়ে কুচিকুচি করছে।

বহুকাল আগের মত আবার একদিন ছাদে আগুন জ্বললো। সুবর্ণলতার গোলাপী রঙের বাড়ির ছাদে।…না, যত উদভ্রান্তই হোক সে, তদ্দণ্ডেই বাড়ির যেখানে-সেখানে আগুন জ্বেলে একটা অগ্নিকাণ্ড করে বসেনি।

ধীরে-সুস্থে সময় নিয়ে জ্বালিয়েছে আগুন, অনেক সময় নিয়ে।

'পয়সায় দুখানা বর্ণপরিচয়'-এর কাগজে ছাপা, তেমনি মলাটেই বাঁধাই, পাঁচশোখানা বই পুড়ে ছাই হতে এতক্ষণ লাগলো? না, সেগুলো বেশী সময় নেয়নি। সময় নিয়ে আর চোখ-জ্বালানো ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করে যেগুলো পুড়লো, সেগুলো হচ্ছে অনেক কালের হলদে হয়ে যাওয়া পাতা, আর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কালিতে লেখা অনেকগুলো খাতা। সদ্য কেনা নতুন চকচকে মলাটের খাতা! খাতার রাশি!

ধ্বংস হয়ে গেল আজীবনের সঞ্চয়, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরকালের গোপন ভালবাসার ধনগুলি। সুবর্ণলতার আর কোনো খাতা রইল না।

যে খাতাগুলি দীর্ঘকালের সঙ্গী ছিল, তিলে তিলে ভরে উঠেছিল বহু সুখ-দুঃখের অনুভূতির সম্বলে! লোকচক্ষুর অন্তরালে কত সাবধানেই লেখা আর তাদের রাখা! এক-একখানি খাতা সংগ্রহের পিছনেই ছিল কত আগ্রহ, কত ব্যাকুলতা, কত চেষ্টা, আর কত রোমাঞ্চময় গোপনতার ইতিহাস!

হাতের পয়সার অভাব তার কখনই ছিল না একথা সত্যি, উমাশশীর মত বিন্দুর মত দুঃখময় 'শূন্যহাতে'র অভিজ্ঞতা কদাচ না, প্রবোধের ভালবাসার প্রকাশই ছিল 'খরচ কোরো' বলে কিছু টাকাপয়সা হাতে গুঁজে দেওয়া। কিন্তু দেওয়াটা লোকের চোখের আড়ালে হলেও, সেই 'খরচ'টা তো আড়াল দিয়ে হওয়া সম্ভব ছিল না? সুবর্ণ তো আর নিজে দোকানে যাবে না?

কাউকে দিয়ে আনানো?

তা সদর রাস্তার পথ ধরে যে বেরোবে আর ঢুকবে সে মশা-মাছি হয়ে করবে না সেই কাজটা? প্রথমবার যখন সুবর্ণ অবোধ ছিল, অতএব অসতর্কও ছিল, দুলোকে আনতে দিয়েছিল মলাট-বাঁধানো খাতা একখানা। সহস্র 'কথা'র জনক হলো সেই খাতা।

'কেন, কি দরকার, এমন দামী আর শৌখিন খাতা কোন্ কাজে লাগবে, পয়সা থাকলে ধোপা-গয়লার হিসেবও তাহলে চার আনা ছ আনার খাতায় ওঠে' ইত্যাদি।

সেই থেকে সাবধান হয়ে গিয়েছিল সুবর্ণ।

গোপনতা সে ভালবাসে না। কিন্তু এমন উদ্‌ঘাটিত হতেও ভাল লাগে না। তাই ঘরের জানলা থেকে পাশের বাড়ির একটা ছোট ছেলের হাতে সুকৌশলে খাতার পয়সা এবং তার ঘুড়ি-লাট্টুর পয়সা চালান করে করে মাঝে মাঝে খাতা আনাতো। বাঁধানো রুলটানা খাতা।

লোকচক্ষুর অগোচরে আনিয়েছে তাদের মালিক, লোকচক্ষুর অন্তরালেই রেখে দিয়েছে। লালন করেছে হৃদয়রস দিয়ে, পুষ্ট করছে জীবন-বেদনার আবেগ দিয়ে।

কতদিন কত নিভৃতক্ষণে ভালবাসার হাতে হাত বুলিয়েছে তাদের গায়ে, ভালবাসার চোখে তাকিয়েছে। যেন তারা শুধু প্রাণতুল্য কোনো বস্তুই নয়, প্রাণাধিক কোনো জীবন্ত প্রিয়জন।

সেই তাদের অহঙ্কার হলো, আলোর মুখ দেখতে চাইল তারা!

অন্ধকারের জীব তোরা, কিনা আলোর মুখ দেখবার বাসনা? অতএব পেতে হলো সেই দুঃসহ স্পর্ধার শাস্তি!

সেই ভালবাসার হাতই তাদের গায়ে আগুন লাগালো, সেই ভালবাসার চোখই নিষ্পলকে বসে বসে দেখল তাদের ভস্ম হয়ে যাওয়া!

ছাতের সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল সুবর্ণ, ভেবেছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী না থাকে।

কিন্তু সিঁড়ির ওই দরজাটার ছিটকিনি আল্‌গা ছিল, দরজাটা ধরে টানতেই খুলে গিয়েছিল। তাই—রয়ে গেল একজন সাক্ষী।

হঠাৎ স্তব্ধ দুপুরে কাগজ-পোড়া-গন্ধে আশঙ্কিত হয়ে এঘর-ওঘর দেখে ছুটে ছাতে উঠে এসেছিল সে।

দরজাটা টেনে খুলেছিল, আর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল!

ওখানটায় চিলেকোঠার দেওয়ালের ছায়া পড়েছিল, তাই এই প্রচণ্ড রোদের মাঝখানেও সুবর্ণর মুখে আগুনের আভার ঝলক দেখা যাচ্ছিল। সেই আভায় চিরপরিচিত মুখটা যেন অদ্ভুত একটা অপরিচয়ের প্রাচীর নিয়ে স্থির হয়ে ছিল।

কিন্তু ওই অপরিচিত মুখটার প্রত্যেকটি রেখায় রেখায় ও কিসের ইতিহাস আঁকা?

জীবনব্যাপী দুঃসহ সংগ্রামের?

না পরাজিত সৈনিকেব হতাশার, ব্যর্থতাব, আত্মধিক্কারের?

কে জানে কি!

যে দেখেছিল, তার কি ওই রেখার ভাষা পড়বার ক্ষমতা ছিল?

হয়তো ছিল না। তাই মুহূর্তকাল বিহ্বল বিচলিত দৃষ্টি মেলে দেখেই ভয় পাওয়ার মত ছুটে পালিয়ে এসেছিল সিঁড়ি বেয়ে।

তারপর?

তারপর সেই হত্যাকাণ্ডের দর্শক এক নতুন চেতনার অথৈ সমুদ্রে হাতড়ে বেড়িয়েছে সেই রেখার ভাষার পাঠোদ্ধারের আশায়।

অজ্ঞাতে কখন তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে, মনে মনে উচ্চারণ করেছে সে, 'চিরদিন তোমাকে ভুল বুঝে এসেছি আমরা, তাই অবিচার করেছি।'

তারপর? তারপর এল এক নতুন ঢেউ।

॥ একুশ ॥

ঢেউটা আনলেন জয়াবতী।

সুবর্ণলতার সঙ্গে যাঁর চিরকালের সখীত্ব বন্ধন।

নিত্য দেখা হয় তা নয়, চিঠিপত্রের সেতু রচনা করেই যে হৃদয়ের আদানপ্রদান বজায় তাও নয়, অথচ আছে সেই বন্ধন অটুট অক্ষয়। সেই শৈশবের মতই নির্মল, উজ্জ্বল, স্নেহ আর সম্ভ্রমের সীমারেখায় সুন্দর।

জয়াবতী এখানে কদাচিৎই আসেন।

যদিও বাপের বাড়িতেই থাকেন অধিকাংশ সময় এবং সে বাড়িটা বড়লোকের বাড়ি, কাজেই তাঁর গতিবিধির উপর যেমন কোনো নিয়ন্ত্রণাদেশের চাপ নেই, তেমনি আসা-যাওয়ার অসুবিধেও নেই, তথাপি যোগাযোগ রাখার কৃতিত্বটা বরং সুবর্ণলতাকেই দিতে হয়। অনেক কাল দেখা না হলে—সুবর্ণই গিয়ে পড়ে একদিন জয়াবতীর বাপের বাড়ি।

প্রবোধ এতে মান-অভিমানের প্রশ্ন তুললেও সুবর্ণ সেটা গ্রাহ্য করে না। সুবর্ণ সে প্রশ্নের উত্তরে বলে, 'ও এসে হবেটা কি? আমার এই নিরবচ্ছিন্ন সংসারের মধ্যে নিশ্চিন্দি হয়ে দুটো গল্প করবার সময় পায়? এই এটা, এই সেটা, চৌদ্দবার উঠছি আর ছুটছি। তার থেকে আমি যে সংসারের দায় থেকে খানিক ছুটি নিয়ে চলে গিয়ে বসি, সেটা অনেক স্বস্তির। ওর তো ওখানে কোন কাজের দায় নেই!...তোমার যদি গাড়িভাড়ার পয়সাটা গায়ে লাগে তো বল, মান-সম্মানের কথা তুলতে এসো না।'

কুটুমবাড়ি?

তাতে কি?

আপন-পর নির্ধারণের বাঁধা সড়ক ধরে কোনোদিনই চলতে পারে না সুবর্ণ, কাজেই ওকথা বলে লাভ নেই। সামান্য একটা অনুষ্ঠানের সূত্রে মুক্তকেশীর সংসার-পরিজনের পোষা বিড়ালটি পর্যন্ত সুবর্ণর 'আপন', আর তার বাইরে দুনিয়ার আর কেউ 'আপন' হতে পারবে না, এ নিয়মে বিশ্বাসী নয় সুবর্ণ।

কাজেই 'মন কেমন' করলে সুবর্ণই গিয়েছে প্রবোধের খুঁৎখুঁতেমি উপেক্ষা করে।

কিন্তু ইদানীং বহুকাল বুঝি যায়নি।

তাই জয়াবতীই এলেন একদিন।

উকিল ভাই কোর্টে যাবার সময় গাড়ি করে এনে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। ফেরার সময় নিয়ে যাবেন।

সুবর্ণর দাদাও উকিল, আর তাঁরও নাকি গাড়ি আছে। সুবর্ণলতার ছেলেরও গাড়ি আছে। কিন্তু থাক্ সে কথা। জয়াবতী এলেন, এবং একটা ঢেউ নিয়ে এলেন। সেটাই হচ্ছে আসল কথা।

জয়াবতীরা কয়েকজনে দল বেঁধে বদরিকাশ্রম যাচ্ছেন, সুবর্ণলতাও চলুক না। বাইরের

কেউ নয়, জয়াবতীর দুই বোন, একজন ভাজ আর একটি ননদ! তা সে তো সুবর্ণরও ননদ।

সঙ্গে যাবে বাড়ির এক পুরনো সরকার, আর ওখানকার পাণ্ডা। অতএব দলটা ভালোই।

আর জয়াবতীরও খুব ইচ্ছে হচ্ছে, সুবর্ণ চলুক।

সুবর্ণলতার জ্বরের মত যাচ্ছে কদিন, সুবর্ণলতা শুয়েছিল। উঠে বসলো, বললো, 'হ্যাঁ যাবো।'

জয়াবতী হাসলেন, 'দাঁড়া বাবু! আগে বরের মত নে, তবে দলিলে সই কর। যাব বললেই তো হবে না!'

সুবর্ণ সংক্ষেপে বললো, 'হবে। তুমি আমার ব্যবস্থাও কর। আর কি কি সঙ্গে নিতে হবে, কত কি লাগবে সেটাও—'

'মেজ ঠাকুরপো আবার এতদিনের বিরহে চোখে অন্ধকার দেখবে না তো?' জয়াবতী হেসে বললেন, 'তাড়াতাড়ির কিছু নেই, ভেবে-চিন্তে বললেই হবে, এখনো মাসখানেক সময় হাতে আছে।'

সুবর্ণলতা বলে, 'ভেবে-চিন্তেই বলেছি। ভেবে ভেবেই মরছিলাম, কোথায় পালাই, তুমি ভগবান হয়ে এলে!'

জয়াবতী ভগবান হয়ে এলেন সুবর্ণকে দুদিনের জন্যে কোথাও পালাবার জায়গা খুঁজে দিতে। কিন্তু সুবর্ণর ভাগ্যের ভগবান? দুঃসাহসী সুবর্ণ যাকে জিজ্ঞেস না করেই দলিলে সই করে বসলো? সে কি চুপ করে থাকবে?

নাকি আহ্লাদে গলে গিয়ে বলবে, 'তা বেশ তো! এমন একটা সুযোগ যখন এসেছে, যাও না। যাও নি তো কখনো কোথাও!'

তা বললে হয়তো মহত্ত্ব হতো, কিন্তু অত মহৎ হওয়া সবাইয়ের কুষ্ঠিতে লেখে না। বাড়ি ফিরে খবরটা শুনে উত্তাল হলো প্রবোধ, 'ঢেউটি আনলেন কে? ঢেউটি? ও-বাড়ির গিন্নী? তা তাঁর উপযুক্ত কাজই করেছেন, চিরটাকালই তো মনসার মন্দিরে ধুনোর ধোঁয়া দিয়ে এসেছেন তিনি! বলে দিও, "যাওয়া সম্ভব হবে না"।'

সুবর্ণ শান্ত গলায় বলে, 'বলে দিয়েছি যাব।'

'বলে দিয়েছ? একেবারে কথা দেওয়া হয়ে গেছে?' প্রবোধ ক্ষুব্ধ ক্রোধের গলায় বলে, 'আমি একটা বুড়ো যে আছি বাড়িতে, তা বুঝি মনেই পড়ল না? বলতে পারলে না—"না জিজ্ঞেস করে কি করে বলবো"?'

সুবর্ণ অনেকদিন পরে আবার আজ একটু হাসলো, বললো, 'তা আমিও তো বুড়ো হয়েছি গো! নিজের ব্যাপারে নিজের একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে চলবে না, এটাও তো দেখতে খারাপ।'

একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে!

প্রবোধ যেন মাথায় লাঠি খায়।

'একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে? কোন্ কাজটা না তোমার ইচ্ছেয় হচ্ছে?'

সুবর্ণ আবারও হাসে, 'তাই বুঝি? তা হলে তো গোল মিটেই গেল। সবই হচ্ছে, এটাও হবে।'

'না, না, হবে-টবে না।'

প্রবোধ যেন ফুঁ দিয়ে তুলোর ফুলকি ওড়ায়।

'এই শরীর খারাপ, নিত্য জ্বরের মতন, এখন চলবেন মরণবাঁচনের তীর্থে! তীর্থ পালিয়ে যাচ্ছে!'

'তীর্থ পালিয়ে যাচ্ছে না সত্যি', সুবর্ণ মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, 'আমি তো পালিয়ে যেতে পারি?'

সহজ কথার পথ অনেকদিন রুদ্ধ ছিল, হঠাৎ একবার এক অলৌকিক মন্ত্রে খুলে গিয়েছিল সেই বন্ধ দরজা। শ্যামাসুন্দরী দেবীর ছেলে জগন্নাথ চাটুয্যের নিচের তলার একটা স্যাঁৎসেতে ঘরে প্রাণ পাচ্ছিল সেই মন্ত্র, তারপরে ভেস্তে গেল সব, মন্ত্র গেল হারিয়ে। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। শুধু আবরণ একটা থাকলো। জ্বরভাব। নিত্যই যদি জ্বরভাব হয় মানুষটার, সহজ ভাব আর আসবে কোথা থেকে?

আজ আবার অনেকদিন পরে হেসে কথা বললো সুবর্ণ, 'আমি তো পালিয়ে যেতে পারি?'

কিন্তু প্রবোধ কি এই ছেলেভোলানো কথায় ভুলবে? প্রবোধ হাঁ-হাঁ করে উঠবে না? বলবে না, 'মেজাজ খারাপ করে দিও না মেজবৌ, ওই সব ছাই-ভস্ম কথা বলে। আমি বলে দিচ্ছি--এই শরীর নিয়ে কোথাও যাওয়া-টাওয়া হবে না তোমার। ভানু কাল কোর্টে নতুন গিন্নীর দাদার কাছে খবরটা দিয়ে আসবে।'

'তা হয় না—', সুবর্ণ বলে, 'কথা দিয়েছি। শরীর বরং পাহাড়ে হাওয়ায় ভালই হবে।'

'ভাল হবে? বললেই হলো?' প্রবোধ দু'পাক ঘুরে হঠাৎ বলে ওঠে, 'যাব বলছো মানে? বড়বৌমার ছেলেপুলে হবে না?'

সুবর্ণ শ্রান্ত গলায় বলে, 'সে হবে, ওর মা'র কাছে হবে। ও নিয়ে তুমি পুরুষমানুষ মাথা ঘামাচ্ছো কেন?'

'আমি মাথা ঘামাব না? আমি বাড়ির কেউ নই?' হঠাৎ জামার হাতাটা একবার চোখে ঘষে প্রবোধ, তারপর ভাঙা গলায় বলে, 'বৌমা বাপের বাড়ি চলে যাবে, আর আমি আমার কাজকর্ম ফেলে তোমার ওই ধাড়ি আইবুড়ো মেয়েকে আগলাবো?'

সুবর্ণর ইচ্ছে হয় চাদরটা মুখ অবধি টেনে পাশ ফিরে শোয়, তবু সে ইচ্ছে দমন করে

আস্তে বলে, 'আগলাবার কথা উঠছে কেন? ছোট বৌমা তো কোথাও যাচ্ছে না? দুজনে থাকবে—'

'থাকবে!' হঠাৎ যেন গর্জন করে ওঠে প্রবোধ, 'থাকবে কি উড়বে তা ভগবানই জানে! তোমার রাগের ভয়ে বলি না কিছু, বোবাকালা সেজে বসে থাকি। কিন্তু এই বলে দিচ্ছি, তোমার এই ছোট মেয়েটির ভাবভঙ্গী ভাল নয়। পরিমলবাবুর ছেলেটার সঙ্গে তো যখন তখন গুজগুজ! কেন? ওর সঙ্গে এত কিসের কথা? আমি বলে দিচ্ছি মেজবৌ, তুমি যদি তীর্থ তীর্থ করে উধাও হও, এসে মেয়েকে ঘরে দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ! হয়তো—'

স্বর্ণ উঠে বসে, স্বর্ণ প্রবোধের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকায় একটু, তারপর তেমনি স্থির গলায় বলে, 'তা যদি দেখি, সে সাহস যদি দেখাতে পারে ও, বুঝবো আমার রক্তমাংস একেবারে বৃথা হয়নি। একটা সন্তানও মাতৃঋণ শোধ করেছে।'

শুয়ে পড়ে আবার।

প্রবোধ সহসা একটা যেন চড় খেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর ভাবে, বৃথা দোষ দিচ্ছি মাথাটা খারাপই! ছটফটিয়ে বেড়ায় খানিক, তারপর আবার ঘুরে আসে। আর আবারও নির্লজ্জের মত বলে ওঠে, 'রাগের মাথায় বলে তো দিলে একটা কথা, কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে তবে তা পরের কথায় নাচা—'

হয়তো ঠিক এভাবে কথা বলার ইচ্ছে তার ছিল না, তবু অভ্যাসের বশে এ ছাড়া আর কিছু আসে না মুখে।

স্বর্ণ এবার সত্যিই পাশ ফিরে শোয়।

শুধু তার আগে আরো একবার উঠে বসে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'তোমার কাছে হাতজোড় করে কটা দিন ছুটি চাইছি, সেটুকু দাও তুমি আমাকে! সব চাকরিরই তো কিছু না কিছু ছুটি পাওনা হয়, তোমার সংসারে এই ছত্রিশ বচ্ছর দাসত্ব করছি আমি, দুটো মাসও কি ছুটি পাওনা হয়নি আমার!'

॥ বাইশ ॥

অভিমানী পারুল স্বেচ্ছায় স্বর্গের টিকিট ত্যাগ করেছিল! একদা তার আর বকুলের স্কুলে ভর্তি হওয়া নিয়ে যখন সংসারে ঝড় উঠেছিল, তখন পারুল বেঁকে বসেছিল, বলেছিল, 'এত অপমানের দানে রুচি নেই আমার'।

অথচ ওই 'স্কুল' নামক জায়গাটা সত্যিই তার আজন্মের স্বপ্ন-স্বর্গ ছিল। সামনে-পিছনে আশেপাশে যে বাড়িগুলো দৃষ্টিগোচর হতো, সকালের দিকে সেই বাড়িগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা একটা কাজই ছিল পারুলের।

সেই সব বাড়ির যে সব মেয়েরা স্বর্গরাজ্যের প্রবেশপত্র পেয়েছে তারা কেমন করে বেণী ঝুলিয়ে বইখাতা বুকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, তাদের দেখবার জন্যে চেষ্টার আর অন্ত ছিল না তার।

আর যাদের যাদের বাড়ির দরজায় সেই একটি খড়খড়ি আঁটা টানা লম্বা গাড়ি এসে দাঁড়াতো, পোশাকপরা চালক বিশেষ একটি সুরে হাঁক দিত, এবং একটু বড় বয়সের মেয়েরা খোঁপাবাঁধা ঘাড়টা একটু হেঁট করে তাড়াতাড়ি বেরিয়েহ গাড়িতে গিয়ে উঠতো!

তাদের দিকে ছিল বুঝি বুভুক্ষার দৃষ্টি, ঈর্ষার দৃষ্টি!

'জগতের আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ।'

নিমন্ত্রণ নেই শুধু পারুলদের!

যেহেতু তারা ভারি একটা পুণ্যময় সনাতন বাড়ির মেয়ে। তাই পারুল শুধু তাদের জানলার খড়খড়ি তুলে সেই নিমন্ত্রণ-যাত্রার দৃশ্য দেখবে।

বড় হওয়া অবধি বারান্দায় দাঁড়ানোর শাসনদৃষ্টি পড়েছিল, তাই ভরসা ওই 'পাখী' দেওয়া জানলা। পারুল বকুলের মা চেয়েছিল ওই টিকিট তাদের জন্যে যোগাড় করে দিতে। সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়নি।

ঝড় উঠেছিল. সেই ঝড়ের ধুলোয় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল অভিমানিনী পারুল। পারুল বলেছিল, 'আমার দরকার নেই।'

বকুলের অভিমান অত দুর্জয় নয়।

বকুল অবজ্ঞা আর অবহেলায় ছুঁড়ে দেওয়া টিকিটখানা পেয়েই ধন্যবোধ করেছিল।

তা হয়তো ওটুকুও জুটতো না, যদি বকুলের সামনের লাইনে তার দিদি না থাকতো।

সেজদি!

দুজনের দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুবর্ণ, সুবর্ণর যুদ্ধ-ভীত স্বামী মাঝামাঝি রক্ষা করতে চেয়েছিল, বলেছিল, 'বকুল যায় যাক, পারুল আবার যাবে কি?'

আর তার বিদ্বান বিজ্ঞ ছেলেরা বলেছিল, 'বিদুষী হয়ে হবেটা কি? কলাপাতে না এগাতেই তো গ্রন্থ লিখছে!'

অতএব পারুল সেই রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছিল। আর এক কড়া স্কুলে ভর্তি হয়ে চলে গিয়েছিল সেখানের বোর্ডিঙে!

নিঃশব্দচারিণী নিঃসঙ্গ বকুল নীরবে তার স্বর্গে যাওয়া-আসা করছিল।

কিন্তু সেই আসা-যাওয়ার পথের দিকে যদি কেউ চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে, যদি চোখোচোখি হওয়া মাত্র আনন্দে ভাস্বর হয়ে ওঠে সেই চোখ, বকুল কি করবে?

• বকুল বড় জোর বলতে পারে, 'রোজ রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাক যে?' কলেজ নেই তোমার?'

সে তো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে, 'স্কুল বসবার পরে কলেজের টাইম, এই একটা মস্ত সুবিধে!'

বকুল যদি লাল-লাল মুখে বলে, 'বাঃ, তাই বলে তুমি রোজ রোজ—'

সে সপ্রতিভ গলায় বলে ওঠে, 'থাকি তা কি? তোর কি ধারণা তোকে দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি?'

আর কি বলতে পারে বকুল?

আর কিভাবে প্রতিকার করতে চেষ্টা করবে?

ওর সঙ্গে কথা কইতে যাওয়াতেও যে ভয়! ওর চোখের তারায় যেন অজস্র কথার জোনাকি, ওর কথার ভঙ্গীতে যেন এক অসীম রহস্যলোকের ইশারা।

তবু ওর বেশি নয়।

যেন উদ্‌ঘাটিত হতে রাজী নয় কেউই।

যা বলবে কৌতুকের আবরণে।

কিন্তু বলবে অনেক ছলে, আর দেখা করবে অনেক কৌশলে।

তবু সে কৌশল ধরা পড়ে যাচ্ছে অপরের চোখে।

অন্তত বকুলের বাপের চিরসন্ধানী সন্দেহের চোখে। আর সে ওই নুড়ির মধ্যেই পর্বত দেখছে, চারাগাছের মধ্যেই মহীরুহ!

অতএব সর্বনাশের ভয়ে আতঙ্কিত হচ্ছে!

কিন্তু শাসন দিয়ে সর্বনাশকে ঠেকানো যায়? বালির বাঁধ দিয়ে সমুদ্রকে? তথাকথিত সেই সর্বনাশ তো এসে যাচ্ছে নিজের বেগে। বন্যার জল যেমন মাঠ-পথ গ্রাস করে ফেলে বাড়ির উঠানে এসে ঢোকে।

সব দিকেই উঁকি মারছে সে, যখন-তখনই সমাজে সংসারের গণ্ডিভাঙার ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

আর মজা এই, সেই ভাঙনে যেন কারুর ভয় লজ্জা নেই, বরং গর্ব আছে। পরিমলবাবুর ভগ্নী যে বাড়িতে ওস্তাদ রেখে কালোয়াতি গান শিখছে, সেটা যেন পরিমলবাবুর গর্বের বিষয়, সামনের বাড়ির যোগেনবাবুর নতুন জামাই যে বিলেত-ফেরত, সেটা যেন যোগেনবাবুর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক, ভানুর কোন্ মামাতো শালার ভায়রাভাই যে বৌ নিয়ে বিলেত গেছে, সেটা যেন রাজ্যসুদ্ধ লোককে বলে বেড়াবার মত প্রসঙ্গ, আর বিরাজের ভাওরঝি যে শুধু একটা পাস করেই ক্ষান্ত হয়নি, একটার পর দুটো, এবং দুটোর 'পর তিনটে পাস করে ফেলে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসলো, এটা রীতিমত একটা বুক ফুলিয়ে বলবার

খবর। এ খবর যেন বিরাজের সনাতন বনেদী শ্বশুরবাড়িকে একটি গৌরবময় উচ্চস্তরে তুলে দিয়েছে।

মেয়েদের ঘোমটা খুলেছিল ওদের কবেই! যবে থেকে জুড়িগাড়ি বাতিল করে মোটর-গাড়ি কিনেছে, তবে থেকেই ওরা খোলা গাড়িতে মুখ খুলে বসে হাওয়া খেতে শুরু করেছে। তবু সেটা যেন অনেকটা শুধু 'পয়সা থাকা'র চিহ্ন। আর এটা হচ্ছে প্রগতিশীলতার চিহ্ন।

যদিও খবরটা বিরাজ নিন্দাচ্ছলেই শুনিয়ে গেল, কারণ জা-ন্যাওরের নিন্দে করে হাল্কা হবার জন্যেই মাঝে মাঝে মেজদার বাড়ি বেড়াতে আসে বিরাজ, অতএব সুরটা নিন্দের মতোই শোনালো, তবু তার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন রইল ওই প্রগতির গর্বটুকু, তা প্রচ্ছন্ন থাকলেও ধরা পড়তে দেরি হলো না।

কিন্তু প্রগতি যে ক্রমশই আপন বাহু প্রসারিত করছে, বিস্তার করছে আপন দেহ। নইলে কানুর শালী মাস্টারনী হয়ে বসে?

পাস অবশ্য করেছে সে মাত্র দুটো, কিন্তু তাতে মাস্টারনী হওয়াটা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। নিচু ক্লাসেও তো আছে ছেলে-মেয়ে, তাদেরই পড়াবে।

তা উঁচু ক্লাস নিচু ক্লাসটা তো কথা নয়, কথাটা হচ্ছে—কানুর পিসতুতো শালী নিত্য দুবেলা পিরিলি করে শাড়ি পরে, কাঁধে ব্রোচ এঁটে, আর পায়ে জুতো-মোজা চড়িয়ে একা রাস্তায় যাওয়া-আসা করছে।

আর পিসশ্বশুর-বাড়ির এই প্রগতিতে কানু নিন্দায় পঞ্চমুখ না হয়ে গৌরবে মহিমান্বিত হচ্ছে। কথায় কথায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই গৌরব।

কিন্তু এসব কি সমাজে এই নতুন এল?

আসেনি এর আগে?

তা একেবারে আসেনি বললে ভুল হবে।

এসেছে।

এসেছে আলোকপ্রাপ্তদের ঘরে; এসেছে ধনীর ঘরে।

কিন্তু সেটাই তো সমাজের মাপকাঠি নয়? মাপকাঠি হচ্ছে মধ্যবিত্ত সমাজ।

যারা সংস্কারের খুঁটিটা শেষ পর্যন্ত আটকে রাখে।

ভাঙনের ঢেউটা যখন তাদের ঘরে ঢুকে পড়ে সেই খুঁটি উপড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখনই নিশ্চিত বলা চলে—এসেছে নতুন, এসেছে পরিবর্তন।

অতএব ধরতেই হবে যে এসেছে পরিবর্তন, এসেছে প্রগতি। আর প্রথমেই নাশ করছে ভয় আর লজ্জা।

নচেৎ ভানুও একদিন বড় মুখ আর বড় গলা করে তার এক বড়লোক বন্ধুর ভাইঝির জলপানি পাওয়ার গল্প করে?

এণ্ট্রেন্স পাস করে জলপানি পেয়েছে বন্ধুর ভাইঝি, সেই উপলক্ষে ভোজ দিচ্ছে বন্ধু সেই গৌরবের সংবাদটুকু পরিবেশন করে ভানু তার নিজের ছোট বোনকে একহাত নেয়।

স্বাভাবিক ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'তার বয়েস কত জানিস? মাত্র পনেরো! আর তুমি ধাড়ি মেয়ে এখনো থার্ডক্লাসে ঘষটাচ্ছো। লজ্জাও করে না!'

বকুল আনন্দোজ্জ্বল মুখেই দাদার বন্ধুর ভাইঝির গুণকীর্তন শুনছিল, হঠাৎ এই মন্তব্যে উজ্জ্বল চোখে জল এসে গেল তার। আর হঠাৎ আহত হওয়ার দরুনই বোধ হয় সামলাতে না পেরে বড় ভাইয়ের মুখের ওপর বলে বসে, 'নিজেই তো বললে তোমার বন্ধু ভাইঝির জন্যে চল্লিশ টাকা খরচ করে তিন-তিনজন মাস্টার রেখেছিলেন—'

তা ভানু অবশ্য বোনের এই উচিতবাক্যে চৈতন্যলাভ করে না।

জগতে কেই বা করে?

উচিতবাক্যের মত অসহনীয় আর কি আছে?

ভানুও তাই অসহনীয় ক্রোধে বলে ওঠে, 'মাস্টার? তোমার জন্যে যদি চারশো টাকা খরচ করেও মাস্টার পোষা হয়, কিছু হবে না, বুঝলে? ওসব আলাদা ব্রেন! তোমার জন্যে মাস্টার রাখলে তুমি আর একটু ঔদ্ধত্য শিখবে, আর একটু অসভ্যতা। হুঁ!'

বকুল আর কিছু বলে না, বোধ করি অশ্রুজল গোপন করবার চেষ্টাতেই তৎপর হয়। বলে বকুলের মা, যে এতক্ষণ নিঃশব্দে একটা লেপের ওয়াড় সেলাই করছিল দালানের ওপ্রান্তে বসে।

হয়তো বেছে বেছে এইখানটাতেই এসে বন্ধুর ভাইঝির গৌরবগাথা শোনানোর উদ্দেশ্য ছিল ভানুর। মাকে ডেকে বলতে ইচ্ছে না করলেও মাকে শোনানোর ইচ্ছেটা ছিল প্রবল। মেয়েদের 'পড়া পড়া' করে কত কাণ্ডই করেছেন, বলি, এইরকম মেয়ে তোমার? এ মেয়ে ক্লাসে একবারও ফার্স্ট ভিন্ন সেকেণ্ড হয়নি, আর এখনও এই দেখ!

তা যতক্ষণ সেসব বলছিল ভানু বোনকে এবং বৌকে উপলক্ষ করে ততক্ষণ কিছুই বলেনি সুবর্ণলতা। মনে হচ্ছিল না শুনতে পাচ্ছে, হঠাৎ এখন কথা কয়ে উঠলো। বললো, 'ওঘরে গিয়ে গল্প করগে তোমরা, আমার বড্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, কথা ভাল লাগছে না।'

মাথার যন্ত্রণা?

যে মানুষ ছুঁচ সুতো নিয়ে সেলাই করছে, তার কিনা কথার শব্দে মাথার যন্ত্রণা?

ভানু বোধ করি এই অসহ্য অপমানে পাথর হয়ে গিয়েই কোনো উত্তর দিতে পারে না, শুধু 'ওঃ' বলে গট গট করে উঠে চলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ভানুর বৌও।

শুধু বকুলই বসে থাকে ঘাড় হেঁট করে।

হয়তো অন্য কিছুই নয়, তাকে উপলক্ষ করে দাদার এই যে অপমানটা ঘটলো, তার প্রতিক্রিয়া কি হবে তাই ভাবতে থাকে দিশেহারা হয়ে।

সুবর্ণ হাতের কাজটা ঠেলে রেখে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'সুনির্মলকে একবার ডেকে দিতে পারবি ?'

সুনির্মল !

তাকে ডেকে দেবার আদেশ বকুলকে ?

এ আবার কোন্ রহস্য !

আর বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে সুনির্মলের সম্পর্ক কি ? এ যে অবোধ্য !

শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে মা'র দিকে তাকায় বকুল। সুবর্ণ সেইদিকে এক পলক তাকিয়ে বলে, 'একটা মাস্টারের জন্যে বলবো ওকে।'

মাস্টার !

বকুলের জন্য মাস্টার !

ধরণী দ্বিধা হচ্ছো না কেন ?

ছেলের সঙ্গে হার-জিতের খেলায় মা কি এবার বকুলকে হাতিয়ার করবেন ? হে ঈশ্বর, দুর্মতি কেন হচ্ছে মা'র ? অথচ দাদার থেকে মাও কিছু কম ভীতিকর নয়। তবু ভয় জয় করে বলে ফেলে বকুল, 'না না, ওসবে দরকার নেই মা—'

'দরকার আছে কি নেই সে কথা আমি বুঝবো। তুই ডেকে দিবি।'

হাতের কাজটা আবার হাতে তুলে নেয় সুবর্ণ।

॥ তেইশ ॥

তা তো হলো।

কিন্তু সুবর্ণর সেই কেদারবদরী যাওয়ার কি হলো ? এটা কি তার ফিরে আসার পরের কাহিনী ?

দূর, যাওয়াই হলো না তার ফিরে আসা !

সুবর্ণলতার ভাগ্যই যে বাদী, তা তার তীর্থ হবে কোথা থেকে ?

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল যাত্রা করে, দু'ঘণ্টা পরেই আবার ফিরে আসতে হলো সেই বাড়িতে।

কথা ছিল যারা যারা যাবে, জয়াবতীর বাপের বাড়িতে এসে একত্র হবে, সেখান থেকেই রওনা। সুবর্ণও তাই গিয়েছিল। জয়াবতীর মা'র কাছেই খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে একবার খাওয়াবেন সবাইকে এই তাঁর বাসনা।

অনেক রাগের আর অনেক নিষেধের পাহাড় ঠেলে বেরিয়ে পড়েছিল সুবর্ণ, মনের মধ্যে অপরিসীম একটা ক্লান্তি ছাড়া আর যেন কিছুই ছিল না। তবু এদের বাড়িতে এসে পৌঁছে যেন বদলে গেল মন।

যাত্রাপথের সঙ্গীরা সবাই আগ্রহে আর উৎসাহে, আনন্দে আর ব্যাকুলতায় যেন জ্বল্‌জ্বল্ করছে। তার ছোঁয়াচ লাগল সুবর্ণর মনে।

নিজেকে যেন দেখতে পেল অনন্ত আকাশের নিচে, বিরাট মহানের সামনে, অফুরন্ত প্রকৃতির কোলে।

চির-অজানা পৃথিবীর মুখোমুখি হবে সুবর্ণ, চিরকালের স্বপ্নকে প্রত্যক্ষে পাবে।

আনন্দে চোখে জল আসছিল সুবর্ণর!

তা চোখ মুছছিল সবাই।

আর ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলছিল, 'বাবা বদরীবিশালের কী কৃপা! আমার মত এই অধমকেও করুণা করেছেন—'

সুবর্ণ চোখ মুছছিল না, সুবর্ণর চোখের জল চোখের মধ্যেই টলমল করছিল। সুবর্ণ ওদের গোছগাছ দেখছিল।

যখন তাড়াহুড়ো করে খেতে বসতে যাচ্ছে—তখন—তখন এল সেই ভয়ঙ্কর খবর।

সমস্ত পরিবেশটার ওপর যেন বজ্রাঘাত হলো। কপালে করাঘাত করলো সবাই।

সুবর্ণলতার স্বামীর কলেরা হয়েছে।

কলেরা!

দলের মধ্যে একজন মাত্র সধবা যাচ্ছিল, তারও এই! তা যাওয়া তো আর হতে পারে না তার এযাত্রা!

কিন্তু রোগটা হলো কখন? এত বড় একটা মারাত্মক রোগ! এই ঘণ্টা তিনেক তো মাত্র এসেছে সুবর্ণ বাড়ি থেকে।

তাতে কি, এ তো 'তড়িঘড়ি' রোগ!

তা ছাড়া সূচনা তো দেখেই এসেছিল সুবর্ণ। যে খবর দিতে এসেছিল, সে বললো সেকথা। দেখে এসেছিল।

সূচনাটা দেখেই এসেছিল?

সুবর্ণর দিকে ধিক্কারের দৃষ্টিতে তাকায় সবাই, দেখে এসেছে, তবু চলে এসেছে! তা ছাড়া বলেওনি একবার কাউকে?

ধন্যি মেয়েমানুষের প্রাণ তো!

পাছে যাওয়া বন্ধ হয়, তাই স্বামীকে যমের মুখে ফেলে রেখে চলে এসে মুখে তালা-চাবি এঁটে বসে আছে।

বিস্ময়ের সাগরে কূল পায় না কেউ।

জয়াবতীর দাদা শুধু বিস্মিতই হন না, বিরক্তও হন। বলেন, 'রোগের সূচনা দেখেও তুমি কি করে চলে এলে সুবর্ণ?'

সুবর্ণ মৃদু গলায় বলে, 'বুঝতে পারিনি, ভাবলাম বদ্‌হজম মত হয়েছে—'

তথাপি জয়াবতীর দাদা অসন্তুষ্ট গলায় বলেন, 'সেই ভেবে নিশ্চিন্দি হয়ে চলে এলে তুমি? না না এ ভারী লজ্জার কথা! এক্ষেত্রে তো তোমার আর তীর্থে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। এখন শীগগির চল, গাড়ি বার করছে।'

তথাপি নির্লজ্জ আর হৃদয়হীন সুবর্ণ বলেছিল, 'ভগবানের নাম করে বেরিয়েছি, আমি আর ফিরবো না দাদা! ছেলেরা তো রয়েছে, বৌমারা রয়েছে—'

এবার একযোগে সবাই ছি-ছিক্কার করে ওঠে, এ কী অনাসৃষ্টি কথা! ছেলে-বৌ রয়েচে বলে তুমি স্বামীর কলেরা শুনেও যাবে না? কলেরা রুগীর সেবাটাই বা করবে কে?...

ভগবান?

আর স্বামীর আগে তোমার ভগবান?

জয়াবতী মৃদুস্বরে বলেন, 'বুঝতেই পারছি তোর ভাগ্যে নেই। যা এখন তাড়াতাড়ি, দাদা রাগ করছেন। চল যাই তোর সঙ্গে, দেখে আসি একবার—'

যাত্রা স্থগিতের কথা কেউ তোলে না।

অন্য সকলের পক্ষেই ওই যাত্রাটা—অলঙ্ঘ্য অপরিহার্য অমোঘ, শুধু সুবর্ণলতার যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না!

কই একথা তো কেউ বলল না, 'সুবর্ণ, তোকে ফেলে কি করে যাব, আজ নাই গেলাম, দেখি তোর ভাগ্যে কি লিখেছে ভগবান!'

না, তা কেউ বলল না।

বরং সুবর্ণ যে স্বামীর এই আসন্ন মৃত্যুর খবর শুনেও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো না, বরং কথা কাটলো, তীর্থের লোভটিকে আঁকড়ে রইলো, এতে ধিক্কারই দিল।

'ছেলেরা আছে, ডাক্তার-কবরেজ দেখাবে, সেরে যাবে—' এ একটা কথা?

বলি কোন্ প্রাণে হিমালয় ভাঙবে তুমি? তাছাড়া আর সকলেই বা কোন্ স্বস্তিতে সঙ্গে নেবে তোমাকে? যে জায়গায় যাচ্ছ সেখানে তো খবর আনাগোনার পথও নেই। তবে?

তার মানে তুমি বিধবা হয়েও শাড়ি-চুড়ি পরে ঘুরবে সবাইয়ের সঙ্গে, সব কিছু ছোঁবে নাড়বে!

হলেই হলো। আহ্লাদ?

দাদা আর একবার অসহিষ্ণু গলায় প্রায় ধমক দিয়ে গেলেন, 'কি হলো? সুবর্ণ, তুমি

কি আমায় দোষের ভাগী করতে চাও? বেশ তো—এদের তো এখনো যাত্রার ঘণ্টাতিনেক দেরি রয়েছে, গিয়ে দেখো কি অবস্থা—'

'অবস্থা আমার জানা হয়ে গেছে দাদা—', বলে আস্তে গিয়ে গাড়িতে ওঠে সুবর্ণ। জয়াবতীকে সঙ্গে আসতে দেয় না।

কেন, এই শুভযাত্রার মুখে একটা কলেরা রোগীকে দেখতে যাবে কেন জয়াবতী? তাছাড়া বিপদের ভয়ও তো আছে। শুধু একা নিজেরই নয়, অন্য পাঁচজনেরও।

গাড়িতে ওঠবার সময়ও জয়াবতী আর একবার মৃদু প্রশ্ন করেন, 'ভেদবমি তুই দেখে এসেছিলি?'

সুবর্ণ ওর চোখের দিকে নির্মিমেষে তাকিয়ে দেখে বলেছিল, 'এসেছিলুম!'

জয়াবতী কপালে হাত ঠেকান।

গাড়ি ছেড়ে দেয়।

কে জানে রোগীরও এতক্ষণে নাড়ী ছেড়ে গেছে কিনা!

সুবর্ণ চলে যাওয়ার পর অবিরত সুবর্ণর সমালোচনাই চলতে থাকে, এবং একবাক্যে স্থির হয় এরকম হৃদয়হীন আর আক্কেলহীন মেয়েমানুষ পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

খবর দিতে এসেছিল সুবর্ণর ঝি। সে বার বার কপালে হাত ঠেকাচ্ছিল আর বলছিল, 'হে মা কালী, গিয়ে যেন বাবুকে ভাল দেখি—'

তবে তার বলার ধরনে মনে হয়েছিল, গিয়ে ভাল তো দূরস্থান, বাবুকে জ্যান্ত দেখার আশাও সে করছে না!

সুবর্ণর সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা করলো সে অনেকবার, বাবুর রোগের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করলো বারকয়েক, এবং শেষ অবধি বিরক্ত হয়ে বললো, 'আমি মা পথেই নেমে পড়বো। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, মা ওলাবিবি বুঝবেন সেটা।'

তথাপি সুবর্ণ নির্বাক নিস্তব্ধ।

স্তব্ধতা ভাঙলো বাড়ি এসে দোতলায় উঠে।

যেখানে বিছানায় পড়ে কাত্‌রাচ্ছিল প্রবোধ, আর বকুল বাদে অন্য মেয়েছেলেরা দরজার বাইরে আশেপাশে ঘুরছিল।

ডাক্তারের নিষেধে ঘরে ঢোকেনি কেউ, অপেক্ষা করছিল কখন সুবর্ণলতা এসে পড়ে—, কলেরা রুগী বলে ভয় খেলে যার চলবে না, ভয় খাওয়াটা যার পক্ষে ঘোরতর নিন্দনীয়।

গাড়ি থেকে নামা দেখেই সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, কেউ কিছু বলল না, শুধু দেখল মা উঠে গেল নীরবে।

হ্যাঁ, একেবারে নীরবে।

ঘরে ঢুকে রোগীর মুখোমুখি দাঁড়ালো সুবর্ণ, নীরবতা ভাঙলো, স্থির গলায় প্রশ্ন করলো, 'ক আউন্স ক্যাস্টর অয়েল খেয়েছিলে ?'

হ্যাঁ, এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কথাটা বলেছিল সুবর্ণ সেই মরণোন্মুখ লোকটার মুখের উপর। যার জন্যে তার নিজের পেটের মেয়ে চাঁপা বলেছিল, 'বুঝতে পারি না মাকে, মানুষ না কষাই ! আমাদের ভাগ্যে বাবা এযাত্রা বেঁচে উঠলেন তাই, যদি সত্যিই একটা কিছু ঘটে যেত ? ওই মুখ তুমি আবার লোকসমাজে দেখাতে কি করে ?'

'তুমি' দিয়ে বললেও আড়ালেই বলেছিল অবশ্য, চন্নন ছিল শ্রোতা। চন্নন বেশি কথা বলে না, সে শুধু মুচকি হেসে বলেছিল, 'মা'র আবার মুখ দেখানোর ভয় !'

বাপের অসুখ শুনে ছুটে এসেছিল তারা, আর অনেকদিন পরে আসা হয়েছে বলেই দু-চারদিন থেকে গিয়েছিল। থেকে গিয়েছিল অবিশ্যি ঠিক বাবার সেবার্থে নয়, দুই বোন এক হয়েছে বলেই। 'রাজায় রাজায় দেখা হয় তো বোনে বোনে দেখা হয় না। এই তো পারুলের সঙ্গে কি হলো দেখা ? সে তো সেই কোন্ বিদেশে !'

কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের অসুখের কারণ সম্পর্কে এই নির্লজ্জ সন্দেহ কি একা সুবর্ণলতারই হয়েছিল ? সুবর্ণলতার প্রখর-বুদ্ধি ছেলেদের হয়নি ? হয়েছিল বৈকি, তাছাড়া প্রমাণপত্রই তো ছিল তাদের হাতে। কিন্তু তবু তারা এত নিষ্ঠুর হতে পারেনি, এত নির্লজ্জ ! তাই তারা প্রবোধের যে যেখানে আছে তাদের 'তড়িঘড়ি' খবর দিয়ে বসেছিল। অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছিল, 'খবর দেওয়া উচিত তাই জানালাম, তবে রোগটা ছোঁয়াচে, সেই বুঝে—'

তা সেই 'বুঝ'টা সুবোধ আর উমাশশী বাদে আর সকলেই বুঝেছিল, বুঝেছিল বিরাজের বাড়ির সবাই, বুঝেছিল প্রবোধের জামাইরা, তবে মেয়েরা বোঝেনি, আর বোঝেনি জগু।

শ্যামাসুন্দরীও অবশ্য একটু অবুঝ হচ্ছিলেন, জগু নিবৃত্ত করে এলেন মাকে। হাঁউমাউ করে কেঁদে বললেন, 'যা হবে তা তো বুঝতেই পারছি, শিবের অসাধ্য ব্যাধি, তুমি আশী বছরের বুড়ী সে দৃশ্য দেখতে পারবে ?'

'দেখতে পারবো'—একথা আর কে বলতে পারে ? অতএব জগু একাই কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হয়েছিলেন।

এসে দেখেন বিচারসভা বসে গেছে।

রুগী আছে শুধু বকুলের হেফাজতে, সুবর্ণলতাকে ঘিরে বাকি সবাই।

না, কটু কথা বলছে না কেউ কিছু, শুধু এইটুকুই বলছে, 'পারলে তুমি এ কথা বলতে ? কি করে পারলে ? "হৃদয়" বলে বস্তুটা কি সত্যিই নেই তোমার ?'

শ্রান্ত সুবর্ণলতা একবার শুধু বলেছে, 'তাই দেখছি, সত্যিই নেই এত দিনে টের পেলাম সে কথা।'

উমাশশী কাঠ হয়ে বসেছিল, সুবোধচন্দ্র বললেন, 'তুমি এখন যাবে, না থাকবে? আমার তো আবার--

অফিসের দেরির কথাটা আর মুখ ফুটে বলেন না! পেন্সন হয়ে যাবার পর ধরাধরি করে চাকরির মেয়াদ আরো দু বছর বাড়িয়ে নিয়েছেন, কিন্তু কোথাও যেন সূক্ষ্ম একটু লজ্জা আছে সেটার জন্যে। তাই পারতপক্ষে 'অফিসের বেলা' কথাটা উচ্চারণ করেন না সুবোধচন্দ্র। যেন ওটা এলেবেলে, ওটা অন্যের কাছে অবজ্ঞার ব্যাপার।

উমাশশী চকিত হয়।

উমাশশী যাবার জন্যে ব্যগ্র হয়।

কলেরাকে ভয় করছে না উমাশশী, ভয় তার এই পরিস্থিতিটাকে, ভয় তার মেজজাকে। চিরটাদিন যাকে বুঝতে পারল না সে। সেই দুর্বোধ্যকে চিরদিনই ভয় তার। নইলে ইচ্ছে কি করে না মাঝে মাঝে আসে, দু'দণ্ড মেজবৌয়ের এই সাজানো-গোছানো চক্‌চকে সংসারটায় এসে বসে! লক্ষ্মী ওথলানো সংসার দেখতেও তো ভাল লাগে।

কিন্তু কি জানি কেন স্বস্তি পায় না।

মনে হয় তার পিঠোপিঠি ওই জাটি যেন সহস্র যোজন দূরে বসে কথা বলছে তার সঙ্গে।

অথচ বলে তো সবই!

ছেলেমেয়েদের খবর কি? নাতিরা কে কোন্ ক্লাসে পড়ছে? মেয়েদের আর কার কি ছেলেমেয়ে হলো? সবই জিজ্ঞেস করে। আদর-যত্ন করে, খাওয়ায় মাথায়, সঙ্গে মিষ্টি বেঁধে দেয়, তবু কে জানে কোথায় ওই দূরত্বটা?

গিরিবালা, বিন্দু, ওরা তো বড়জাকে একেবারেই পোঁছে না, এক ভিটেয় বাস করেও প্রায় কথা বন্ধই। নেহাৎ উমাশশী সেই 'মরুভূমি'টা সহ্য করতে পারে না বলেই যেচে যেচে দুটো কথা কইতে যায়। তবু ওদের সঙ্গেও যেন নেই এতটা ব্যবধান, ওরা কাছাকাছি না হলেও—কাছেরই মানুষ। তাই উমাশশী এখানে বসেই ভাবছিল, রোগটা ছোঁয়াচে বলে আসতে পারলো না বটে, খবরটার জন্যে হাঁ করে আছে ওরা, গিয়েই জানাতে হবে ভয়ের কারণটা নেই আর, রোগী সামলেছে একটু!

কদিন কথা নেই, এ একটা বরং সুযোগ এল।

তাই তাড়াতাড়ি বললো, 'না, আমিও চলেই যাই তোমার সঙ্গে। থাকা মানেই তো আবার পৌঁছনোর জন্যে ছেলেদের ব্যস্ত করা! চাঁপা-চন্নন এসে গেছে, মেজবৌ এসে গেছে, আর ভাবনা করি না। উঃ, ভগবানের কী অনন্ত দয়া যে মেজবৌ রওনা দেয়নি!'

আজকাল এটুকু উন্নতি হয়েছে উমাশশীর, ঘোমটা দিয়ে হলেও সকলের সামনে বরের

সঙ্গে কথা কয়। সেই সকলটা যে সকলেই তার কনিষ্ঠ, এতদিনে যেন সে খেয়াল হয়েছে উমাশশীর।

তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠে বসে উমাশশী। সুবর্ণকে একটু বলে গেলে ভাল হতো, কিন্তু পরিস্থিতিটা যে বড় গোলমেলে। এসেই তো শুনেছে চাঁপার মুখে, কি কথা বলেছে সুবর্ণ তার স্বামীকে!

হতে অবিশ্যি পারে। মেজ ঠাকুরপো চিরদিনই তো ওই রকম বৌ-পাগলা, বৌকে একবেলার জন্যে চোখের আড় করতে পারে না। সেই বৌ একেবারে বদরিকাশ্রম যাবার বায়না করে বসেছে দেখেই, করে বসেছে এই কেলেঙ্কারি কাণ্ড! জানে তো বারণ শোনবার মেয়ে নয় মেজবৌ!

তবু সত্যিও যদি তাই-ই হয়, বড় বড় ছেলে, ছেলের বৌদের সামনে মানুষটাকে এমন হেয় করবি তুই? তা ছাড়া যে কারণেই হোক, বলতে গেলে প্রায় তো মরতেই বসেছে! নাড়ী ছাড়বার যোগাড়! তাকে এমন লাঞ্ছনা!

ছি ছি, এ কি নির্মায়িকতা?

গাড়িতে উঠে বসে ঘোমটাটা একটু খাটো করে সেই কথাই বলে ফেলে উমাশশী।

সুবোধের দিকে জানলাটা খোলা ছিল, সুবোধ সেই জানলার বাইরে তাকিয়েছিলেন, হঠাৎ সচকিত হয়ে বলেন, 'কার নির্মায়িকতার কথা বললে?'

'মেজবৌয়ের কথাই বলছি—'

হঠাৎ সুবোধ স্বভাব-বহির্ভূত তীব্র হন। সুবোধের প্রৌঢ় চোখে যেন দপ করে একটা আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে, বলে ওঠেন, 'মেজবৌমার কথা? মেজবৌমার নির্মায়িকতার কথা? মেয়েমানুষ হয়েও তুমি শুধু ওই দিকটাই দেখতে পেলে বড়বৌ? পেবো লক্ষ্মীছাড়ার নিষ্ঠুরতা তোমার চোখে পড়ল না? অবস্থার গতিকে আমি তোমায় কখনো কোনো তীর্থ-ধর্ম করাতে পারিনি, আমার বলা শোভা পায় না, তবু পেবোর "অবস্থা" ছিল বলেই বলছি, অবস্থা সত্ত্বেও তুই মানুষটাকে কোনদিন আকাশ-বাতাসের মুখ দেখতে দিলি না। নিজের স্বার্থে খাঁচায় পুরে রেখে দিয়েছিস, লজ্জা করল না তোর এই বুড়ো বয়সে এই কেলেঙ্কারিটা করতে? স্বামী হয়ে তুই ওর এত বড় একটা তীর্থযাত্রার সুযোগ পণ্ড করলি? সুযোগ বার বার আসে? বৌটা যে চিরদিন আকাশ-বাতাসের কাঙাল, তা জানিস না তুই? আর তাও যদি না হয়, হিন্দু বাঙালীর মেয়ে তো বটে। "বদরীনারায়ণ" যাত্রা করছিল, কত বড় আশাভঙ্গ হলো তার, সেটা তুমি বুঝতে পারলে না বড়বৌ?'

একসঙ্গে এত কথা কইতে সুবোধকে জীবনেও কখনো দেখেছে কিনা উমাশশী সন্দেহ, তাই সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে, আর বোধ করি কথাগুলো অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। সুবোধও বোধ হয় এই আবেগ প্রকাশ করে ফেলে লজ্জিত

হলেন, তাই এবার শান্ত গলায় বলেন, 'মেজবৌমা মানুষটা আলাদা ধাতুর, ওকে তোমরা কেউ বুঝলে না। আর পেবোটা হচ্ছে—' চুপ করে যান।

তা কেউ যদি সকলের দুর্বোধ্য হয় তো সে দোষ কার? তার, না সকলের?

বিন্দু আর গিরিবালা 'নে থো' করে রান্না সেরে তাড়াতাড়ি হাঁড়ির ভাত চুকিয়ে নিচ্ছিল, কে জানে কখন কি খবর আসে। মল্লিকা নেই, কদিনের জন্যে শ্বশুরবাড়ি গেছে, শাশুড়ীর অসুখ শুনে! কাজেই চক্ষুলজ্জা করবার মত কেউ নেই। নইলে যা কট্‌কটে মেয়ে, খুড়ীদের এখন ভাতের কাঁসি নিয়ে বসা দেখলে কট্‌কট্ করে কথা শোনাত। নেই বাঁচা গেছে।

অতএব দুজনে ছেলেপুলেকে ভাত দিয়েই একই রান্নাঘরের দু প্রান্তে দু-কাঁসি ভাত বেড়ে নিয়ে বলাবলি করছিল, 'যা হবে তা তো দেখাই যাচ্ছে, তবে মেজদির এবার কি হবে তাই ভাবনা! চিরটা দিন তো ওই একটা মানুষের ওপর দাপট করে তেজ-আস্পদ্দার ওপরই চালিয়ে এলেন, এখন পড়তে হবে ছেলে-বৌয়ের হাতে!'

এরা দুজনে যে পরস্পরের প্রাণের সখী তা নয়, দুজনের আলাদা অবস্থা, আলাদা কেন্দ্র। পাড়া-পড়শীর সঙ্গে দুজনেরই গলায় গলায় ভাব (যেটা মুক্তকেশীর আমলে সম্ভবপর ছিল না) হলেও সেই পড়শীরা ভিন্ন ভিন্ন দলের, এবং সেখানেই নিশ্চিন্ত হয়ে পরস্পরের সমালোচনা করে বাঁচে। তবু একেবারে কথা বন্ধ, মুখ দেখাদেখি বন্ধটা নেই, বরং মিলই আছে। ক্ষুদ্রতার সঙ্গে ক্ষুদ্রতার, সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে সঙ্কীর্ণতার, স্বার্থবোধের সঙ্গে স্বার্থবোধের এক ধরণের হৃদ্যতা থাকে, এ সেই হৃদ্যতা। গিরিবালা আছে, তাই বিন্দু একজনকে ঈর্ষা করতে পায়, বিন্দু আছে, তাই গিরিবালা তার অহমিকা বিকাশের একটা ক্ষেত্র পায়—ওদের কাছে তারও মূল্য আছে বৈকি।

তা ছাড়া কেউ তো উদার নয় যে, একের অপরের কাছে 'ছোট' হয়ে যাবার প্রশ্ন আছে। উমাশশীর পয়সা নেই, তাই সে পয়সা খরচে কৃপণ, কিন্তু হৃদয়ে কৃপণ নয় উমাশশী। তাই উমাশশীকে ওরা দেখতে পারে না।

তবু উমাশশীই যেচে যেচে আসে। বলে, 'কি রে সেজবৌ, আজ কি রাঁধলি?··· ওমা, ছোটবৌ তো খাসা মৌরলা মাছ পেয়েছিস!'

ওরা গ্রাহ্য করে উত্তর দিলে গল্পটা এগোয়, ওরা অগ্রাহ্য-ভাব দেখালে উমাশশী আস্তে সরে আসে। আজ ভাবছিল মেজবৌয়ের বাড়ির খবর নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ গল্প চালানো যাবে, কিন্তু হঠাৎ মনটা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। বারে বারে কানে বাজছে, 'শুধু এইটাই তোমার চোখে পড়লো বড়বৌ?—'

বেশি কথা আর বলল না, রুগী সামলেছে, প্রাণের ভয় নেই, শুধু এইটুকুই জানিয়ে দিয়ে আস্তে চলে এল উমাশশী।

'তবে আর সাত-সকালে গিলে মরি কেন' মনে মনে এই কথাটুকু উচ্চারণ করে বাড়াভাতে

এক-একখানা গামলা চাপা দিয়ে, দুই জা দুজনের দিকে তাকিয়ে একটু তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে, 'ভাগ্যিটা দেখলে? এ বাবা স্রেফ্ মেজদির ভাগ্যের জোরে—নইলে এ হলো শিবের অসাধ্যি ব্যামো!'

তা জগুও সেই কথাই বলতে বলতে এসেছিলেন এবং রুগীর বিছানার ধারে বসে পড়ে কেঁদে বলে উঠেছিলেন, 'কি রে পেবো, মায়ের ছেলে মায়ের কাছে চললি?'

প্রবোধ কষ্টে বলেছিল, 'যেতে আর পারলাম কই? এ হতভাগাকে যমেও ছোঁয় না। তোমাদের ভাদ্রবৌ তো বলে গেল, রোগ নয় ছল!'

গেঙিয়ে গেঙিয়ে বললেও বুঝতে পারা গেল এবং বলা বাহুল্য অবাকই হলেন জগু। মেজবৌমা কি তাহলে সত্যিই 'মাথা খারাপ' রুগী? নচেৎ এই যমের দোরে পৌঁছনো মানুষটাকে এই কথা বলে?

অবিশ্যি মাথা খারাপ হলে কথা নেই, কিন্তু না হলে? নাঃ, মাথাটাই ঠিক নয়, দেখলাম তো—

কিন্তু খানিক পরে সহসা এই রুগীর বাড়িতেই সেই মানুষেরই হা-হা হাসির শব্দ ছাদে গিয়ে ধাক্কা খায়। 'অ্যাঁ, তাই নাকি? মেজবৌরা বদরীনারায়ণ যাচ্ছিলেন, চলে আসতে হলো। ও, তাহলে আর দেখতে হবে না কানু, এ স্রেফ আমার মগজওলা ভায়ার কারসাজি। নাঃ, বুদ্ধি একখানা বার করেছে বটে!······কিন্তু ভারি অন্যায়। যাচ্ছিলেন একটা মহাতীর্থে! তাছাড়া নিজেরও বয়েস হয়েছে, যদি হয়ে যেত একটা কিছু? তখন তুমি পরিবারের হিল্লী-দিল্লী যাওয়া বন্ধ করতে আসতে? যাক গে, ছলই হোক আর সত্যিই হোক, ভায়া পটকে গেছে খুব। এখন স্রেফ জলবার্লি! পুরো তিনটে দিন স্রেফ জলবার্লি। বকুল রে, বাবা ভাত খেতে চাইলেও দিবি না।···যাই, সেই আশী বছুরে বুড়ীটা মরছে ধড়ফড়িয়ে, বলি গে তাকে।'

একে একে সকলকেই ধড়ফড়ানো থেকে রক্ষা করা হলো। শুধু জয়াবতীর বাড়িতে খবর দেবার কিছু নেই। জয়াবতীরা রওনা হয়ে গেছে। হয়তো এখন তাদের বিশ্বাস আর ভক্তির গলা থেকে উচ্চারিত হচ্ছে, 'জয় বাবা বদরীনারায়ণ! জয় বাবা বদরীবিশাল কি জয়!' পাণ্ডাঠাকুরের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিশে হয়তো উদাত্ত হয়ে আকাশে উঠছে সেই স্বর।

কে জানে সুবর্ণলতার ওই ভক্তির ঘরটায় ফাঁকি ছিল কি না। নইলে তার কণ্ঠস্বরটুকু আকাশে ওঠবার সুযোগ পেল না কেন?

জয়াবতীর ননদ, অতএব সুবর্ণরও সম্পর্কিত ননদ সেই কথাই বলাবলি করে, 'কেবলই তো হিমালয় দেখবো, হিমালয় দেখবো চিন্তা দেখলাম, বাবার নাম তো একবারও শুনলাম না।··· ঠাকুর অন্তর্যামী, দেখছেন সব।'

আশ্চর্য, ওই কথাই বলে লোকে।

ভয়ঙ্কর এই ভুল কথাটা।

কোটি কল্পকাল ধরে বলে আসছে।

হয়তো বা আরো কোটি কল্পকাল ধরে বলবে। যারা উল্টো কথা বলতে চাইবে, তারা সমাজে পতিত হবে।

॥ চব্বিশ ॥

কিন্তু চিরদিনের উল্টো-পাল্টা সুবর্ণলতা কি সেদিন উল্টো কথা বলেছিল? না ওই কোটি কল্পকালের কথাটাই একবার উচ্চারণ করেছিল?

কে জানে! তারপরও তো আবার দেখা যাচ্ছে সুবর্ণলতা দুঃসহ স্পর্ধায় তার ষোল বছরের আইবুড়ো মেয়েকে বলছে, 'সুনির্মলকে একবার ডেকে দে তো।'

যে ছেলেটা নাকি বাইশ বছরের।·····

প্রবোধের নিজের আর সাহস হয়নি, এবার ছেলেকে এসে ধরেছিল, কিন্তু ছেলে মুখের ভঙ্গীতে একটা তাচ্ছিল্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মুখের ওপর জবাব দিল, 'আমার দ্বারা হবে টবে না। আমার কী দরকার? যে যার নিজের ছাগল ল্যাজে কাটবে, আমি বাধা দেবার কে?'

'তা ও যদি পাগল হয়, সবাইকে তাই হতে হবে?'

'হবে। পাগলের কর্ত্তীর মধ্যে থাকতে হলেই হবে তাই।'

'কী বলবেন?'

আগে বলত না, ইদানীং বাপকে 'আপনি' বলছে ভানু।

'বলব আবার কি!' প্রবোধ ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'বলব, তোমার ওই জোয়ান ছেলের এসে এসে আর আমার ওই ধাড়ি ধিঙ্গী মেয়েকে পড়াতে হবে না।'

'পরিমলবাবু যদি বলেন, নিজের মেয়েকে না সামলে আমায় বলতে এসেছ কেন?'

কথাটা প্রণিধানযোগ্য, তাই প্রবোধ গুম হয়ে যায়, তারপর আবার বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, ওই ছেলেটাকেই শাসিয়ে দিচ্ছি।'

ভানু যেন একটা মজা দেখছে, এইভাবে বলে, 'দিতে পারেন। তবে সেখানেও অপমানিত হবার ভয় আছে। এযুগের ছেলে, ওদের গুরু-লঘু জ্ঞানটা তো ঠিক আপনাদের হিসেবমত নয়!'

প্রবোধের একটা কথা মুখে এসেছিল, সামলে নিয়ে বলে, 'তবে ওই হারামজাদা মেয়েকেই শায়েস্তা করছি আমি, রোসো। সুনির্মলদার কাছে পড়া করছেন! পড়ে আমার গুষ্টির মাথা উদ্ধার করবেন। কী করবো—শাঁখের করাতের নিচে পড়ে আছি আমি, নিজের সংসারে চোর, তা নইলে—'

তা নইলে কি হতো তা আর বলে না, চলে যায়।

ভানু কেমন একটা ব্যঙ্গমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কী ফুটে ওঠে সেই দৃষ্টিতে? মানুষটা কী অপদার্থ?

যাক, ভানুর দৃষ্টিতে কিছু গেল এল না, সুনির্মলের ওই বকুলকে পড়াতে আসা নিয়ে সংসারে একটি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করলেন প্রবোধচন্দ্র এবং 'পদার্থে'র পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সেটি বন্ধ করতেও সমর্থ হলেন। কে জানে কি কলকাঠি নাড়লেন, পরিমলবাবুর স্ত্রী দীর্ঘদিন পরে এ বাড়িতে এলেন, এবং ঘি আর আগুনের সেই চিরন্তন উদাহরণটি নতুন করে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুচকি হেসে বললেন—'বুঝতাম, যদি মেয়েকে ঘোষাল বামুনের ঘরে দিতে! শুধু শুধু কেন আমার ছেলেটাকে চঞ্চল করা ভাই! একেই তো ছোট থেকে—'

সুবর্ণ সহসা প্রতিবেশিনীর একটা হাত চেপে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, 'নেবেন আপনি বকুলকে?'

ভদ্রমহিলা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'আমি নিতে চাইলেই কি বকুলের বাবা দেবেন? তুমি না হয় আলাভোলা মানুষ, অত ধরবে না, তোমার ছেলেরা? তোমার কর্তা? না ভাই, গৃহবিচ্ছেদ বাধাতে চাই না আমি। মেয়ে পাহাড় হয়ে উঠেছে, বিয়ে দিয়ে ফেল, আর পড়িয়ে কি হবে? চাকরি করতে তো যাবে না? মনে কিছু কোরো না ভাই, 'সুনি' আর আসবে না।'

এরপরও কি সুবর্ণ, 'হ্যাঁ, তাকে আসতে হবে!'

তা বলা সম্ভব নয়, তবু সেই সুনির্মলকে ধরেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল সুবর্ণ! মাইনে করা মাস্টার ঢুকিয়েছিল বাড়িতে ষোল বছরের মেয়ের জন্যে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক, কোন এক সরকারী স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, এখন টিউশ্যনি করে চালাচ্ছেন। চুক্তিপত্রে সই করে ছাত্রছাত্রীকে তামিল দেন। অনেক মেয়েই তো প্রাইভেট পড়ে পরীক্ষা দিচ্ছে আজকাল।

বকুলের জ্যাঠামশায়ের চাইতে বয়েস বেশি, এ মাস্টারকে নিয়ে আর কিছু বলবার আছে?

রাস্তায় দেখার সুযোগ ক্রমশঃই কমছে, বাড়িতে আসার পাটটাও এই একটা ক্লেদাক্ত আলোড়নে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, তবু একসময় দেখা হলো। মৃদু হাসলো বকুল, 'কি সুনির্মলদা, পেয়েছ খুঁজে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা? টাকমাথা, কুঁজো পিঠ…'

সুনির্মল এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুক করে ওর মাথায় একটা টোকা মেরে বলে, 'পেলাম। ওদের জন্যে না হোক, আমার নিজের নিরাপত্তার জন্যেই খুঁজতে হলো।'

'তোমাদের বাড়িটি তো আমাদের বাড়ির থেকে এক তিলও অগ্রসর নয়, সাহস করেছিলে কি করে তাই ভাবছি। হয়েছ তো এখন জব্দ?'

'জব্দ আবার কি, ভারি ফাজিল হয়েছিস!' বলে চলে যায় তাড়াতাড়ি। তা জব্দ সে সত্যিই হয়নি। আগে থেকেই আঁটঘাট বেঁধেছিল।

সুবর্ণলতা যখন প্রস্তাব করেছিল, তখন সুনির্মল বিপুল পুলক গোপন রেখে, 'আচ্ছা, আসবো সময় করে। এই আহ্লাদী, নভেল পড়াটা একটু কমাস—' বলে চলে গেলেও বাড়ি গিয়ে মা'র কাছে বলেছিল, 'এই এক হলো ঝঞ্ঝাট। এমন সব অন্যায় অনুরোধ করে বসে মানুষ। ও-বাড়ির খুড়ীমা ডেকে ডুকে অনুরোধ করে বসলেন কি জানো? রোজ গিয়ে ওই মেয়েটাকে পড়াতে হবে!'

বলা বাহুল্য, সুনির্মলের মা এতে পুলকিত হলেন না, ক্রুদ্ধই হলেন। বললেন, 'তার মানে?'

'মানে আর কি। ঘষটাচ্ছে তো এখনো থার্ড ক্লাসে। অথচ বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে মন্দ নয়। তাই বাসনা, গড়িয়ে-পিটিয়ে সামনের বছরেই প্রাইভেট পাস দেওয়াবেন।'

'পাস দেওয়াবেন! মেয়েকে পাস দিইয়ে কী চতুর্বর্গ হবে শুনি?'

'তা কে জানে বাবা! বললেন। কথা এড়াবো কি করে?'

'কথা এড়াবো কি করে? চমৎকার! কেন—বললেই তো পারতিস আমার এখন এম-এ ক্লাসের পড়া—'

'বলেছিলাম, বললেন একটু সময়-টময় করে। মুখের ওপর "না" করা যায়?'

পরিমল-গৃহিণীও এটা স্বীকার করেন। তাই শেষতক বলেছিলেন, 'বেশ, পড়াও তো ওর মা'র সামনে বসে পড়াবে।'

তাই চলছিল, এটাই জানতেন পরিমল-গিন্নী। কিন্তু জল অনেকদূর গড়ালো। অতএব রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হলো তাকে, বাষট্টি বছরের গণেশবাবুকে আসন ছেড়ে দিয়ে।

গণেশবাবু সম্পর্কে কী আর আপত্তি তুলবে সুবর্ণর সনাতনী সংসার?

এদিকে তো চতুর্দিক থেকে রকম রকম খবর আসছে ঝপাঝপ।

সুরাজের ছোট ছেলে বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়ে মেম বিয়ে করে এনেছে, সুরাজ সেই মেমবৌকে সমাদরে ঘরে তুলেছে। বৌ-ছেলের জন্যে আলাদা বাবুর্চি ঢুকেছে বাড়িতে।

এদিকে সুবালা যে সুবালা, সেও নাকি একটা মেয়েকে বারেন্দ্র বামুনের ঘরে বিয়ে দিয়ে বসেছে, আর অমূল্য বলছে, 'ঠিক আছে বাবা, আমায় সবাই যদি জাতে ঠেলে তো বাকি যে কটা পড়ে আছে ওই বারেন্দর-টারেন্দর দেখেই দিয়ে দেব!'

এদিকে—

ঊনিশ বছর বয়েস থেকে হবিষ্যি গিলে আর শুচিবাই করে করে যে মল্লিকার জন্মের শোধ

আমাশার ধাত, হাতে-পায়ে হাজা, সেই মল্লিকার নিজের খুড়শ্বশুর ব্রাহ্মধর্ম না নিয়েও বিধবা মেয়ের বিয়ে দিলেন।

আত্মীয়রা বলুক 'বেহ্ম', করুক 'পতিত', অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী করেই হলো সে বিয়ে।

তা ছাড়া হরদমই তো পথে-ঘাটে মেয়ে দেখা যাচ্ছে, ট্রামগাড়িতেই যেয়ে উঠে বসছে! মেয়ে ইস্কুলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে মাস্টারনীও বাড়ছে, এই বন্যার মুখে মাস্টার নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করে আর কি হবে?

তবু শেষ চেষ্টা করেছিল প্রবোধ 'আমার অত পয়সা নেই' বলে। সুবর্ণ সংক্ষেপে বলেছে, 'তোমায় দিতে হবে না'। তারপর ঈশ্বর জানেন, সুবর্ণ কাকে দিয়ে দুখানা গহনা বিক্রি করে ফেলেছে।

কে জানে গিরি তাঁতিনী এই কাজে সহায় হয়েছে কিনা। বৌদের তো তাই বিশ্বাস। নইলে আজকাল এত আসে কেন ও?

আচ্ছা, প্রবোধই বা নিজে কি করছে? এত বড় আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে বসে আছে না? কারণ? কারণ ঘরে ঘরে বড় বড় মেয়ে রয়েছে পড়ে, সেই সাহস!

॥ পঁচিশ ॥

হ্যাঁ, চলছিল গিরির আনাগোনা।

মাঝে মাঝেই কাপড়ের বোঁচকা নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে জল খেতে দেখা যায় তাকে এ বাড়িতে, পান চাইতে দেখা যায়। কাপড় না গছিয়েও চলে যাচ্ছে, আবার আসছে।

গিরি এখনো যেমনটি ছিল যেন ঠিক তেমনটিই আছে।

সুবর্ণলতার চেহারায় কত ভাঙচুর হলো, সুবর্ণলতার স্বাস্থ্যে কতই ক্ষয় ধরলো, গিরি অটুট অক্ষয়। শুধু কাপড়ের মোটের মাপটা একটু ছোট হয়েছে তার ইদানীং। তা সে বেশি বইতে পারে না বলে, না বেশি গছাতে পারে না বলে, তা কে জানে! আজকাল যেন লোকের তাঁতিনীর কাছে কাপড় কেনার থেকে দোকানের ওপরই বেশি ঝোঁক।

তাই গিরি আর মোটা আটপৌরের বোঝা বেশি বয়ে বেড়ায় না, বাছাই বাছাই জরি-পেড়ে শান্তিপুরী, মিহি মিহি ফরাসডাঙ্গার আধুনিক ধরনের পাড়ের দু-চারখানি শাড়ি, এই নিয়ে বেরোয়।

আর এসেই বলে, 'শ'বাজারের রাজবাড়িতে দিয়ে এলাম এককুড়ি শাড়ি, ওতোরপাড়ার রাজাদের বেয়াইবাড়িতে দিয়ে এলাম এককুড়ি সাতখানা শাড়ি, নাটোরের মহারাণীর বাপের বাড়িতে দুকুড়ি শাড়ির বরাত আছে, যেতে হবে সেখানে।'

রাজবাড়ি ছাড়া কথা নেই আজকাল গিরির মুখে। দিন 'গত' হয়ে আসবার আভাস যত স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই কি শুধু প্রচারের জোরে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার চেষ্টা গিরির?

ঘটকালি তো গেছেই, এ ব্যবসাটাও যেন গেল গেল।

কিন্তু ঘটকালিটা কি একেবারে গেছে ?

এ বাড়িতে তবে আজকাল কোন্ কাজে আনাগোনা তার ? হ্যাঁ, সেই পুরনো ব্যবসাটাই আবার ঝালাতে বসেছে গিরি !

সুবর্ণলতার সেজ ছেলে মানুর জন্যে একটি কনের সন্ধান এনেছে।

মানুর বিয়ের বয়েস আগেই হয়েছিল, বছরের আড়াআড়ি পিঠোপিঠি ভাই তো ওরা—ভানু, কানু, মানু। তবে মানু কৃতী হয়ে বিদেশে চাকুরি করতে চলে যাওয়ার দরুন বিয়েটা পিছিয়ে গেছে। আর হয়তো বা সুবর্ণলতার অনাগ্রহেও গেছে।

নচেৎ মেয়ের বাপেদের তো মেয়ে নিয়ে ধরাধরির কামাই নেই।

সুবর্ণলতা বলে, 'ছেলে ছুটিতে বাড়ি আসুক, তখন কথা হবে। আজকাল ছেলেদের নিজের চোখে দেখে নেওয়া রেওয়াজ হয়েছে।'

ইচ্ছে করে ছেলেকে এই বেহায়াপনা শিক্ষা দেবার ব্যাপারে বাড়ির কারুরই অনুমোদন নেই। যে দম্পতিযুগলের না দেখে বিয়ে হয়েছে, তারা সরবে বলে, 'কেন বাবা, আমরা কি ঘর করছি না ?'

তবু সুবর্ণ বলে, 'তা হোক। যে কালে যা ধর্ম !'

ওই বলে বলে তো ছেলেটাকে বিদেশযাত্রায় প্ররোচিত করলো সুবর্ণই। এই যে ছেলেটা ঘরবাড়ি ছেড়ে দিল্লীতে পড়ে আছে, তাতে কি খুব সুখ হচ্ছে তোমার ? প্রবোধ কি আপত্তি করেনি ? বলেনি কি 'এ বংশের কেউ কখনো "ভাত ভাত" করে দেশছাড়া হয়নি ?'

সুবর্ণ বলেছে, 'কখনো হয়নি বলে কখনো হবে না ? তোমার ঠাকুদ্দা প্র-ঠাকুদ্দারা তো কখনো গায়ে কাটা কাপড় তোলেননি, পায়ে চামড়ার জুতো ঠেকাননি, তুমি মানছো সেই সব নিয়ম ? নিয়ম জিনিসটা কি হিমালয় পাহাড় যে, সে নড়বে না ?'

অতএব মানু দিল্লীতে চলে গিয়েছিল।

ছুটছাটায় যখন আসে, মানুকে আর এক বাড়ির ছেলের মত লাগে। বেআন্দাজী বেপরোয়া আর শৌখিন তো ছিলই চিরকাল। এদের এই সনাতনী বাড়ির প্রলেপ যেন আর রঞ্জিত রাখতে পারছে না তাকে।

সুবর্ণর এটায় যেন আলাদা সুখ।

বললে লোকে 'ছি ছি' করবে, তবু মাতৃস্নেহের মুখ রাখে না সুবর্ণলতা।

মানু বরাবর বাইরেই থাকুক, ওখানেই সংসার পাতুক, এই তার একান্ত ইচ্ছে।

তা সম্প্রতি মানুর চিঠি পড়ে মনে হয় যেন ওই 'সংসার-পাতা'র ইচ্ছেটা উঁকি মারছে। রাঁধুনে ঠাকুরের হাতে যে খাওয়া-দাওয়া ভাল হচ্ছে না এটা প্রায়শই জানাচ্ছে।

তবু সুবর্ণলতা ঔদাসীন্যের খোলস ত্যাগ করে বিয়ের তোড়জোড় করছিল না, হঠাৎ এই সময় গিরি একটি মেয়ের সন্ধান নিয়ে এসে ধরে বসলো।

একেবারে নেহাৎ গরীবের ঘর, অসহায়া বিধবার মেয়ে, তবে মেয়ে পরমাসুন্দরী। মেজবৌমার দয়ার শরীর বলেই গিরি এখানে এসে পড়েছে।

গরীবের ঘর।

অসহায়া বিধবার মেয়ে!

পরমা সুন্দরী!

এই তিনটে শব্দ যেন সুবর্ণকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করে এনেছিল।

তারপরই গিরি শাড়ির ভাঁজ থেকে কনের একখানা ফটো বার করলো। বললো, 'এ ছবি তোমার ব্যাটাকে যদি পাঠিয়ে দাও দিও, মোট কথা গরীবের কন্যাদায়টা উদ্ধার করতেই হবে তোমায়।'

সুবর্ণ ফটোখানা চোখের সামনে তুলে ধরলো, আর তন্মুহূর্তেই যেন আত্মসমর্পণ করে বসলো।

আহা কী নম্র ভঙ্গী, কী নমনীয় মুখ, কী কোমল চাউনি! অথচ কেমন একটি দীপ্ত লাবণ্য! দেখলে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে!

গিরি এদিকে কথা চালিয়ে যায়, 'মেয়ের পিসের বুঝি ফটক তোলার শখ, তাই কবে একখানা ফটক তুলেছিল, সেইটুকুই সম্বল, নইলে গরীব বিধবার মেয়ে, কে কী করছে। বংশ খুব উঁচু গো, তোমার মামারবাড়ির সঙ্গে কি যেন সুবাদ আছে।'

'আমার মামারবাড়ি?'

সুবর্ণ যেন চমকে ওঠে।

সুবর্ণর আবার মামারবাড়ি কোথায়? এদের এই বাড়িটা ছাড়া সুবর্ণর আর কোথাও কোনো 'বাড়ি' আছে নাকি? মাসীর বাড়ি, পিসির বাড়ি, দিদির বাড়ি, জেঠি-খুড়ীর বাড়ি, যা সব থাকে লোকের? তাই মামারবাড়ি থাকবে?

সুবর্ণ ম্লান হাসির সঙ্গে বলে, 'আমার আবার মামারবাড়ি! ভূতের আবার জন্মদিন!'

গিরিও হাসে, 'আহা, তা উদ্দিশ তারা না করলেও, ছিল তো একটা মামারবাড়ি? ভুঁইফোঁড় তো নও?'

'আমার তো নিজেকে তাই মনে হয়।'

সুবর্ণ ছবিখানা আবার হাতে তুলে নেয়, দেখে নিরীক্ষণ করে।

গিরি আঁচল থেকে 'গুলের' কৌটো বার করে একটিপ দাঁতের খাঁজে রেখে বলে, 'তা তুমি খবরাখবর না রাখলেও তেনারা রাখে। এই মেয়ের যে দিদিমা তার সঙ্গে দেখা হলো। তিনিই বললো, 'তুমি পাত্তরের মাকে বোলো, আমি হচ্ছি তাঁর মায়ের জ্ঞাতি পিসি। পিসি

ভাইঝি আমরা একই বয়সী ছিলাম, গলায় গলায় ভাব ছিল।' কি যেন ছাই নাম ছিলো তোমার মায়ের? বললো সেই নাম—'

কিন্তু কাকে বলছে গিরি?

সুবর্ণ যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে হঠাৎ।

তার মায়ের সমবয়সী পিসী?

গলায় গলায় ভাব ছিল?

কে সে? কী নাম তার?

সুবর্ণ যেন নিথর সমুদ্রে ডুবুরি নামাতে চেষ্টা করে। মা'র কাছে মা'র ছেলেবেলার গল্প শুনেছিল না?

'নাম জানো তাঁর—'

আস্তে বলে।

গিরি দেখে ওষুধ ধরেছে।

গিরি অতএব পান বার করে এবং পানটি খেয়ে একটু কালক্ষেপ করে বলে, 'জানি—নাম তো বললো বুড়ী। তোমার মায়ের পিসি হয় বললো, "পুণ্যি পিসি" না কি। বললো, "ওই বললেই বোধ হয় বুঝতে পারবেন"।'

পুণ্যি পিসি। পুণ্যি পিসি!

বিস্মৃতির কোন্ অতল থেকে ভেসে উঠল এ নাম? একখানি উজ্জ্বল হাসি হাসি মুখ থেকে ঝরে পড়তো না এই নামটি?

'আমি আর পুণ্যি পিসি, এই দুইটিতে ছিলাম একেবারে দুষ্টুমির রাজা।···একদিন আমি আর পুণ্যি পিসি, হি হি হি, দুজনে পাল্লা দিয়ে এমন সাঁতার কাটলাম যে ফিরে এসেই সঙ্গে সঙ্গে কাঁথামুড়ি দিয়ে তেড়ে জ্বর।......পুণ্যি পিসি ছিল এদিকে ভারি ভীতু—'

সুবর্ণ চোখ তুলে বলে, 'উনি মেয়ের কে হন বললে?'

'দিদিমা গো। খোদ মায়ের মা! অবস্থা একদা উঁচু ছিল, ভগবানের মারে পড়ে গেছে সে অবস্থা—'

সুবর্ণ স্থির গলায় বলে, 'তুমি এখানেই কথা কও গিরি ঠাকুরঝি, এই মেয়েই আমি নেব।'

এই মেয়েই আমি নেব।

এই মেয়েই আমি নেব।

যেন জপের মন্ত্র!

এই ছবির মুখে যেন কী এক শান্তির আশ্বাস পেয়েছে সুবর্ণ!

এই ছবির মুখে কি সুবর্ণর মার মুখের আদল আছে?

কিন্তু কেন তা থাকতে যাবে?

কোন্ রক্ত কোন্ দিকে গড়িয়েছে হিসেব আছে তার ?

কোনো যুক্তি নেই, তবু সুবর্ণর মনে হতে থাকে, এই মেয়ের মধ্যে তার মা'র মাধুরী মাখানো আছে। আছে সুরে সুরে সাদৃশ্য। এই যোগসূত্র কে এনে ধরে দিল ? নিশ্চয়ই ভগবান! সুবর্ণ নিজে তো যায়নি খুঁজতে ?

তবে ?

এ ভগবানের খেলা!

সুবর্ণর ভয়ানক শূন্যতার দিকটায় বুঝি পূর্ণতার প্রলেপ দিতে চান তিনি এতদিনে।

ছবিখানা মামুর কাছে পাঠিয়ে দিতে হলে—হয় স্বামীকে, নয় পুত্তুরদের জানাতে হবে। সুবর্ণ তো আর পার্শেল করতে যাবে না ? আগের মত দিন থাকলে সুনির্মলকেই বলতো। কিন্তু ওই পড়া আর পড়ানো নিয়ে এমন বিশ্রী একটা আবহাওয়া হয়ে গিয়েছে যে, তেমন স্বচ্ছন্দে আর ডেকে কাজ বলা যায় না।

অথচ এখুনি এই ছবির খবরটা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না কাউকে। এ যেন সুবর্ণর নিজস্ব গোপন ভারি দামী একটি সম্পত্তি।

একখানি মিষ্টি মুখ, এত প্রভাবিত করতে পারে মানুষকে ?

'আমিই এই—', মনে মনে একটু হাসে সুবর্ণ, তবে আর ভবিষ্যতে আমার ছেলেকে দোষ দেওয়া চলবে না। সে তো আত্মহারা হয়েই বসবে। ফটো আর পাঠিয়ে কাজ নেই, মূর্ছা যাবে।

ফটোটা পাঠাল না সুবর্ণ, এমনি একটা চিঠি লিখলো ছেলেকে।

তাতে জানালো, 'সে মেয়ে অপছন্দ হবার নয়, দেখলেই বুঝবে মা'র নজরটি কেমন। এক দেখায় বলা যায় পরমা সুন্দরী মেয়ে, তাই আর কালবিলম্ব না করে কথা দিয়ে দিয়েছি। তুমি পত্রপাঠ ছুটির দরখাস্ত করবে। গরীব বিধবার মেয়ে, বয়েসও হয়েছে, তারা একান্তই ব্যস্ত হয়েছে।

আবার সেই বাড়ির কর্তাকে বাদ দিয়ে, বড় বড় ছেলেদের উপেক্ষা করে কথা দেওয়া!

শিক্ষা আর সুবর্ণর হবে না!

তা মাস্টার রাখা এবং কলেরা কাণ্ডের পর থেকে সুবর্ণকে যেন সবাই ভয় করতে শুরু করেছে।

ভক্তি নয়, ভয়!

চৈতন্য হয়ে সমঝে যাওয়া নয়, রাগে গুম হয়ে থাকা। অতএব এই 'কথা দেওয়া' নিয়ে আড়ালে যতই সমালোচনা চলুক, সামনে কেউ কিছু বলে না।

তবে সুবর্ণ যদি বলে বসে, 'গিরির সঙ্গে একবার ওদের বাড়ি যাই না?' তাতেও চুপ করে থাকবে মানুষ?

বিরক্ত প্রবোধ না বলে পারে না, 'ওদের বাড়ি যাবে তুমি? ছেলের মা ছুটবে মেয়ের মা'র পায়ে তেল দিতে?'

'পায়ে তেল দিতে আবার কি?' সুবর্ণ বলে, 'শুনলে তো বাড়িতে পুরুষ অভিভাবক তেমন নেই, মা আর দিদিমা। তা দিদিমা তো আমার থেকে সম্পর্কে বড়, গুরুজন, যেতে দোষের কি আছে?'

বলে এ কথা সুবর্ণ।

দোষের কিছু দেখে না সে।

কিন্তু কেউ যদি কেবলমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই দোষ-গুণের বিচার করে, সেটা তো সংসারসুদ্ধু লোক মানতে পারে না!

সুবর্ণ যদি ছেলের মা হয়ে হ্যাংলার মত মেয়ের বাড়িতে যায়, তারা তো এ কথাও ভাবতে পারে, নির্ঘাত ছেলের কিছু গলদ আছে, নচেৎ এত গরজ কিসের?

কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। ঝুনো সংসারী লোকেরা তো এই ভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। যেখানেই দেখবে চুলচেরা হিসেবের বাইরে কিছু ঘটছে, সেখানেই ধরে নেবে নিশ্চয় কোথাও কোনো গলদ আছে, নচেৎ এমন বেহিসেবী কেন?

পাত্রপক্ষ সিংহাসনে আসীন থাকবে, পাত্রীপক্ষ জুতোর শুকতলা ক্ষয়াবে, এই নিয়ম। এর বাইরে যেতে চেয়ো না তুমি সুবর্ণ!

অতএব যাওয়া হয় না।

শুধু সুবর্ণ ভবিষ্যৎ বাংলার ছবিতে মেয়েদের জন্যে 'মড়ক' প্রার্থনা করে, 'বাংলাদেশের মেয়েদের ওপর এমন কোনো মড়ক আসে না গো, যাতে দেশ মেয়েশূন্যি হয়ে যায়? তখন দেখি তোমরা মহানুভব পুরুষসমাজ কোন্ সিংহাসনে বসে ক্রীতদাসী সংগ্রহ কর? এ অহঙ্কার ফুরোবে তোমাদের। তোমাদেরই জুতোর শুকতলা ক্ষয়াতে হবে, এই আমি অভিশাপ দিচ্ছি।' নিজ মনে এই ভয়ানক কথা উচ্চারণ করে সুবর্ণ, বলে, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান—'

তবু এই বিয়ে উপলক্ষে আবার যেন ঝেড়ে উঠছে সুবর্ণ। আশ্চর্য, কোথায় লুকনো আছে তার এই অদম্য প্রাণশক্তি, যে শতবার ভেঙে লুটিয়ে পড়ে-পড়েও আবার ওঠে খাড়া হয়ে?

কতবারই তো মনে হয় এইবার বুঝি ফুরিয়ে গেল সুবর্ণলতা, আবার দেখা যায়, আরে এ যে আবার জীবন্ত মানুষের ভূমিকা নিয়েছে!

বকুলের বুড়ো মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে তো দিব্বি কথাবার্তা শুরু করে দিয়ে মেয়ের পড়ার

তত্ত্ব-বার্তা নিচ্ছিল, আবার তাঁকে ধরেই আলাদা এক অঙ্কর মাস্টার রাখিয়েছে, বছরের মধ্যেই মেয়েকে এণ্ট্রান্স একজামিন দেওয়াবে বলে।

ভানু আর ভানুর বৌ হাসে আড়ালে।

বলে, 'মা তাঁর ছোট কন্যাটিকে গার্গী মৈত্রেয়ী লীলাবতী না করে ছাড়বেন না।'

কানু আর কানুর বৌ হাসে আর বলে, 'এ হচ্ছে সেই দাদার বন্ধুর বোনের ওপর আক্রোশ।'

আর কানুর বৌ আর ভানুর বৌ বলে, 'মা'র দেখছি মন্ত্রের সাধন শরীর পতন। মেয়েকে জলপানি না নিইয়ে ছাড়বেন না। তবে কিনা কথায় আছে, "হিংসেয় সব করতে পারে--বাঁজা পুত বিয়োতে নারে।" মগজে ঘি থাকলে তবে তো জলপানি!'

ধরে নেয় নেই ঘি।

কিন্তু ওরাই কি পরম পাপে পাপী? সংসার তো এই নিয়মেই চলে।

বহির্দৃশ্য নিয়েই তো তার কারবার। কে কি করছে, সেটাই দেখে লোকে, কেন করছে তা কি অত দেখতে যায়? দেখতে যায় না, তাই নিজেদের হিসেব অনুযায়ী একটা কারণ নির্ণয় করে নিয়ে সমালোচনার স্রোত বহায়।

সুবর্ণর এই ব্যবহারটা হিংসুটে মনের আক্রোশের মতই তো দেখাচ্ছিল।

আবার মানুর বিয়েতে বেশি উৎসাহ দেখলেও নির্ঘাত লোকে বলবে, বেশি রোজগেরে আর দূরে-থাকা ছেলে কিনা। জগতের রীতিই তো 'বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মোধো'।

এ ছেলে বাইরে আছে, নগদ নগদ টাকা পাঠাচ্ছে, অতএব মানু দামী ছেলে।

তবে দামী বৌ হচ্ছে না এই যা।

এ কথা জনে জনে বলছে।

চাঁপা তো গাড়িভাড়া করে এসে বলে গেল, 'রূপ নিয়ে কি ধুয়ে জল খাবে মা? মেয়ে তো শুনছি ডোমের চুপড়ি-ধোয়া। মানুর মতন দামী ছেলেকে তুমি কানাকড়িতে বিকিয়ে দেবে? অথচ আমার পিসশ্বশুর অত সাধ্যসাধনা করলেন, তখন গা করলে না তুমি? উনি মেয়েকে মেয়ের ওজনে সোনা দিতেন, তার ওপর খাট-বিছানা, আর্শি, আলনা, ছেলের সোনার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরের আংটি, সোনার বোতাম—'

সুবর্ণ হঠাৎ খুব জোরে হেসে উঠেছিল।

বলেছিল, 'তা হলে তো স্যাকরার দোকানের সঙ্গে বিয়ে দিলে আরো ভাল হয় রে চাঁপা।'

চাঁপার ওই জমিদার পিসশ্বশুর সম্পর্কে সমীহর শেষ নেই, তাই চাঁপা রাগ করে উঠে যায়।

সুবর্ণ ভাবে, জঞ্জালের বোঝাকে এত বেশি মূল্য দেয় কেন মানুষ? সুবর্ণ ভাবে, চাঁপাটা চিরকেলে মুখ্যু।

তা হয়তো সত্যি। মুখ্যু চাঁপা মুখ্যুর মত কথা বলেছে।

কিন্তু মানু?

মানু তো মুখ্যু নয়?

মানু তো বিদ্যের জোরেই তিন-তিনশো টাকা মাইনের চাকরি করছে।

সে তবে এমন চিঠি লেখে কেন?

মানুর চিঠির ভাষা কৌতুকের। তবে বক্তব্যটা অভিন্ন। সেও বলেছে, এযুগে রূপের চেয়ে রূপোর আদর বেশি। তা ছাড়া হাড়দুঃখী বিধবার মেয়ে বিয়ে করে চিরকাল যে তাদের টানতে হবে তাতে সন্দেহ নাস্তি। কাজ কি বাবা অত ঝামেলায়। বরং নিজেরই এখন নগদ কিছু টাকা হাতে পেলে ভাল হয় তার। একটা ভাল চাকরির সন্ধান পেয়েছে, দিল্লী-সিমলের কাজ—ভবিষ্যতের আশা আছে, তবে নগদ পাঁচটি হাজার জমা দিতে হবে। অতএব এই বিয়েটাকেই তাক্ করে আছে মানু ওই টাকার সুরাহার ব্যাপারে। তা সে সুরাহার মুখও একটু দেখা যাচ্ছে। বর্তমান অফিসের বড়কর্তার নাকি তাকে জামাই করে ফেলবার দারুণ ইচ্ছে এবং সেই ইচ্ছের খাতে ওই টাকাটি দিতে পারেন। অবশ্য বিয়ের আনুষঙ্গিক দান-সামগ্রী, বরাভরণ, মেয়ের গহনা ইত্যাদিতে কিছু ঘাটতি হতে পারে, কিন্তু কি লাভ কতগুলো জঞ্জালের স্তূপে?

জঞ্জালের স্তূপ।

সুবর্ণলতার কথাটাই তো বলেছে তার ছেলে, তবে আর অমন সাপে-খাওয়ার মত স্তব্ধ হবার কি আছে সুবর্ণলতার?

ছুটি নিয়ে এল মানু বিয়ে করতে। বড়কর্তার স্ত্রীপুত্র পরিবার সবই কলকাতায়। সত্যিই তাঁরা জঞ্জালটা বেশি দিলেন না। তবে ঘটা-পটার ত্রুটি হলো না। এ পক্ষেও হলো না। বড়লোকের বাড়ি বিয়ে হচ্ছে বলে, মানরক্ষার ব্যাপারে তৎপর হলো মানুর বাপ-ভাই।

সানাই বাজলো তিন দিন ধরে, আলো জ্বললো অনেক, অ্যাসিটিলিন গ্যাসের লাইন চললো বরের সঙ্গে সঙ্গে, এদিকে ছাদ জুড়ে হোগলা ছাওয়া হলো, এঁটো গেলাস কলাপাতায় ফুটপাথ ভর্তি হয়ে গেল, কাকেরা আর কুকুরেরা সমারোহের ভোজ খেয়ে নিশ্চয় শতমুখে আশীর্বাদ করলো।

চাঁপা-চন্নন তো কাছের মেয়ে এলোই, দূরের মেয়ে পারুলও এলো।

আর মায়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই থমকে উঠলো সে, 'এ কী চেহারা হয়েছে মা তোমার?'

তারপর গল্পপ্রসঙ্গে বললো, 'বেশ করছো ওকে লেখাপড়ায় এগোচ্ছো। বিদ্যেটা করে ফেলতে পারলে তবে তো এ প্রশ্ন তোলা যাবে—মেয়েমানুষই বা চাকরি করবে না কেন? মেয়েমানুষেরই বা চিরকুমারী থাকতে ইচ্ছে করলে সে ইচ্ছে পূরণ হবে না কেন? বলা যাবে—মেয়েদেরই বিয়ে না হলে জাত যায়, পুরুষের যায় না, এ শাস্ত্রটা গড়লো কে?'

তারপর বকুলের সঙ্গে একান্তে দেখা হলে হেসে বললে, 'প্রেমের ব্যাপারে কতদূর এগোলি?'

বকুল বললো 'আঃ সেজদি!'

'আঃ কেন বাপু! তবু একজনেরও যদি জীবনে কোন নতুন ঘটনা ঘটে, দেখে বাঁচি।'

'খুব কবিতা লিখছিস বুঝি আজকাল?' বকুল হাসে। অনেক দিন পরে সেজদিকে পেয়ে মনের দরজা খুলে যায় যেন তার। কতদিন একটু সরস কথার মুখ দেখেনি। তাই হেসে হেসে বলে, 'প্রেমের কবিতা? তাই এত ইয়ে—'

পারুল একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে, 'নাঃ, কবিতা আর লিখি না।'

'লিখিস না? মূর্তিমান কাব্যতেই একেবারে নিমগ্ন হয়ে আছিস?'

'তাই আছি।'

পারুলের মুখে কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার মত একটা ম্লান হাসির আভা।

'এই শোন্ সেজদি, বেশি চালাকি করিস না, ইতিমধ্যে কটা খাতা ভরালি দেখবো। এনেছিস তো?'

পারুল উড়িয়ে দেয় সে কথা। তারপর একসময় হেসে উঠে বলে, 'প্রেমের কবিতা বড় ভয়ানক বস্তু রে! ও লোকবিশেষকে জলবিছুটি দেয়। প্রেম ব্যতীত প্রেমের কবিতা এ তার বিশ্বাসের বাইরে।'

'হুঁ!' বকুল আস্তে বলে, 'তার মানে—উচ্চশিক্ষা জিনিসটা শুধু একটা শার্ট-কোটের মত! গায়ের ওপরে চড়িয়ে বাহার দেবার!'

পারুল একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'কি জানি, সর্বত্রই তাই, না কোথাও কোথাও সেটা অস্থিমজ্জায় গিয়ে মিশে চিত্তকে উচ্চে তোলে!'

'এই সত্যি, সেজ জামাইবাবু প্রেমের কবিতা দেখলে চটে?'

'চটে! উঁহু না তো—', পারুল হেসেই বলে, 'চটে না। শুধু বলে, 'গুপ্ত প্রেম না থাকলে এত গভীর প্রেমের কবিতা আসতেই পারে না। পাতায় পাতায় এই যে "তুমি" আর "তোমার" জন্যে হাহাকার, তার লক্ষ্যস্থল যে হতভাগা আমি নয়, সে তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। তা এই প্রেম যখন আইবুড়ো বেলা থেকেই আছে, তখন আর এ হতভাগার গলায় মালা দেওয়া কেন?'

'চমৎকার! কবিরা সব প্রেমে পড়ে পড়ে তবে…'

'থাক্ বকুল, ও কথা রাখ্। তোর কথা বল্। এতদিন এখানে কি হলো-টলো বল্।'

'সে তো মহাভারত!'

পারুল হাসে। পারুল তার ভেতরের সমস্ত বিক্ষোভকে নিজের মধ্যে সংহত রেখে স্থির থাকবে, এই বুঝি পারুলের পণ! অভিমানের কাছে সব 'পরম'কে বলি দেবে এই বুঝি ওর জীবন-দর্শন।

তাই পারুল সব কিছুকে চাপা দিয়ে বলে, 'তবে তো হাতে সুপুরি হর্তুকি নিয়ে বসতে হয় রে! মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।'

তা যে যেভাবেই হোক, এ বিয়েটার উপলক্ষে আমোদ-আহ্লাদটা করলো খুব, নববিবাহিত মানু একদিন নিজের পয়সা খরচ করে সবাইকে নতুন একটা জিনিস দেখালো, বাংলা বায়োস্কোপ!

চন্নন একদিন নতুন বৌয়ের ছুতোয় গুষ্টিবর্গ সবাইকে নেমন্তন্ন করলো। শুধু সব কিছু আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত থাকলো সুবর্ণ। সুবর্ণকে আবার ঘুষঘুষে জ্বরে ধরেছে।

আর বকুল কোনো আমোদে যোগ দেয় না তার স্বভাবগত কুনোমিতে।

তবু সুবর্ণর যেন মনে হয়, অসুস্থ মা একা বাড়িতে পড়ে থাকবে এটা অনুমোদন করছে না বলেই বকুলের এতটা কুনোমি। নইলে সেজদি পারুলের সঙ্গে তো আছে হৃদ্যতা।

বায়োস্কোপ দেখতে, নেমন্তন্ন খেতে দুদিনই মায় প্রবোধ সবাই বেরিয়ে যায়। সুবর্ণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে, যেন দেওয়ালে কত কি লেখা আছে, পড়ছে সেই সব।

সুবর্ণর ছোট ছেলে সুবল কোথায় থাকে বোঝা যায় না, শুধু হঠাৎ এক-একবার এসে ঘরের মাঝখানে স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে পড়ে আস্তে বলে, 'ওষুধ-টষুধ কিছু খাবার ছিল নাকি?' নয়তো বলে, 'বলছিলে নাকি কিছু?' অথবা বলে, 'খাবার রেখে গেছেন ওঁরা?··· জল আছে?'

'তোমার খাবার'—এত স্পষ্ট করে বলে না। শুধু 'খাবার'।

তবু মায়ের জন্যে যে উৎকণ্ঠিত সে, এটা যেন বোঝা যায়।

কিন্তু সুবর্ণর এই ছোট ছেলে যদি এসে বিছানার ধারে বসে পড়ে বলতো, 'মা, তোমার কি বেশী জ্বর এল নাকি?'···কিংবা নীরবে কপালে হাতটা রেখে অনুভব করতে চেষ্টা করতো উত্তাপের মাত্রাটা কতখানি?

হয়তো সুবর্ণ বেঁচে যেত।

তা সে করে না।

শুধু মা'র ধারে-কাছে কোথায় যেন তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একটু কাসির শব্দ পেলেই

দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। হয়তো ওর ইচ্ছে হয়, মা'র বিছানার ধারে বসে মা'র গায়ে হাত রাখে, অনভ্যাসের বশে পারে না। তাই শুধু তার চোখে-মুখে একটা বিপন্ন উৎকণ্ঠার ভাব ফুটে ওঠে।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকলেও সুবর্ণ অনুভব করতে পারে সেই মুখচ্ছবি। তবু সুবর্ণও তো বলে না, 'আয় না সুবল, আমার কাছে এসে একটু বোস না।'

বলে না নয়, বলতে পারে না।

সুবর্ণর সমস্ত অন্তরাত্মা বলবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। তবু বোবা হয়ে থাকে বাক্‌যন্ত্র।

যেন ক্ষুধিত তৃষ্ণার্ত সুবর্ণর হাতেই মজুত রয়েছে তার ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার জল, কিন্তু রয়েছে একটা সীল করা বাক্সে, আর সেই সীল ভেঙে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার ক্ষমতা সুবর্ণর নেই।

॥ ছাব্বিশ ॥

মেয়েরা একে একে বিদায় নিল।

পারুলের যাত্রাকালে বকুল আস্তে বলে, 'ভুল করিস না সেজদি! চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবি তুই?'

পারুল ঈষৎ কঠিন হাসি হেসে বলে, 'চোরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে থালার দখলটা নেবার প্রবৃত্তিও নেই!'

'তা বলে তুই কবিতা লেখা ছেড়ে দিবি? অত ভাল লিখতিস?'

'বকিস না', পারুল হেসে ওঠে, 'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। ভারী তো লেখা। ছেড়ে দিলে পৃথিবীর ভারী লোকসান!'

'পৃথিবীর না হোক, তোর নিজের তো অনেক লোকসান।'

পারুল অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'লবণ-সমুদ্রে বাড়তি একমুঠো নুন ফেললে, কি ইতরবিশেষ হয় বল্ তো? জীবনটাই তো লোকসানের।'

'কিন্তু সেজদি, অমলবাবু তো—'

'আরে কী মুশকিল, তোদের অমলবাবুর নিন্দে করছি নাকি আমি? মহদাশয় ব্যক্তি, স্ত্রীর একটু আরাম-আয়েসের জন্যে ভাঁড়ার ভেঙে খরচা করতে পারেন, শুধু ওই প্রেমের কবিতা চলবে না।'

'বেশ তো, ভগবানের বিষয় নিয়ে লিখবি—'

পারুল ওর মাথাটায় একটু আদরের নাড়া দিয়ে বলে, 'ভারী তো লেখা, তার জন্যে ভেবে ভেবে মুণ্ডুটা তোর গেল দেখছি। 'বিদ্বান-মুখ্যু'দের নিয়ে আবার অনেক জ্বালা রে! ঈশ্বরই যে মানুষের আদি-অনন্তকালের প্রেমাস্পদ, এ ওদের মগজে ঢোকে না। আবেগ

আর ব্যাকুলতা, এ দেখলেই তার মধ্যে আঁশটে গন্ধ পায় ওরা। যাক গে মরুক গে, মাও তো জীবনভোর কত কি লিখলেন, তার পরিণাম তো নিজেই বললি!'

যদিও মা'র ওই 'লেখা' সম্পর্কে খুব একটা উচ্চ ধারণা ছিল না পারুলের, বরং মা'র তীব্রতা, মা'র আবেগ, মা'র সব বিষয়ে তাল ঠুকে প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ করা, এসবকে পারুল খুব অবজ্ঞার চোখেই দেখতো, জানতো মা'র লেখাও ওই পর্যায়ের, কাজেই মূল্যবোধ কিছু ছিল না তার সম্বন্ধে, তবু এখন একটু উল্লেখ করলো।

ব্যর্থতার তুলনা করতে করলো উল্লেখ।

বকুল চুপ করে থাকলো।

বকুলের হঠাৎ সেই এক লহমার জন্য দেখা আগুনের আভায় স্পষ্ট হয়ে ওঠা মুখটা মনে পড়লো।

সে মুখ পরাজিত সৈনিকের, না অপরাজেয় কাঠিন্যের, আজ পর্যন্ত ঠিক করতে পারেনি বকুল।

তা হয়তো পরাজিতেরই।

হয়তো সুবর্ণ ওই দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেওয়ালের লেখা পড়ে না, লেখে সেখানে। অদৃশ্য কালিতে লিখে রাখে বঞ্চনা-জর্জর-পীড়িত আত্মাদের ইতিহাস। না, শুধু তার নিজের কথা নয়, লক্ষ লক্ষ আত্মার কথা। পরবর্তীকাল পড়বে ওই লেখা।

কে জানে তখন আবার তার প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেবে কিনা আর এক নতুন জাতি—উদ্ধত, অবিনয়ী, অসহিষ্ণু, অসন্তুষ্ট, আত্মকেন্দ্রিক!

দেওয়ালের লেখাও তো শেলেটের লেখার মত একবার লেখা হয়, একবার মোছা হয়।

আজ হয়তো এক হৃতসর্বস্ব সৈনিক পরাজয়ের কথা লিখে রেখে যাচ্ছে, আগামী কাল—

কিন্তু সত্যিই কি তবে এবার যাচ্ছে সুবর্ণলতা? তা নইলে এত ভেঙে পড়েছে কেন? উঠতে যদি পারেও, উঠতে চায় না।

বিছানাতেই রাতদিন।

মেজেয় মাদুরের ওপর পাতা বিছানা, ঘরমোছা-ঝি জ্ঞানদা এসে বলে, 'একটু যে উঠতে হবে মা—'

আগে আগে উঠছিল সুবর্ণ, আজকাল বলে, 'আর উঠতে পারি না বাপু, পাশ থেকে মুছে নিয়ে যাও।'

আর মাঝে মাঝে বলে, 'দক্ষিণের ওই বারান্দাটায় একটা চিক্ টাঙিয়ে দিলে ওইখানেই শুতাম—'

প্রবোধ শুনতে পেয়ে রাগ করে বলে, 'ওই খোলা বারান্দায় শোবে? এই নিত্যি জ্বর—'

'ঘুষঘুষে জ্বরে খোলা হাওয়া ভাল', সুবর্ণ একটু হেসে বলে, 'তাছাড়া দক্ষিণের বারান্দায় মরবার যে বড় সাধ আমার।'

'ওসব অলুক্ষুণে কথা বোলো না মেজবৌ—', প্রবোধ গুম্ হয়ে যায়।

সুবর্ণ বলে, 'অলুক্ষুণে কি গো? এখন মরলে জয়জয়কার। যাক্ গে, মরছি না তো— মরবোও না। তবে রাত্তিতে কেসে মরি, তোমার ঘুম হয় না—'

তা কথাটা মিথ্যে নয়।

ও দেওয়ালের একেবারে ওপ্রান্তে উঁচুখাটে ঝালর দেওয়া বালিশ-তাকিয়ায় ঘেরা যে বিছানাটি বড় আরামের শয্যা ছিল, প্রবোধের সেখানে আর নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যাচ্ছে না।

ওই কাসি!

কাসির শব্দ হলেই কেমন যেন ঘরে টিঁকতে পারে না প্রবোধ, দরজা খুলে বেরিয়ে দালানের চৌকিতে এসে বসে।

তবু প্রতিবাদ করে প্রবোধ, 'বাঃ, শুধু আমার ঘুমটাই বড় হলো? তুমিও তো কেসে কেসে—', কিন্তু প্রতিবাদের সুরটা যেন দুর্বল শোনায়।

সুবর্ণ দেওয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'তা নিজেকে তো নিজের কাছ থেকে সরিয়ে নেবার উপায় নেই?'

আজও আবার সেই কথাই ওঠে।

কারণ গতরাত্রে প্রবোধ প্রায় সারারাতই ভিতরদালানে কাটিয়েছে। তবু আজ যেই সুবর্ণ দক্ষিণের বারান্দায় 'চিক' ফেলার কথা বলে, প্রবোধ পাড়া জানিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'এই বকুল, দাদাদের বল্ মুটে ডেকে আমার খাটখানা ওই ছোট ঘরে নিয়ে যাক। ওখানেই শোবো আমি আজ থেকে। কাসির জন্যে নাকি ঘুমের ব্যাঘাত হয় আমার, তাই একটা রুগী যাবে খোলা বারান্দায় শুতে!'

ঘরে দাঁড়িয়ে নয়, ঘর থেকে বেরিয়ে চেঁচায়।

সুবর্ণ যেন সেই চেঁচানিটার দিকেই একটা রহস্যময় ব্যঙ্গহাসির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

ব্যবস্থাটা করে দিল সুবল।

বাবার নয়, মা'র।

কোথা থেকে যেন খানতিনেক চিক আর ত্রিপল এনে বারান্দায় ঝুলিয়ে দিয়ে মা'র বিছানাটা তুলে নিয়ে গেল সেখানে। নিঃশব্দে, সকলের অগোচরে।

বলেছিলও সুবর্ণ সকলের অগোচরে।

সুবর্ণ কি ভেবেছিল হাতে মজুত এই বাক্সটার সীল্ আমি ভাঙবই? তাই বলেছিল

সুবর্ণ, 'সুবল, কখনো তো কিছু অনুরোধ করিনি বাবা, একটা অনুরোধ রাখবি? দক্ষিণের বারান্দায় মরবার বড় শখ হয়েছে। করে দিবি ব্যবস্থা?'

সুবল উত্তর দেয়নি, বোঝা যায়নি করবে কিনা, কিন্তু খানিক পরেই দেখা যায় সুবল বারান্দায় পর্দা ঘিরছে।

॥ সাতাশ ॥

কেদার-বদরি ফেরত মাসখানেক বারাণসীতে কাটিয়ে, দীর্ঘদিন পরে কলকাতায় ফিরলেন জয়াবতী। আর এসেই দুদিন পরে দেখতে এলেন সুবর্ণকে।

দেখলেন নতুন ব্যবস্থা।

দেখলেন জীর্ণ অবস্থা।

কাছে বসে পড়ে বললেন, 'মানুষের ওপর অভিমান সাজে সুবর্ণ, ইট-পাথরের ওপর অভিমান করে নিজেকে শেষ করার বাড়া বোকামি আর কি আছে?'

সুবর্ণ হেসে বলে, 'জানোই তো চিরকেলে বোকা। কিন্তু অভিমানটা ইট-পাথরের ওপর এ কথা কে বললো? যদি বলি সৃষ্টিকর্তার ওপর?'

'তা সে লোকটাও তো ইট-পাথর।'

'তবে নাচার।'

'বৌরা বলছিল, শরীরের ওপর অবহেলা করে-করেই নাকি রোগটি বাধিয়েছ!'

'ওরা "মা" বলে ব্যস্ত হয়, তাই ওকথা বলে, মরণকালে তো একটা কিছু হবেই?'

'তা "কাল"টাকে তো স্বেচ্ছায় ত্বরান্বিত করছিস! শুনলাম, ওষুধ খাস না, পথ্যি খাস না, বৌরা সেবা-যত্ন করতে এলে নিস না—এটা তো ঠিক নয় ভাই।'

সুবর্ণর ব্যাধি-ম্লান চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠলো, তারপর ছায়া হয়ে গেল। বললো, 'ওই তো বললাম, চিরকেলে বোকা!'

জয়াবতী বললেন, 'তা তো জানি। সংসারে যে পুরো খাঁটিতে কাজ চলে না, ন্যায়ে আর অন্যায়ে, সত্যিতে আর মিথ্যেতে আপস করে নেওয়া ভিন্ন যে সংসার অচল, এ কথা তো কখনো বুঝিয়ে পারিনি তোকে। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে নাই বা সরে পড়লি? একজন তো কোন্‌কালে ফেলে চলে গেছে, তুই গেলে যে একেবারে নির্বান্ধব!'

সুবর্ণর সেই দীঘ কালো চোখ দুটো কোটরে বসে গেছে, তবু বুঝি সে চোখ আজও কথা বলতে ভুলে যায়নি। সেই চোখের কথার সঙ্গে মুখের কথাও মেশায় সুবর্ণ, 'যে ফেলে চলে গেছে, সে তোমাকে আজও ভরে রেখেছে জয়াদি, তোমার নির্বান্ধব হবার ভয় নেই।'

'বুঝলাম, খুব জ্ঞান দিলি। তবু দুটো মনের কথা বলারও তো সঙ্গী দরকার? আর তুই কি শেষটা হার মেনে চলে যাবি?'

'পণ ছিল হার মানব না। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার যে সুবর্ণর ওপর বড় আক্রোশ, আর পারছি না। সেবা-যত্নের কথা বলছো জয়াদি, যে যা করতে আসে, কেউ কি অন্তর থেকে করে? সবই লোক-দেখানো।'

জয়াবতী হেসে ফেললেন। বললেন, 'চোখে যেটা দেখা যায় সেটাই দেখতে হয় সুবর্ণ, অন্তরটা দেখতে যাওয়া বিধাতার বিধানের ব্যতিক্রম।'

সুবর্ণ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলে, 'থাক্ জয়াদি, ও নিয়ে তর্ক করা বৃথা! এ কাঠামোয় নতুন করে আর কিছু হবে না। তার চাইতে তুমি যা সব দেখে এলে তার কথা বলো।'

জয়াবতী ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'সে আর বিশদ করে বলতে ইচ্ছে নেই সুবর্ণ। তোর কাছে চিরকালের লজ্জা রয়ে গেল আমার। তীর্থ করেছি না রাতদিন অপরাধের ভারে মরমে মরে থেকেছি—'

'ওমা শোনো কথা—', সুবর্ণ ওকথা চাপা দিতে চেষ্টা করে; কিন্তু জয়াবতী কথাটা শেষ করেন, 'শুধু আমি একা হলে, তোকে ফেলে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু "দল" বড় ভয়ানক জিনিস! ও জিনিসের মায়া থাকে না, মমতা থাকে না, চক্ষুলজ্জা থাকে না। "যাব না" বললে খেয়ে ফেলতো আমায়। আমিই তো উয্যুগী!'

সুবর্ণ বলে, 'যাবে না কি বল? তীর্থ বলে কথা! মহাতীর্থ! জীবনে দুবার সুযোগ আসে না, আমার ভাগ্য আমায়—'

হ্যাঁ, এই একটা জায়গা যেখানে সুবর্ণ সাধারণ মানুষের মত কথা কয়। ভাগ্য নিয়ে আক্ষেপ করে।

'ঠাকুরপোর অসুখ যে শক্ত নয় সে আমি বুঝেছিলাম।' জয়াবতী একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'তবু যাওয়া আটকাতো না যদি ছেলেরা প্রতিকূল না হতো।'

সুবর্ণ হঠাৎ হেসে ওঠে।

খাপছাড়া ভাঙা-ভাঙা।

'শোনো কথা।· জন্মলগ্নই যার প্রতিকূল, তার আবার কে অনুকূল হবে?'

তা এইটাই হয়তো ঠিক কথা।

জন্মলগ্ন নাকি তার রাশি-নক্ষত্রের সৈন্যসামন্ত নিয়ে আজীবন তাড়া করে বেড়ায় মানুষকে, এটা একটা অঙ্কশাস্ত্রের কথা।

কথায় ছেদ পড়লো।

এক হাতে গেলাস, এক হাতে রেকাবি নিয়ে এসে ঢুকলো ভাসুর বৌ। সহাস্যে বললো,

'জেঠিমা তীর্থ থেকে ফিরেছেন, আজ কিন্তু আপনাকে জল না খাইয়ে ছাড়বো না। দেখুন আমি তসর কাপড় পরে, পাথরের বাসনে করে নিয়ে এসেছি।'

জয়াবতী স্মিত মুখে বলেন, 'না জিজ্ঞেস করে এসব করতে গেলে কেন গো পাগলী মেয়ে! আজ যে আমার "সঙ্কটা", কিছু খাব না তো।'

'কিছু খাবেন না?'

'না গো মা-জননী, কিছু না। দেখো দিকি, শুধু শুধু কষ্ট পেলে।'

দুঃখের আর অবধি থাকে না বড়বৌমার, ম্লানমুখে চলে যায়।

চলে গেলে সুবর্ণলতা বলে, 'তুমিও তো বেশ অভিনয় করতে পারো জয়াদি!'

জয়াবতী হেসে বলেন, 'উপায় কি? জগৎটা তো থিয়েটারই। তুমি অভিনয় করতে পারলে না বলেই হেরে মরলে!'

সুবর্ণলতা আস্তে ওর হাতটা মুঠোয় চেপে ঈষৎ চাপ দিয়ে বলে, 'হেরেছি, কিন্তু হার মানিনি।'

জয়াবতী উঠছিলেন, প্রবোধ এসে দাঁড়ালেন, হৈ-চৈ করে বলে উঠলেন, 'এই যে নতুন বৌঠান, তীর্থ টীর্থ হলো? ভালো ভালো। তা দেখছেন তো আপনার সইয়ের অবস্থা? অথচ এক পুরিয়া ওষুধ খাবে না, সেবা-যত্ন নেবে না! আবার এই খোলা জায়গায় এসে শোওয়া। নিজের দোষেই প্রাণটা খোওয়াবে মানুষটা।'

সুবর্ণলতা হঠাৎ দারুণ কাসতে থাকে।

থামতেই চায় না।

প্রবোধ ভয়ার্ত মুখে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই বকুল, কোথায় থাকিস সব? রোগা মানুষ! একটু জলও—আচ্ছা আমি দেখছি—' বলে বোধ করি নিজেই জলের চেষ্টায় বেরিয়ে যায়।

॥ আঠাশ ॥

গঙ্গার জল কত বাড়লো, পৃথিবীর গতি কত বদলালো, তবু 'সমাজ-সামাজিকতা'র লৌহনিগড় থেকে ছুটি নেয় না বুড়ো-বুড়ীরা। শ্যামাসুন্দরীকে এখন কেউ 'সামাজিকতা' করলো না বলে নিন্দে করবে না, তবু তিনি কানুর খোকা হয়েছে শুনে রুপোর ঝিনুকবাটি নিয়ে মুখ দেখতে এলেন। অর্থাৎ চিরকাল যা করে এসেছেন, তা করবেন। সবাই বকতে লাগলো।

উনি বললেন, 'তা হোক তা হোক। প্রবোধের এই প্রথম পৌত্তর। বড় নাতবৌ তো প্রথম "মেয়ে" দেখিয়েছে।'

পোত্তুর!

তাই বটে!

জিনিসটা আরাধনার।

অথচ সুবর্ণলতা বেহুঁশ হয়ে বসেছিল। সোনার হার দিয়ে মুখ দেখার কথা যার। নিজের ত্রুটি দেখে না সুবর্ণ, কেবল পরের ত্রুটিই টের পায়।

সে যাক্, শ্যামাসুন্দরীর ছানি পড়ে আসা চোখেও অবস্থাটা ধরা পড়লো। প্রবোধকে ডেকে বললেন কথাটা, 'বৌমার কি হাল প্রবোধ? ডাক্তার-বদ্যি কিছু দেখিয়েছো?'

প্রবোধ মাথা চুলকে বলে, 'ডাক্তার-বদ্যি, মানে পাড়ার একজন খুব ভালো হোমিওপ্যাথ— তাঁর কাছ থেকেই ওষুধ এনে দিয়েছিলাম। কিন্তু খেলেই না ওষুধ। পড়ে থাকলো। চির-কালের জেদি তো! ওই মনের গুণেই কখনো শান্তি পেল না। তুমি তো দেখেছো মামী, চিরটাকাল সাধ্যের অতিরিক্ত করলাম। তবু কখনো মন উঠলো না।'

শ্যামাসুন্দরী ব্যস্ত গলায় বলেন, 'আহা "মন-মন" করেই বা দোষ দিচ্ছ কেন বাবা? মানুষের দেহেই কি ব্যাধি হয় না?'

শ্যামাসুন্দরী চলে যেতেই প্রবোধ পাড়ার ব্রজেন কবরেজকে ডেকে আনলো।

সুবর্ণলতাকে উদ্দেশ করে দরাজ গলায় বললে, 'এই যে কবরেজ মশাই এসেছেন। নাও এখন বলো, তোমার অসুখটা কী?'

এঁদের দেখেই চমকে উঠে বসে মাথায় কাপড় টেনে দিয়েছিল সুবর্ণ। কবিরাজ মশাই 'কই দেখি তো মা হাতটা—' বলে নিজের হস্ত প্রসারণ করতেই, দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আপনাকে অকারণ কষ্ট দেওয়া হলো কবিরাজ মশাই, কোথাও কোনো অসুখ আমার নেই।'

কবরেজ পাড়ার লোক, সমীহ কম, প্রবোধ তিরিক্ষি গলায় বলে ওঠে, 'অসুখ নেই? অথচ সমানে শুনছি ঘুষঘুষে জ্বর, কেসে কেসে অস্থির—'

সুবর্ণলতা মাথা নেড়ে বলে, 'ও কিছু না।'

' "কিছু না" বলে তো জেদটি দেখাচ্ছো; এদিকে আত্মীয়স্বজন এসে আমায় গালমন্দ করে যায়। কবরেজ মশাই যখন এসেইছেন, একবার না হয় দেখেই যান না! খামোকা দিন দিন শুকিয়েই বা যাচ্ছো কেন, সেটাও তো দেখা দরকার?'

সুবর্ণলতা আরো দৃঢ় গলায় বলে, 'না, দরকার নেই। আপনাকে বৃথা কষ্ট দেওয়া হলো কবরেজ মশাই। আপনি আসুন গিয়ে।'

অর্থাৎ 'আপনি বিদায় হন।'

এমনি করে একদিন কুলপুরোহিতকে তাড়িয়েছিল।

ব্রজেন কবরেজ ফর্সা মানুষ, আরক্ত মুখটা আরো আরক্ত করে বলেন, 'বাড়িতে পরামর্শ করে তবে ডাক্তার-বদ্যিকে "কল" দিতে হয় প্রবোধবাবু!'

প্রবোধবাবু ঘাড় হেঁট করে সঙ্গে সঙ্গে নেমে যান।

'কবরেজ এসেছিলেন দেখানো হয়নি কেন?' বহুকাল আগে যে-বাড়ি ছেড়ে এসেছে ভানু, আজও অবিকল সে-বাড়ির একজনের মত মুখভঙ্গিমায় বলে উঠলো, 'এটার মানে?'

সুবর্ণলতা সে মুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'দরকার নেই বলে।'

'দরকার আছে কি নেই, সেটা চিকিৎসকের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলেই ভালো হতো না?'

সুবর্ণ উঠে বসলো, স্থির গলায় বললো, 'সেই "ভালো"টা অবশ্যই তোমাদের? কিন্তু বলতে পারো, আজীবন কেবলমাত্র তোমাদের ভালোটাই ঘটবে কেন পৃথিবীতে?'

কবরেজের মত মুখ করে ভানুও উঠে গেলো। বলে গেলো—'সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালাটাই এখন প্রধান কাজ হয়েছে তোমার।...আর এখনই বা কেন? চিরকালই।'

খাতার নীচে চিরদিনের মত ঢেরা টেনে দিয়ে চলে গেল বলেই মনে হলো।

আশ্চর্য, একটা মানুষ শুধু মনের দোষেই থাক্ করলো সবাইকে!

'রোগ হয়নি' বলে কবরেজ তাড়ালে। অথচ চিরশয্যা পেতে শুয়ে আছে। মানেটা কি?

তা মানেটা আবিষ্কার করে বৌরা।

চুপিচুপি বলাবলি করে সেটা তারা।

'দেখতেই তো পাওয়া যাচ্ছে রোগটা ভালো নয়, কাসি রোগ ছোঁয়াচে রোগ, তবু ডাক্তার কবরেজ দেখালেই তো হাতেনাতে ধরা পড়া, মেয়ের বিয়ে দিতে বেগ পেতে হবে, তাই—'

তবু মানে একটা আবিষ্কার করেছে তারা, যেটির মধ্যে সুবর্ণলতার সৎবুদ্ধি আর সংসারের প্রতি শুভেচ্ছা দেখতে পেয়েছে তারা। পরের মেয়ে হয়েও পেয়েছে। বরং কানুর বৌ এটাও বলেছে, 'অতিরিক্ত অভিমানী মানুষ! অথচ বাবা একেবারে অন্য ধরনের -- '

কিন্তু এসব তো তারা সুবর্ণলতার সামনে বলে না যে সুবর্ণলতা টের পাবে, তাকে কেবলমাত্র 'মন্দবুদ্ধি' ছাড়াও অন্য কিছু ভাবে কেউ কেউ।

তড়িঘড়ি রোগ নয়, তাই হুড়মুড়িয়ে দেখতে আসার কথা নয়। তবু চন্নন আজকাল মাঝে মাঝেই আসে। শ্বশুরবাড়িতে মনোমালিন্য চলছে, তাই ছুতো করে পালিয়ে আসে।

এসে মা'র কাছে বসে খানিকটা কুশল প্রশ্ন আর খানিকটা হা-হুতাশ করে উঠে যায়। থিয়েটার দেখার ঝোঁকটা প্রবল তার, সেই ব্যবস্থা করতেই ভাজেদের কাছে আসা। ওখান থেকে যেতে গেলেই তো একপাল জা-ননদের টিকিটের দাম গুনতে হবে, ভেতরে যতই মনোমালিন্য থাক, বাইরে সৌষ্ঠব না রাখলে চলে না।

এখানে ও বালাই নেই, বৌ দুটোকে নাচালেই হয়ে যায় ব্যবস্থা। গিন্নীবান্নী একটা

ননদ সঙ্গে যাচ্ছে দেখলে আপত্তি করে না বরেরা। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস তো হলো চন্নেনের, ঝিয়ের সঙ্গে চলে যায়, টিকিট কেনার ঝামেলা ঝিকে দিয়েই মেটে।

থিয়েটার দেখে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে বিদায়গ্রহণ। কদাচ চাঁপাও এসে জোটে। তবে তার ফুরসৎ কম। শ্বশুরবাড়িতে ভারী শাসন।

চন্নন এসেছিল—

যাবার সময় আবার মা'র কাছে একটু বসে গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে বিদায় নেয় চন্নন। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আবার সময় পেলেই আসবো মা!'

সুবর্ণলতা মেয়ের কথার উত্তর দেয় না। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কানুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওদের সব বলে দিও কানু, আমার মরার আগে আর কারুর আসার দরকার নেই। মরলে পরে যেন আসে।'

বললো এই কথা।

মরতে বসেও স্বভাব যায়নি।

পেটের মেয়েকে এই অপমান করলো। মানুষকে অপমান করে করে ওটাই যেন পেশা হয়ে গেছে ওর।

কিন্তু মেয়ে বলে তো এই অপমানটা নীরবে হজম করতে পারে না চন্নন! ভাবতে পারে না রোগা মানুষের কথা ধর্তব্য নয়!

সেও 'আচ্ছা মনে থাকবে—' বলে গটগটিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠে। কানু পিছু পিছু যায় পৌঁছতে।

পরদিনই খবরটা চাঁপার কাছে পৌঁছে যায় এবং বহুবার বলা কথাটাই আবার বলে দুজনে, 'আমরা হচ্ছি সতীন-ঝি! আসল মেয়ে পারুলবালা আর বকুলবালা।'

তদবধি মায়ের আদেশ পালন করেই চলছিলো তারা, আসছিল না, কিন্তু মরতে যে বড় বেশী বিলম্ব করলো সুবর্ণলতা।

কানুর ছেলের অন্নপ্রাশন ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে আট মাস তুলেও যখন বিছানা থেকে তোলা গেল না সুবর্ণকে, তখন প্রবোধ নিজেই হাল ধরে ঘটার আয়োজন করলো। নইলে লোক-সমাজে যে মুখ থাকে না।

সেই সময় অনেক সাধ্য-সাধনা করে মেয়েদের নিয়ে এল প্রবোধ। তা তারা আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিলেও মা'র কাছে ভার-ভার হয়েই থাকলো। শুধু যা একটু প্রণাম, তাও তো শোওয়া মানুষকে প্রণাম নিষেধ!

বকুল বেচারা একবার দিদিদের দিকে, আর একবার মা'র দিকে, ছুটোছুটি করতে লাগলো। পাছে কোনো এক পক্ষ চিরদিনের মত বেঁকে বসে।

কিন্তু বকুলের পরীক্ষা ?

বকুলের জলপানি পাওয়া ? তার কি হলো ?

কিন্তু সে দুঃখের কথা থাক্।

পড়া আর এগোলো কই তার ? সুবর্ণই কারণ !

সুবর্ণলতা পৃথিবীর দিক থেকে পিঠ ফিরিয়েছে, তবু যা বকুলকেই এখনো খুব ঠেলে সরায়নি। বকুল যদি দুধটা সাবুটা এনে দাঁড়ায়, হাত বাড়িয়ে নেয়। আর কেউ আনলেই তো বলে, 'রেখে যাও, খাবো।'

তবু মাঝে মাঝে সুবর্ণ খোঁজ নেয়, 'তোর লেখাপড়ার কি হলো ? মাষ্টারকে বিদেয় করে দিয়েছে বুঝি ?'

বকুল মনে মনে বলে, 'ভগবান, মিথ্যে কথায় দোষ নিও না—', মুখে বলে, 'অসুখ করেছে মাস্টার মশাইয়ের।'

সুবর্ণ আর কথা বলে না, চোখটা বোজে।

বুঝতে পারা যাচ্ছে এবার শেষ হয়ে আসছে। যে মানুষ চিরটা দিন শুধু কথাই বলেছে, 'আর বলবো না' প্রতিজ্ঞা করেও না বলে পারেনি—শুধু সংসারটি নিয়েই নয়, দেশ নিয়ে, দশ নিয়ে, সমাজ নিয়ে, সভ্যতা নিয়ে—রাজনীতি, ধর্মনীতি, পুরাণ-উপপুরাণ সব কিছু নিয়ে কথা বলেছে, আর অপর কেউ তার বিপরীত কথা বললে তাল ঠুকে তর্ক করেছে, সে মানুষের যখন কথায় বিতৃষ্ণা এসেছে, তখন আর আশা করার কিছু নেই।

নেশাখোরের 'কাল সন্নিকট' ধরা যায় তখন, যখন তার নেশার বস্তুটায় অনাসক্তি আসে।

সুবর্ণলতার কথা নেই, এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা নিয়ে যেন ছটফটিয়ে বেড়ায় তার চির-দিনের সব দুর্বাক্যের শ্রোতা, সব অভিযোগের আসামী ! কালীঘাটে পূজো মানত করে আসে সে, ঠনঠনিয়া কালীর খাঁড়াধোওয়া জল চেয়ে নিয়ে আসে।

মাটির ভাঁড়টা বিছানাটার অদূরে নামিয়ে রেখে ভাঙা-ভাঙা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, 'এটুকু বুকে মাথায় বুলিয়ে খেয়ে ফেলো দিকি, কষ্টের উপশম হবে।'

'উপশম হবে ?' সুবর্ণ বলে, 'রাখো, রেখে দাও।'

বেশীক্ষণ ওই রুগীর সামনে বসে থাকতে পারে না প্রবোধ, আসে যায়।

আবার ঘুরে এসে বলে, 'অভক্তি কোরো না মেজবৌ, একেবারে সদ্য খাঁড়া ধোওয়া।'

॥ উনত্রিশ ॥

সুবর্ণ একদিন উঠে বসে হাত বাড়িয়ে নিল জলটা, অনেকদিন পরে একটু হেসে বললো, 'তুমি আমায় খুব ভালোবাসো, তাই না ?'

তা প্রবোধ চমকে গেল বৈকি !

ভালবাসার কথা তুলছে সুবর্ণ !

চমকে গিয়ে এদিক ওদিক তাকালো, ধারে-কাছে কেউ আছে কিনা দেখলো। তারপর কাছে সরে এসে কাঁদো কাঁদো ব্যাকুল গলায় উত্তর দিল, 'এতদিন পরে এই প্রশ্ন তুমি করছো আমায় ? মুখ ফুটে বলতে হবে সে কথা ?'

নাঃ, সত্যিই সুবর্ণ বদলে গেছে।

হয়তো সুবর্ণ পৃথিবীকে ক্ষমা করে যাবে সংকল্প করেছে, তাই বলে উঠলো না—'না, মুখ ফুটে বলতে হবে না বটে, সারাজীবন কাঁটা ফুটিয়ে ফুটিয়েই তো সেটা জানান দিয়ে এসেছ !'

সুবর্ণ শুধু আর একটু হাসলো। তারপর বললো, 'না, বলতে হবে না অবিশ্যি। তবে ভালোই যখন বাসো, আমার একটা শেষ ইচ্ছে পূরণ করো না।'

'শেষ ইচ্ছে ?' প্রবোধ গেঞ্জিটা তুলে চোখ মোছে, তারপর বলে ওঠে, 'একশোটা ইচ্ছের কথা বল না তুমি মেজবৌ—'

'একশোটা মনে আসছে না। আপাততঃ একটাই বলছি—মেজ ঠাকুরঝিকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।'

মেজ ঠাকুরঝি !

তার মানে সুবালা ?

প্রবোধ যেন শূন্য থেকে আছাড় খায়।

মেয়ে নয়, জামাই নয়, নাতি-নাতনী নয়, ভাই-ভাইপো নয়, দেখতে ইচ্ছে হল কিনা মেজ ঠাকুরঝিকে ?

তাজ্জব !

তা তাজ্জব করাই পেশা ওর বটে।

বেশ, সেটাই হবে।

তড়বড় করে বলে উঠল প্রবোধ, 'এমন একটা আজগুবী ইচ্ছেই যখন হয়েছে তোমার, তা সেই ব্যবস্থাই করছি।'

•

প্রবোধের কথাটা অযৌক্তিক নয়, যে শুনলো সুবর্ণর শেষ ইচ্ছে, অবাকই হলো। আজগুবী ছাড়া আর কি ? এত দেশ থাকতে—চারটে ননদের মধ্যেকার একটা ননদকে দেখবো, এই হলো একটা মানুষের জীবনের শেষ ইচ্ছে ? এই আবদারটুকু করেছে মুখ ফুটে ?

তাও যদি সমবয়সী ননদ হতো !

তাও যদি জলজলাট অবস্থার হতো !

হাস্যকর !

কিন্তু অভাগার ভাগ্যে বুঝি তুচ্ছও দুর্লভ।

সেখানেও তো মস্ত বাধা।

সুবালা যে তার শেষদিকের মেয়েগুলোকে ঝপাঝপ যা-তা বিয়ে দিচ্ছে! একটাকে চক্রবর্তীর ঘরে, একটাকে ঘোষালের ঘরে, একটাকে নাকি বারেন্দ্রর ঘরে, আবার শোনা যাচ্ছে ছোটটাকেও নাকি ওইরকম কি একটা ধরে দেবে বলে তোড়জোড় করছে।

শহুরে নয়, ফ্যাশানি নয়, পয়সাওলা নয়। তবু এত সাহস! দেশে গ্রামে বসে এত স্বেচ্ছাচার!

মরুক গে যা খুশি করুক গে। ছেলেমেয়ের বিয়েতে 'পোস্টে' একটা পত্তর দেওয়া ছাড়া যোগাযোগ তো ছিলই না, কে ওই রাবণের গুষ্টিকে 'এসো বোসো' বলে ডাকবে? আসতে যেতে ভাড়া গুনতেই তো ফতুর হতে হবে। সবাই ভেবে রেখেছিল, অতএব এই পত্তরখানাও এবার বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু এখন আবার এই সমস্যা!

অথচ ঝপ করে কথা দিয়ে ফেলা হয়েছে মৃত্যুপথযাত্রিণীর কাছে। তার উপায়? এ সমস্যার সমাধান করলো কানু। বললো, 'এ তো আর আপনি কোনো সামাজিক কাজে আনছেন না বাবা, এ:ত আর কি হচ্ছে? মা যখন মুখ ফুটে বলেছেন—'

ছেলের সমর্থন পেয়ে ভরসা পেলো কানুর বাবা।

অতএব সুবালা এল।

আনতে গেল ও-বাড়ির বুদো।

যে নাকি আশপাশের সকলেরই ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো! 'কায়ে' পড়ে প্রবোধ নিজে খরচাপত্তর ধরে দিয়ে অনুরোধ করে এল তাকে।

'মেজ জেঠির শেষ অবস্থা। তোমায় দেখতে চেয়েছে।'

এ খবর শুনে পর্যন্ত সেই যে কান্না শুরু করেছিল সুবালা, সে আর থামে না। চোখ মুছে মুছে আঁচলটা তার ভিজে শপ্‌শপে হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো ফুলে লাল।

আরো দুটো দাঁত পড়ে সারা মুখটাই যেন তার আজকাল হাস্যকর বিকৃতির একটা প্রতীক! কেঁদে আরো কিম্ভুত!

বাড়ি ঢুকেই প্রবোধের পায়ে একটা প্রণাম ঠুকে উথলে উঠে বলে, 'আছে?

প্রবোধও উথলে বলে, 'আছে এখনও, তবে বেশীদিন থাকবে না।'

'বেশীক্ষণ নয়, বেশী দিন!' তবু ভালো।

'জ্ঞানে আছে?'

'তা টনটনে!'

'ঠাকুর রক্ষে কোরো। কথা-টথা বলছে?'

'বলছে অল্পস্বল্প।'

অতএব একটু ঠাণ্ডা হয় সুবালা, চোখেমুখে জল দিয়ে রুগীর কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। প্রবোধ এবার চড়া গলায় বলে, 'মেয়েগুলোর অঘরে-কুঘরে বিয়ে দিচ্ছিস শুনলাম…'

সুবালা ওর স্বভাবে কান্নায় ফোলা চোখেও হেসে ফেলে।

'অঘর-কুঘর নয় মেজদা, তবে স্বঘর নয়।'

'তার মানেই তাই। তা এ মতিচ্ছন্নের কারণ?'

'কারণ আর কি?' সুবালা দিব্যি সপ্রতিভ গলায় বলে, 'অভাবেই স্বভাব নষ্ট! হাতে নেই কানাকড়ি, ঘরে একগণ্ডা বিয়ের যুগ্যি মেয়ে! নীচু ঘরেরা অমনি হাতে নিয়ে গেল—'

'গলায় দড়ি তোর! এর চেয়ে মেয়েগুলোকে গলায় পাথর বেঁধে পুকুরে ফেলে দিলেই হতো।'

সুবালা শিউরে উঠে বলে, 'দুগ্‌গা দুগ্‌গা! কি যে বল মেজদা! আমার কুলীনগিরিটা ওদের প্রাণের থেকে বড় হলো? ভাল ঘরে পড়েছে, খেয়ে পরে সুখে আছে, এই সুখ। তাতে লোকে আমায় "একঘরে" করে করুক।'

বোনের সম্পর্কে কোনোকালেও কোনো দায়িত্ববোধ না থাকলেও তার এই দুঃসাহসী কথায় খিঁচিয়ে ওঠে দাদা, 'একঘরে করে করুক? ভারী পুরুষার্থ হলো! অমূল্যটাও বুঝি এমনি গাড়োল হয়ে গেছে আজকাল?'

সুবালা এ অপমান গায়ে মাখে না। শালা-ভগ্নিপতি সম্পর্ক, বলেই থাকে অমন। সুবালা তাই হেসে বলে, 'তা যা বলো! মোট কথা নিজের কুলের বড়াইটি নিয়ে বসে থাকবো, ওদের মুখ চাইবো না, এতো স্বার্থপর হতে পারলাম না মেজদা! স্বঘরের কেউ কি আমার মুখ চাইলো? আর আমার এসব কুটুমরা! একেবারে পায়ের কাদা। যাক্ গে বাবা ওসব কথা, এখন যাকে দেখতে এসেছি…বাড়ি তো খাসা করেছ—মেজবৌয়েরই ভোগে নেই—', আর একবার উথলে ওঠে সুবালা, আর একবার সে জল ঘষে ঘষে মুছে ফেলে দোতলায় উঠে যায় মেজদার পিছু পিছু।

'কেঁদেই মলো!'

সুবর্ণ বহুদিন পরে ভারী মিষ্টি হাসি হাসে। মুখের লাবণ্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবু কাঠামোটা আছে। সেই কাঠামোখানাই যেন উজ্জ্বল দেখায়।

সুবালা এসেই ওর বিছানার ধার চেপে বসেছিল, সুবর্ণ নিষেধ করেনি।

সুবর্ণ তার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। সুবালার কান্না দেখে সেই হাতে একটি নিবিড় গভীর চাপ দিয়ে মিষ্টি হেসে বলে, 'কেঁদেই মলো!'

'ভাল থাকতে আমি মরতে একবারও এলাম না!'

বুজে আসা গলায় আক্ষেপ করে সুবালা।

অন্যকে অভিযোগ করে না। বলে না, 'এত ছেলে-মেয়ের বিয়ে গেলো, একবার আনলে না আমায়!' ও অভিযুক্ত করলো নিজেকে, 'ভাল থাকতে একবার এলাম না আমি!'

সুবর্ণ হাতে ধরা হাতটায় আর একটু চাপ দিয়ে বলে, 'তোমার মতন মনটা যদি সবাইয়ের হতো মেজ ঠাকুরঝি! কাউকে দোষ দেওয়া নেই, কোখাও কোনো অভিযোগ নেই, সুন্দর!'

তারপর জিজ্ঞেস করে ওর ছেলে-মেয়েদের কথা।

কে কত বড় হলো, কার কার বিয়ে হলো? কিন্তু উত্তরের দিকে কি মন ছিল সুবর্ণর? প্রশ্ন করছিল শুধু, উপযুক্ত প্রশ্নের অভাবে। একথা-সেকথার পর হঠাৎ বলে ওঠে, 'আচ্ছা, তোমার সেই বাউণ্ডুলে দ্যাওরটির খবর কি? সেই যাকে আমি বাড়িতে ঢুকতে দিইনি, দরজা থেকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম?'

'দুগ্‌গা দুগ্‌গা! তাড়িয়ে আবার কি!···অম্বিকা ঠাকুরপোর কথা বলছো তো?' সুবালা ব্যস্ত গলায় বলে, 'তুমি বলে তাকে কতো ভালোবাসো! সেও মেজবৌদি বলে—।' থেমে যায় সুবালা নেহাৎই গলাটা বুজে আসায়।

'জানি!' সুবর্ণ একটু থামে, তারপর যেন কৌতুকের গলায় বলে, 'তা সে ঘর-সংসারী হয়েছে? না আবার জেলে ঢুকে বসে আছে?'

'ঘর-সংসারী?' সুবালা বিষণ্ণ গলায় বলে, 'পোড়া কপাল আমার! সে আবার ঘর-সংসারী হবে? সে তো বিবাগী হয়ে গেছে।'

'বিবাগী!'

হাত ধরা মুঠোখানা শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ে! প্রশ্ন-হারানো বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকে সুবর্ণ যেন ওই অদ্ভুত কথাটার দিকেই।

সুবালা আঁচলের ভিজে কোণটা দিয়েই আবার চোখটা মুছে নিয়ে ধরা গলায় বলে, 'তা বিবাগী ছাড়া আর কি! কোথায় কোথায় ঘোরে, ন-মাসে ছ-মাসে একখানা চিঠি দেয়। পায়ে হেঁটে নাকি ভারত ঘুরছে। তোমাদের ননদাই বলে, আবার হয়তো লাগবে ব্রিটিশের পেছনে, তাই দল যোগাড় করছে। আমার তা বিশ্বাস হয় না ভাই। গেরুয়াই নেয়নি, নচেৎ ও তো সত্যিই একটা বৈরিগী উদাসীন! এ জগৎ ছাড়া, অন্য এক জগতের মানুষ! নিজের জন্য কানাকড়ার চিন্তা নেই, অথচ কোথাও কিছু অন্যায় অবিচার দেখলো তো আগুন। সেই যেবার এখানে এসেছিলো—', হঠাৎ একটু সামলে নেয় সুবালা। অবোধ হলেও যেন বুঝতে পারে, সেদিনের কথা আর না তোলাই ভালো। তাই বলে, 'সেই তাঁর কদিন পরেই বাড়ি-ঘর বেচে দিয়ে চলে গেল। বলে গেল, "এই ভারতবর্ষে বাংলা দেশের

মতন অভাগা দেশ আরও কটা আছে দেখবো।”·· মনে মনে তাই ভাবি মেজবৌ, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস, গারদে ভরা আছিস, কী আর করবি? তুই যদি বেটাছেলে হতিস, নির্ঘাত ওই অম্বিকা ঠাকুরপোর মতন হতিস্! সংসারবন্ধনে বেঁধে রাখা যেত না তোকে। স্রেফ কোন দিন “জগৎ দেখবো” বলে পথে বেরিয়ে পড়তিস!'

'মেজ ঠাকুরঝি!'

সুবর্ণ যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

সুবর্ণ আবার ওর হাতটা চেপে ধরে।

আর সুবর্ণর সেই আর্তস্বরটা যেন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আস্তে ঝরে পড়ে, 'এই কথা ভাবো তুমি? অথচ কদিনই বা দেখলে তুমি আমাকে! আর যারা জীবনভোর দেখলো—'

সুবালা বুদ্ধিহীন, কিন্তু সুবালা অনুভূতিহীন নয়। তাই সেই ঝরা-স্বরের মৃদু মূর্ছনার উপর আর কথা চাপায় না। শুধু চুপ করে বসে থাকে। অনেকক্ষণ বসে থাকে।

তারপর, অনেকক্ষণ পর সেই নীরবতা ভেঙে উদ্বিগ্ন গলায় বলে, 'হাতটা যে তোমার বড্ড ঘামছে মেজবৌ!'

॥ ত্রিশ ॥

ওই ঘামটাই হলো শেষ উপসর্গ।

দু দিন দু রাত্তির শুধু ঘামছে।

হাত থেকে কপাল, কপাল থেকে সর্বাঙ্গ। মুছে শেষ করা যাচ্ছে না।

তা হয়, সকলেরই শুধু মরণকালে এরকম হয়।

ওই ঘামটাই যেন জানান দিয়ে বলে, 'পৃথিবীর জ্বর ছাড়ছে তোমার এবার!'

জেদী রোগী নিয়ে ভুগেছে এতদিন সবাই. চিকিৎসা করতে পারেনি সমারোহ করে, আর এখন তার জেদ মানা চলে না। এখন অভিভাবকদের হাতে এসে গেছে রোগী। অতএব দুদিনেই দুশো কাণ্ড! যেখানে যত বড় ডাক্তার আছে, সবাইকে এক-একবার এনে হাজির করবার পণ নিয়েছে যেন সুবর্ণলতার ছেলেরা।

কদিন আগেই মানুকে চিঠি লেখা হয়েছিল 'শেষ অবস্থা, দেখতে চাও তো এসো'। মানুও এসে পড়লো ইতিমধ্যে। আর চিকিৎসার তোড়জোড়টা সে-ই বেশী করলো।

বিয়ের ব্যাপারে মাকে মনঃক্ষুণ্ণ করেছিল, সে বোধটা ছিল একটু। এসে একেবারে এমন দেখে বড় বেশী বিচলিত হয়ে গেছে। তাই বুঝি ত্রুটি পূরণ করতে চায়।

প্রথমটা অবশ্য প্রবোধ অনুমতি নিয়েছে। সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে বলেছে, 'আর জেদ করে কি হবে মেজবৌ, চিকিচ্ছে করতে দাও! তুমি বিনি চিকিচ্ছেয় চলে যাবে, এ আপসোস রাখবো কোথায়?'

মেজবৌ ওই ঘামের অবসন্নতার মধ্যেও যেন হাসে একটু, 'আপসোস রাখবার জায়গা ভেবে কাতর হচ্ছ? তবে তো জেদ ছাড়তেই হয়! কিন্তু আর লাভ কি?'

'লাভের কথা কি বলা যায়?' মেজবৌকে এতগুলো কথা বলতে দেখে যেন ভয়টা কমে ভরসা আসে প্রবোধের। তাহলে হয়তো সত্যি নিদানকাল নয়, সাময়িক উপসর্গ। নাড়ি ছেড়ে গিয়েও বেঁচে যায় কত লোক!

তাই ব্যস্ত হয়ে, 'লাভের কথা কি বলা যায়? চামড়া ফুঁড়ে ওষুধ দেবার যে ব্যবস্থা হয়েছে আজকাল, তাতে নাকি মন্তরের মতন কাজ হয়।'

'চামড়া ফুঁড়ে?' সুবর্ণ এবার একটু স্পষ্ট হাসিই হাসে। নীল হয়ে আসা ঠোঁটের সেই হাসিটা কৌতুকে ঝলসে ওঠে, 'তা দাও।'

পাওয়া গেল অনুমতি।

অতএব চললো রাজকীয় চিকিৎসা।

পরে আবার আপসোস রাখবার জন্যে জায়গা খুঁজতে হবে না সুবর্ণলতার স্বামী-পুত্রকে।

শুধু চিকিৎসাতেই নয়, শেষ দেখা দেখতে আসার সমারোহও কম হল না। প্রবোধের তিনকূলে যে যেখানে ছিল, প্রবোধের এই দুঃসময়ের খবরে ছুটে এল সবাই। খবরদাতা বুদো। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এল। মেজ জেঠিকে সত্যই বড় ভালবাসতো ছেলেটা ছেলেবেলায়। সময়ের ধুলোয় চাপা পড়ে গিয়েছিল সেই অনুভূতি। হঠাৎ এই 'শেষ হয়ে যাচ্ছে'র খবরটা যেন উড়িয়ে দিয়ে গেলো সেই ধুলো।

তা বুদো বলেছে বলেই যে সবাই আসবে, তার মানে ছিল না। বুদো যদি নিজের মা'র শেষ খবরটা দিয়ে বেড়াতো, কজন আসতো?

সুবর্ণলতা বলেই এসেছে।

এটা সুবর্ণলতার ভাগ্য বৈকি।

এত কার হয়?

তা সুবর্ণলতার দিকে যে এরা সারাজীবন সবাই তাকিয়ে দেখেছে!

ভাগ্য সুবর্ণকে মগডালে তুলেছে, অথচ নিজে সে সেখান থেকে আছড়ে আছড়ে মাটিতে নেমে এসে ঘূর্ণি-ঝড় তুলেছে। এ দৃশ্য একটা আকর্ষণীয় বৈকি।

তাই তাকিয়েছে সবাই।

আর যার দিকে সারাজীবন তাকিয়ে থেকেছে, তার তাকানোটা জীবনের মত বন্ধ হয়ে যাবার সময়, দেখবার সাধ কার না হয় ?

আসেনি শুধু তাদের কেউ, যেখান থেকে সুবর্ণ নামের একটা ঝক্‌ঝকে মেয়ে ছিটকে এসে এদের এখানে পড়েছিল। তাদের কে খবর দিতে যাবে? তাদের কথা কার মনে পড়েছে? কে বলতে পারে খবর পেলেও আসতো কি না? সেখানে তো অনেকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে সুবর্ণর।

কিন্তু প্রবোধের গুষ্টিও তো কম নয়।

তাতেই বিরাম নেই এই ছুদিন।

এসে দাঁড়াচ্ছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত চীৎকারে রোগিণীকে সম্বোধন করে আপন আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত করে দিতে চাইছে, তাদের জানার জগতে মৃত্যুকালে কার কার এমন ঘাম হয়েছিল সেই আলোচনা করছে সেই ঘরে বসে, এবং রোগিণীর 'জ্ঞান চৈতন্য নেই'ই ধরে নিয়ে হা-হুতাশ করছে।

তবে সকলেই কি ?

ব্যতিক্রমও আছে বৈকি।

পুরুষরা সবাই এরকম নয়।

এদিক থেকে খবর নিয়েও বিদায় নিচ্ছে অনেকে।

জিজ্ঞেস করছে, 'কথা কি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে?···চোখ কি একেবারে খুলছেন না? গঙ্গাজল আছে তো হাতের কাছে? তুলসীগাছ নেই বাড়িতে?'

শুভানুধ্যায়ীরই কথা!

কিন্তু স্বভাব যায় না মলে, এ কথাটা সত্যি বৈকি।

নইলে মৃত্যুর হাতে হাত রাখা মানুষটাও কারুর শত ডাকেও চোখ খুলছে না, আবার কারুর এক ডাকেই টেনে টেনে খুলছে চোখ।

ময়লা কাপড় ছেঁড়া গেঞ্জি পরা আধবুড়ো দুলো যখন কাছে এসে ফুঁপিয়ে বলে উঠলো, 'মেজমামী!' তখন তো আবার কথাও বেরোলো গলা থেকে! অস্পষ্ট, তবু শোনা গেল— 'পালাও, মারবে!'

তা এ অবিশ্যি প্রলাপের কথা।

এক-আধটা অমন ভুল কথা বেরোচ্ছে মুখ থেকে।

তবে ঠিক কথাও বেরোচ্ছে।

বিরাজের বর যখন এসে বসেছিল মাথার কাছে, বিরাজ চেঁচিয়ে বলেছিল, 'মেজবৌ,

দেখ কে এসেছে।' তখন আস্তে হাত দুটো জড়ো করবার বৃথা চেষ্টায় একবার কেঁপে উঠে বলেছিল, 'ন-মোস-কার।'

ভুলটা বাড়লো রাত্রের দিকে।

সারারাত্তির ধরে কত কথা যেন কইল। কত যেন শপথ করলো। আবার একবার প্রবোধের দিকে তাকিয়ে স্পষ্টই বললো—'ক্ষমা!'

ক্ষমা চাইলো?

না ক্ষমা করে গেল?

কে বলে দেবে সে রহস্য?

যারা কাছে ছিল তারা অবশ্য ধরেই নিলো ক্ষমা চাইলো। অনেক দৌরাত্ম্য তো করেছে স্বামীর ওপর!

কিন্তু তারপরে এসব কথা বলছে কেন প্রলাপের মধ্যে?

'বলেছিলাম আর চাই না। যাবার সময় বলে যাচ্ছি, চাই। এই দেশেই, মেয়েমানুষ হয়েই।......শোধ নিতে হবে না?'

কে জানে কি চাইছিল সে, কিসের শোধ নেবার শপথ নিচ্ছিল!

প্রলাপ! প্রলাপের আর মানে কি?

সারারাত যমে-মানুষে যুদ্ধ চললো। রাত্রিশেষে যখন পূব আকাশে দিনের আলোর আভাস দেখা দিয়েছে, তখন শেষ হলো যুদ্ধ।

পরাজিত মানুষ হাতের ওষুধের বড়ি আছড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠলো। বিজয়ী যম নিঃশব্দে অদৃশ্য পথে অন্তর্হিত হলো, জয়লব্ধ ঐশ্বর্য বহন করে।

ছড়িয়ে পড়লো ভোরের আলো।

তুলে দেওয়া হলো বারান্দা-ঘেরা ত্রিপল আর চিক্। দক্ষিণের বারান্দার পূব কোণ থেকে আলোর রেখা এসে পড়লো বিছানার ধারে। মৃত্যুর কালিমার উপর যেন সৌন্দর্যের তুলি বুলিয়ে দিল।

•

সুবর্ণলতার শেষ দৃশ্যটি সত্যিই বড় সুন্দর আর সমারোহের।

এ মৃত্যুতে দুঃখ আসে না, আনন্দই হয়।

কেন হবে না? যদি কেউ জীবনের সমস্ত ভোগের ডালা ফেলে রেখে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়, তার মৃত্যুটা শোচনীয়, সে মৃত্যু দুঃখের। আবার বয়সের বিষকীটে জীর্ণ হয়ে যারা শেষ পর্যন্ত অপরের বিরক্তির পাত্র হয়ে উঠে প্রতিনিয়ত জীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে অবশেষে মরে, তাদের মৃত্যুটা নিশ্চিন্ততার, হাঁফ ছেড়ে বাঁচার। যেমন মরেছিলেন মুক্তকেশী।

মুক্তকেশীর উনআশী বছরের পুরানো খাঁচাখানা থেকে যখন বন্দীবিহঙ্গ মুক্তিলাভ করলো, তখন তাঁর আধবুড়ো আর আধ-পাগলা ভাইপোটা লোক হাসিয়ে 'পিসিমা গো পিসিমা গো' করে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদলেও, বাকী সকলেই তো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। মুক্তকেশীর পরম মাতৃভক্ত ছেলেরা পর্যন্ত!

সে তো শুধু মুক্তকেশীর প্রাণপাখীরই মুক্তি নয়, ছেলেদের আর বৌদেরও যে পাষাণভার থেকে মুক্তি!

কিন্তু সুবর্ণলতার কথা স্বতন্ত্র।

সুবর্ণলতা পরিপূর্ণতার প্রতীক।

ফলে, ফুলে, ব্যাপ্তিতে, বিশালতায় বনস্পতির সমতুল্য।

এমন বয়সে আর এমন অবস্থায় মৃত্যু হলো সুবর্ণলতার যে, সে মৃত্যু অবহেলা করে ভুলে যাবারও নয়, শোকে হাহাকার করবারও নয়।

জলজলাট জীবন, জলজলাট মৃত্যু!

আজীবন কে না হিংসে করেছে সুবর্ণলতাকে? তার জায়েরা, ননদেরা, পড়শিনীরা, এরা-ওরা। সেই ছোট্ট থেকে দাপটের ওপর চলেছে সুবর্ণলতা। কাউকে ভয় করে চলেনি, রেয়াত করে চলেনি। অমন যে দুর্ধর্ষ মেয়ে মুক্তকেশী, তিনি পর্যন্ত হার মেনেছেন সুবর্ণলতার কাছে। সেই দাপটই চালিয়ে এসেছে সে বরাবর। ভাগ্যও সহায় হয়েছে। আশেপাশের অনেকের মাথার চাইতে মাথা উঁচু হয়ে উঠেছিল সুবর্ণলতার।

টাকাকড়ি, গাড়িবাড়ি, সুখ-সম্পত্তি, কী না হয়েছিল? সংসার-জীবনে গেরস্তঘরের মেয়েবৌয়ের যা কিছু প্রার্থনীয়, সবই জুটেছিল সুবর্ণলতার ভাগ্যে!

তাই সুবর্ণলতার মৃত্যুতে 'ধন্যি-ধন্যি' পড়ে গেল চারিদিকে। সবাই বললো, 'হ্যাঁ, মরণ বটে। কটা মেয়েমানুষ এমন মরা মরতে পারে?'

কেউ কেউ বা বেশি কায়দা করে বললো, 'মরা দেখে হিংসে হচ্ছে! সাধ যাচ্ছে মরি!'

আর হয়তো বা শুধু কায়দাই নয়, একান্তই মনের কথা। বাঙালীর মেয়ে জন্মাবধিই জানে জীবনে প্রার্থনীয় যদি কিছু থাকে তো 'ভাল করে মরা'।

শাঁখা নিয়ে সিঁদুর নিয়ে স্বামীপুত্রের কোলে মাথা রেখে মরতে পারাই বাহাদুরি! বাল্যকাল থেকেই তাই ব্রত করে বর প্রার্থনা করে রাখে—'স্বামী অগ্রে, পুত্র কোলে, মরণ হয় যেন গঙ্গার জলে!'

মৃতবৎসা বিরাজ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'সেই যে বলে না—পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই ভাগ্যের কথাতেও সেই কথাই বলতে হয়! মরে না গেলে তো বলবার জো নেই "ভাগ্যবতী"? মেজবৌ গেল, এখন বলতে পারি, কপালখানা করেছিল বটে! এতখানি বয়েস হয়েছিল, ভাগ্যের গায়ে কখনো যমের আঁচড়টি পড়েনি। সব

দিকে সব বজায় রেখে, ভোগজাত করে কেমন নিজের পথটি কেটে পালিয়ে গেল!'

তা বিরাজের কাছে এটা ঈর্ষার বৈকি! বিরাজ চিরদিনই ভাজ মেজবৌকে ভালবেসেছে যেমন, ঈর্ষা করেছে তেমন।

বিরাজের শ্বশুরবাড়ি অবস্থাপন্ন, বিরাজের বর দেখতে সুপুরুষ, তবু বিরাজের মনে শান্তি কোথায়? সর্বদাই তো হাহাকার।

কাছাকাছি বয়েস, একই সময়েই প্রায় সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে দুজনের, কিন্তু ফলাফল প্রত্যেকবারই দুজনের ভিন্ন। বড়লোকের বৌ বিরাজ, যেই একবার করে সেই সম্ভাবনায় ঐশ্বর্যবতী হয়ে উঠেছে, তার জন্যে দুধের বরাদ্দ বেড়েছে, মাছের বরাদ্দ বেড়েছে, তার জন্যে ঝি রাখা হয়েছে। তবু পূর্ণতার পরম গৌরবে পৌঁছবার আগেই আবার শূন্য কোল আর ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে এসে পড়তে হয়েছে তাকে, সেবা খেতে, সান্ত্বনা পেতে।

অথচ সুবর্ণলতা!

সুবর্ণলতা আঁতুড়ে ঢোকবার ঘণ্টা পর্যন্ত দৌড়-ঝাঁপ করে বেড়িয়েছে, দু-চার ঘণ্টার মেয়াদে হৃষ্টপুষ্ট একটা শিশুর আমদানি করেছে, আঁতুড়ঘরের সর্ববিধ বিঘ্ন-বিপদ অবহেলায় অতিক্রম করে যথানির্দিষ্ট দিনে ষষ্ঠীর কোলে একুশ চুপড়ি সাজিয়ে দিয়ে নেয়ে ধুয়ে ঘরে উঠেছে।

সবটাই তো বিরাজের চোখের উপর।

বিরাজ গহনা-কাপড়ে ঝলমলিয়ে এসে বসতো, শ্বশুরবাড়ির মহিমার গল্পে পঞ্চমুখ হতো, বাপের বাড়ির সমালোচনায় তৎপর হতো, আর তারপর ভাইপো ভাইঝিদের কোলে-কাঁখে টেনে তাদের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে, নিঃশ্বাস ফেলে গাড়িতে উঠতো গিয়ে।

অন্য আর তিন বৌয়ের ছেলেমেয়ে তবু সরু-মোটায় মিশানো, মেজ বৌয়ের সব কটি পাথরকুচি।

কত বা দুধ খেয়েছে সুবর্ণ, কত বা মাছ খেয়েছে? গেরস্থঘরের চারটে বৌয়ের একটা বৌ, আর সব বৌ কটাই তো একযোগে বংশবৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করে চলেছে। উমাশশী সব আগে শুরু করেছিল, সব শেষে ছোট বৌ বিন্দুর সঙ্গে সারা করেছে!

তবু ওদের তিনজনের কোনো না কোনো সময়ে কিছু না কিছু ঘটেছে, শুধু অটুট স্বাস্থ্যবতী মেজবৌয়ের 'জেঁওজ' ঘরে কখনো চিড় খায়নি। সেই কথা নতুন করে মনে পড়লো বিরাজের।

এসেছিল উমাশশী, গিরিবালা, বিন্দু।

সুবর্ণলতার মরণ দেখে হিংসে করল তারাও।

বলল, 'ভাগ্যি বটে! ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা! তার সাক্ষী দেখ, চার

ভাইয়ের মধ্যে মেজবাবুই বংশছাড়া, গোত্রছাড়া। চিরটাকাল মেজগিন্নীর কথায় উঠেছেন বসেছেন।···আর শুধুই কি স্বামীভাগ্য? সন্তানভাগ্য নয়? ছেলেগুলি হীরের টুকরো, মেয়েগুলি গুণবতী! ভাগ্যবতী ভাগ্য জানিয়ে মরলোও তেমনি টুপ করে।'

'টুপ করে' কথাটা অবশ্য অত্যুক্তি। স্নেহের অভিব্যক্তিও বলা চলে। তবু বললো।

বড় মেয়ে চাঁপাও কেঁদে কেঁদে আক্ষেপ করতে লাগলো, 'কর্পূরের মত উপে গেলে মা, প্রাণ ভরে দুদিন নাড়তে চাড়তে অবসর দিলে না!'

ছেলেরা বৌরা অবিশ্যি বড় ননদের এই আক্ষেপে মনে মনে মুচকি হাসলো। কারণ ঝাড়া হাত পা গিন্নীবান্নী হয়ে যাওয়া চাঁপাকে অনেকবার তারা খোশামোদ করে ডেকেছে মাকে একটু দেখতে। শাশুড়ী বৌদের দূরে রাখতেন, যদি মেয়ে এলে ভাল লাগে!

চাঁপা তখন আসতে পারেনি!

চাঁপা তখন ফুরসৎ পায়নি।

চাঁপার সংসার-জ্বালা বড় প্রবল।

তখন চাঁপার শাশুড়ীর চোখে ছানি, পিসশাশুড়ীর বাত, খুড়শ্বশুরের উদরী, দ্যাওরপোদের, হাম-পানবসন্ত, নিজের ছেলেদের রক্ত-আমাশা, হুপিং কাসি। তা ছাড়া চাঁপার ভাসুরঝির বিয়ে, ভাসুরপোর পৈতে, ভাগ্নীর সাধ, মামাশ্বশুরের শ্রাদ্ধ, আর সর্বোপরি চাঁপার বরের মেজাজ। পান থেকে চুন খসবার জো নেই! গামছাখানা এদিক-ওদিক থাকলে রাক্ষসের মত চেঁচায়, তামাকটা পেতে একটু দেরি হলে ছাত ফাটায়।

চাঁপা অতএব মাতৃসেবার পুণ্য অর্জন করতে পেরে ওঠেনি। ভাইয়েরা যখনই ডেকেছে, চাঁপা তার সংসারের জ্বালার ফিরিস্তি আউড়ে আউড়ে অক্ষমতা জানিয়েছে।

তাছাড়া চাঁপা কোনোকালেই এটাকে বাপের বাড়ি ভাবে না।

চাঁপার সত্যিকার টান তো দর্জিপাড়ার গলির সেই বাড়িটার ওপর। যে বাড়িটার ছাতের সিঁড়ি আর গাঁথা হলো না কোনোদিন। তা চাঁপা সে অভাব অনুভব করেনি কখনো, সুবর্ণলতার মেয়ে হয়েও না! চাঁপার প্রিয় জায়গা রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ঠাকুমার ঘর, জেঠির ঘর!

চাঁপা ওইটেকেই বাপের বাড়ি বলে জানতো, চাঁপা সংসার-জ্বালা থেকে ফুরসৎ পেলে ওইখানে এসে বেড়িয়ে যেত।

হয়তো সেটাই স্বাভাবিক।

চাঁপার পক্ষে এ বাড়িকে আপন বলে অনুভবে আনার আশাটাই অসঙ্গত।

এ বাড়ির কোথাও কোনোখানে চাঁপা নামের একটা শিশুর হামাগুড়ি দেওয়ার ছাপ আছে কি? চাঁপা নামের একটা বালিকার পদচিহ্ন?

এ বাড়িতে চাঁপার অস্তিত্ব কোথায়?

দর্জিপাড়ার বাড়িটা চাঁপার অস্তিত্বে ভরা। তার প্রত্যেকটি ইট চাঁপাকে চেনে, চাঁপাও চেনে প্রতিটি ইট-কাঠকে।

চাঁপা তাই বাপের বাড়ি আসবার পিপাসা জাগলেই চেষ্টা-যত্ন করে চলে আসতো ওই দর্জিপাড়ার বাড়িতেই। ফেরার দিন হয়তো একবার মা-বাপের সঙ্গে দেখা করে যেত। কৈফিয়ৎ কেউ চাইত না, তবু শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, 'ঠাকুমা বুড়ীর জন্যেই ও-বাড়ি যাওয়া! বুড়ী যে কটা দিন আছে, সে কটা দিনই ও-বাড়িতে আসা-যাওয়া। কবে আছে কবে নেই বুড়ী, 'চাঁপা চাঁপা' করে মরে!' ঠাকুমা মরলে বলেছে, 'মল্লিকাটার জন্যে যাই!'

সুবর্ণলতা কোনদিন বলেনি, 'তা অত কৈফিয়ৎই বা দিচ্ছিস কেন? আমি তো বলতে যাইনি, তুই ও বাড়িতে পাঁচদিন কাটিয়ে এ বাড়িতে দুঘণ্টার জন্যে দেখা করতে এলি কী বলে?'

সুবর্ণলতা শুধু চুপ করে বসে থাকতো।

সুবর্ণলতা হয়তো কথার মাঝখানে বলতো, 'জামাই কেমন আছেন?' বলতো, 'তোর বড় ছেলের এবার কোন্ ক্লাস হল?'

চাঁপা সহজ হতো, সহজ হয়ে বাঁচতো। তারপর শ্বশুরবাড়ির নানান জ্বালার কাহিনী গেয়ে চলে যেত।

আবার কোনোদিন ও-বাড়ির খাবারদালানে গড়াগড়ি দিতে দিতে চাঁপা এ-বাড়ির সমালোচনায় মুখর হতো। তখন সমালোচনার প্রধান পাত্রী হলো চাঁপারই মা!

মায়ের নবাবী, মায়ের বিবিয়ানা মায়ের গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিহীনতা, মায়ের ছেলের বৌদের আদিখ্যেতা দেওয়া, আর কোলের মেয়েকে আস্কারা দেওয়ার বহর, এই সবই হলো চাঁপার গল্প করবার বিষয়বস্তু।

চাঁপা সুবর্ণলতার প্রথম সন্তান, চাঁপা সুবর্ণলতাকে 'বৌ' হয়ে থাকতে দেখেছে, অথচ দেখেছে তার অনমনীয়তা, আর দেখেছে বাড়িসুদ্ধ সকলের বিরূপ মনোভঙ্গী।

চাঁপার তবে কোন্ মনোভাব গড়ে উঠবে?

তাছাড়া মায়ের নিন্দাবাদে দর্জিপাড়ার সন্তোষ, মায়ের সমালোচনায় দর্জিপাড়ার কৌতুক, মায়ের ব্যাখ্যানায় ওখানে 'সুয়ো' হওয়া, এটাও তো অজানা নয় চাঁপার।

চাঁপা তাই ও-বাড়ির সন্তোষবিধান করেছে, এ-বাড়িকে কৌতুক করে।

হয়তো আরও একটা কারণ আছে।

হয়তো চাঁপাও ভিতরে ভিতরে মায়ের প্রতি একটা আক্রোশ অনুভব করে এসেছে বরাবর। চাঁপার শ্বশুরবাড়ির শাসন একেবারে পুলিসী শাসন, লোহার জাঁতার নীচে থাকতে হয় চাঁপাকে, চাঁপা তাই মায়ের সেই চিরদিনের বেপরোয়া অনমনীয়তাকে ঈর্ষা করে, মায়েরা এই এখনকার স্বাধীনতাকে ঈর্ষা করে।

চাঁপার মনে হয়, চাঁপার বেলায় মা চাঁপাকে যেমন-তেমন করে মানুষ করেছে, কখনো একখানা ভাল কাপড়জামা দেয়নি, অথচ এখন ছোট মেয়ের আদরের বহর কত! কাপড়ের ওপর কাপড়, জ্যাকেটের ওপর জ্যাকেট।

চাঁপা ক্রুদ্ধ হয়েছে, অভিমানাহত হয়েছে।

কিন্তু এখন চাঁপা কেঁদে কেঁদে আক্ষেপ করছে, 'কর্পূরের মত উপে গেলে মা, একটু নাড়বার-চাড়বার অবকাশ দিলে না!'

হয়তো এই মুহূর্তের ওই আক্ষেপটাও সত্য। ওই কান্নাটুকু নির্ভেজাল, তবু ভাইবৌরা মনে মনে হাসলো।

অবিশ্যি বাইরে তারাও কাঁদছিলো।

না কাঁদলে ভালো দেখাবে না বলেও বটে, আর চাঁপার কান্নাতেও বটে। কান্না দেখলে কান্না আসে।

শুধু সুবর্ণর মস্ত আইবুড়ো মেয়ে বকুল কাঁদলো না একবিন্দু। কাঠ হয়ে বসে রইলো চুপ করে। বোধ হয় অবাক হয়ে ভাবলো, জ্ঞানাবধি কোনোদিনই যে মানুষটাকে অপরিহার্য মনে হয়নি, সেই মানুষটা চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে এমন করে পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে কেন? সুবর্ণর বয়স্ক ছেলেরা প্রথমটা কেঁদে ফেলেছিল, অনেক অনুভূতির আলোড়নে বিচলিত হয়েছিল, সামলে নিয়েছে সেটা। তাদের দায়িত্ব অনেকখানি। এখন তারা বিষাদ-গম্ভীর মুখে যথাকর্তব্য করে বেড়াচ্ছে।

তাদের তো আর কাঠ হয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাদের ভূমিকা গম্ভীর বিষাদের। শিক্ষিত সভ্য ভদ্র পুরুষের পক্ষে ও ছাড়া আর শোকের বহিঃপ্রকাশ কি?

তবে হ্যাঁ, প্রবোধচন্দ্রের কথা আলাদা।

তার মত লোকসান আর কার?

প্রবোধ শোকের মত শোক করলো। বুক চাপড়ালো, মাথার চুল ছেঁড়ার প্রয়াস পেলো, মেঝেয় গড়াগড়ি খেলো, আর সুবর্ণলতা যে তার সংসারের সত্যি লক্ষ্মী ছিলো, সাড়ম্বরে সে কথা ঘোষণা করতে লাগলো।

বড় ভাই সুবোধচন্দ্র ইদানীং হাঁটুর বাতে প্রায় শয্যাগতই ছিলেন, তবু সুবর্ণলতার মৃত্যুর খবরে আস্তে আস্তে লাঠি ধরে এসেছিলেন। ধীরে ধীরে বলেছিলেন, 'লক্ষ্মীছাড়া হলি এবার প্রবোধ।'

সেই শোকবাক্যে প্রবোধ এমন হাঁউমাউ করে কেঁদে দাদার পা জড়িয়ে ধরেছিলো যে, পা ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে পথ পাননি সুবোধচন্দ্র!

প্রবোধ হাঁক পেড়েছিলো, 'ও দাদা, ওকে আশীর্বাদ করে যাও।'

সুবোধ বলেছিলেন, 'ওঁকে আশীর্বাদ করি আমার কী সাধ্যি? ভগবান ওঁকে আশীর্বাদ করছেন।'

প্রবোধ এ-কথায় আরো উদ্দাম হলো, আরো বুক চাপড়াতে লাগলো। সেই শোকের দৃশ্যটা যখন দৃষ্টিকটু থেকে প্রায় দৃষ্টিশূল হয়ে উঠলো, তখন বড় জামাই আর ছোট দুই ভাইয়েতে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে গেল এ-ঘর থেকে ও-ঘরে। জোর করে শুইয়ে দিয়ে মাথায় বাতাস করলো খানিকক্ষণ, তারপর হাতের কাছে দেশলাই আর সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিয়ে চলে এলো।

মৃত্যুকে নিয়ে দীর্ঘকাল শোক করা যায়, মৃতকে নিয়ে দুঘণ্টাও নিশ্চিন্ত হয়ে শোক করা চলে না। আচার-অনুষ্ঠানের দড়াদড়ি দিয়ে শোকের কণ্ঠরোধ করে ফেলতে হয়।

সমারোহ করে শেষকৃত্য করতে হলে তো আরোই হয়।

সুবর্ণলতার শেষকৃত্যও সমারোহের হবে বৈকি। ভাল লালপাড় তাঁতের শাড়ি আনতে দিয়েছিল ছেলেরা, আনতে দিয়েছিলো গোড়েমালা, গোলাপের তোড়া। ধূপ, অগুরু, চন্দন, এসবের ব্যবস্থাও হচ্ছিল বৈকি। এ ছাড়া নতুন চাদর এসেছিল শ্মশানযাত্রার বিছানায় পাততে।

উমাশশী গিরিবালা বিরাজ বিন্দুর দল দালানের ওধারে বসে জটলা করছিলো। গিরিবালা বললো, 'সব দেখেশুনে মুখস্থ করে যাচ্ছি, বাড়ি গিয়ে ফর্দ করে রাখবো। মরণকালে বার করে দেব ছেলেদের। গোড়ে গলায় না নিয়ে যমের বাড়ি যাচ্ছি না বাবা।'

এই কৌতুক কথায় মৃদু হাস্য-গুঞ্জন উঠল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বকুল তাকিয়ে দেখল, স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল।

তা ওরা বোধ হয় একটু অপ্রতিভ হলো, বিরাজ তাড়াতাড়ি বললো, 'হাঁ রে, পারুল তা হলে আসতে পারল না?'

বকুল মাথা নাড়ল।

গিরিবালা বললো, 'মায়ের মৃত্যু দেখা ভাগ্যে থাকা চাই। এমন কত হয়, বাড়িতে থেকেও দেখা যায় না। দু'দণ্ডের জন্যে উঠে গিয়ে শেষ দেখায় বঞ্চিত হয়।'

বকুল ছেলেমানুষ নয়, তবু বকুল যেন কথাগুলোর মানে বুঝতে পারে না।

মায়ের মৃত্যু দেখা ভাগ্যে থাকা চাই?

দৃশ্যটা কি খুব সুখের?

বঞ্চিত হলে ভয়ঙ্কর একটা লোকসান? যে চোখ এই পৃথিবীর সমস্ত রূপ আহরণ করে করে সেই পৃথিবীকে জেনেছে বুঝেছে, সেই চোখ চিরদিনের জন্যে বুজে গেল, এ দৃশ্য মস্ত একটা দ্রষ্টব্য?

যে রসনা কোটি কোটি শব্দ উচ্চারণ করেছে, সেই রসনা একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল, এ কী ভারি একটা উত্তেজনার?

হয়তো তাই।

ওঁরা বড়, ওঁরা বোঝেন।

উমাশশী বললো, 'তা খবরটা তো দিতে হবে তাড়াতাড়ি? চতুর্থী করতে হবে তো তাকে?'

উমাশশীর এই বাহুল্য কথাটায় কেউ কান দিল না। এই সময় আস্তে ডাক দিলেন জয়াবতী, 'চাঁপা!'

'সুবর্ণলতার শেষ অবস্থা' এ খবর সকলের আগে তাঁর কাছে পৌঁছেছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই এসেছেন তিনি। যতক্ষণ সুবর্ণলতার শ্বাসযন্ত্র কাজ করে চলেছিল, ততক্ষণ মৃদু গলায় গীতার শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন জয়াবতী, একসময় দুটোই থেমেছে। তারপর—অনেকক্ষণ কী যেন করছিলেন, একসময় চাঁপাকে বললেন, 'ভাইদের একবার ডেকে দাও তো মা!'

চাঁপা তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

ও-বাড়ির জেঠিমাকে সমীহ সেও করে বৈকি। বিলক্ষণই করে। জয়াবতীর শ্বশুরবাড়ির গুষ্টির সবাই করে।

একে তো সুন্দরী, তার ওপর আজীবন কৃচ্ছ্রসাধনের শুচিতায় এমন একটি মহিমময়ী ভাব আছে যে দেখলেই সম্ভ্রম আসে। বড়লোকের মেয়ে, সেই আভিজাত্যটুকুও চেহারায় আছে। ও-বাড়ির জেঠি ডাকছেন শুনে ছেলেরা ব্যস্ত হয়ে কাছে এল।

জয়াবতী শান্ত গলায় বললেন, 'একটি অনুরোধ তোমাদের করবো বাবা, রাখতে হবে।'

সুবর্ণলতার ছেলেরা আরো ব্যস্ত হয়ে বললো, 'সে কী! সে কী! অনুরোধ কী বলছেন? আদেশ বলুন?'

জয়াবতী একটু হাসলেন।

বললেন, 'আচ্ছা আদেশই। বলছিলাম তোমাদের মায়ের জন্যে কালো ভোমরাপাড়ের গরদ একখানি, আর একখানি ভাল পালিশের খাট নিয়ে আসতে। এটা ওর বড় সাধ ছিল! পারবে?'

শুনে ছেলেরা অবশ্য ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল, কারণ এমন অভাবিত আদেশের জন্যে প্রস্তুত ছিল না তারা। এ একেবারে বাজেটের বাইরে। তা ছাড়া—সবই তো আনতে গেছে। শাড়ি, মালা, খাটিয়া।

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ওই শান্ত প্রশ্নের সামনে 'পারবো না' বলাও তো সোজা নয়!

এ উমাশশী জেঠি নয় যে, কোনো একটা কথায় ব্যঙ্গ হাসি দিয়ে দমিয়ে দেওয়া যাবে! হ্যাঁ, উমাশশী হলে বলতে পারতো তারা শান্ত ব্যঙ্গের গলায়, 'খাটটা কি শুধুই পালিশের, না চন্দন কাঠের?'

উমাশশী হলে বলতই।

কিন্তু ইনি উমাশশী নন, জয়াবতী। এঁর ব্যক্তিত্বই আলাদা। এঁর সামনে ছোট হতে পারা যাবে না, দৈন্য প্রকাশ করতে বাধবে।

তবু বাজেটের বিপদটাও কম নয়? মায়ের চিকিৎসা উপলক্ষেও তো কম খরচ হয়ে গেল না?

সব টাকা বাড়িতে ঢেলে, আর বহুদিন বাড়ি বসে বসে, প্রবোধের হাত তো স্রেফ ফতুর। টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন না তিনি, যা করতে হবে ছেলেদেরই হবে। হয়তো বা বড় ছেলেকেই বেশি করতে হবে।

তাই বড় ছেলে শুকনো গলায় প্রশ্ন করলো, 'আপনি যদি বলেন, অবশ্যই আনা হবে জেঠিমা, তবে—ইয়ে বলেছিলাম কি, ওটা কি করতেই হয়?'

জেঠি আরও স্নিগ্ধ আরো ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, ' "করতেই হয়" এমন অসঙ্গত কথা বলতে যাবো কেন বাবা? এতো খরচার ব্যাপার আর কজন পারে? তবে তোমরা তিনটি ভাই কৃতী হয়েছো, তাই বলতে পারছি। সুবর্ণর অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল একখানি কালো ভোমরাপাড়ের গরদ শাড়ি পরে, আর একখানি ভাল খাট-গদিতে শোয়। মন খুলে কথা তো আমার কাছেই কইতো বেশিটা। কতদিন কথাচ্ছলে হাসতে হাসতে বলতো, "জন্মে কখনো খাটে শুলাম না জয়াদি, মরে যখন ছেলেদের কাঁধে চড়ে যাবো, একখানা পালিশ করা খাটে শুইয়ে যেন নিয়ে যায় আমায়।" '

জন্মে কখনো খাটে শুলাম না!

খাটে!

জন্মে কখনো!

এ আবার কি অদ্ভুত ভাষা!

ছেলেরা অবাক হয়ে তাকালো।

মনশ্চক্ষে সমস্ত বাড়িখানার দিকেই তাকালো। তাকিয়ে অবাক হলো, হতভম্ব হলো। এত বড় বাড়ি, ঘরে ঘরে জোড়া খাট, অথচ সুবর্ণলতার এই অভিযোগ।

মরার পর আর কেউ গাল দিতে পারবে না বলেই বুঝি ছেলেদের সঙ্গে এই অদ্ভুত উগ্র কটু তামাশাটুকু করে গেছে সুবর্ণলতা!

বড় ছেলের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল সেই বিস্ময়-প্রশ্ন, 'জন্মে কখনো খাটে শোননি!'

জয়াবতী হাসলেন।

জয়াবতী থেমে থেমে কোমল গলায় উচ্চারণ করলেন, 'কবে আর শুতে পেল বল বাবা! সাবেকী বাড়িতে যখন থেকেছে, তখনকার কথা ছেড়েই দাও। ইট দিয়ে উঁচু করা পায়াভাঙা চৌকিতে ফুলশয্যে হয়েছিল, কতদিন পর্যন্ত তাতেই কাটিয়েছিল। দর্জিপাড়ার নতুন বাড়িটা হবার পর ঘরে ঘরে একখানা করে নতুন চৌকি হয়েছিল।··· খাট নয়, চৌকি। তা কোলের ছেলে গড়িয়ে পড়ে যাবার ভয়ে তাতেই বা কই শোয়া হয়েছে, বরাবর মাটিতেই শুয়েছে! তোমাদের অবিশ্যি এসব ভুলে যাবার কথা নয়।···

তারপর যদি বা জেদাজেদি করে চলে এসেছিল সেই গুহা থেকে, ঘরবাড়িও পেয়েছিল, কিন্তু ভোগ আর করলো কবে বল? তোমরা ষেটের সবাই পর পর মানুষ হয়েছো, বৌমারা এলেন একে একে, নিজের বলতে তেমন একখানা ঘরই বা কই রইল বেচারার? ওই ছোট্ট একটু শোবার ঘর। রাতে আলো জেলে বই পড়ার বাতিক ছিল ওর, অথচ তোমাদের বাবার তাতে ঘুমের ব্যাঘাত—'একটু হাসলেন জয়াবতী, বললেন, 'প্রবোধ ঠাকুরপোর তবু বসতে দাঁড়াতে বৈঠকখানা ঘরটা আছে, ও বেচারার নিজস্ব বলতে কোথায় কি? শেষটা তো বারান্দায় শুয়েই কাটিয়ে গেল!'

খুব শান্ত হয়ে বললেন বটে, তবু যেন শ্রোতাদের বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল। আর তাদের পশ্চাদ্‌বর্তিনী বৌমাদের মুখ লাল হয়ে উঠল। তবে কথা তারা বলল না তাড়াতাড়ি। শুধু মেজ ছেলে আরক্তিম মুখে বলল, কাশির জন্যে মা নিজেই তো আর কারুর সঙ্গে ঘরে শুতে চাইতেন না!'

জেঠি আরো নরম হলেন।

মধুর স্বরে বললেন, 'সে কি আর আমিই জানি না বাবা! তোমরা তোমাদের মাকে কোনদিন অবহেলা করেছ, এ কথা পরম শত্রুতেও বলতে পারবে না! বহু ভাগ্যে তোমাদের মত ছেলে হয়। তবে কিনা মনের সাধ ইচ্ছের কথা তোমাদের কাছে আর কি বলবে? আমার কাছেই মনটা খুলতো একটু আধটু, তাই ভাবলাম, এটুকু তোমাদের জানাই!'

জেঠি বললেন, 'এটুকু তোমাদের জানাই'।

জানার পর অতএব অজ্ঞতা চলে না!

অগত্যাই বাজেট বাড়াতে হলো।

মায়ের সাধের কথা ভেবে যতটা না হোক, ধনীদুহিতা জ্ঞাতি জেঠির কাছে নিজেদের মান্য রাখতেও বটে।

তবু বড় ছেলে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে গলা নামিয়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলো, 'নতুন জেঠিমার কথাটা শুনেছ?'

বৌ উদাস গলায় বললো, 'শুনেছি।'

'মানেটা ঠিক বুঝলাম না তো। মা'র গরদ শাড়ি ছিল না?'

বৌ গম্ভীর গলায় বললো, 'মানে আমিও বুঝতে অক্ষম। তিন ছেলের বিয়েতে তিন-তিনখানা গরদ পেয়েছেন কুটুমবাড়ি থেকে!'

'আশ্চর্য! যাক্ কিনতেই হবে একখানা।'

মেজ ছেলে বৌয়ের কাছে এল না, মেজবৌই বরের কাছে এল। মড়া ছুঁয়েছে বলে আর নিজ নিজ শোবার ঘরে ঢোকেনি, ছাদের সিঁড়ির ওধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যঙ্গের

গলায় বললো, 'এই বেলা বলে রাখি, আমার একখানা পুষ্পহার পরবার সাধ আছে। দিও সময়মত, নইলে আবার মরার পর ছেলেদের মুখে কালি দেব।'

মেজ ছেলে শুকনো মুখে বললো, 'এটা যেন জেঠিমার ইচ্ছাকৃত হয়ে বলে মনে হলো। অথচ ঠিক এরকম তো নন উনি।'

মেজবৌ মৃদু হাসির মত মুখ করে বলে, 'কে যে কি রকম, সে আর তোমরা বেটাছেলে কি বুঝবে? জেঠিমার সঙ্গে কত রকম কথাই হতে শুনেছি—তা ছাড়া এয়োস্ত্রী মানুষকে কালোপাড় শাড়ী পরে শ্মশানে পাঠানো? শুনিনি কখনো।'

'যাক্ যেতে দাও! ওরকম একখানা গরদের কাপড়ে কি রকম আন্দাজ লাগবে বলতে পারো?'

মেজবৌ ভুরু কুঁচকে বললো, 'তোমার ঘাড়েই পড়ল বুঝি!'

মেজ ছেলে বোধ করি একটু লজ্জিত হলো। তাড়াতাড়ি বললো, 'ঘাড়ে পড়াপড়ি আর কি! একজন কাউকে তো যেতে হবে দোকানে। অবিশ্যি খুব ভাল খাপি জমি-টমির দরকারই বা কি? নেবে তো এক্ষুনি ডোমে!'

'হুঁ! তা নেহাৎ ফ্যারফেরে ঝ্যারঝেরে জমি হলেও, বারো-তেরো টাকার কমে হবে বলে মনে হয় না।'

'বারো-তেরো!'

মেজ ছেলে বিচলিতভাবে চলে গেল। একবার নিজে একা টাকাটা বার করলে কি আর পরে ভাইদের কাছে চাওয়া যাবে?

তা হোক, কি আর করা যাবে? ত্রুটী না থাকে। কেউ না ভাবে তাদের 'নজর' নেই! দাদা খাটটার ভার নিক।

তা সেই ভাগাভাগি করেই খরচটা বহন করলো ছেলেরা। বড় ছেলে আনলো পালিশ-করা খাট, মেজ ছেলে কালো ভোমরাপাড় গরদ। যে মানুষটাকে যখন তখন ষষ্ঠীমনসায় লালপাড় গরদ পরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে, তার একখানা কালোপাড় গরদ পরা হয়নি বলে আক্ষেপে মরে যাবে এমন ভাব-প্রবণতা অবশ্য কারো নেই, তবু দেখেশুনে কালো ভোমরাপাড়ই কিনে আনলো। বারো-তেরো কেন, চোদ্দ টাকা পড়ে গেল। ঢালাপাড়ের চেয়ে নকশাপাড়ের দাম বেশি কিনা।

সেজ ছেলে নিজ মনেই আনলো ফুলের গাদা, আনলো ধূপের প্যাকেট, আনলো গোলাপজল এক বোতল।

এসব কথা কবে নাকি বলে রেখেছিল সুবর্ণলতা। হয়তো ঠাট্টাচ্ছলেই বলেছিল। তবু সেই হেসে হেসে বলা কথাটাই মনে পড়ে মনটা 'কেমন' করে ওঠা অসম্ভব নয়। সুবর্ণলতার সেজ ছেলে কথা বেশি বললো না। শুধু ধূপের গোছাটা জেলে দিল, শুধু ফুলগুলো সাজিয়ে দিল, আর গোলাপ জলের সবটা ঢেলে দিল।

মড়ার গায়ে গোলাপজল ঢালা মুক্তকেশীর গোষ্ঠীতে যে এই প্রথম তাতে সন্দেহ কি ?

মুক্তকেশীরই কি জুটেছিল ? জুটেছিল শুধু একটা ফুলের তোড়া !

তাঁর মৃত্যুর দিন সুবর্ণই বলেছিল, 'একটা ফুলের তোড়া কিনে আন্ বাবা, তোদের ঠাকুমার জন্যে। পৃথিবী থেকে শেষ বিদেয় নেবার সময় সঙ্গে দেবার তো আর কিছুই থাকে না !'

বলেছিল এই সেজ ছেলেটাকেই।

হয়তো সেদিনের স্মৃতি মনে জেগেছিল তার, তাই অত ফুল এসেছিল। বিরাজ বলেছিল, 'মনে হচ্ছে তোদের মা'র বিয়ে হচ্ছে ! বাসরের সাজ সাজালি মাকে ! আমার শ্বশুর-বাড়িতেও মরণে এত ঘটা দেখিনি।'

নিজের শ্বশুরবাড়িটাকেই সর্ববিধ আদর্শস্থল মনে করে বিরাজ।

গিরিবালা বললো, 'যা বলেছ ছোট ঠাকুরঝি। এত দেখিনি বাবা !'

গিরিবালার বাপের বাড়ির সাবেকী সংসারে এত ফ্যাশান এখনো ঢোকে নি। ওদের বাড়িতে এখনো বাসরেই ফুলের তোড়া জোটে না, তা শ্মশানযাত্রায় !

আজন্মের সাধ মিটলো সুবর্ণলতার।

কালো ভোমরাপাড়ের নতুন গরদ পরে, রাজকীয় বিছানাপাতা নতুন বোম্বাই খাটে উঠে শুলো, আশেপাশে ফুলের তোড়া, গলায় গোড়েমালা।

পায়ে পরানো আলতার 'ছুটি' নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, মাথার সিঁদুরের কণিকা প্রসাদ পাবার জন্যে হুড়োহুড়ি বাধলো। কেবলমাত্র নিজের বৌ-মেয়েরাই তো নয়, এসেছে ভাসুরপো-বৌ তার স্যাওরপো-বৌদের দল, এসেছে জা-ননদ, পাড়াপড়শী, বেয়ান-কুটুম।

সুবর্ণলতার শেষযাত্রা দেখতে তো লোক ভেঙে পড়েছে।

এসেছে ধোবা গয়লা নাপতিনী ঘুঁটেওয়ালী সবাই। সকলেই অসঙ্কোচে ধুলোকাদা পায়ে উঠে এসেছে দোতলায়, উঁকিঝুঁকি মারছে শবদেহের আশে-পাশে। এটা বাড়ির লোকের পক্ষে বিরক্তিকর হলেও, এ সময় নিষেধ করাটা শোভন নয়। এরাও যে তাদের ময়লা কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে বলছে, 'এমন মানুষ হয় না।'

চিরকাল বলেছে, এখনও বললো, 'এমন মানুষ হয় না।'

এখন আর কোনোখানে কেউ বলে উঠলো না, 'তা জানি। ঘর-জ্বালানে পর-ভোলানে যে !'

মৃত্যু সকলকে উদার করে দিয়েছে, সভ্য করে দিয়েছে।

আসন্ন সন্ধ্যার মুখে সুবর্ণলতার শেষ চিহ্নটুকু পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। চিতার আগুনের লাল আভা আকাশের লাল আভায় মিশলো, ধোঁয়া আর আগুনের লুকোচুরির মাঝখান থেকে সুবর্ণলতা যে কোন্ ফাঁকে পরলোকে পৌঁছে গেল, কেউ টের পেল না।

মানু বললো, 'এটা হোক। যা খরচা লাগে, আমি "বেয়ার" করবো।'

মানুর দাদারা বললো, 'তা যদি করতে পারো, আমাদের বলবার কি আছে? ভালই তো।'

প্রবোধ হাঁউমাউ করে কেঁদে বললো, 'কর বাবা, কর তোরা তাই। আত্মাটা শান্তি পাবে তার। এই সবই তো ভালবাসতো সে।'

কে জানে, মানুর এই সদিচ্ছা তার অপরাধবোধকে হালকা করে ফেলতে চাওয়া কিনা, অথবা অনেকটা দূরে সরে গিয়ে 'মা' সম্পর্কে তার মনের রেখাগুলো নমনীয় হয়ে গিয়েছিল কিনা।

নিত্য সংঘর্ষের গ্লানিতে যে জীবনকে খণ্ড ছিন্ন অসমান বলে মনে হয়, দূর পরিপ্রেক্ষিতে সেই জীবনই একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিস্তৃতির মহিমায়, ব্যাপ্তির মহিমায়। নিতান্ত নিকট থেকে যে আগুন শুধু দাহ আর উত্তাপের অনুভূতি দেয়, দূরে গেলে সেই আগুনই আলো যোগায়।

দূরত্বেই সম্ভ্রম, দূরত্বেই প্রত্যয়।

শ্রাদ্ধের শেষে ওই যে এনলার্জ করা ফটোখানা দেয়ালে ঝুললো অবিনশ্বর একটি প্রসন্ন হাসি মুখে ফুটিয়ে, ওই ছবির বংশধরেরা কি কোনদিন সন্দেহ করবে, এ হাসিটুকু কেবল ফটোগ্রাফারের ব্যগ্র নির্দেশের ফসল।

মানুও হয়তো দূরে চলে গিয়ে তার মায়ের রুক্ষ অসমান কোণগুলো ভুলে গিয়ে শুধু স্থির মসৃণ মূর্তিটাই দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু পেল বড় দেরিতে। আর তখন কিছু করার ছিল না মানুর।

তাই মানু ভেবেচিন্তে ওই কথাটাই বললো। 'কাঙালী খাওয়ানো হোক এই উপলক্ষে।'

খরচটা সে একাই বহন করবে।

তবে আর বলার কি আছে? তা খরচ আর ঝঞ্ঝাট দুটোরই ভার নিক।

তা নিল মানু।

অতএব সুবর্ণলতার শ্রাদ্ধে কাঙালীভোজন হলো। অনেক কাঙালী এল—আহূত, রবাহূত, অনাহূত। কাউকেই বঞ্চিত করলো না এরা। আশা করলো, সুবর্ণলতার বিগত আত্মা পরিতৃপ্ত হলো এতে। বিশ্বাস রাখলো, ছেলেদের আশীর্বাদ করছে সুবর্ণলতা আকাশ থেকে।

পরদিন মানু চলে গেল বৌকে বাপের বাড়ি রেখে দিয়ে। ছুটি ফুরিয়েছে তার।

তার পরের দিন তার বোনেরা, পিসিরা, জেঠি খুড়ীরা। 'নিয়মভঙ্গ' পর্যন্ত ছিল সবাই, মিটলো তো সবই।

শুধু পারুল আসেনি এই বিরাট উৎসবে। পারুলের আসবার উপায় ছিল না।

॥ একত্রিশ ॥

নিস্তব্ধ হয়ে গেল বাড়ি, স্তিমিত হয়ে গেল দিনের প্রবাহ। রোগের বৃদ্ধি থেকে এই পর্যন্ত চলছিল তো উত্তাল ঝড়! ক্লান্ত মানুষগুলো এবার অনেক দিনের ক্লান্তি পুষিয়ে নিতে ঘুমিয়ে নেবে কিছুদিন দুপুর-সন্ধ্যেয়।

বকুলও ঘুমিয়ে পড়েছিল ভরদুপুরে, জেগে উঠলো পড়ন্ত বেলায়। তাড়াতাড়ি বুঝি দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ছুটে চলে এল বারান্দার দিকে। ভুল বুঝতে পারলো, আস্তে ফিরে এল, ছাতে চলে গেল।

দেখলো পশ্চিমের আকাশে বিশাল এক চিতা জ্বলছে। তার অগ্নিআভা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে মাটিতে।

বকুল শ্মশানে যায়নি, মায়ের চিতা জ্বলা দেখেনি, তাই বুঝি নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল সেদিকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।···যখন আস্তে আস্তে নিভে গেল সে আগুন, মনে পড়লো আর একদিনের কথা। এই ছাতেরই ওই কোণটায় আর এক চিতা জ্বলতে দেখেছিল সে। কোনোদিন জানলো না কী ভস্মীভূত হয়েছিল সেদিন।

আজ ঘুমের আগে মা'র ফেলে যাওয়া সমস্ত কিছু তন্নতন্ন করে দেখছিল সে, কোথাও পায়নি একটি লাইন ও হস্তাক্ষর। সুবর্ণলতা যে নিরক্ষর ছিল না, সে পরিচয়টা যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে সুবর্ণলতা।

বকুল ছাতের সেই চিতার কোণটায় বসে রইল অন্ধকারে।

কড়া নাড়ার শব্দে এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দিলেন জগুই।

অবাক হয়ে বললেন, 'তুই এই রোদ্দুরে? কার সঙ্গে এসেছিস?'

'ঝিয়ের সঙ্গে।'

'ঝিয়ের সঙ্গে একা এলি তুই? বলিস কি? খুব সাহস আছে তো? কিন্তু কেন বল্ তো হঠাৎ?'

বকুল আস্তে বলে, 'জ্যাঠামশাই, আপনার প্রেস্টা দেখতে এলাম।'

'প্রেস্টা? আমার প্রেস্টা? এখন দেখতে এলি তুই?' হা-হা করে হেসে ওঠেন জগু, অথচ বকুলের মনে হয়, বুড়োমানুষটা যেন কেঁদে উঠলেন "হা-হা" করে।

হাসিই। হাসি থামিয়ে জগু কথাটা শেষ করেন, 'প্রেস্ আর নেই, প্রেস্ তুলে দিয়েছি।'

'তুলে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তুলে দেওয়াই ভালো', জগু হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ান, জোরে

জোরে বলেন, 'কে অত ঝামেলা পোহায়? ওই যে শূন্য ঘরখানা পড়ে আছে দাঁত খিঁচিয়ে!'

বকুল মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ থেকে বলে, 'আচ্ছা, জ্যাঠামশাই, যেসব বই ছাপা হয়, তার পাণ্ডুলিপিগুলো কি সব ফেলে দেওয়া হয়?'

জগু সন্দিগ্ধ গলায় বলেন, 'কেন বল্ দিকি?'

'এমনি, জানতে ইচ্ছে করছে।'

জগু তেমনি গলাতেই বলেন, 'এমনি? না তোর—ইয়ে, মা'র সেই খাতাটা খুঁজতে এসেছিস?'

'না এমনি। বলুন না আপনি, থাকে না?'

'থাকে, ছিল—', জগু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন, 'গুদোমঘরে সব ডাঁই করা পড়েছিল। আদি অন্তকালের সব। ওই ব্যাটা নিতাই, দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম আমি, প্রেস উঠিয়ে দিলাম দেখেই যেখানে যা ছিল ঝেঁটিয়ে শিশি-বোতলওলাকে বেচে দিয়েছে। শুনেছিস কখনো এমন কাণ্ড? দেখেছিস এমন চামার? আমিও তেমনি। দিয়েছি দূর করে! আর হোক দিকিনি এমুখো।···আয়, বসবি আয়।'

'না থাক্, আজ যাই।'

'সে কি রে? এই এলি রোদ ভেঙে, বসবি না?'

'আর একদিন আসবো জ্যাঠামশাই—'

হেঁট হয়ে প্রণাম করে বকুল জ্যাঠাকে।

জগু ব্যস্ত হয়ে সরে দাঁড়ান, 'থাক্ থাক্। বুড়ী ঘুমোচ্ছে, দেখা হলো না।'

বকুল বোধ হয় ভুলে আরও একবার প্রণাম করে জ্যাঠাকে, তারপর বলে 'যাচ্ছি তবে।'

'যাচ্ছিস! চল্ না হয় আমি একটু এগিয়ে দিই—'

'না না, দরকার নেই। আপনি বুড়োমানুষ এই রোদ্দুরে—'

'তবে যা, সাবধানে যাস।'

'আপনি বুড়োমানুষ'—এই অপমান গায়ে মেখেও দাঁড়িয়েই থাকেন জগু দরজায়। শেকলটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন না সঙ্গে সঙ্গে গটগট করে।

তার মানে বকুলের কথাই ঠিক। বুড়ো হয়ে গেছেন জগু।

বকুল রাস্তায় নামে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বুঝি সেই দাঁত-খিঁচোনো ঘরটার উদ্দেশেই মনে মনে একটা প্রণাম জানিয়ে মনে মনেই বলে, 'মা, মাগো! তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা,

না-লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো, সব কথা আমি নতুন করে লিখবো। দিনের আলোর পৃথিবীকে জানিয়ে যাব অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস।...

'যদি সে পৃথিবী সেই ইতিহাস শুনতে না চায়, যদি অবজ্ঞার চোখে তাকায়, বুঝবো আলোটা তার আলো নয়, মিথ্যা জৌলুসের ছলনা। ঋণ-শোধের শিক্ষা হয়নি তার এখনো!'

সামনের রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে যায় বকুল, পিছু পিছু আসা দেহরক্ষিণীটার কথা ভুলে গিয়ে।

আর এক দিন

দুটো বেণী দিয়ে গড়া প্রকাণ্ড খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো, হাতে ভারী ওজনের মোটা মোটা কঙ্কণ, মিহি ক্রেপের শাড়ীর জমকালো টিস্যুর আঁচলাটা অবহেলায় পিঠে ফেলা, পায়ের জুতোয় আর হাতের ভ্যানিটি ব্যাগে শ্রীনিকেতনী শিল্পচাতুর্য—অতি আধুনিকার একখণ্ড নিখুঁৎ নমুনা কৃশাঙ্গী কস্তুরী, গাড়ী থেকে নেমে যেন হালকা হাওয়ার মতো ভেসে বাড়ীতে উঠে এলো।

উঠেই আসতে হয়, রাস্তা থেকে বাড়ীটা উঁচু।

প্রদীপ বলে "বাইশতলা দেশ"।

মিথ্যে বলে না। উপরে নীচে এখানে ওখানে পথ আর বাড়ীর যেন গোলক ধাঁধা!

কস্তুরীকে দেখে প্রদীপের একাধারে গৃহরক্ষক দেহরক্ষক সেবক পালক সব কিছু, পাহাড়ী বালক নানকুটা হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে। তা'র চাকরীদশায় এহেন অপরূপ আবির্ভাব কখনো ঘটেনি।

কস্তুরী ওর স্তম্ভিত ভাবটা উপভোগ করে আরো যেন ঝড় বইয়ে দেয়—ঘরে আবার চাবি লাগানো কেন রে? কী মুস্কিল! খোল খোল।

বলা বাহুল্য এমন দরাজ হুকুমের পর ইতস্ততঃ করা সম্ভব নয়। নানকু সসম্ভ্রমে দোরটা খুলে দেয়।

ভ্যানিটি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে দিব্য সপ্রতিভ ভাবে ঘরে ঢুকে পড়ে কস্তুরী।

আর ঢুকেই প্রদীপের টেবিলের কাগজ পত্র উল্টে পাল্টে তচ্‌নচ্‌ করতে থাকে। কবি কোথাও কিছু লিখে ছড়িয়ে রেখে গেছে কি না।

ও বাবা! প্যাডের মধ্যে এ যে চিঠি! কস্তুরীকে মনে আছে তা'হলে! আজ মাস দুই আড়াই তো প্রায় চিঠি পত্র বন্ধ। মাঝে মাঝে দু'এক ছত্র যা পাঠায় সে আর চিঠি নয় নেহাৎই দায়সারা কুশল বার্তা।

আরে এ যে রীতিমতো সাহিত্য! ...চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে প্যাডটা খুলে ধরে কস্তুরী, তবু সয়না।

বাস্‌রে, এসব আবার কি লিখছে প্রদীপ!

"—রাত জেগে তোমায় চিঠিটা লিখছি কস্তুরী—রাত্রে আজকাল জেগেই থাকি প্রায়, কিছুতেই কেন জানি না ঘুম আসতে চায় না। তবু এই জেগে থাকা আমার খারাপ লাগে না। মনে হয় রাতে ঘুমিয়ে থেকে ভারী ভুল করি আমরা। ঘুমিয়ে থাকি তাই পৃথিবীর সমস্ত রহস্য আমাদের অজানা থেকে যায়। আমরা যখন সারাদিন স্থূল প্রয়োজনের তাগিদে ছুটোছুটি করে মরি, তখন ঘৃণায় করুণায় বোবা পৃথিবী নিশ্চল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে।

রাত্রে যদি ঘুমিয়ে না পড়ে আমার মতো জানলায় এসে বসো কস্তরী, তা'হলে অনেক কিছু জানতে পারবে। জ্ঞানের পরিধি কতো বেড়ে যাবে তোমার। ভারী আশ্চর্য লাগবে সুদীর্ঘকাল ধরে রাত্রিটা ঘুমিয়ে নষ্ট করে এসেছো বলে।

তুমি কি জানো কস্তরী, রাত্রির অন্ধকারে অরণ্যে যে মর্মর-ধ্বনি ওঠে সে ধ্বনি কিসের? তুমি হয়তো আজও জানোনা সে কথা, আমি জানি।……

পাতায় পাতায় বাতাসের লীলামৃগয়ার মুখর চপলতা সে নয়, সে ধ্বনি কোটি কোটি অশরীরি আত্মার বিক্ষুব্ধ আর্তনাদ। প্রতিদিন প্রতিরাত্রে মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্ঠুর নিয়মের নিষ্করুণ আকর্ষণে যে সব হতভাগ্যরা আশা আকাঙ্খার ভরাপাত্র নামিয়ে রেখে এই শোভাসম্পদময়ী ধরণী থেকে অসময়ে স্খলিত হয়ে পড়ে যাচ্ছে—অনন্ত শূন্যের ক্ষুধার্ত জঠরে, দলে দলে উঠে আসে তারা, অন্ধকারের অসাবধান অবসরে। উঠে আসে—ছেড়ে যাওয়া পুরানো পৃথিবীর বুকে। উঠে এসে অবাক হয়ে যায় তারা! বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে যায়। ধিক্কারে স্তম্ভিত হয়ে যায় পৃথিবীর দুর্ব্যবহারে।…এসে চিনতে পারেনা কিছু, খুঁজে পায়না নিজের পুরানো জায়গাটাকে। বুঝতে পারে না -কোথায় হারিয়ে গেলো, তা'কে হারিয়ে ফেলার গভীর ক্ষতচিহ্নটা? জানতো না—মমতাহীনা পৃথিবী হারিয়ে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষে মুছে ফেলে ক্ষতির সকল চিহ্ন। নতুন করে নিজেকে সাজিয়ে নেয় আগামী নতুনের জন্য।…

কাউকে হারিয়ে ফেলে হাহাকার করতে বসবে এতো সময় পৃথিবীর হাতে নেই।…

বুঝতে পেরে ওরা ক্ষুব্ধ অপমানে দলে দলে গিয়ে জড়ো হয় অরণ্যে অরণ্যে। পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ওদের হতাশ হাহাকার। যেন মাথা কুটে কুটে সাড়া তুলতে চায় মমতাহীনার প্রস্তরীভূত বক্ষপঞ্জরে। বুঝি মনে পড়িয়ে দিতে চায় …"আমি ছিলাম" "আমি ছিলাম"…"একদা তোমার এই শোভাসম্পদের উপর ষোলো আনা অধিকার ছিলো আমার, এমন নির্মম ঔদাসীন্যে আমাকে ভুলে যেও না।" এক সময় ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়ে ওঠে নিজেরা নিজেরা! নিঃশ্বাস ফেলে বলে—"ভুলে গেছে আমাদের!" …"আমরা নেই।" তখন হয়তো ক্ষণকালের জন্যে অরণ্যানী স্তব্ধ হয়ে যায়, শুধু একটা অনুচ্চারিত 'হায় হায়' স্থির হয়ে থাকে।

আবার আছড়ে এসে পড়ে নতুন দল।

আবার তাদের ভারাক্রান্ত নিঃশ্বাসে পাতায় পাতায় ওঠে মর্মর শিহরণ। সারা রাত্রি ধরে চলে এই আনাগোনা, এই মাতামাতি।

নিরুপায় অরণ্যকে সমস্ত রাত ধরে সহ্য করতে হয় অশরীরি আত্মাদের এই অদ্ভুত আক্রমণ। ঊষার আলো ফুটলে তবে অরণ্যের মুক্তি, তখন সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

প্রেত আত্মারা আলোর আভাসে সচকিত হয়ে ওঠে, বুঝতে পারে জীবিত প্রাণীর রাজ্যে এ তা'দের অনধিকার প্রবেশ। বুঝতে পেরে ম্লান মুখে বিদায় নেয় তারা।

... .

আমার এই অদ্ভুত কল্পনার খবর পেয়ে তুমি কি হাসছো কস্তুরী ? ভাবছো—দিনের আলোয় কি অরণ্যে মর্মরধ্বনি ওঠেনা ?...

ওঠে বৈকি। ওঠে।

সে ধ্বনি শাখাপত্রে বাতাসের লীলাচাপল্যের। তখন কেউ ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়ে ওঠে না। ···কস্তুরী, দিনের আলোয় তুমি যদি অরণ্যের জটিলতায় ঘুরে বেড়াতে চাও, তখন সে শব্দ তুমি শুনতে পাবে, সে নিতান্তই তোমার নিজেরই পায়ের চাপে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। তখন রহস্যহীন মৌন অরণ্য গম্ভীর মুখে চেয়ে থাকবে তোমার দিকে। সারা রাত্রির মাতামাতির ইতিহাস দেখতে পাবেনা তার মুখের কোনো রেখায়।

কস্তুরী, অরণ্যের এতো কাছাকাছি কখনো থেকেছো তুমি, যেখান থেকে জানলা খুললেই বনের গন্ধ পাওয়া যায় ? গভীর রাত্রে বিছানা থেকে উঠে এসে জানলায় দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করেছো অরণ্য-মর্মরের সত্যকার ইতিহাস ?

না না।

নিশ্চয় তুমি এসব দেখোনি কস্তুরী, নিশ্চয় শোনোনি এ সব! যদি শুনতে পেতে—তাহ'লে পরীক্ষায় একটা বাড়তি ডিগ্রী আর কিছু পরিমাণ বেশী নম্বর আহরণের আশায় ইটকাঠের অরণ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থেকে অমন দুরূহ তপস্যায় মগ্ন থাকতে পারতে না। তোমার এই তপস্যাটা কী হাস্যকরই আজ লাগছে আমার কাছে! আকাঙ্খার পরিধি কতো ছোটো হয়ে গেছে আমাদের, ভাবলে তোমার বিস্ময় লাগেনা কস্তুরী ?

পড়ে হাসছো ?

কিন্তু সত্যি বলছি, কেন জানিনা রোজ রাত হলেই এই অদ্ভুত কল্পনায় যেন পেয়ে বসে আমাকে। কী হাস্যকর লাগে নিজেদেরকে!...কী তুচ্ছ লাগে দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের সহস্র খুঁটিনাটি!···

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে গেলো এখানে—চিঠিতে খুলে লেখবার উপায় নেই। দেখা হলে বলবো। আমার মনে হয়, হয়তো এ সমস্ত সেই ঘটনারই প্রতিক্রিয়া। সত্যকার একটা পরীক্ষা না এলে—"

প্যাড্টা উল্টে পাল্টে দেখে কস্তুরী। নাঃ আর কোথাও কিছু লেখা নেই। নিশ্চয় রাত্রে লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কবি, তারপর ভোর না হ'তেই ছুটেছেন চাকরী বজায় রাখবার কঠোর তপস্যায়।

মৃদু একটু হাসি ফুটে ওঠে কস্তুরীর ঠোঁটের কোণে।

আহা বেচারা! ও কি জানতো সাড়ে তিনশো মাইল দূর থেকে হঠাৎ এসে পড়ে কস্তুরী ওর কাব্যির ওপর হানা দেবে?...নিশ্চয় আবার আজ রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে দু'চারটে

সিগারেট ধ্বংস করে নিয়ে মৌজ করে বসে অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ কর্‌তো কথার জাল বুনে বুনে। মধুর রসের প্লাবন বইয়ে ফেলেও কস্তুরীকে ভাসিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি বলেই বোধহয় এবারে অদ্ভুত রসের আমদানী করতে সুরু করেছে প্রদীপ!

'অরণ্য মর্মরের সত্য ইতিহাস'!

রৌদ্রদগ্ধ বহিপ্রর্কৃতির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে আর একবার হেসে ওঠে কস্তুরী। আহা বেচারা রে! শক্তিসামর্থ্যওয়ালা এতোখানি লম্বাচওড়া পুরুষ জাতটাকে 'বিরহ' জিনিষটা কী কাবুই না করে ফেলে! ...তা' নয়তো সমস্ত দিন খেটেপিটে এসে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কিনা মাঝরাত্রে জানলা খুলে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বঞ্চিত আত্মাদের অতৃপ্ত হাহাকার শুনতে বসেন!

মাথা খারাপ! কিন্তু "ঘটে যাওয়া ঘটনাটা" কি?

প্যাডটা চাপা দিয়ে রেখে ভ্যানিটিব্যাগটা লুফতে লুফতে ঘরের বাইরে আসে কস্তুরী। বাচ্চা চাকরটাকে ডাক দিয়ে প্রশ্ন করে—ওহে বীরভদ্র, তোমার 'সাহেব' কখন ফিরবেন জানো?

পাহাড়ী ছেলেটার ভাগ্যে এমন একটি গরীয়সী প্রশ্নকারিণী কখনো জুটেছে কি না সন্দেহ। তবে সে বিগলিত কৃতার্থে একগাল হেসে ভাঙা বাঙলায় যা বলে সেটা কস্তুরীর পক্ষে খুব হৃদয়গ্রাহী হয়না। সন্ধ্যার আগে প্রদীপের ফেরবার কোন আশাই নেই নাকি।

আর এখন সবে বেলা এগারোটা।

অর্থাৎ কমপক্ষে এখনো ঘণ্টা সাতেক একা থাকতে হবে কস্তুরীকে! ট্রেণে এলে এইটি হতো না! যথারীতি খবর দিয়ে বেরিয়ে, অধীর আগ্রহে ষ্টেশনে অপেক্ষমান প্রদীপের কাছে এসে নেমে পড়তে পারলেই হয়ে যেতো। অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে দিশেহারা প্রদীপের সেই চেহারা কল্পনা করতে পারছে কস্তুরী।

তা নিজেই বা সে কি কম কবিত্বটা করে বসেছে? যেই ইচ্ছে হলো আকাশে উড়ে চলে এলো! হঠাৎ এসে পড়ার মজাটাই মনে রেখেছে, অসুবিধেটা ভেবে দেখেনি তো!

এতোক্ষণ কি করবে সে? স্নান আহার সেরে নিয়ে দিব্যি নীটোল একটি ঘুম দেবে?

আরে ছিঃ, অসম্ভব!

তবে?

জুতোর চাপে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে বনের ধারে ধারে?

উঁহু, রক্ষে করো বাবা!

তা'হলে?

প্রদীপের ঘর সংসার তচ্‌নচ্‌ করে নতুন করে গোছাতে বসবে? 'পুঁথিগতপ্রাণা' হলেও

কস্তুরী যে গৃহিণীপনার অযোগ্য নয়, একথা প্রমাণ করে দেবে প্রদীপের কাছে?…থাকগে যাক, কে অকারণ অতো খাটে! সংসার করতে যখন আসবে, দেখিয়ে দেবে একেবারে।… তবে কি ওর খাতাপত্র বই কাগজ তল্লাস করবে বসে বসে? আরো কি কি উদ্ভট পাগলামীর নমুনা সংগ্রহ করতে পারা যায় তাই দেখতে?

দূর! মজুরী পোষাবে না!

সব থেকে ভালো, যতো ইচ্ছে আলিস্যি করে স্নানাহারপর্ব সেরে এই চাকরটার সঙ্গে গল্প জমানো।… হোক না বালকমাত্র, তবু কৃতার্থ হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। শিথিল ভঙ্গীতে খোঁপাটা খুলতে খুলতে ভ্রুভঙ্গী করে বলে—

—এই হাঁদারাম, তোর সাহেবের ঘরবাড়ী সব তো এক কথায় আমার হাতে ছেড়ে দিলি, বল দিকিন আমি কে?

'হাঁদারাম' ঘাড় হেলিয়ে বলল—জানি, মেমসাহেব!

—চমৎকার! কে তোকে বললো শুনি?

—কেউ বললো না। আমি বুঝছি।

—বেশ করছো। যাও এখন চায়ের জল দাও দিকি? হুঁ, তা'পর তোদের এখানে কিছু খেতে টেতে পাওয়া যাবে তো?

—খুব!—যতোটা সম্ভব ঘাড় হেলিয়ে জবাব দেয় নানকু।

ভারী আশ্বাসের স্বর ছেলেটার কণ্ঠে!

কস্তুরী হেসে ফেলে বলে—শুনে বাঁচলাম। তা' কি খেতে দিবি একেবারে জেনেই প্রাণ শীতল করে যাই। কি আছে তোদের ভাঁড়ারে?

কথার সুখেই কথা কওয়া। খুসির পাত্র উপ্‌চে পড়লে এমনই হয় বোধ হয়। পাহাড়ী ছেলেটা কস্তুরীর কৌতুক কথার অর্থ বুঝুক না বুঝুক, তবু উপযুক্ত শ্রোতার অভাবে ওর সামনেই নিজেকে ঝলসে তুলবে কস্তুরী।…গানের সুরের মতো হেসে উঠবে অকারণ, গেয়ে উঠবে এক লাইন গান। কথা বলবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

প্রদীপ অনুপস্থিত। তবু সারাবাড়ীতে তো তার উপস্থিতির বাতাস বইছে! এ বাড়ী কস্তুরীর, এ সংসারের ওপর যথেচ্ছ কর্ত্রীত্বের দাবী কস্তুরীর, ভাবতে কী অপূর্ব রোমাঞ্চ!

সত্যি! বইখাতা নিয়ে তখন চলে এলেই হতো প্রদীপের সঙ্গে।…নাইবা অনার্স নিতো, নাইবা হতো ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট!

কী লাভ হবে তাতে? কী ক্ষতি হতো এম-এটা যদি নাই দিতো; প্রদীপ 'বেচারা', না কস্তুরী নিজেই 'বেচারী'?

খোলাচুল আঙুলে জড়াতে জড়াতে কস্তুরী হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে—কই বল শুনি?

ছেলেটা মহোৎসাহে জানায়—চালডাল আলু পিঁয়াজ ডিম মাখন ঘি আটা—কোনো

বস্তুরই অভাব নেই সাহেবের ভাঁড়ারে! তবে যদি মেমসাহেবের মুরগীর মাংস খাবার বাসনা থাকে, কিঞ্চিৎ সবুর করতে হবে।...অবিশ্যি বেশী নয়, ছুটে গিয়ে ওই বনের ধারে মনিহারীর বৌকে খবর দিয়ে আসতে যা দেরী।

—মনিহারীর বৌ? সে আবার কে?

সাধারণ কৌতূহলে প্রশ্ন করে কস্তুরী। কিন্তু উত্তর শুনে কৌতূহল আর সাধারণ থাকে না, ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

মনিহারীর বৌ!

সেই যে মনিহারী, সাহেবের 'টুরে' বেরোনোর সময় তল্পী বইতো, সাহেবের গাড়ী আর বন্দুক সাফ্ করতো, যে মারা পড়লো—সাহেবেরই সেই বন্দুকের গুলিতে। তারই বৌ।...সাহেবের প্রাণ বাঁচাতে পুলিশের কাছে মিছে কথা বলেছে বলে ওর আত্মীয় কুটুমেরা একঘরে করে দিয়েছে কিনা।...ওই বনের মধ্যে একটা চালা তুলে নিয়ে একা থাকে সে এখন—মুরগী পোষে, ডিম বেচে, বেতের চুপড়ি বোনে।

তা'কে একবার খবর দিতে পারলেই কস্তুরীর বাসনা পূর্ণ হয়।...এমন কি ও এসে মাংস রান্না করে দিয়ে যেতে পারে পর্যন্ত। খুব ভালো রাঁধে ও। কতোদিন রান্না মাংস চুপি চুপি রেখে যায় সাহেবের জন্যে, সাহেব না জেনে তারিফ করেন এই আনাড়ি ভূত নানকুকে।

... ...

আঙুলের আগায় খোলা চুলের গোছা এঁটে এঁটে বসেছে, লাল হয়ে উঠেছে আঙুলের ডগা।...কিন্তু মুখটা? মুখটা অমন লাল হয়ে উঠেছে কেন কস্তুরীর? অদৃশ্য কোন রজ্জুতে কেউ ওর কণ্ঠনালীটা কি জড়িয়ে জড়িয়ে পাক দিচ্ছে? ও বসে পড়েছে—উঠোনে পড়ে থাকা তেলচিটে খাটিয়াটার ওপর! ধুলোয় লুটোচ্ছে দামী শাড়ীর ঝকঝকে আঁচলটা।...এই তবে 'ঘটনা'?

অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বরকে এইটুকু মুক্তি দিতে পারে কস্তুরী—ও—ওই মনিহারী গুলি খেলো কেন?

ছেলেটা অকপট সরলতায় ব্যক্ত করে, যদিও অপরের কাছে বলতে মানা কিন্তু কস্তুরী যখন নিতান্তই সাহেবের নিজের মেমসাহেব, তখন বলতে বাধা নেই। পুলিশ জানে বটে বন্দুক সাফ করতে গিয়ে হঠাৎ ভুলক্রমে গুলি ছুটে মারা গেছে মনিহারী, ওর বৌও বলেছে সেই কথা পুলিশের কাছে, কিন্তু আসল কথা তা নয়। রাতের অন্ধকারে সাহেব ওর চোখ দেখে বনবিড়াল ভেবে ভয় খেয়ে গুলি করেছেন!

—ভয়? কিসের ভয়! মানুষকে বনবিড়াল ভাববার মানে?

আর্ত চীৎকার করে ওঠে কস্তুরী।

ছেলেটা হতাশ ভাবে দুইহাত উল্টে বলে—কি জানি মেম সাহেব। ও পাগলটা কেন যে রাতভোর জেগে জেগে সাহেবের জানলায় চোখ রেখে ঘর পাহারা দিতো কে জানে! ওর চোখ দুটো ছিলো ঠিক বনবিড়ালের মতো। রাতে আগুনের মতো জলতো।...ঘুমের ঘোরে উঠে সাহেব হঠাৎ ভয় খেয়ে—

ধীরে ধীরে ধাতস্থ হচ্ছে কস্তুরী।

গম্ভীর ভাবে বলে—তা' ওর বৌ পুলিশের কাছে মিছে কথা বলতে গেলো কেন?

ছেলেটা যেন কস্তুরীর অজ্ঞতায় অবাক হয়ে যায়। নিজে নিতান্ত বিজ্ঞের মতো বলে—না বললে সাহেবের নামে কেস্ হতো না?

—হতোই বা। উদ্ধত স্বরে বলে কস্তুরী—সাহেবের ফাঁসী হলে ওর কি লোকসান ছিলো? ওর নিজের স্বামী খুন হয়ে গেলো—

ছেলেটা নিজের ঠোঁটের উপর একটা আঙুল ঠেকিয়ে কণ্ঠস্বর খাটো করবার ইঙ্গিত জানায় কস্তুরীকে। চুপি চুপি প্রতিপ্রশ্ন করে—সাহেবের ফাঁসি হলে ওর আদমী বেঁচে উঠতো?

এতবড়ো মহৎ প্রশ্নের উত্তর সাধারণ মানুষের কাছে থাকে না। কিন্তু কস্তুরী কেন সেই মহানুভব নারীর কাছে কৃতজ্ঞ হচ্ছে না? যার একটীমাত্র কথায় ফাঁসি হয়ে যেতে পারতো কস্তুরীর স্বামীর। সে সুযোগ গ্রহণ না করে যে নিজের স্বামীহন্তার প্রাণরক্ষা করেছে!

বরং আরো রুক্ষ আরো ক্রুদ্ধ স্বরে মন্তব্য করে বসে কস্তুরী—নাই বা বাঁচলো—মানুষ খুন করলে ফাঁসি হওয়াই তো উচিত!

পাহাড়ী ছেলেটা চমকে মুখ তুলে এক নিমিষ তাকিয়ে থাকে কস্তুরীর মুখের দিকে। তারপর গম্ভীরভাবে বলে চলে যায়—গোসলখানায় জল দিচ্ছি!

সাতঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না, বেলা তিনটের মধ্যেই এসে পড়ে প্রদীপ। এরোড্রোমের এক ছোকরা কর্মচারী কী সূত্রে যেন চিনতো কস্তুরীকে, সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খবর দিয়েছে প্রদীপকে।

ছুটে এসেছে প্রদীপ গাড়ীখানার 'হাওয়া গাড়ী' নাম সার্থক ক'রে। ছুটে এসেছে বিস্ময় আনন্দ আর উৎসাহে জল জল করতে করতে। নাঃ নিজেকে আর আটকে রাখতে রাজী নয় সে, ছোকরা চাকরটার সামনেই কস্তুরীকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আর কি!

কিন্তু আশ্চর্য!

কস্তুরী কী কঠিন আর কী নিরুত্তাপ !

জমাট কঠিন হিমশীতল একখণ্ড বরফ স্বামীকে উপহার দেবে বলেই কি এই হিমপাহাড়ের দেশে ছুটে এসেছে কস্তুরী ? রোদপড়া বরফের মতোই কী ভয়ানক ঝক ঝক করছে ওর সাদা উজ্জ্বল চোখ দুটো।

—কি হলো কস্তুরী ? শরীর খারাপ লাগছে ?

—শরীর ? হেসে ওঠে কস্তুরী—আশ্চর্য রকমের ভালো লাগছে। পাহাড়ে হাওয়ায় এখুনি খিদে বেড়ে যাচ্ছে !

প্রদীপ ব্যথিত স্বরে বলে—এলে যদি তো অমন দূরে কেন কস্তুরী ? কী অদ্ভুত লাগছে তোমাকে ! 'তুমি' বলে যেন চেনাই যাচ্ছে না !

কস্তুরী আর একবার হাসির ঝিলিক দিয়ে ওঠে—রাত জেগে 'ক্ষুধিত আত্মা'র নিশ্বাস শুনে শুনে তোমার পার্থিব দৃষ্টিটা কিছু খাটো হয়ে গেছে বোধ হয়।

—ওঃ ! তুমি আমার চিঠিটা পড়েছো বুঝি ?··· চমকে ওঠে প্রদীপ।···ও সব আমার অর্থহীন পাগলামী ! দেখলে কেন ? লিখেছিলাম তোমাকে, কিন্তু পাঠাতাম না। তুমি এসেই সব দেখে ফেললে ?

—অন্যায় হয়ে গেছে না ?

কস্তুরী বাঁকা কটাক্ষে বলে—হঠাৎ বড়ো অসুবিধেয় পড়ে যেতে হলো কেমন ? যাক্ কালই ফিরছি, বেশী অসুবিধে বাড়াবো না।

ব্যাকুল প্রদীপ এ রহস্যের মীমাংসা করতে পারে না।

এমন হঠাৎ এসে পড়লো কেন কস্তুরী ? এসেছে যদি তো এমন দূরত্বের আবরণে ঘিরে রেখেছে কেন নিজেকে ? কেন ওর স্বভাবসিদ্ধ প্রগল্‌ভতায় বেপরোয়াভাবে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে ঝুলে পড়ে বলছে না—'কী মজা করলাম বলোতো ? কেমন জব্দ ! চিঠি না দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে আর ?'

যাক গে। এখন আর রহস্যভেদের চেষ্টা করে লাভ নেই !

রাত্রিটা তো হাতে আছে—সমস্ত দ্বন্দ্ব সমস্ত বাধা, যতো কিছু অভিমান আর ভুল বোঝার মধুর পরিসমাপ্তির আশ্বাস নিয়ে। এখন চলুক সাধারণ আতিথ্যের পালা।

তা' সেটা উভয় পক্ষেই চলে। ভদ্রতা আর সৌজন্যের কে কতো নিখুঁৎ অভিনয় করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলে যেন।···চা খাওয়া সারা হতে বেলা পড়ে যায়।

প্রদীপ বলে—চলো কস্তুরী, বেড়িয়ে আসা যাক একটু !

—বেড়াতে ? কোথায় ?

—বনে জঙ্গলে যেখানে তোমার খুসি। আজ সব তোমার ইচ্ছেয়—

কস্তুরী তীক্ষ্ণ হেসে বলে ওঠে—বনের পথটা তোমাকে ভীষণভাবে টানে, তাই না?

প্রদীপ একটু থতমত খেয়ে ওর দিকে তাকায়, তারপর অবাক হয়ে বলে—ঠিক বলেছো কস্তুরী। সত্যিই, অরণ্য যেন অবিরত আমাকে আকর্ষণ করতে থাকে। কেন বলোতো?··· নিজেই বুঝতে পারি না আমি কেন এমন হয়। কতোদিন—মাঝরাতে ইচ্ছে করে বেরিয়ে পড়ি, দেখি কি রহস্য লুকোনো আছে ওখানে। কেন কিছুতেই ওকে ভুলে থাকতে পারি না আমি! তুমি বলতে পারো কস্তুরী, কেন এমন হয়?

—পারি। গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় কস্তুরী—বুনো পাহাড়ী মেয়েরা অনেক কিছু মন্ত্র তন্ত্র তুকতাক জানে।

—ওর মানে? ও আবার কি একটা যা খুসি উত্তর হলো? একথা বললে যে—

—বললাম এমনি। চলো চলো। দেখে আসি—তোমার অরণ্যের আত্মাকে।

—দূরছাই। প্রদীপ চেষ্টাকৃত লঘু স্বরে বলে—কি ছাইপাঁশ বাজে কথা লিখে রেখে তোমার মাথাটাকেই বিগড়ে দিয়েছি দেখছি।

বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায়।

কৃষ্ণপক্ষের মৃদু জ্যোৎস্না গাছের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও হালকা কোথাও ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। · পায়ের চাপে চাপে শব্দ উঠছে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাওয়ার।

আগে কিছু কিছু কথা হচ্ছিলো, ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে গেছে।

নির্বাক দুটি প্রাণী যেন কোন অমোঘ বন্ধনে বন্দী হয়ে যন্ত্রের মতো চলেছে পাশাপাশি।

হঠাৎ এক সময় মৃদু একটু হেসে কস্তুরী বলে ওঠে—দেখো অরণ্যের জটিলতায় পথ হারিয়ে ফেলবে না তো?

প্রদীপ দাঁড়িয়ে পড়ে। একটু চুপ করে থেকে স্থির স্বরে বলে—বোধ করি অমনি কোনো সন্দেহ তোমার পথকে জটিল করে তুলছে কস্তুরী। কিন্তু নিশ্চিন্ত থেকো, আমার পথ হারাবে না। আমার ধ্রুবতারা আছে।

—কই? কোথায়?

একটু দুর্বল আর ফ্যাকাসে শোনায় কস্তুরীর গলা।

—বাঃ বলে খেলো হবো কেন? সে হলো নিজের জিনিষ।

উত্তর দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কস্তুরী। সভয়ে বলে—বনের ভেতর ওখানে আলো কিসের?

—আলো নয় আগুন। শুকনো পাতা জেলে ভাত রাঁধছে···ওকি ওকি পাথর ছুঁড়ছো কেন?···কী সর্বনাশ!—হঠাৎ একি—

পথ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া ভারী পাথরের টুকরোটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে কস্তুরী প্রায়

হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—দেখতে পাচ্ছো না। ওখানে কি যেন একটা বুনো জানোয়ার বসে রয়েছে ?

—কী ভয়ানক ! ও যে মনিহারীর বৌ ! ওইতো পাতা জ্বেলে ভাত রাঁধছে। কিম্ভুত মতো বিশ্রী জোব্বাজাব্বা পরে আছে বলে ওই রকম দেখাচ্ছে। ওর গল্প করবো তোমার কাছে।…এখন বলছো জানোয়ার, শুনে বলবে দেবতা।…ও আমার প্রাণদাত্রী তা জানো ? আচ্ছা—এখন পরিচয় করিয়ে দিই, পরে সব বলবো !…. ওরে এই বৌ। এ—মনিয়ার বৌ রে—

পায়ে পায়ে দু'জনেই বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে ততক্ষণে।

সাড়া পেয়ে আগুনের কাছ থেকে উঠে আসে মানুষটা। উঠে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। কথার উত্তর দেয় না, নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুটো মানুষের দিকে।…

গাছের সারি এখানে পাতলা, জ্যোৎস্না যেন খানিকটা হাঁফ ফেলে বেঁচেছে। সেই মৃদু জ্যোৎস্নায় সামনাসামনি স্থির হয়ে থাকে দু'জোড়া চোখ।

খুব স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না।…অস্পষ্ট হয়ে গেছে শিফন শাড়ী, ওমেগা ঘড়ি, জয়পুরী কঙ্কণ আর শান্তিনিকেতনী বটুয়া…অস্পষ্ট হয়ে গেছে বহু ব্যবহৃত ঘাগরার গায়ে বেরঙা ছিটের তালি, দড়াদড়া সেলাই। অস্পষ্ট হয়ে আছে সমস্ত পরিবেশ।

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শুধু দু'জোড়া চোখ।

কি আছে সে চোখে ?

প্রভু পত্নীর প্রতি সসম্ভ্রম সমীহ ?.

স্বামীর প্রাণদাত্রীর প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতা ?

না। সে চোখে আছে শুধু আদিম অরণ্যের নিবিড় ছায়া, অথবা ছায়া নয় আগুন ! আগুন যারা জ্বালাতে জানতো না সেই গুহাবাসিনী আদিম প্রপিতামহীদের চোখে যে আগুন ঝিলিক্ মারতো সেই আগুন !

পরিবেশটা সহনীয় করে তুলতে প্রদীপ বুঝি বলতে চেষ্টা করে—'কি রে রান্না করছিস।' কিন্তু গলা দিয়ে ওর স্বর ফোটে না। যেমন এসেছিলো তেমনি ফিরে যায় মনিহারীর বৌ, শুধু অবহেলার একটা সেলাম জানিয়ে।

ফেরার পথে হালকা হাসির ভঙ্গীতে কস্তুরী বলে—উঃ কী ভয়ানক চোখ দুটো ওর ! যেন জ্বলছিলো। ভাগ্যিস তোমার বন্দুকটা সঙ্গে ছিলো না। থাকলে—হয়তো বা বনবিড়াল ভেবে গুলি করে বসতাম।

চমকে ওঠে প্রদীপ। কে বললো ওকে ?

মুহূর্তে সব স্পষ্ট হয়ে যায় ওর কাছে। ওঃ তাই। তাই এই ভাবান্তর কস্তুরীর ! কিন্তু বেশ স্থির কৌতুকের ভঙ্গীতেই বলে—তবু ওর বাঁচাটা নিতান্তই ভাগ্য বলতে হবে, নইলে অস্ত্রের অভাব তো ছিলো না কস্তুরী ? আদিম পৃথিবী সেই আদিম বর্বর যুগ থেকে এই সভ্যভব্য আণবিক যুগ পর্যন্ত মানুষের হাতের কাছে পাথরের টুকরোর জোগান ঠিকই রেখেছে !…প্রস্তর যুগ শেষ হয়ে গেছে বলে যে সে অস্ত্রে কাজ হয় না তাতো নয় ?

যাত্রার আয়োজন চলেছে।

তোড়জোড় করে নয়, ঢিমে চালে। প্রয়োজনটা প্রবল, ইচ্ছেটা দুর্বল। কিন্তু প্রয়োজন নিয়েই জগৎ, ইচ্ছেকে নিয়ে কে কোথায় ঘরকন্না করছে ?

শেষরাত্রে ট্রেন।

শেষবারের মতো রাত্রের খাওয়াটা একসঙ্গে খেতে বসে সরোজকান্তি আপশোষের ভঙ্গীতে বলে ওঠে—বেশ থাকা গিয়েছিল একটা মাস। সত্যি নিরু, তোমার কাছে এসে যে এতোটা অভ্যর্থনা আর সমাদর পাবো মোটেই ভেবে আসিনি। আসবার আগে বরং একটু ভয়ই করছিলো।

জলের গ্লাসটা মুখে তুলেছিলো বলেই বোধহয় বন্ধুর কথাটা শেষ পর্যন্ত শেষ করতে দিলো নিরুপম। শেষ হতেই চাপা হাসির গাম্ভীর্যে প্রশ্ন করলো—ভয়টা কিসের ? পাছে বাড়ী ঢুকতে না দিই ?

—অতোটা না হোক—সরোজকান্তি হাসতে থাকে—পাছে বিব্রত ভাবটা প্রকাশ করে বসো।

নিরুপম মুচকে হেসে বলে—ভাগ্যিস ! ভাগ্যিস মনের ভাব অপ্রকাশ রাখবার আর্টটা আয়ত্ত আছে।

যদিও আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তিন ব্যক্তিই ভিতরে ভিতরে ম্রিয়মান, তবু আজকের এই সামান্য ক্ষণটুকুই বা সেই বিষাদের বাষ্পে স্যাঁৎসেতে করে ফেলবে কেন ? সুদীর্ঘ তিরিশটি দিন যেমন কেটেছে আলো ঝলমল শরৎ সকালের মতো, তেমনি কাটুক শেষের দিনটি। অক্ষয় হয়ে থাকুক এই আনন্দের স্মৃতি তিনজনের জীবনেই।

প্রবাসী বন্ধু নিরুপম, আর অতিথি দম্পতি শুভ্রা-সরোজ।

আনন্দ সৃষ্টি করতে পারাও একটা ক্ষমতা বৈকি, সে ক্ষমতা সকলের থাকে না।

শুভ্রা খিলখিল করে হেসে উঠে বলে—মনের ভাব অপ্রকাশ ? মিথ্যে অহঙ্কার করতে হবে না মশাই, যথার্থ মনের ভাব মুখে চোখে উপচে উঠেছিলো বুঝলেন ?

নিরুপম মৃদু হেসে বলে—সেটা অভিনয়। অতিথি দর্শনে আনন্দের ভান সজ্জনের রীতি।

—হয়েছে, আর রীতি নীতির মহিমা আওড়াতে হবে না। কোনটা অভিনয়, আর কোনটা অভিনয় নয়, সেটা বুঝে ফেলবার দক্ষতা মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ।

—হতভাগা নির্বোধ পুরুষ জাতির যে সে ক্ষমতা একেবারেই নেই তাও নয়—সরোজকান্তি হেসে উঠে বলে—কিন্তু আজকে বোধহয় যবনিকাটা একটু তাড়াতাড়িই টানা উচিত। রাত দুটোয় উঠতে হবে।

নিরুপম একটু অগ্রাহ্যের সুরে বলে—হ্যাঃ রাত দুটোয় উঠতে হবে না আর কিছু। সাড়ে তিনটের ট্রেন তিনটেয় উঠলেই যথেষ্ট। গাড়ী বলা আছে, কতোক্ষণ লাগবে পৌঁছতে ?

—আর তোমার বান্ধবী যে বলে রেখেছেন চা না খেয়ে "পাদমেকং ন গচ্ছামি"।

শুভ্রা বলে—তা'তো নয়ই। ট্রেনে চড়বার আগে চা এক পেয়ালা চাই-ই আমার। যে টাইমই হোক! তবু তো শুধু চায়ের আবদারটাই করেছি, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য" বলিনি তো গো!

খাবার টেবিল ছেড়ে একতলার খোলা বারান্দায় এসে বসেছে ওরা। উঠেছে ঝোড়ো হাওয়া।···বাইরের গাছপালাগুলো অন্ধকারে হাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালাচ্ছে। বাতাসের আস্ফালন শব্দের সঙ্গে গাছেদের আর্তনাদ মিশে গেছে।··· থেকে থেকে আছড়ে এসে পড়ছে সে শব্দ। 'উঠি' 'উঠি' করেও ওদের একান্ত প্রিয় এই মনোরম জায়গাটুকুর আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারছে না। তিনবন্ধুর অনেক সুখের স্মৃতি বিজড়িত আছে এখানে।

চেয়ারটাকে বাতাসের উল্টোমুখে ঘুরিয়ে নিয়ে সরোজ বলে—বলোনি ওইটুকুই আমার কপালের জোর। কিন্তু এও বলে রাখি, যাওয়া না যাওয়া তোমাদের হাত। যথাসময়ে ঘুমভাঙা সম্বন্ধে আমার ওপর কোন ভরসা রেখো না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে, আর আমাকে ঠেঙিয়ে তোলা ছাড়া—

থামিয়ে দিয়ে নিরুপম বলে--ঠিক আছে বন্ধু, ঠিক আছে। নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাওগে। আমার সেই বিখ্যাত টাইমপীসটিকে এ্যালার্ম দিয়ে রেখে এসেছি তোমার ঘরে। সে একবার ডাকতে সুরু করলে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হতে বাধ্য।····বলিনি বুঝি কোনোদিন ওর গল্পটা? এখানে আসছি, দাদা ওটিকে প্রেজেন্ট করে বললেন—'বিদেশে যাচ্ছিস, একা থাকবি, নতুন চাকরী। ঠিক সময়ে উঠতে পারবি কি না, এইটা নে। রোজ রাত্রে এ্যালার্ম দিয়ে রাখবি।'

প্রথম এসে দুদিন কিছু করিনি, কাজে 'জয়েন' করবার আগের রাত্রে রেখেছি এ্যালার্ম দিয়ে। সময় হাতে রেখে ভোর পাঁচটাতেই দিয়েছি।·· আরে ভাই, যথাসময়ে নিজস্ব কালোয়াতি গলায় ডাকতে সুরু করলেন উনি। ডিসেম্বরের পাঁচটা, সে একরকম রাতই, রীতিমত অন্ধকার। হঠাৎ সেই অন্ধকারের বুক চিরে ঘড়ির শব্দ ছাপিয়ে আরো একটা বিকট শব্দ! ঠিক যেন একটা বন্য জন্তুর আর্তনাদ। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম—একটা বন্যজন্তুরই নিবিড় আলিঙ্গন!···কি কষ্টে যে ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম ঈশ্বর জানেন। আলো জ্বালিয়ে দেখি—নেকড়ে নয়, ভালুক নয়, শ্রীমান বুধন! নাকি সাইরেনের শব্দ শুনে বোমার আতঙ্কে ছুটে এসেছে, আমাকে বুক দিয়ে রক্ষে করতে।

হেসে উঠলো তিন জনেই। কেবল সরোজ সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে বলে—আমরা হাসছি বটে, কিন্তু ভাবো তো কতোখানি আন্তরিকতা, কতোখানি বিশ্বস্ততা, কি সহজভাবে মিশে থাকে ওদের মধ্যে? তখন তো মাত্র তোমার দিন তিনেকের পুরণো চাকর!

—তাতো বটেই। এই কোয়ার্টার্সেই কাজ করতো বরাবর। যে ভদ্রলোক আমার

আগে এখানে ছিলেন, তাঁর নাকি নিতান্ত সুন্দর একটি "বাচ্চা বেবি লোগ" ছিলো, সেটিকে স্মরণ করে বসে বসে চোখের জল ফেলছিলো। আমার সঙ্গে 'বেবিলোগের' কোনো চিহ্ন না দেখে মনক্ষুণ্ণ হয়ে বললে—'দিল নেহি লাগতা'। বললাম—দেখিস বাবা, পরে বুঝবি আমিও তার চাইতে খুব বেশী মাতব্বর নই। সেই থেকে রয়েই গেলো।

—সভ্যসমাজের ভালোবাসা আর অসভ্যদের ভালোবাসায় অনেক তফাৎ নিরুর অনেক উঁচুদরের!

শুভ্রা বিদ্রূপহাস্যে বলে- থামো বাবু, এখন আর তোমার নীতিকথা আওড়াতে বোসোনা। প্রভুভক্ত কুকুরের নজীর তো চিরদিনই আছে। তাই বলে কে আর সেই উঁচুদরের প্রেমকে নিয়ে কাব্য রচনা করছে? ওদের ভালোবাসা সেই ক্লাসের।

—আমার মতে সেই ক্লাসটাই হচ্ছে ফার্স্টক্লাস।

—তোমার মত শুনলে মাঝে মাঝে 'ভিরমি' যেতে ইচ্ছে হয় আমার। কিন্তু নিরুপমবাবু, আমি বলি কি ঘড়িতে এ্যালার্ম দেবার শ্রম স্বীকার করার চাইতে এ ক' ঘণ্টা সময় এইভাবে গল্প করে কাটিয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি?

নিরুপম কিছু বলবার আগেই সরোজ বলে ওঠে—যথেষ্ট ক্ষতি। তা'হলে কালকে সারাদিন নিরু অফিসে বসে ঢুলবে, আর আমি ট্রেনে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যথাসময়ে গাড়ী চেঞ্জ করতে ভুলবো। ঘুম বন্ধ করে—

শুভ্রা উচ্ছল কণ্ঠে বলে—তোমার আর কি চিন্তা, শুধু ওই ঘুমের তালেই আছো। বেশ যাওনা তুমি, নিশ্চিন্ত সুখে ঘুমোওগে। আমরাও পরমানন্দে আড্ডা দিই বসে।···কি বলেন নিরুপমবাবু?

প্রশ্ন শুনে নিরুপম যতোটা না অস্বস্তি বোধ করে, বিস্মিত হয় তার চাইতে বেশী। এ আবার কি বেপরোয়া প্রস্তাব শুভ্রার! ঠিক এতোটা উচ্ছলিত ভাব ওর ব্যবহারে দেখেছে কি কোনোদিন? তিনটি প্রাণীতে রাত্রির আহারপর্ব চুকিয়ে আড্ডা দিয়েছে বটে অনেক দিন। তাস খেলেছে, তর্ক করেছে, এমন কি গানও গেয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু সেটা তিনটি প্রাণীতে।···বন্ধুকে বাদ দিয়ে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে রসালাপ? তাও এই নির্জ্জন রাত্রে? রাত্রি গভীরতার দিকে তাকিয়ে বুকটা যেন থর থর করে ওঠে নিরুপমের। এতো স্পর্দ্ধা কিসের শুভ্রার?···স্বামীর নিশ্চিন্ততার? না নিজের বিশ্বস্ততার?

কিন্তু সরোজ নিজস্ব পরিহাসের হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় সব সঙ্কোচ। মৃদু হেসে বলে—তোমাদের আড্ডাটা পরমানন্দের হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ঘুমটা কি ঠিক নিশ্চিন্ত সুখের হবে? তোমার কি মনে হয় নিরুপম?

নিরুপমের হয়ে শুভ্রাই উত্তর দেয়—হিংসুটের নিশ্চিন্ত ঘুম কোনদিন হয় না। কিন্তু যাহ

বলো তুমি, কাঁচাঘুমে উঠে সিল্কের শাড়ী জড়াতে বসার চেয়ে বসে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া অনেক আরামের।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সরোজ।

নিতান্ত সহজভাবে বলে—ও, তাহলে সত্যিই এখন জাগতে চাও তুমি? আমি ভাবছিলাম ঠাট্টা করছো। আচ্ছা, তা'হলে বোসো তোমরা। গুড্‌নাইট নিরুপম!

ক্ষণকাল ওর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে থেকেই নিজেকে সামলে নিয়ে নিরুপম ত্রস্তভাবে বলে—দিলেন তো ক্ষেপিয়ে? কি হলো আপনার আজ? অমন বেপরোয়া ঠাট্টা করতে সুরু করলেন কেন? যান এখন মান ভাঙান গিয়ে।

সরোজের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুভ্রা একটু পাংশু হয়ে উঠেছিলো বটে, কিন্তু নিরুপমের এই সাবধান বাণীতে উল্টো উৎপত্তি হলো। আরও বেপরোয়া জেদের ভঙ্গীতে বল্লে—ঈস্, মান ভাঙাতে দায় পড়েছে আমার। ঘুমোকনা ও পড়ে পড়ে।···আমাদের কালকের সেই কমিউনিজ্‌মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে মুলতুবি তর্কটা শেষ করা যাক আজ।

নিরুপম নিঃশব্দে চোখ তুলে ওর বিদ্যুতালোকে উদ্‌ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে।··কোন 'ইজ্‌মের'ই মূলতত্ত্ব বুঝতে উদগ্রীব মুখ সে নয়। কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির ভাব। কোথায় যেন রয়েছে হঠাৎ জলে ওঠা আগুনের আশঙ্কা!

এই দীর্ঘ সাহচর্যের মাঝখানে, বহু চকিত মুহূর্তে এ মুখে এমনি একটা অপরিচিত দীপ্তি ঝলসে উঠতে দেখেছে সে, কিন্তু আজকের মতো এতো প্রখর, এতো স্পষ্ট কি? এর দায়িত্ব নেওয়া কি সহজ?

বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ বস্তুকে চোখ বুজে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কি করতে পারা যায়? তাই নিরুপম জোর করে হেসে বলে—শেষ বেলাটুকু আর তর্কের কচ্‌কচিতে নীরস করে তুলে লাভ কি?

আর বলেই বুঝতে পারে অসাবধানে কি সর্ব্বনেশে কথা বলে বসেছে সে।...

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই নিরুপমের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি অসাড় করে দিলো একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ। স্পর্শ আর স্বর।

যে বিদ্যুৎ ঝিলিক্ মারছিলো শুভ্রার সুর্মাটানা চোখের তারায়, সেটা কি নেমে এসেছে ওর আঙুলের কটি ডগায়? তা নয়তো শুভ্রার হাতখানা যদি এসেই পড়ে থাকে নিরুপমের হাতের ওপর, এমন আত্মবিস্মৃত হচ্ছে কেন সে? ওকি বুঝতে চেষ্টা করছে—এ স্পর্শ কার? এ স্বর শুভ্রার কি না? ও কি বুঝতে পারছে না, একবার উচ্চারিত কথা সহস্রবার উচ্চারিত হচ্ছে কেন! অবিরত কে বলে চলেছে নিরুপমের কানের কাছে—"সময়কে সরস করে তোলবার ক্ষমতা তোমার আছে?" "সময়কে—?"···"সময়কে··"

বাতাসে উড়ছে শুভ্রার হাতের শিল্পচাতুর্যে সমৃদ্ধ টেবিলক্লথের কোণ, উড়ছে পিছনের ঘরের দরজা জানলার পর্দাগুলো...উড়ছে শুভ্রার দুই রগের পাশের ঝুরো চুলের গোছা।

কাঁপছে নিরুপমের আঙুলের ডগা, আশঙ্কিত হৃৎপিণ্ড।

কাঁপছে শুভ্রার পাতলা ঠোঁট, ঘন আঁখিপল্লব।

শুধু নীরব প্রহরীর মহিমায় নিষ্কম্প শিখায় জ্বলছে পঁচাত্তর পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্‌বটা।···কিন্তু—

নিষ্কম্প দৃষ্টিতে পাহারা দিচ্ছে কি শুধু ওই বালব্‌টাই ? আর কোনো দৃষ্টি নয় ?

দূরে সহরের বিখ্যাত ঘড়িঘরে একটা একটা করে বাজলো বারোটা ঘণ্টা।—হাত সরিয়ে নিয়ে নিরুপম স্নিগ্ধ স্বরে বললে—শুতে যাও শুভ্রা, সরোজ বেচারাকে মিথ্যে উৎকণ্ঠিত করে লাভ কি ?

—উৎকণ্ঠিত হবার জন্যে জেগে বসে থাকবার ক্ষমতা থাকলে তো! শুভ্রা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—বিছানায় পড়তে না পড়তে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোয়।

নিরুপম মৃদু হেসে বলে—আজ ঘুমোয়নি। যাও।

—যদি না যাই ?

—নিতান্তই যদি না যাও, বসেই কাটাতে হবে রাতটা। উপায় কি ? ক্রমশঃ নিজেকে ফিরে পাচ্ছে নিরুপম।

-- শুধু এইটুকু ? শুধু উপায়হীনতা ? আর কিছু নয় ?

সর্ব্বনাশের ছায়া শুভ্রার সুর্মাটানা কালো চোখে। সর্ব্বনাশের ইসারা ওর চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে।

কিন্তু নিরুপম আর ভয় পাচ্ছেনা ওতে। আরো সহজ পরিহাসের সুর নকল করে বলে—'আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়।......রহে যাহা মর্ম্মমাঝে—' কিন্তু দুপুর রাতে এখন রবীন্দ্র কাব্য আওড়াতে বসলে কাব্যবোধহীন বুধন হতভাগাটার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠবে। ঘুম বলে মরে যায় হতভাগা, ঘুমোতে পাচ্ছে না।

সচকিত হয়ে ওঠে শুভ্রা। স্থান কাল পাত্রের জ্ঞান ফিরে পায় বুঝিবা। বিস্ময় উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করে—বুধন ? কেন তার আবার ঘুমোতে কি হোল ? কোথায় আছে সে ?

চোখের ইসারায় সামনের অন্ধকার মাঠের একটা জায়গার দিকে শুভ্রাকে অবহিত করে দিয়ে নিরুপম বলে—ওই নীচে, গাছতলায় বসে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে।

আরো উদ্বিগ্ন শোনায় শুভ্রার গলা—কেন! রাত দুপুরে ঝড়ের মুখে ওরকম মাঠের মাঝখানে বসে আছে কেন ও ?

—খুব সম্ভব আমাদের পাহারা দিতে ওই জায়গাটাই ও দৃষ্টিক্ষেপণের পক্ষে সুবিধে বলে মনে করেছে।

—জানতে তুমি ?

—আন্দাজ করছিলাম, দেখতে পেলাম। ভয়ঙ্কর ভীতু লোকটা, ঘড়ির এ্যালার্মকে বোমার সাইরেণ বলে ভুল করে বুক দিয়ে রক্ষা করতে ছুটে আসে !

অপমানের কালো মুখে ঠিকরে উঠে দাঁড়ায় শুভ্রা, চলে যেতে যেতে বলে—ওঃ। সেই রক্ষাকবচের ভরসাতেই বুঝি এতোক্ষণ তুমি এতো নিশ্চিন্ত ছিলে ?

চলে যাওয়ার অধৈর্য ব্যস্ততায় বেতের চেয়ারটা গেলো উল্‌টে পড়ে।

মিনিট খানেক স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে আস্তে আস্তে চেয়ারটা তুলে সোজা করে দিয়ে পিছনের পর্দা ঠেলে নিজের ঘরে ঢুকে যায় নিরুপম !

কে জানে শুয়ে পড়লো না বসেই থাকলো। ঘর অন্ধকার, বোঝার উপায় নেই।

কিন্তু যতো রকম নাটকীয় ঘটনার একত্র সমাবেশ কি এই রাত্রিটুকুর জন্যেই তোলা ছিলো ?

আবার যে শুভ্রা এরকম উন্মত্ত অধীরতায় নিরুপমের ঘরে এসে আছড়ে পড়বে তা' কে ভেবেছিলো ? রক্ষে এই এসেই আলোটা জেলে দিয়েছে।

—নিরুপম। জব্দ করে দাও ওকে, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট করে দাও ওর। পালিয়ে চলো আমাকে নিয়ে। একলা ফিরে যাক ও।

বিছানার একাংশে বসেছে শুভ্রা, জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে নিরুপম

—কী পাগলামী করছো শুভ্রা ? হলো কি ?

—ঘরে খিল আটকে রেখেছে ও। নিশ্চয় জানি জেগে আছে, তবু খুললো না ! বারবার ধাক্কা দিলাম, তবু থাকলো চুপ করে !

—কিন্তু জেগে আছে কে বল্লে তোমায় ? তুমিই তো বলো ওর অজ্ঞান ঘুম, চলো দেখি—

—না না কক্ষনো যেতে পাবেনা তুমি। ঘুমোয়নি ও আমি জানি। ঘুমোলে খিল লাগাতো না। ইচ্ছে করে, শুধু আমায় অপমান করবার জন্যেই···আমি এতো রাত অবধি বাইরে থাকলাম, তাই ও······ওর কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে যাও নিরুপম।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শুভ্রা।

নিরুপম যেন ভাবতে পারছে না ঘটনাটা কি ঘটে যাচ্ছে।

কোনো নাটকের অভিনয় দেখছে না তো ? এ রকম অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটে সত্যিকার জীবনে ? নিরুপায় নিশ্চেষ্টতায় শুভ্রার কান্নাটাই দেখতে থাকে সে।

* * * *

কিন্তু সাধে বলছিলাম—'একত্র সমাবেশ' !

অকস্মাৎ সমস্ত বাড়ীটাই শুধু নয়, বোধকরি সহরটাই কেঁপে ওঠে দরজা ঠেলার প্রচণ্ড শব্দে। ধাক্কার পর ধাক্কা, নিবৃত্ত হতে চায়না। গভীর রাত্রের শব্দ কী ভয়ানক !

এ আবার কি !

এ শুনে বাড়ীর সব ক'টা লোক এক জায়গায় জড়ো না হয়ে করবে কি ? এ হেন আকস্মিকতায়, যে বিষ খেয়ে মরতে বসেছে সেও বিষের পাত্রটা হাত থেকে নামিয়ে একবার অকুস্থলে উঁকি না দিয়ে পারে না—যে গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছে সেও বোধ করি দড়ি গাছটা হাতে করে রঙ্গস্থলে এসে হাজির হয়।

আর—এর পরও ঘুমের ভান টিঁকিয়ে রাখবে এমন পাগলই বা কে আছে ?

অথচ—

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। 'বহু মাইজীর' মৃদু করাঘাতে 'বন্ধুবাবুর' ঘুম ছুটলোনা দেখে, হতভাগা বুধন কোথা থেকে এসে ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।...

এবার শুভ্রার সরোজের ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়বার পালা।

কেন সরোজ খামোকা এমন অপদস্থ করলো শুভ্রাকে ? চাকরবাকর আড়ালে হাসবে, একি বিশ্রী বিদঘুটে ঠাট্টা ? কি না কি ভাবলো ওরা কে জানে ! দরজা ঠেলে ঠেলে ফিরে যেতে হলো শুভ্রাকে ! এর চাইতে অপমান আর কি আছে জগতে ? অন্য মেয়ে হলে, অকারণ এমন অপমানে, রাগে অভিমানে গলায় দড়ি দেয়।

শেষ কথাটারই শুধু উত্তর দেয় সরোজ—তুমিও দিলে না কি বলে, তাই ভেবেই তো অবাক হয়ে যাচ্ছি।

অথচ—

এ অপমানও হজম করতে হয় শুভ্রাকে।

সত্যি তো আর এখন দড়ি খুঁজে বেড়াবে না সে ? তবে একমিনিটও আর তিষ্ঠোবে না এ বাড়ীতে, ষ্টেশনে বসে থাকবে বরং দু' ঘণ্টা, এদের সামনে মুখ দেখাবেনা আর ! সরোজ না যায় নিজেই চলে যাবে সে। ছি ছি, বুধনটা পর্যন্ত কি না বুঝতে পারলো ?

সেই থেকে মৌনব্রতই নিয়েছিলো নিরুপম। এই দণ্ডে চলে যাওয়ার প্রস্তাবে একবার শুধু আড়াল খুঁজে বলে—যেতেই তো হতো ? কিছুক্ষণের জন্যে এভাবে 'শো' করে চলে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না শুভ্রা।

চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দেয় শুভ্রা—আর বেশীক্ষণ থাকলে তোমার পোষা কুকুরটাকে লেলিয়ে দিতে কি না, তারই বা নিশ্চয়তা কি !

বলবে না তো কি ? প্রত্যাখ্যাত নারীহৃদয়ের মতো এমন ভয়ঙ্কর হিংস্র আর কি আছে জগতে ?

যাবার সময় সরোজের কাঁধে একটা হাত রেখে নিরুপম ক্ষুব্ধ হাসির সঙ্গে বলে—যাও এখন ত্ব'ঘণ্টা ষ্টেশনে বসে থাকো গে। বোকার মত দরজায় খিল লাগাতে গেলে কেন ?

কাঁধের ওপর রাখা বন্ধুর হাতখানার ওপর নিজের অপর হাতটা রেখে একটা মৃদু গভীর চাপ দিয়ে সরোজ হেসেই উত্তর করলো--তাই ভাবছি। নেহাৎ বোকামীই হয়ে গেছে। দরজার খিল কতোকাল আটকে রাখা যায় বলো ? খিল আটকে 'জেগে বসে থাকবো' ভাবার মতো হাস্যকর বোকামী আর কি আছে ?

ভাবশূন্য নীরেট মুখে ওদের প্রত্যেকটি মালপত্র সযত্নে গাড়ীতে তুলে দিয়ে ট্রেণ ছাড়া পর্যন্ত দেখে ফিরে এসেছে বুধন। হয়তো এতোক্ষণে শুতেই গেলো নিশ্চিন্ত হয়ে।

বারান্দায় তেমনি পাতা রয়েছে বেতের টেবিল চেয়ারগুলো। তেমনি বাতাসে উড়ছে টেবিলক্লথের ফুলকাটা কোণ, উড়ছে জানলা দরজার পর্দা।

সারারাত ধরেই ঝড় বইছে আজ।

ভোর হয়ে আসছে, তবু আলোটা নিভিয়ে দেবার কথা মনে পড়েনি, মনিব চাকর কারুর। অনর্থক জ্বলেই যাচ্ছে সমান তেজে।

বিছানায় পড়ে পড়ে কি ভাবছে নিরুপম কে জানে।

বিকেল পাঁচটায় যাবার কথা ছিল ওদের, নিরুপমই আটকেছিলো।

আটকেছিলো শেষ রাত্রের ট্রেনখানার অজস্র গুণকীর্ত্তন করে করে। কিন্তু কোন্ সাহসেই বা করেছিলো ? অসংখ্যবার পায়নি কি বিপদের সঙ্কেত ?

আচ্ছা সরোজই কি পায়নি ?

ঘড়ির অ্যালার্মকে বোমার সঙ্কেত ভেবে আতঙ্কিত হওয়াটা যেমন হাস্যকর, তেমনি হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা নয় কি সত্যিকার 'সাইরেণ' শুনেও অসতর্ক থাকা ? অন্ধ আত্মবিশ্বাস, অর্থহীন উদারতা আর মূঢ় অসতর্কতায় প্রভেদ কতোটুকু ?

আগের ট্রেনখানা ধরলে হয়তো বন্ধু আর বন্ধু-পত্নীকে সসম্মান স্নেহে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবার সময়ে নিরুপম জানিয়ে রাখতে পারতো পরবর্তী ছুটির জন্য সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ।

ট্রেনের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে শুভ্রা সরোজ দিতো সহাস্য প্রতিশ্রুতি।

কে খোঁজ করতে যেতো কোন নির্জনতায় চিরদিনের জন্য জেগে রইলো এক অন্তহীন নিরুত্তর প্রশ্ন।

কে জানে চলন্ত ট্রেনের জানলায় মুখ রেখে আসন্ন ভোরের আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সরোজও ওই একই কথা ভাবছে কি না। কোনটা শ্রেয়— অন্তহীন নিরুত্তর প্রশ্ন না সন্দেহহীন নির্মম উত্তর ?

এগারটী সন্তানের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট কনিষ্ঠ পুত্রের মুখাগ্নি সেরে বৃদ্ধ পিনাকপাণি যখন স্নান করে তীরে উঠলেন, পশ্চিমের আকাশ তখন সবে ম্লান হয়ে এসেছে। গোধূলি বেলায় সারা পৃথিবীর বুকে মুঠি মুঠি সোনা ছড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ যেন আকাশ চমকে উঠেছে অপরিমিত অপব্যয়ের অঙ্ক দেখে, তাই কুণ্ঠিত কৃপণতায় কুড়িয়ে দিতে চায় আপনারই অজস্র দানের সোনার ফসল।

গাছের মাথায় মাথায় তখনো ঐশ্বর্যের আভাস, নীচে নদীর জলে নেমেছে দারিদ্র্য।

পিনাকপাণি সেই পশ্চিম আকাশের পানে মুখ করে একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন, হাত জোড় করে নয়—বক্ষবদ্ধ হাতে সোজা সতেজ। বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের বিশাল বংশের শেষ বংশদণ্ড, পিনাকপাণি চৌধুরী।

দীর্ঘ ঋজু দেহ, একতিল নুয়ে পড়েনি। শোকের ভারে নয়, বার্দ্ধক্যের ভারে নয়, অবস্থা বিপর্যয়ের অসংখ্য ঘাতপ্রতিঘাতে নয়।

বিধাতার স্পর্দ্ধিত ধৃষ্টতাকে পিনাকপাণি উপেক্ষার তীব্র ভ্রুকুটী হেনে এসেছেন আজীবন। আজও বংশের শেষ প্রদীপ কমলপাণির আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেন না, অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন শুধু। অবাক হয়ে গেলেন—বিধাতার অর্থহীন ধৃষ্টতার বহর দেখে।

শ্মশান সঙ্গীর দল যারা এসেছিল—তারা তখনো জলে নামেনি, খানিকটা তফাতে বসেছিল জটলা করে, পিনাকপাণি চৌধুরীর সঙ্গে একসঙ্গে স্নানে নামবার সাহস হয়নি হয়তো, তাদের মধ্যে একজন নদীর অপর পারে আঙুল বাড়িয়ে বললে—দেখেছো ?

সচকিত দৃষ্টিতে অপর সকলে বলে উঠলো—কি ?

ওপারে ঠিক সামনেই আকাশের মাঝখানে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাজপড়া তালগাছ বিধাতার অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের মতন। তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পিনাকপাণির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শশাঙ্ক একটা নিঃশ্বাস ফেলে অন্যমনস্ক ভাবে বললে—আশ্চর্য মিল! শশাঙ্কর মত দৃষ্টিভঙ্গি না থাক্ তবু বক্তব্যের গভীরতা অনুভব করে উপস্থিত সকলেই নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে পিনাকপাণি নিজেই সরে এলেন—ধীর শান্ত গলায় বললেন—সন্ধ্যা হয়ে আসছে, স্নান সেরে নাও তোমরা।

এর মধ্যে একমাত্র শশাঙ্কই তাঁর আত্মীয়—নিকট নয়, দূর সম্পর্কের ভাগিনেয়, কিন্তু সম্পর্ক নিকটতম হয়ে উঠেছিল কমলপাণির সঙ্গে আবাল্য সৌহার্দ্যে। চৌধুরী বংশের উগ্র আভিজাত্যবোধ যেন পিনাকপাণির মধ্যেই জমাট হয়ে গিয়েছিল। ছেলে মেয়েদের মধ্যে কেউ পায়নি বাপের প্রকৃতি, পেয়েছিল মায়ের স্বভাব। কমলপাণির কোমল আর ভাবুক মন একাকী থাকতে পারেনি, চেয়েছিল সঙ্গ, চেয়েছিল বন্ধুত্ব।

যাক্, এগারটী সন্তান তা'দের রুচি প্রবৃত্তি শিক্ষা সাহস সমস্ত মুছে দিয়ে একে একে চলে গেছে, শেষে গেল কমলপাণি। পিনাকপাণির উঁচু মাথা হেঁট করে দেবে এমন আর রইল না কেউ এ বংশে।

মাথার শিরা ছিঁড়ে অকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছে কমলপাণির। শশাঙ্কর মনে হচ্ছিল তারও মাথার ভিতরের শিরাগুলো রক্তে ফেটে ছিঁড়ে যাবে বুঝি।

"কমল নেই"—কী অদ্ভুত আর সৃষ্টিছাড়া কথা!

তপ্তসোনার মত গৌর দেহ, উন্নত দীর্ঘ গঠন, বিশাল বুক, লম্বা ছাঁদের রক্তাভ আঙ্গুলগুলি, আর সেই তার সদা প্রসন্ন মুখখানা, এইমাত্র সমস্ত পুড়িয়ে ছাই করে এল সবাই!

শশাঙ্ক নিজেই দিয়েছে জ্বলন্ত কাঠ ঠেলে।

আর এই হাত নিয়ে শশাঙ্ক ফিরে যাবে? মুখ দেখাবে উর্ম্মিলাকে? কি বলবে উর্ম্মিলা?

পিনাকপাণি আর একবার ডাকলেন—শশাঙ্ক, ওঠ।

মুখ তুলে তাকালো না কেউ, মাথা হেঁট করে উঠে দাঁড়ালো সকলেই।

বৃদ্ধ বলে নয়, শোকগ্রস্ত বলে নয়, পিনাকপাণি চৌধুরীকে সকলে সমীহ করে পিনাকপাণি চৌধুরী বলেই। হৃতগৌরব বংশের বাইরের মর্যাদা সবই লুপ্ত হয়ে গেছে, লুপ্ত হয়নি শুধু অন্তরের আভিজাত্য। নীলরক্তের মর্যাদাবোধ নিয়ে পিনাকপাণি এই বিশাল জগতে নির্ব্বান্ধব একাকী। পুত্র-শোকাতুরকে সান্ত্বনা দিতে আসবে এমন পাগলামীর কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

ধ্বংসোন্মুখ বিরাট প্রাসাদের ভাঙা দেউড়ির সামনে এসে পিনাকপাণি দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন—আচ্ছা তোমরা এবার যেতে পারো, অনেক পরিশ্রম করেছ সারাদিন।

আদেশ! ধন্যবাদ, সৌজন্য, সাধারণ লৌকিকতা কিছুই নয়।

মর্চ্চেধরা লোহার কপাটটা ক্যাঁচ করে একটা আর্ত্তনাদ করে উঠলো, ঠেলে খুলেছেন পিনাকপাণি, ভেজানোই ছিল। লোহার যে খিলটা তুলে লাগাবার কথা সেটা তুলবার ক্ষমতা আর কারোর নেই এ বাড়ীতে।

উর্ম্মিলার না, বুড়ি নিস্তারেরও না।

শশাঙ্ক যায়নি। ঈষৎ ইতস্ততঃ করে বললে—আমি আজ থাকতাম—

—থাকতে চাও? আচ্ছা এসো—দরকার ছিল না কিছু—

"দরকার ছিল না!"—শশাঙ্ক একবার এই নিবিড় অন্ধকারের স্তূপের দিকে চোখ তুলে চাইলে।···দক্ষিণের দোতলাটা সমস্ত ধ্বসে গিয়ে একতলার ছাদে জন্মেছে আগাছার জঙ্গল, আর নাটমন্দিরের জায়গায় খানিকটা জমাট অন্ধকার। দিনের বেলা দেখা যায়, দু'শতাব্দী

আগের ছোট ছোট পাতলা ইট, গোল চৌকো অদ্ভুত সব আকারের—জমে পাহাড় হয়ে আছে।

দেউড়ির খিলানটা একটা স্তম্ভ সমেত কবে খসে পড়েছে—আর একটা স্তম্ভ অবিকৃত দাঁড়িয়ে আছে তার অসংখ্য কারুকার্য আর সিংহের থাবা নিয়ে।

আমলা কর্ম্মচারিদের ছোট ছোট ঘরওয়ালা একতলা মহলটা এদিক ওদিক খোলা হাঁ হাঁ করছে, একটারও কপাট নেই। 'তোষাখানা' 'মালখানা' 'নজর ঘর' ইত্যাদি অসংখ্য মহল, বালির আস্তর ঘুচিয়ে, কপাট হারিয়ে, ছাদ ভেঙে, পড়ে আছে অনেক ঝড় বৃষ্টি শীত গ্রীষ্মের চিহ্ন বুকে নিয়ে মহাকালের নীরব সাক্ষীর মত।

শুধু 'অন্দর মহলের' খানকয়েক ঘর এখনো সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হয়ে পড়েনি। তারই একটাতে থাকেন পিনাকপাণি, তাঁর ছ'খানা পায়া লাগান তিন হাত উঁচু পালঙ্ক নিয়ে।

দূরত্ব বাঁচিয়ে ওদিকের একটা ঘরে কমলপাণি থাকতো তার এস্রাজ বই আর বৌ নিয়ে। সেখানে ছিল শশাঙ্কর অবাধগতি।

পিনাকপাণি কোনদিন লক্ষ্য রাখেননি তার গতিবিধির।

মামার পিছন পিছন শশাঙ্ক ঢুকলো ধীরে ধীরে সাবধানে। মর্চ্চে ধরা লোহার কপাটটা ঠেলে বন্ধ করতে গিয়ে দেখলো রীতিমত শক্তির প্রয়োজন।

এই কপাট খুলতে এ বাড়ীতে আর কে আসবে? কোন্ শক্তিধর?

উর্মিলা আছে এখানে, এই বিরাট রাক্ষসপুরীর কোন্ অন্ধকার কোণে? পিনাকপাণির প্রয়োজন না থাক—তার কি প্রয়োজন নেই সান্ত্বনার?

অনেক গোলক ধাঁধাঁ পার হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পিনাকপাণি যেন প্রথম লক্ষ্য করলেন শশাঙ্ক তাঁর অনুসরণ করছে।—আচ্ছা তুমি তা'হলে পাশের ঘরে শুয়ে পড়ো শশাঙ্ক, আজ রাত্রে তো আর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কিছু—বলে ছ'খানা পায়া লাগানো তিনহাত উঁচু পালঙ্কের উপর শুয়ে পড়লেন।

অস্ফুট ব্যাকুল কণ্ঠে শশাঙ্ক বললে—বৌদি?

—বৌমা? ওঃ! নিস্তার আছে তাঁর কাছে।

ব্যস। সদ্য স্বামীহারা অসহায়া তরুণী, তার জন্যে আর কিছু ভাববার নেই।

শশাঙ্ক স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

এই ঔদাসীন্য, এই নির্ব্বিকার নির্লিপ্ততা, একি সত্যই স্বাভাবিক? প্রলয়ের ঝড়েও চূর্ণ হয়ে যায় না এই পাষাণের বাঁধ?

হঠাৎ শশাঙ্ক মরিয়া হয়ে বলে উঠলো—তাঁর সম্বন্ধে একটু খোঁজ নেওয়া দরকার নয় কি?

—দরকার? ঈষৎ হাসলেন পিনাকপাণি—কাউকে শোকে মারা পড়তে দেখেছ

কখনো? চেঁচাবে, আছড়াবে, চুল ছিঁড়বে, বুক চাপড়াবে, আবার এক সময় স্থির হয়ে যাবে।

কিন্তু উর্মিলা কি সেই প্রকৃতির মেয়ে? শশাঙ্কর মনে পড়লো তার সেই আর্ত্ত অসহায় মুখ, যখন কমলপাণিকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে এলো ওরা, মুহূর্ত্তের জন্য একবার খসে পড়েছিল মুখের আবরণ, খসে পড়েছিল বনেদী ঘরের আব্রু।

বাণ খাওয়া পাখীর মত লুটিয়ে পড়ে একটীবার শুধু চেঁচিয়ে উঠেছিল—ঠাকুর পো, তোমার পায়ে পড়ি ভাই নিয়ে যেও না—

সে অনুরোধ রাখেনি শশাঙ্ক, রাখবার নয় বলেই রাখতে পারেনি, কিন্তু এ কী নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার তাদের? কী দুর্দ্দশা ঘটলো উর্মিলার, একবার দেখবে না? নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে যাবে?

তাই শেষ চেষ্টার মত বললে—তবু দেখি একবার, নিস্তার হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে—

—নিস্তার কমলকে মানুষ করেছিল শশাঙ্ক, মাতৃহীন শিশুকে। ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই। আজ থাক। সদ্য বিধবার মুখ দেখতে নেই, শাস্ত্রের নিষেধ।

শশাঙ্ক জানে এর উপর প্রতিবাদ নেই, যুক্তি নেই। শাস্ত্রের নিষেধ না হোক পিনাকপাণির নিষেধ।

আশ্চর্য! না মেনে উপায় নেই? লঙ্ঘন করতে দেখেছে কেউ কখনো? কিন্তু কেন? বিধাতার বজ্র ভেঙে পড়বে? কিন্তু কই পারলোও না তো।

সকালবেলা পিনাকপাণি শশাঙ্ককে ডেকে পাঠালেন।

পরিশ্রম, অনাহার আর রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি নিয়ে শশাঙ্ক এসে দাঁড়ালো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। পিনাকপাণি পরিষ্কার মার্জিত গলায় বললেন—শোন শশাঙ্ক, একটা কথা বলা দরকার। কমল তার স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা সম্বন্ধে তোমাকে এতখানি স্বাধীনতা দিয়েছিল আমার জানা নেই, এ বিষয়ে সন্ধান রাখা আমি অনধিকার চর্চা বলেই মনে করতাম, কিন্তু আজ—দুর্ভাগ্যক্রমে তার দায়িত্ব এসে পড়লো আমার হাতে। আমার বিবেচনায় তোমাদের সাক্ষাৎ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়

শশাঙ্ক মূঢ়ের মত চেয়ে রইল, যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না কথাটা, তারপর নম্র গলায় ঈষৎ মিনতির সুরে বললে—বৌদির যে কথা বলবার দ্বিতীয় সঙ্গী নেই মামাবাবু।

—বিধিলিপি। যে যার কর্ম্মফল ভোগ করতে বাধ্য। তা'ছাড়া সঙ্গী হিসেবে তুমি তাঁর বিশেষ উপকারী হবেনা বোধ হয়। যাক্ আশা করি দ্বিতীয়বার বলার কষ্টটা আমায় দেবেনা তুমি।

—না। শশাঙ্ক ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ভাঙা ইটের কারাগার থেকে। সমস্ত অনুভূতি

ছাপিয়ে অপমানের একটা তীব্র অনুভূতি মাথার মধ্যে আগুনের শিখার মত জ্বলতে লাগলো।

স্বামীর শেষ শয্যায় মুখ গুঁজে তখনো পড়েছিল উর্মিলা। ওঠেনি, মুখ তোলেনি, স্নান করেনি, বৈধব্যের বেশ গ্রহণ করেনি। নিজের হাতে করতে হবে, সেটা হয়তো ভাবতেও পারেনি।

পিনাকপাণি বধূর টকটকে সিঁথির পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে ঈষৎ কোমল গলায় বললেন—সিঁদুরটা ধুয়ে ফেলো বৌমা, ওটা রাখতে নেই।

উর্মিলা উঠে বসে মাথায় কাপড় তুলে দিলে। শ্বশুরকে সে বুঝতে পারেনা, তার ভয় করে, তাই সাবধানে স্বামীর ছায়ায় কাটিয়ে এসেছে এতদিন, সহজে কাছ ঘেঁষেনি। কিন্তু আজ ছায়ার ব্যবধান ঘুচে প্রখর সূর্যের নীচে এসে দাঁড়াতে হ'ল উর্মিলাকে।

পিনাকপাণি বললেন—দেখ বৌমা, এ বাড়ীতে আজ পর্যন্ত কখনো চাকুরে ঘরের মেয়ে বৌ হয়ে আসেনি। তোমায় এনেছিলাম—কোষ্ঠি দেখে। আয়ুস্তির জোরে যমকে পরাস্ত করবে এমনি নাকি তোমার কোষ্ঠির ফল। কিন্তু চৌধুরী বংশের অভিশাপের কাছে হার মানল তোমার কোষ্ঠি। যাক্, নিয়তি খণ্ডাবার সাধ্য কারোর নেই, এখন তুমি কি করতে চাও?

উর্মিলা বিস্ময়ব্যাকুল দুই চোখ মুহূর্তের জন্য তুলে ধরলে, কি করবে সে? কি করতে চাইবে? তার জীবনে চাইবার আর কিছু বাকী আছে নাকি?

—বলছি, তোমার বাবার কাছে ফিরে যেতে চাও?

—কেন?—এতক্ষণে এইটুকু মাত্র বলতে পারলো উর্মিলা।

—এই সঙ্গীহীন নির্বান্ধব পুরীতে চৌধুরীবাড়ীর সম্মান রক্ষা করে চলতে পারবে? আজীবন—আমরণ? মনে রেখো এখানে দয়া নেই মায়া নেই ক্ষমা নেই, আছে শুধু বংশমর্যাদা।

উর্মিলা একবার কেঁপে উঠলো।

—আর যদি চলে যেতে চাও, আপত্তি করব না—পিনাকপাণি চৌধুরীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বংশ আর বংশমর্যাদা দুইই লোপ পেয়ে যাবে। কিন্তু জেনো, চলে গেলে এ বাড়ীর দেউড়ি চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে, চৌধুরীবাড়ীর বৌরা কখনো দেউড়ির বাইরে রাত্রিবাস করেনি। এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়া মানে সব সম্বন্ধ শেষ করে যাওয়া—

—আমাকে এ বাড়ী ছাড়তে বলবেন না, বাবা!

আহত পশুর মত আর্তনাদ করে উঠলো উর্মিলা

—ভেবে দেখো—আমার মৃত্যুর পরে—একেবারে একলা—

—বাবা—

অধীর আবেগে কি যেন বলতে গেল উর্মিলা, স্বর ফুটল না, শুধু কচি কিশলয়ের মত দুটি ঠোঁট কেঁপে উঠলো থরথর করে।

চৌধুরীবংশের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ করবে কি করে উর্মিলা? কমলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি তার সত্তা লুপ্ত হয়ে গেছে? উর্মিলার সারা দেহে ব্যাপ্ত হয়ে নেই চৌধুরী বংশের রক্তধারা?

কিন্তু এ সংবাদ কে জানাবে পিনাকপাণিকে?

কমল নেই, শশাঙ্ক আসে না, পাড়ার লোকের সাহস নেই এ বাড়ীর কুশল নিতে আসবার। বিশ্বজগত থেকে নিজেকে লুপ্ত করে নিয়ে উর্মিলা একটা অজানা আশা, একটা অনমুভূত আশঙ্কায় দিন গোণে।

শ্বশুরের দিকে আসতে গেলেই ভয়ে ওর বুকের ভিতর হিম হয়ে আসে। ভাত বেড়ে দিয়ে সরে যায়, বলে—নিস্তার, ডেকে দাও।

নিস্তার মাঝে মাঝে বলে—বাবুকে এইবার বলি, বৌমা? একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে?

উর্মিলা ওর মুখ চেপে ধরে বলে—তোর পায়ে পড়ি নিস্তার, আমার বড় ভয় করে।

নিস্তার আঁচলে চোখ মোছে—কি কপাল নিয়েই এসেছিলে মা? মা রয়েছে বাপ রয়েছে—এই দুর্দিনে কি আবার মানুষে এই রাক্ষসপুরিতে পড়ে থাকে? কি করবো মা, শ্বশুর তো নয় যেন যম। আজ তিরিশ বছর এ বাড়ীর অন্নজল খাচ্ছি বৌমা, তবু আমারই এখনও দেখলে ভয় লাগে। তুমি ত কচি বাচ্চা!

উর্মিলা ভাবে শিশুর কলধ্বনি কি পাষাণে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে? এই মৃত্যুপুরীতে জাগবে জীবনের স্পন্দন?

কিন্তু উর্মিলার একমাত্র আশ্রয়স্থল নিস্তারও একদিন গেল মরে।

জ্বরের ঘোরে কাঁদলে আর বললে—"তোমায় রেখে মরেও আমার সোয়াস্তি নেই বৌমা।"

স্বস্তি কমলেরই কি ছিল? তবু মরলো। উর্মিলার ভাগ্যলিপি!

নিস্তার মারা গেছে শুনে শশাঙ্ক আর স্থির থাকতে পারল না, কমলের মৃত আত্মা তা'কে যে অবিরত তিরস্কার করছে! পিনাকপাণির জেদই কি শুধু বড় হয়ে থাকবে সকলের উপর? থাকবে না দয়া ধর্ম, বুদ্ধি বিচার?

নির্জন ঘরে প্রদীপের আলোয় দীর্ঘ ছায়া দেখে শিউরে উঠে মুখ তুলে তাকালো উর্মিলা···কে? কে? শশাঙ্ক ত্রস্ত স্বরে বললে—বৌদি, রাগ কোরোনা, গুছিয়ে সব কথা বলবার সময় নেই, শুধু একটা কথা তোমার কাছে জানতে এসেছি—তুমি কি মরতে চাও?

—মরতে?

ম্লান হেসে উর্মিলা উঠে এসে কপাট ধরে দাঁড়ালো। বললে—মরতে পেলে বেঁচে যেতাম ঠাকুরপো, কিন্তু মরবার আমার উপায় নেই ভাই।

আসন্ন মাতৃত্বের স্পষ্ট অভিব্যক্তি উর্মিলার নিরুপায়তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিলে।

শশাঙ্ক চমকে উঠলো—এতদিন এ সন্দেহ তার মনে আসেনি কেন? পরিহাসছলে এমনি একটা আভাস কমল একদিন জানিয়েছিল না? হায় দুর্ভাগিনী।

—অথচ এর পরেও তুমি এ বাড়ীর ভাঙ্গা ইট কামড়ে পড়ে থাকবে? এ বাড়ীর বাতাসে আছে বিষ, এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমানো আছে অভিশপ্ত আত্মার নিঃশ্বাস, এখানে থাকলে তুমি বাঁচবে না বৌদি—

—বাঃ শশাঙ্ক, চমৎকার! তোমার কথাগুলি শুনতে বেশ। কোনো ভাল নভেল থেকে পড়ে এলে বুঝি?

পিছন থেকে লোহার মত কঠিন আঙুলগুলো শশাঙ্কর গলায় চেপে বসে ক্রমশঃ শ্বাসরোধ করে আনতে থাকে······

অন্ধকারে পিনাকপাণির দীর্ঘ দেহটাকে মনে হচ্ছে প্রেতাত্মা। মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লো উর্মিলা, বোধ করি দাঁতে দাঁত চেপে চীৎকারকে রোধ করে রাখবার পরিশ্রমে।

এতদিনে পিনাকপাণির নজরে পড়লো পুত্রবধুর দৈহিক পরিণতির দিকে। একী! এতোদিন কি অন্ধ হয়ে ছিলেন তিনি?

কলঙ্ক পড়লো চৌধুরী বংশে পিনাকপাণি বেঁচে থাকতে!

—পাপের শেষ হোক—বলে জীবিত ও মৃত দুটো দেহকেই ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলেন পিনাকপাণি।

শুধু শিকল নয়, ভারি আর মজবুত তালাব দরকার।

কেটে যায় রাত্রি আর দিন, দিন আর রাত্রি।

গরাদের উপর মুখ চেপে কাতর কান্নায় ভেঙে পড়ে উর্মিলা—ভুল বুঝে এতবড় সর্বনাশ কেন করছেন বাবা? একবার খুলে দিন—চৌধুরী বংশ লোপ হতে দেবেন না।—বিশ্বাস করুন এ বাড়ীর অমর্যাদা হয়নি।

ঘরের ভিতরকার গলিত মৃতদেহের পচা গন্ধে টিঁকতে পারে না সে!

ক্রমশঃ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে গরাদে মাথা ছেঁচে আর উন্মাদের মত চেঁচায়—নিস্তার দোর খোল্, নিস্তার দোর খোল্।···

স্বর ভেঙে আসে—ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে, অবশেষে একদিন নীরব হয়ে যায়। অভিশপ্ত চৌধুরী বংশের অনাগত বংশধর পৃথিবীর আলো দেখবার আগেই বিদায় নিলো পৃথিবী থেকে।

চৌধুরী বংশ! চৌধুরী বংশ! তবে কি পিনাকপাণিরও ভুল হয়? দুই কান রোধ করে পিনাকপাণি সেই বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ হাতড়ে বেড়ান পাগলের মত।

মজবুত লোহার তালা শিকলে লাগিয়ে চাবিটা ফেলেছিলেন অন্ধকারে ছুঁড়ে, সে চাবি গ্রাস করেছে ভাঙা অট্টালিকার কোন্ ক্ষুধিত গহ্বর, কে তা'র সন্ধান দেবে পিনাকপাণি চৌধুরীকে!

—————

আমায় ক্ষমা করো

প্রায় আধখানা গ্রাম জুড়িয়া যে ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদশ্রেণী বিগত গৌরবের নিদর্শন বহিয়া ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মত ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে আজও তাহারা দর্শকের মনে একটা সকরুণ শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলে।

মজুমদার বংশের অতীত মহিমার মূক সাক্ষী।

একদিন নাকি ইঁহাদের "রাজা" বলিয়া খ্যাতি ছিল।

'বারমহল', 'অন্দরমহল', 'কাছারিঘর', 'নাটমন্দির', 'দুর্গাদালান', 'ভোগমণ্ডপ', রান্নাবাড়ী', ইত্যাদি নামের আড়ালে ভাঙা ইঁটের স্তূপের ভিতর যে অস্পষ্ট ছবি ভাসিয়া ওঠে তাহার সামনে মাথাটা আপনিই কেমন নত হইয়া আসে, আর আসে একটা 'হায় হায়' ভাব কেমন ছিল সেই বিচিত্র সমারোহের কোলাহলময় দিনগুলি....কেমনই বা ছিল ইহাদের অধিবাসীরা.. যাহারা এখানে একদিন জন্মমৃত্যু হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের অংশ অভিনয় করিয়া গিয়াছে! ভাঙা দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে এখনও কি তাহাদের অতৃপ্ত নিঃশ্বাস জড়াইয়া আছে? ভোগের এই অজস্র উপকরণ ফেলিয়া যাওয়ায় অতৃপ্তি?

চৈত্র-বৈশাখের এলোমেলো-সন্ধ্যায় কপাট-খসা জানলার ফোকরে ফোকরে যে আর্ত্তস্বর হাহাকার করিয়া ফিরে—সে কি তাহাদেরই সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস?

চামচিকা ও গোলাপায়রার ঝাঁক ছাড়া এখানে অন্য কোন জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব বাহির হইতে বিশ্বাস করা শক্ত —বরং বেশী সহজ ভূতের অস্তিত্ব কল্পনা। তবু, আছে।

হয়তো নেহাৎ নিরুপায় বলিয়াই আছে।

অন্দরমহলের মধ্যে যে ঘরগুলো এখনো কোন প্রকারে টিঁকিয়া আছে তাহারই একখানিতে থাকেন "নতুনগিন্নি"। নবদ্বীপ মজুমদারের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী! সত্তরের কাছাকাছি বয়স, মাজাভাঙা থুনথুনে বুড়ি, চোখের চাহনি নিষ্প্রভ, শুধু গলার জোর আছে সমান!

দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার হোঁচোট্ খাইতে খাইতে কোন গতিকে বুড়ি নিজের পেটের ব্যবস্থাটুকু করিয়া লয়, আর ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ হইতে সুরু করিয়া পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ দেব-দানব সকলের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে থাকে।

বিশ্বসংসারে সকলের উপর ওর অদ্ভুত এক বিজাতীয় ক্রোধ। পৃথিবীটাকেই দাঁতে পিষিয়া ফেলিতে পারিলে যেন ওর শান্তি হয়।

গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের তাপ অসহ্য হইলে ভাঙা কোমরকে সোজা করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া চোখের উপর হাত আড়াল করিয়া আকাশমুখী হইয়া তীব্রস্বরে বলে—'মরছ আগুন জেলে? পুড়িয়ে মারছো পৃথিবীকে? তোমার মরণ হয় না অনামুখো? ভর্ দুপুরে শাপ দিই তোমায়—জ্বলে পুড়ে মরো, জ্বলে পুড়ে মরো।'

অবশ্য সূর্যদেবের গায়ে ব্রাহ্মণ কন্যার অভিসম্পাতের আগুন স্পর্শ করে কি না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু বুড়ির এই অযথা শক্তিক্ষয়ে আলস্য নাই।

আবার বর্ষার দিনে একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ ছাপাইয়া অসন্তোষ মুখর হইয়া ওঠে—'ঝাঁটা খেকো দেবতা, কেঁদে মরছেন, কোন্ যমে ধরেছে তোমায় ?'

কাক চিল ইঁদুর আরশোলা সকলের সঙ্গেই প্রতিপক্ষের ভঙ্গীতে বাক্যবাণ বর্ষিত হয়।

উঠানের ওপারে শ্যামাকে দেখা গেলো···দুই হাতে একগোছা সজিনা ডাঁটা ও একটা পাকা বেল, কোঁচড়ে কয়েকটা পাতিলেবু। নতুনগিন্নিকে দেখিয়া অপ্রতিভের ফিকা হাসি হাসে সাধ্যপক্ষে ইহার সামনে পড়িতে চায় না সে।

শ্যামাকে দেখিয়াই তেলে বেগুনে জ্বলিয়া ওঠে বুড়ি— এই যে পাড়া বেড়ানি 'খুদ মাগুনী' এলেন। সকাল বেলাই লোকের দোরে গিয়ে হাত পাততে লজ্জা করে না শামি ? অমন পেটে আগুন ধরিয়ে দে, আগুন ধরিয়ে দে! ভাতারপুতের সংসার নয়—একটা পোড়া পেট, তার জন্যে এত আহিংখে ? ছিঃ ছিঃ, আমি হলে গলায় দড়ি দিতুম।

শ্যামার যে এ বাড়ীতে সত্যকার কি দাবী আছে সেটা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত, হয়তো অতি সূক্ষ্ম একটু সম্বন্ধের রেশ থাকিলেও থাকিতে পারে, হয়তো কেবলমাত্র আশ্রয়হীনতার দাবীতেই সে আছে। অথচ এতবড় ভাঙা বাড়ীতে তাহার মন টেঁকেনা তাই সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। সময় অসময়ে লোকের উপকার করিতেও ছাড়ে না এবং ভদ্রতার আবরণে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়াই তাহার দিন চলে।

আরো একজন বাসিন্দা আছে—সে হৈমন্তী!

প্রেতপুরীর অন্ধকার গহ্বরেও কি সোনার প্রদীপ জ্বলে ? জ্বলিলে হয়তো হৈমন্তীর সঙ্গে তুলনা করিবার মত বস্তু একটা মিলিত!

এ বাড়ীর শেষ বংশধর সমুদ্রনারায়ণের স্ত্রী হৈমন্তী। সৌন্দর্য আর সুলক্ষণের কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া আনা মেয়ে। কিন্তু কোষ্ঠিকারকদের শাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া হৈমন্তীর জীবন-ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে অদ্ভুত অলক্ষণের মধ্যে।

নিতান্ত দরিদ্রের ঘর হইতে যখন এ বাড়ীতে বধূ বেশে আসিয়া দাঁড়াইল হৈমন্তী, তখনও—বাজনার শেষে সুরের রেশের মত এদের পূর্ব গৌরবের কিছু জের আছে। জীর্ণ জামিয়ারের আংরাখা গায়ে দিয়া আর চওড়া কল্কাপাড় শান্তিপুরী ধুতি পরিয়া দাদাশ্বশুর বিশ্বনারায়ণ রূপার থালায় পাঁচখানি আকবরী মোহর দিয়া কন্যা আশীর্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন।

হৈমন্তী পশ্চিমের মেয়ে, দরিদ্র পিতার ঘর হইতে সে প্রচুর ঐশ্বর্য বহিয়া আনিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু আনিয়াছিল অনবদ্য রূপ আর অপূর্ব সঙ্গীতানুরাগ। ইহাদের

বনেদী জমিদারের ঘরে মলপরা নোলোকপরা অষ্টাঙ্গ গহনায় মোড়া মেয়েদের মাঝখানে হৈমন্তী যেন একটা আবির্ভাব।

তা সমুদ্র তাহার মান রাখিয়াছিল, সনাতন নিয়মের গণ্ডী কাটাইয়া তাহার জন্য রাখিয়াছিল অনেকখানি আকাশ, অনেকটা আলো। কিন্তু কয়দিনই বা? উৎসববাড়ীর হাজার বাতির ঝাড়ের মত নিমিষে মিলাইয়া গেল সেই সমারোহের দিনগুলি।

সে দিন চাঁদ উঠিয়াছিল……সদ্য ফোটা চাঁপাফুলের মদির গন্ধে বাতাস ছিলো উন্মনা…… দীঘির ঘাটের বাঁধানো চাতালে হৈমন্তী বসিয়াছে সেতার হাতে…… জ্যোৎস্নায় মাজা দেহ, পরণে নীলাম্বরী……পায়ের কাছে সমুদ্রনারায়ণ……

হৈমন্তী বলিয়াছিল—আজ আর বাজাতে ভাল লাগছে না, কি জানি কেমন যেন ভয় করছে। মনে হচ্ছে—

—কি মনে হচ্ছে বল তো?

—মনে হচ্ছে এত সুখ বুঝি সইবে না—বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি শেষ—

নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে কথার শেষ হারাইয়া গিয়াছিল। সমুদ্র হাসিয়া বলিয়াছিল—বুকের এত কাছে থেকে ভয় কেন হৈম? কিসের ভয়? ওটা দক্ষিণে হাওয়ার গুণ। কবিরা তাই বলেন মাতাল বাতাস! তোমার সেই সুরটা বাজাও, সেদিন ছাদে বসে যেটা বাজালে।

হৈমন্তী ধীরে ধীরে বাজনাটা তুলিয়া লইয়াছিল…কিন্তু হাত খুলিল না, সুর কাটিয়া গেল বার বার! কাতরভাবে বলিয়াছিল—আজ থাক্—শুধু তুমি আমার আরো কাছে এসো, খুব কাছে।

—আরো কাছে? সমুদ্র হাসিয়া ফেলিল কিন্তু হাসির সুর মিলাইবার আগেই বাড়ীর ভিতর হইতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল ক্ষীরোদা ঝি—দাদাবাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে—

—কি রে ক্ষীরোদা, ব্যাপার কি?

—ইন্দির দাদাবাবু নাকি বাগ্দীপাড়ায় গিয়ে কি কেলেঙ্কার করেছিল, তারা পাড়া ঝেঁটিয়ে লাঠি নে' তেড়ে এসেছে—

মুহূর্ত্তে মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল…আবার এই কাণ্ড? এই সেদিন ইন্দ্রের জন্য কত হাঙ্গামা কত অপমান সহিতে হইল। পুলিশকে আক্কেল সেলামী দিতে গিয়া সমুদ্রের উচু মাথাটা হেঁট হইয়া গিয়াছিল। পিসির ছেলেকে লইয়া নিত্য এত ঝঞ্ঝাট পোহানোর দায় কিসের?

বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই ভীত ইন্দ্রনাথ ছুটিয়া আসিয়া কাতরভাবে বলিল—ছোড়দা, তোমার পায়ে পড়ি বাঁচাও, ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে—

—ওরা ? ওদের হাতে পড়বার আগে আমিই তোমায় খুন করবো রাস্কেল—

আচম্‌কা একটা ধাক্কা খাইয়া ইন্দ্র উঁচু রোয়াকের উপর হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িল শান বাঁধানো উঠানে।

আশ্চর্য ! পড়িল আর উঠিল না !

সমুদ্রকে জব্দ করিবার জন্য সত্যই খুন হইয়া গেল ইন্দ্র !

জোয়ান ছেলে, স্বাস্থ্য সবল দেহ, এতোটুকু উঁচু হইতে পড়িয়া মরিয়া যায় ? হয় তো আশঙ্কায় আর উত্তেজনায় স্নায়ু শিরা টান হইয়াছিল, এতটুকু আঘাতেই ছিঁড়িয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

*　　*　　*　　*

এখনও সে দৃশ্য চোখের উপর ভাসিয়া উঠে হৈমন্তীর। উঠানের মাঝখানে ইন্দ্রর মৃতদেহ ঘিরিয়া বাগ্দী প্রজাদের নীরব জনতা, একজনের হাতে একটা মশালের আলো দপদপ করিতেছে……দুরন্ত বাতাসে তাহার সঞ্চরণশীল আলোছায়ায় সমুদ্রনারায়ণ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেন হারাইয়া যাইতেছে।

চাঁদ বোধ করি তখন অস্ত গিয়াছে।

কেমন করিয়া সেই বাগ্দীদের সাহায্যেই লাশ সরানো হইল, কেমন করিয়া তাহাদের নির্বন্ধে সেই রাত্রেই সমুদ্র গ্রাম ছাড়িয়া ফেরার হইল, সে সব কথা এখন আর হৈমন্তীর বোধ করি ভাল মনে পড়ে না।

শুধু সমুদ্রের শেষ কথাটা মনে পড়ে 'পুলিশের হাতে ধরা দেবার সাহস খুঁজে পাচ্ছি না হৈম, তোমাকে বিধবা করতে পারব না—পারব না তোমায় ফেলে মরতে "

তাই দীর্ঘ এক যুগ বৈধব্য আর সাধব্যের অদ্ভুত ত্রিশঙ্কুলোকে কাটাইয়া আসিতেছে হৈম। আর মাস দুই গেলেই সিঁদুর মুছিয়া থান ধরিবার ব্যবস্থা, এক যুগ কাটিয়া গেলে নাকি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

আঠারো বছর হইতে ত্রিশ বছরের দরজায় আসিতে যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে হৈমন্তীকে, সেকি এতই ক্লান্তিহীন ? খুনীর স্ত্রী, ফেরারী আসামীর স্ত্রী, এই ঘৃণ্য পরিচয় লইয়া এতদিন বাঁচিয়া আছে হৈমন্তী কি হিসাবে ?

হয়তো মরিবার সাহস সেও খুঁজিয়া পায় নাই।

সমুদ্র যদি কোনদিন ফিরিয়া আসে…যদি ডাক দেয়…সাড়া দিবে কে ?

শবরীর প্রতীক্ষার মতই বুঝি ধৈর্যহীন প্রতীক্ষা হৈমন্তীর।

তবু এ বাড়ীতে টিঁকিয়া থাকা আশ্চর্য বইকি ! কেবলমাত্র শ্যামা আর নতুনগিন্নির মত লোকের আবহাওয়ায় হৈমন্তীর মত মেয়ে এতদিন কাটাইল কেমন করিয়া, যেখানে রুচি প্রবৃত্তি শিক্ষা পদে পদে ব্যাহত হইতে থাকে ? দারিদ্র্য সহ্য করা সহজ, কিন্তু নির্লজ্জ, নগ্নতা সহ্য করা কঠিন নয় কি ?

সমুদ্রের ফটোয় টাটকা মাগাগাছটি পরাইয়া বাসি মালাটি খুলিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হৈমন্তীর নিত্য কাজ। নতুনগিন্নির যে সে কথা জানা নাই এমন নয়, তবু খিড়কির দরজায় হৈমন্তীর শাড়ীর পাড়ের শেষাংশটুকু মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুনগিন্নি ওদিককার দালান হইতে চীৎকার করিয়া শ্যামাকে প্রশ্ন করেন—মেম সাহেবটী কোথায় হাওয়া খেতে বেরুলেন লা শামি ?

—কি জানি, দীঘিতে বুঝি—

—'কি জানি' কি লা ? জানিস না তুই ? ন্যাকা ! বলে, চোরের সাক্ষী গাঁটকাঁটা আর শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল ! কিন্তু এও বলি মা, ঘরের বৌ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে বাড়ীর বার হওয়া কিজন্যে ? মালা গাঁথছেন—ফুল ভাসাচ্ছেন—কত রঙ্গই জানেন। এই তো—আমার ষোলো বছর বয়সে সোয়ামী গিয়েছিল, বলুক দিকিন্ কেউ, কোনো দিন আদিখ্যেতা করতে দেখেছে ?

তাঁহাকে ষোলো বছর বয়সে দেখিবার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল—তাহারা অবশ্য কেহই এখন উপস্থিত নাই, তবু শ্যামা তোষামোদের ভঙ্গীতে সায় দেয়—

—তোমাদের সঙ্গে কার তুলনা দিদিমা—

দিদিমা বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে বলিয়া উঠেন—খোসামোদ করিসনে শামি, খোসামোদ শুনলে গা জলে যায়।

নিঃশঙ্ক পথিককে এইরূপ আকস্মিক আক্রমণ করিয়া বসা তাঁহার স্বধর্ম।

শ্যামা অপ্রতিভ মুখে বসিয়া থাকে, চট করিয়া উঠিতে পারে না এবং আলোচনাটা ভিন্ন খাতে বহাইতেই বোধ করি একটা নূতন সংবাদের অবতারণা করে।

—সকাল বেলা আমাদের দীঘির ঘাটের ওদিক থেকে আসতে একটা মানুষ দেখলাম দিদিমা—কোট 'পেন্টুল' পরা লম্বা জোয়ান লোকটা, গোরাই হবে নাকি কে জানে, বকুল গাছের ওদিকটায় ঘুর ঘুর করছিল দেখে কেমন ভয় ভয় করলো, পালিয়ে আসতে পথ পাইনা—মনে হল—নতুন এসেছে গাঁয়ে—

—তা মনে হবে বইকি, তোমার তো আর গাঁ সুদ্ধু চিনতে কাউকে বাকী নেই। বলি পালিয়ে এলি—বললিনা কিছু ?

—আমি কি বলবো বাবা ? কোট 'পেন্টুল' দেখলে আমার ভয় করে।

—কচি খুকি ! মেয়ে ঘাটে পুরুষ আসে কোথা থেকে তার হিসেব নেই ? আজ এসেছে কি রোজ আসে কে জানছে ? ও সব মালা ভাসানোর লীলাখেলা কেন তাই বা কে জানে ? কালামুখী তলে তলে কি কীর্ত্তি করছে তা' ভগবানই বলতে পারেন। সোয়ামী যার বারো বছর দেশত্যাগী, তা'র পরিবারের এখনো সেমিজ কামিজ পরে পটের ছবি হয়ে বেড়াতে লজ্জা করে না ! ধন্যবাদ !

নতুনগিন্নির মর্যাদা রাখিতেও হৈমন্তী সম্বন্ধে এতবড় কথাটায় স্পষ্ট অভিমত দিতে মুখে বাধে শ্যামার। নতুন গিন্নী পুনশ্চ যোগ করেন, বুড়ো হয়েছি কোমর পড়ে গেছে, চারদিকে চোখ রাখবার ক্ষ্যামতা নেই, নইলে দেখিয়ে দিতাম সবাইকে—বলিয়া হাঁপাইতে থাকেন।

ঘাটের পথ হইতে ফিরিয়া হৈমন্তী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—কাগজ এখনো দিয়ে যায়নি শ্যামা ঠাকুরঝি ?

—কই না।

নতুনগিন্নি কাঠের উনানে ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে ঘরের ভিতর হইতে খনখনে গলায় বলেন—মেম সাহেবের রোজ খবরের কাগজ না পড়লে চলে না—ধন্যি বাবা, আমি হলে এতদিন গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরতাম, ছিঃ। ঘাটে পথে পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াবার সাহস কি অমনি আসে ? চব্বিশ ঘণ্টা কাগজ কেতাব নিয়ে থাকলেই বুকের পাটা বাড়ে।

হৈমন্তী বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া দুই দণ্ড শ্যামার মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যায়।

হৈমন্তী কবে কাহার সঙ্গে আলাপ করিল ? ঘৃণায় লজ্জায় পৃথিবীর বুক হইতে নিজেকে তো প্রায় লুপ্ত করিয়াই রাখিয়াছে। শুধু একখানি 'খবরের কাগজের সেতু দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে এতটুকু একটু যোগসূত্র রাখা।

কিসের আশায় যে রাখিয়াছে সে কি নিজেই জানে ? বুভুক্ষুর মত তন্ন তন্ন করিয়া সমস্তটুকু না পড়িলে তৃপ্তি হয় না কেন কে বলিবে ?

কিন্তু নতুনগিন্নির মিথ্যা দোষারোপকে আর মিথ্যা বলা চলে কই ? সন্ধ্যার অন্ধকারে দোতলার বারান্দায় এককোণে হৈমন্তী অমন থর থর করিয়া কাঁপে কেন—শ্যামা-বর্ণিত সেই 'সাহেবের মতন' লোকটার সামনে দাঁড়াইয়া ? অমন ভয়কাতর অস্থির ভাব কেন দু'জনের ?

অমন আকুল আগ্রহে সে হৈমন্তীকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল কোন সাহসে ? কে সে ? সমুদ্রনারায়ণ ? সমুদ্র এখনো বাঁচিয়া আছে ?......

অনেকক্ষণ পরে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া হৈমন্তী কম্পিতকণ্ঠে কহিল—লুকিয়ে পালিয়ে যাবো ? লোকে কি বলবে ?

—লোকে যা খুসী বলুক না হৈম, ক্ষতি কি ? তোমাকে নিয়ে যাবো আমার সেই নতুন রাজত্বে, জঙ্গল কেটে সেখানে গড়ে উঠছে নতুন সহর, সেইখানে। নতুন করে গড়বো আমাদের সংসার। সেখানে আমি সমুদ্র নয়, আমি 'মিষ্টার মুখার্জ্জি।'

— নাম বদলেছো ?

—বদলাবো না ? বাবে। পুলিশের ভয়ে নিজেকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি পৃথিবীর

একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তুমি যখন চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে থেকেছ—আমি তখন প্রচণ্ড রৌদ্রে ছুটোছুটি করেছি কুলিমজুরের কাজ নিয়ে।……

দীর্ঘকাল জাপানে আমেরিকায় কাটাইয়া অনেক ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া সমুদ্র অবশেষে কেমন করিয়া আজ একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ফরেষ্ট অফিসার হইয়া বসিয়াছে—সঞ্চয় করিয়াছে প্রচুর অর্থ, তাহারই ইতিহাস শুনাইতে বসে হৈমন্তীকে। পাহাড়ের কোলে জঙ্গল ঘেঁষিয়া তাহার বাড়ীখানি, আরামের আর বিলাসের সমস্ত উপকরণ আনিয়া বোঝাই করিয়াছে হৈমন্তীর জন্য, শুধু হৈমন্তীকে ঘিরিয়া তাহার এতদিনের স্বপ্ন আর সাধনা।

—একবারও তো খোঁজ নিলেনা? যদি মরে যেতুম?

—কক্ষনো না, আমি নিশ্চয় জানতাম হৈম, আবার আমাদের দেখা হবে। আমার তপস্যা ব্যর্থ হবে না।

হৈমন্তীও সমুদ্রের মতন অমন সুন্দর করিয়া বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারে না, বুকের ভিতর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে পারে শুধু।

কান্না আর কথার মধ্য দিয়া রাত্রি গভীর হইতে থাকে…… শেষ রাত্রে হৈমন্তীকে লইয়া পলাইয়া যাইবে সমুদ্র, রোমাঞ্চকর সেই কল্পনায় মুখর হইয়া ওঠে সে—পরের বৌ নিয়ে পালানোর তো নতুনত্ব নেই হৈম, তাই নিজের বৌ নিয়ে পালাবো আমি! বেশ চমৎকার মৌলিক হবে না ব্যাপারটা?……তুমি অমন কাঁদছো কেন বলতো? কত পাহাড় জঙ্গল ডিঙ্গিয়ে, কত অগাধ সমুদ্র পার হয়ে ফিরে এলাম তোমার কাছে— সারা রাতটুকু কেঁদেই নষ্ট করবে?…আচ্ছা এদিকে কেউ এসে পড়বে না তো? এতদিন পরে আবার ধরা পড়তে রাজী নই কিন্তু।

—কেই বা আছে? নতুন ঠাকুমা সিঁড়ি উঠতে পারেন না, শ্যামা ঠাকুরঝির ভূতের ভয়, সন্ধ্যে হলে ঘরের বার হয় না।

—তা' হলে আজকের রাতটুকু নির্ভয়ে আশ্রয় পেতে পারি তোমার ঘরে?

ঘরে খিল লাগাইয়া সাবধানে আলো জ্বালে হৈমন্তী!

—ঘরের চেহারাটা প্রায় একই রকম রেখেছ দেখছি, কি আশ্চর্য লাগছে হৈম, সেই পালঙ্ক, সেই আয়না দেরাজ ছবি আলমারি, সেই জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তোমার মুখে, সেই তুমি প্রায় তেমনিই সুন্দর রয়ে গেছ, যেন কিছুই পরিবর্ত্তন ঘটে নি তোমার জীবনে, যেন আমি এই কিছু দিনের জন্য শুধু বিদেশ ঘুরে এলাম, অথচ কত ঝড় বয়ে গেল আমার জীবনে……

টুকরো কথা…টুকরো হাসি…

এ ছবি কার? গুরুদেবটেব নয় তো? কী আশ্চর্য, এই হতভাগার ছবিতেও মালা

ঝোলে ? নিলাম এটা আমি, আজ আমার পাওনা। বিশ্রী এই খাকির পোষাকে ফুলের মালা মানায় না কি বল ?···

···কাপড় ?···ধুতি ? ধুতি কি আমি সাটের পকেটে নিয়ে বেড়াচ্ছি ?····তুমি দেবে ? আমার জামা কাপড় তুলে রেখেছ এতকাল ধরে ? হৈম হৈম···

—তুমি কি কাউকেই দেখা দেবে না ? নতুন ঠাকুমা, শ্যামা, ক্ষীরোদা—কাউকে বলব না ?

—পাগল হয়েছ ? বললে চাপা থাকবে না, ষ্টেশনে ষ্টেশনে হুলিয়া বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে রূপকথার রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে এসে রাতারাতি দুঃখিনী রাজকন্যাকে নিয়ে উধাও। দেখছো খুব বুড়ো হয়ে যাইনি কিন্তু হৈম। এত সুখ কি আমার জন্যে সত্যিই তোলা ছিল ?······

কথার শেষ নাই, রাত্রির শেষ আছে। পাণ্ডুর চাঁদের ফ্যাকাশে হলদে আলো ভোরের নতুন আলোর কাছে সহসা কোন ফাঁকে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিবে কে জানে !

হয়তো একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সমুদ্র হৈমন্তীকে ডাকিয়া তোলে—'মিসেস মুখার্জ্জি' উঠুন উঠুন—তৈরী হয়ে নিন, চারটে চল্লিশের ট্রেণ ধরতে হবে, অবাক হয়ে তাকাচ্ছো কি ? মনে নেই আমি আর শ্রীল শ্রীযুক্ত সমুদ্রনারায়ণ মজুমদার নয়—মিষ্টার এস্ মুখার্জ্জী, কাজেই তুমি মিসেস মুখার্জ্জী।···তোমার ওই আধা ধুতির মত বিশ্রী শাড়ীটা আমার ভারী খারাপ লাগছে কিন্তু, ভালো একটা কিছু পরে নাও চট করে।

—ভালো আর কি আছে ? হৈমন্তী ম্লান হাসে।

আশু বৈধব্যের জন্য প্রস্তুত হইতে চওড়া পাড় শাড়ী অনেক দিন ছাড়িয়েছে সে।

—তবে থাক, যা আছে থাক, মনের সাধ মিটিয়ে সাজাবো এর পরে। শুধু দেরী করে ফেলো না লক্ষ্মী রাণী আমার, সকাল হয়ে গেলে, ভাবো অবস্থাটা !

হৈমন্তী শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখে···এই তাহার চিরপরিচিত আবেষ্টন, তাহার ধ্যান, ধ্যানের দেবতা, শুচিস্মিত নির্ম্মল জীবনখানি, এই মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। শুধু মালা গাঁথিয়া ফুল ভাসাইয়া বাকী জীবনটুকু কাটানো যায় না ? সহসা সমুদ্রের এই রূঢ় পোষাক পরা বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহখানা হৈমন্তীর নির্জ্জন একক শয্যায় কেমন বেমানান অশুচি লাগে।

হৈমন্তীর জীবনে সমুদ্র কি অবান্তর নয় ? সত্যকার রক্তমাংসে গড়া সমুদ্র, পুরুষের দাবী লইয়া যে ডাক দিল ?

ছবি লইয়াও তো দিন কাটিতেছিল মন্দ নয়।

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তীকে লোকে বলিবে কি ? শ্যামা আর ক্ষীরোদা যখন পাড়ায় পাড়ায় রটাইয়া আসিবে হৈমন্তীর নিরুদ্দেশের খবর ?

—আমায় ক্ষমা করো।

কে বলিল? হৈমন্তী? সমুদ্রের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া যে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে?

হতবুদ্ধি সমুদ্র শুধু প্রশ্ন করিতে পারে—যাবে না?

—আমায় ক্ষমা করো।

—কি আশ্চর্য, বলছো কি তুমি? সিদ্ধির দরজায় এসে আমার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে? হৈম পাগলামি কোরো না।

—তবে তুমি পরিচয় দিয়ে দিনের আলোয় নিয়ে চলো।

—তার মানে সাধ করে ফাঁসির দড়ি গলায় পরি?···রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে যাবার সাহস তোমার নেই? আমার সঙ্গেও না? তুমি কী বলছো বুঝতে পারছো না হৈম ফিরিয়ে দেবে আমাকে! মিথ্যা দুর্নামকে এত ভয়?

—আমায় ক্ষমা করো।

*　　　*　　　*　　　*

হাঁ, সমুদ্র ক্ষমা করিয়াছে বৈ কি। রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলাইয়া গিয়াছে ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা মুছিয়া দিয়া।

কিন্তু হৈমন্তী এ করিল কি?

মাতালের মত কতক্ষণ পড়িয়াছিল কে জানে, হুঁস হইল শ্যামার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে—বলি বৌদি কি আজকাল বুট পরে বিড়ি সিগারেট খেয়ে বেড়াচ্ছ না কি? সারা দালানে জুতোর ছাপ, দেশলাই কাঠি, পোড়া সিগারেট, বাকী আর কিছুই রইল না। জরি পেড়ে ধুতি চাদরও কি রাত বিরেতে পরো নাকি বৌদি? হা গোবিন্দ, নতুন দিদিমা বোঝে ঠিক্।

···　　　···　　　····　　　···

খানিক পরে উদ্দাম হইয়া ওঠে নতুনগিন্নির কণ্ঠস্বর—খবরদার বলে দিচ্ছি শামি, ও যেন লক্ষ্মীর ঘরের ছায়া মাড়াতে না আসে, ঠাকুরদালানের পৈঠেয় পা না ঠেকায়। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দূর করে দিতে হয় অমন বৌকে···বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানো? হরিনারায়ণ মজুমদারের ভিটেতে এখনো সন্ধ্যে পিদিপ পড়ছে—এত অনাচার ধর্ম্মে সইবে না, ধর্ম্মে সইবে না!

———

'—আলসের ধারে ঝুঁকিসনে কঙ্কা, পড়ে মরবি—' শৈশবের কোন বিস্মৃত যুগে কবে একদিন কে সাবধান করে দিতে চেয়েছিল তাকে, ভাল করে মনেই পড়ে না। হয়তো মা, হয়তো আর কেউ। সাধারণ কথা, স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকবার মতো নয়, কিন্তু কোন্ কথা আচমকা কোন্‌ভাবে যে মনোযন্ত্রের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে আঘাত করে বসে, সরাসর গিয়ে বাসা নেয় মস্তিষ্কের অন্ধকার কোটরে, সে কথা বলা কঠিন।

তারপর তো কতদিনই কেটে গেছে—'ন্যাড়াছাদ' ওয়ালা বিপদ্‌জনক সেই বাড়ীখানা—কবে ছেড়ে এসেছে স্পষ্ট মনেই পড়ে না। এখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে কঙ্কা, বিধি-নিষেধের কড়া পাহারা আর নেই, কিন্তু জ্ঞান উন্মেষের পূর্ব্বে শোনা সেই তুচ্ছ কথাটা আটকে রয়ে গেছে মস্তিষ্কচক্রের এক অসমতল খাঁজে।

তাই ছাদে উঠতে ওর ভয়, অথচ ছাদে না উঠলে ওর হয় না। নিষিদ্ধ বস্তুর উপর যে আকর্ষণ, সেই আকর্ষণে যায়। আবার যাওয়া চাই আলসের ধারেই, যেখান থেকে নীচের রাস্তাটা লাগে অদ্ভুত রহস্যময়, চোখে পড়ে ব্যস্ত যানবাহন আর উদ্‌ব্যস্ত মানুষের অবিশ্রাম ঠেলাঠেলি, প্রাণ বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টার অহরহ ধস্তাধস্তি।…"গেল গেল" তবু যায় না, ছোট্ট ছেলেটা খাবারের ঠোঙা হাতে নিরাপদে পার হয়ে যায় উন্মত্ত দৈত্যের মুখ থেকে। অক্ষম ভিখারি গড়াতে গড়াতে গলে যায় দুরন্ত ঘোড়ার পায়ের ফাঁক দিয়ে।

দেখলে হাসি আসে।

অথচ মরে যাওয়া কত সহজ। যেন কিছুই নয়। শুধু এক মুহূর্ত্তের অসতর্কতা, শুধু নিজেকে অল্প একটু আলগা করে দেওয়া। হাল্কা শরীরটাকে আরো একটু হাল্কা করে বাড়িয়ে দেওয়া আলসের ধার থেকে।

ছাদে উঠলেই এই ইচ্ছে যেন পেয়ে বসে কঙ্কাকে। আত্মহত্যা করবার মত জোরালো আর ধারালো ইচ্ছে নয়, লুকিয়ে নিষিদ্ধ বস্তুর আস্বাদ গ্রহণের মতো একটা রোমাঞ্চকর ইচ্ছে।

ইচ্ছেটা যেন পিছন থেকে ভূতের মত ঠ্যালা দিতে থাকে। অনেক দিন আগে এক নিতান্ত অন্তরঙ্গ সখীকে বলেছিল একথা, সখী হেসে বলেছিল—'খবরদার একলা উঠিসনে ছাদে, সুন্দরী মেয়েদের ওপর ভূতপ্রেতের বড় লোভ, অপঘাতে মেরে দলভারী করবার চেষ্টায় ঘোরে ওরা।'

কঙ্কাও হাসে, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করবে এমন বোকা আর সেকেলে মেয়ে অবশ্য নয় সে, তবু তাড়াতেও পারে না এই খেয়ালকে।

কিন্তু কেন এমন হয়? মানসিক অস্বাস্থ্য? স্নায়বিক বিকৃতি? খেয়ালি প্রকৃতির

অর্থহীন বিলাস ? না কি সবারই হয় এরকম ? তা'র মতন হাল্কা-শরীর সুন্দরী মেয়েদের ? যে রকম মেয়েদের—লোকে বলে 'ফুলের মত মেয়ে'। প্রায়ই যারা ছাদে ওঠে, ফিকে রঙের নরম শাড়ী পরে গুণগুণ করে একটা গানের একই লাইন একশোবার গায় আর বেড়িয়ে বেড়ায়, ফুলেরই মত অল্প আঘাতে ভেঙ্গে পড়ে। না শুধু কঙ্কারই এরকম অনাসৃষ্টি ইচ্ছে ?

'সাতটি ভায়ের একটি বোন' না হোক, মা বাপের একটিমাত্র মেয়ে কঙ্কা, আদরিণী আর অভিমানিনী। জীবনটা ওর কাছে এত তুচ্ছ হয়ে গেল কি করে ? জীবন থেকে জীবনটাকে বরবাদ দিলেও যেন ওর লোকসান নেই। ওর কাছে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া যেন প্রায় সমানই। খেলার ছলে—খেলার পুতুলকে একটা আছাড় দেওয়া মাত্র।

আগুন আর জল, আফিং আর দড়ির, উৎকট প্যাঁচে পড়ে মরা নয়—নয় বিছানায় পড়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে মরা। শুধু হাওয়ায় ভাসার মতো, শূন্যে ওড়ার মতো, আবেশময় মৃত্যু !

ছাদ থেকে পথে নেমে আসবার মধ্যের ক্ষণিক মুহূর্ত্তটুকু কল্পনা করে সমস্ত শরীর শির্ শির্ করে আসে কঙ্কার।

অবশেষে একদিন, যখন কঙ্কার বয়েস পনের কি ষোলো, নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে—ছাদ থেকে পড়তেই হবে ওকে, না পড়ে উপায় নেই, শুধু—উপলক্ষ্য একটা থাকলেই ভাল হয়। হয় না কি ? ইচ্ছাটা যাতে জোরালো আর ধারালো হয়ে ওঠে, আকর্ষণ হয় তীব্র।

জীবন থেকে যে জীবনটাকে লোকসান দেবে তার অন্ততঃ কিছু দাম চাই তো ? ভাবলে…পরীক্ষায় ফেল হওয়াটা থাকলো হাতে। যা লিখে এসেছে সেটা যে "লিখে আসবার" মত মোটেই নয় সে বোধটুকু ছিল।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে অবশ্য জানা গেল ফেল্ই হয়েছে—কিন্তু শুধুই কি কঙ্কা ? আরও তো কত মেয়ে ফেল করেছে—অজস্র ছেলে মেয়ে। পাঁচ জনে বললে 'প্রশ্নপত্রের দোষ'। বললে 'কর্ত্তাদের বদমাইসি।' গোলমালে সঙ্কল্পটা চাপা পড়ে গেল। ছাদেই ওঠা হ'ল না দীর্ঘকাল। অনেকদিন পরে, দ্বিতীয়বার যখন উঠে পড়ে লেগেছে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হ'তে, তখন আর পুরানো ইচ্ছেটার মানে থাকে না কি ? তা ছাড়া তাড়াই বা কি ? হাতেই তো রইল। যখন হোক একদিন—

•

হঠাৎ একদিন নজরে পড়লো—পাশের বাড়ীর যে চুল ওল্টানো ছেলেটা ঢিলে পায়জামার সঙ্গে টাইট্ গেঞ্জি পরে হরদম বারান্দায় ঘুরতো, ইজিচেয়ারে শুয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' আওড়াচ্ছে।

দেখতে দেখতে আবার সেই ইচ্ছেটা পেয়ে বসলো ওকে।

• কেমন হয় ? ঠিক এখুনি। যখন ও আওড়াচ্ছে---"আঁকা বাঁকা জল, আঁকা বাঁকা চাঁদ,

আকাশ ফাঁকা —" ঠিক তখন ফাঁকা আকাশ থেকে যদি চাঁদের টুকরোর মত খসে পড়ে কঙ্কা, ঠিক ওর বারান্দার নীচেটায়, কেমন হয়?

কি করে তা হলে ছেলেটা? শক্ড্ হয়ে বসে থাকে পাথরের পুতুলের মত? না কি বিদ্যুতের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে পথের ওপর—আলগোছে বুকের কাছে তুলে নেবে কঙ্কাকে? অথবা ছুটোছুটি করবে ডাক্তার আর ওষুধ ট্যাক্সি আর হাসপাতালের জন্যে?

ঠিক সাব্যস্ত হয় না কোনোটাই, বেশী লোভনীয় কোন্‌টা? বা শোভনীয়? কঙ্কা অবশ্য দেখতে পাবে না, মরেই তো যাবে—কিন্তু আগে থাকতে কল্পনা করতে দোষ কি? অন্ধকার ঘরে একলা বিছানায় শুয়ে, মনের রঙে রাঙিয়ে—ইচ্ছেমত 'ঘটনাচক্র' সাজিয়ে? আলগোছে তুলে নেবার সময় একবারটী যদি চেপেই ধরে বুকের কাছে, টাইট গেঞ্জি পরা নিটোল বুকটায়, ক্ষতি আছে কিছু? মরে গেলে কি জাত যায়? লোকনিন্দে হয়?

কিন্তু তাড়াহুড়োর কি আছে? পালাচ্ছে না তো! "কঙ্কাবতী"র পরে "শেষের কবিতাই" শুনবে না হয়।

পালাচ্ছে না ভেবেছিলো কিন্তু পালালো। ছেলেটা নয়, কঙ্কা নিজেই। পুরনো বাড়ী আর পুরনো পাড়া ছেড়ে কঙ্কার বাবা উঠে গেলেন নতুন পাড়ায়। ভাড়াটে বাড়ী ছেড়ে নিজের বাড়ীতে। রাস্তাটা অনেক চওড়া, বাড়ীটা আরো উঁচু। চমৎকার বাড়ী! চমৎকার বাড়ী হলেই দরকার হয় চমৎকার সব আসবাবপত্রের, মানানো চাইতো? গাড়ীই যদি না রইল, গ্যারেজ থাকবার দরকার কি ছিল বাড়ীর সঙ্গে? ফাঁকা গ্যারেজ দেখে হাসবে না লোকে?

কাটলো অনেকগুলো দিন আর রাত, সৌন্দর্য সৌষ্ঠব আর ফ্যাশানের জল্পনা কল্পনায়। সাজে সজ্জায় আহারে আচারে ঢেলে সাজতে হবে তো নিজেদেরকে, টাকাই যখন বেড়ে গেছে হঠাৎ অনেকগুলো?

প্রথম যেদিন ছাদে আসবার সময় পেলো কঙ্কা চারতলার থেকে নীচুতে তাকিয়ে ওর মাথাটা ঘুরে গেল, মনে হ'ল এখুনি পড়ে যাবে। ছুটে পালিয়ে এল একতলায়। মা বললেন—কিরে কঙ্কা?

—কিছু না মা, বড় গরম হচ্ছে। বলে শুয়ে পড়লো মার কোলে মাথা রেখে। আগে মার অবসর ছিল অল্প, কাজ ছিল বেশী, মাকে পেতনা কাছে। এখন মাকে পেয়ে খুকীপনাও বেড়ে গেছে যেন।

ওপাড়ার ঢিলে পায়জামা পরা ছেলেটাকে এ পাড়াতেও দেখা গেল কিছু দিন, ফুটপাথে ঘোরাঘুরি করে, কারণে কি অকারণে কে জানে। কিন্তু কঙ্কার নজরে পড়ল না। পথটা অনেক বিস্তৃত আর ঘরটা অনেক উঁচু বলেই হয়তো।

তা'ছাড়া—কঙ্কার হঠাৎ বড়লোক বাবার শাসনে ওর মার কাজ যেমন কমেছে, তেমনি ওর নিজের কাজ বেড়ে গেছে বিস্তর। এখন আর কোনো রকমে পরীক্ষায় পাসমার্ক রাখতে পারলেই কর্তব্য শেষ হবে না। গান আর বাজনা, বোনা আর সেলাই, রং আর তুলির আবর্তে পড়ে মাথা তুলবার অবকাশ পায় না বেচারা। এক কথায়, এ্যারিষ্টোক্র্যাট হ'তে হ'লে যা যা দরকার কিছুরই ত্রুটি রাখবেন না ভদ্রলোক এবং সাধারণতঃ এ অভিনয়ের প্রধান পার্টটা নিতে হয় বাড়ীর তরুণী মেয়েটিকেই।

যদিও ছবি আঁকার চাইতে গান, আর গানের চাইতে সেলাই, কঙ্কার অনেক কম খারাপ লাগে, তবু একদিন আবিষ্কার করে বসলো যে আর্টিষ্ট ছোকরাকে রাখা হয়েছে ছবি আঁকা শেখাতে—তাকে মোটেও খারাপ লাগে না ওর। রীতিমত ভালই লাগে। কাজেই সময় দিতে হচ্ছে এতেই বেশী। আর আঁকাটা যখন কিছুতেই এগোতে চায় না, আলোচনা করলেও কতকটা কাজ হয় বৈকি। র‍্যাফেল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউ রেহাই পান না ওদের হাত থেকে।

এই সব হাইক্লাশ আলোচনার মাঝখানে কঙ্কা একদিন বলে বসলো একটা খাপছাড়া কথা। বললো—আচ্ছা মাষ্টারমশাই, ধরুন যদি হঠাৎ একদিন চারতলার ছাদ থেকে পড়ে যাই?

—পড়েই বা যাবে কেন? চশমার পুরু কাঁচের ভেতর থেকে অবাক্ হয়ে তাকায় আর্টিষ্ট।

—দৈবাৎ, দৈবাতের কথা বলা যায় না তো?

—তা'তো যায় না।

—তবে দেখুন, হঠাৎ একদিন গেলাম পড়ে—কি হয় তা'হলে?

—তা'হলে—ভুরু কুঁচকে একটু যেন ভেবে নেয় মাষ্টার—মারাই যাবে খুব সম্ভব।

'মারা যাবে'! আচম্‌কা যেন একটা ধাক্কা খেলে কঙ্কা, সত্যি যেন পড়ে গেল, চারতলার ছাদ থেকে। ও স্বচ্ছন্দে বললো 'মারা যাবে', ফুলের মতন নরম আর পাখীর মতন হাল্কা মেয়েটিকে? এতটুকু মায়া হ'ল না বলতে? যখন তখন ওর দৃষ্টিটা অমন গভীর মনে হয় কেন তা'হলে? চশমার কাঁচ বড় বেশী পুরু বলে? মনে করলো এখুনি ছুটে যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে চারতলার ছাদ থেকে, ইচ্ছেটা সত্যিই জোরালো হয়ে ওঠে যেন, অন্ততঃ পরীক্ষায় ফেল হওয়ার সময়ের চাইতে।

কিন্তু সত্যিই তো আর উঠে যেতে পারে না মানুষের সামনে থেকে। তাই বাকী সময়টা বসে থাকলো মুখ ভারী করে।

আর্টিষ্ট হাসলো মনে মনে, কিন্তু কথা বললো গম্ভীরভাবে—বললো—আজ কিচ্ছু কাজ হল না, পেন্সিলে হাতও পড়েনি।

—ভাল লাগে না ওসব।

—কি সব?

—এই ছবি আঁকা। ছবি আঁকা না ছাই, হিজিবিজি করা, বিশ্রী লাগে।

—তবে কি ভাল লাগে? চারতলার ছাদ থেকে লাফ দিতে?

যদিও কঙ্কা এ্যারিষ্টোক্র্যাট্ হবার সাধনা করছে আপ্রাণ, তবু সামলাতে পারলে না, দুই হাতে মুখ রেখে কেঁদেই ফেললো নেহাৎ গেঁয়ো মেয়েদের মত।

পরের ঘটনাটা নীরস না হ'লেও দীর্ঘ, মোটের মাথায় বলা যায় চোখের জল শুকিয়ে যেতে দেরী হ'ল না এবং তারপর থেকে 'ফাইন আর্ট' জিনিষটা এত বেশী ইন্টারেষ্টিং মনে হতে লাগলো কঙ্কার যে, সময় অভাবে সেলাই-শিক্ষয়িত্রী মিস্ রেবা হাজরাকে বরখাস্ত করা ছাড়া উপায় থাকল না।

……পৃথিবীটা যে মাটির সেটা ভুল হয়ে যায় মাঝে মাঝে, 'হাওয়ায় ভাসবার—শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার'—যে অপূর্ব্ব সুখ সেটার স্বাদও যেন কতকটা পেয়ে গেছে কঙ্কা।

কিন্তু মুস্কিল এই পৃথিবীটা মাটির, কঙ্কার হঠাৎ-আধুনিক বাবা যদি বা পারতেন, চির পৌরাণিক মা'টি বরদাস্ত করে উঠতে পারলেন না ব্যাপারটা। তিনি একদিন রেগে গিয়ে হানা দিলেন স্বামীর অফিসরুমে। বললেন—ভালো চাও তো ধিঙ্গি মেয়েয় বিয়ে দাও, আর ওই 'পোটো' মুখপোড়াকে বিদেয় করো।

—কেন? কেন? হ'ল কি?

—জানি না। তোমার যেমন বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। ভগবানের দয়ায় দুটো পয়সা হয়েছে—ভালো ঘর বর দেখে মেয়ের বিয়ে দাও—তা নয় মেয়েকে বিবি করছেন। ওই ঝাঁকড়া চুলো হাভাতে ছোঁড়ার কাছে দিন তিন ঘণ্টা করে কি শিক্ষে হচ্ছে মেয়ের, খোঁজ নিয়েছ কোনোদিন? সেলাই বোনা চুলোয় গেল, গান বাজনা শিকেয় উঠলো—খালি ছবি আঁকা, ছবি আঁকা, ছবি তো দেখলাম না একখানা!

'দেখিনি'—সে কথা স্বীকার করতেই হ'ল ভদ্রলোককে!

—তবে!

'তবে'র উত্তর অবশ্য নেই, তবে 'পোটো' মুখপোড়াকে বিদায় দিতে হ'ল।

কঙ্কা ক্রুদ্ধ হ'ল, অপমানিত হ'ল, কিন্তু প্রতিবাদ করলো না, কাঁদলো না। কাতর হবার কি আছে, ইচ্ছে করলেই তো সব যন্ত্রণার শেষ করে ফেলতে পারে? করবেও তাই। মেয়ের মৃত্যুর পর বাপ মার শোচনীয় অনুতাপের ছবি কল্পনা করে একটা হিংস্র আনন্দ অনুভব করতে লাগলো কঙ্কা। হাঁ, তাঁদের কিছু শিক্ষা হওয়ার দরকার বই কি, যারা পুরনো চশমা পরে নতুন পৃথিবীকে দেখছে এখনো, যারা নিজেদের বিকৃত সংস্কার নিয়ে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুকেও বিকৃত করে দেখতে চায়।

মেয়ের বিয়ের চেষ্টায় বাপকে হৈ হৈ ছুটোছুটি করতে দেখে কঙ্কা বিদ্রূপের হাসি হাসলে মনে মনে। কঙ্কা কি বিয়ে করতে বেঁচে থাকবে? বেঁচে থাকবার আর কি সার্থকতা আছে কঙ্কার? যে গভীর দৃষ্টি এতদিন হৃদয়ের মাঝখানে গভীর দাগ কেটে এসেছে তা'কে ভুলে যাওয়া তো সম্ভব নয়।

অবশেষে বিয়ের যে দিন সব ঠিক—মার নামে চিঠি লিখলো একটা, রাখলো টেবিলে বই চাপা দিয়ে। অনেকদিনের যত্ন-সঞ্চিত অনেক চিঠি আর ফটো, আংটি আর কবিতা, সব কিছু সংগ্রহ করে ব্লাউসের মধ্যে রাখলো লুকিয়ে, ধীরে ধীরে উঠে এল ছাদে, সরে এলো আলসের ধারে, নীচের দিকে ঝুঁকে দেখলো—যেখানে ব্যস্ত মানুষের ঠেলাঠেলি,জন্তু আর জানোয়ারের ছুটোছুটি, জীবন চাঞ্চল্যের উন্মত্ত প্রবাহ......এক মুহূর্ত্তে লুপ্ত হয়ে যাবে সমস্ত কিছু।...ঝাপ্‌সা হয়ে এল সারা জগৎ!

'কঙ্কাবতীর কাহিনী'র এইখানেই শেষ হতে পারতো, কিন্তু হ'ল না। শেষ পর্যন্ত সরে এলো কঙ্কা। ভাবলো—মৃত্যু যার হাতের মধ্যেই রয়েছে—সে চট্‌ করে মৃত্যুর হাতের মধ্যে নাই বা গেল? জীবনটাকে আর একবার নতুন ছাঁচে ঢালা যায় কিনা পরীক্ষা করতে দোষ কি? অসহ্য যদি হয়েই ওঠে, সহ্য করতে যাবে কেন? ইচ্ছে করলেই তো—যে কোন মুহূর্ত্তে—

নেমে এসে দেখলো চিঠিটা তেমনিই পড়ে আছে টেবিলে, মোটা একখানা ভারী বইয়ের নীচে। ছিঁড়ে ফেললো।

অনেকদিন পরে আবার দেখলাম কঙ্কাকে, বাপের বাড়ীর চারতলার ছাদে নয়, স্বামীর বাড়ীর দোতলার ছাদে। একলা লুটোপুটি করে কাঁদছে। পুত্রহারা কঙ্কা! কোলের ছেলে কোলছাড়া হওয়ার জ্বালা তো সহজ নয়! নিজেকে বিদীর্ণ করে ফেলতে পারলেই বুঝি এ জ্বালা নেভে!

সত্যি, এর চাইতে যন্ত্রণা, এর বড়ো মর্ম্মান্তিক বেদনা আর কি আছে জীবনে? একমাত্র সন্তান, কোলের সন্তানকে হারানোর মতো? এ জ্বালা সহ্য করা কঙ্কার পক্ষে, কঙ্কার মতো কোমল মেয়ের পক্ষে, সম্ভব নয়। হয়তো এতোদিনে—এইবার—সত্যিই কঙ্কা—

নাঃ তাই কি হয়? কর্ত্তব্য নেই মানুষের? কঙ্কা কি মানুষ নয়? কোলের ছেলের মৃত্যুতে সব দায়িত্ব শেষ হ'ল তা'র? স্বামীর মুখ চাইতে হবে না? শোক কি তাকেও আঘাত করেনি? চোখের জল মুছে উঠে বসলো এক সময়, এলো চুল জড়ালো, নীচে নেমে এলো। দেখলো স্বামী তেষ্টার সময় এক গ্লাস সরবৎ চেয়ে ফিরে গেলেন। বিরক্ত হলো বাড়ীর লোকের উপর। নিজেই করতে বসলো।

কিন্তু স্বামীকেও যদি বিদায় দিতে হয় একদিন ?

সেই চরম দুর্গতির দিনে আর কি করবার আছে ? কি করবার থাকলো ? এত বড় দুর্দ্দিন কি কঙ্কার জীবনে আর কখনো এসেছে ? ষোলো আনাই যখন গেল, কোন্‌টা আঁকড়ে বসে থাকবে সে ?

এতদিনে সত্যিই আত্মহত্যা করলো তা'হলে—বেচারা কঙ্কা ! অভিমানিনী কঙ্কা !

আত্মহত্যা ? অনেকটা তাই বৈ কি ! আল্‌গা করে ছেড়ে দেওয়া নিজেকে, স্রোতের মুখে তৃণের মতো। উঁচু থেকে নীচুতে···ছাদ থেকে রাস্তার ধূলোয়।

কল্পিত কাহিনীর মতো অবিশ্বাস্য ভাগ্যবিপর্যয়ে বিধবা কঙ্কা দূরসম্পর্কের এক ননদের বাড়ী নিয়েছে আশ্রয়। দেখে এলাম সেদিন—মুখরা ননদের অন্যায় লাঞ্ছনায় ওর গোপন কান্না।

ভেবেছিলাম 'কঙ্কাবতীর কাহিনী'র নিশ্চয় ইতি হ'ল এইবার। যা ফুরিয়ে গেছে তার জের টানবো কি দিয়ে ? কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম ইতির পরেও বাকী থাকে স্বাক্ষর। সেটা মনে পড়লো, পথ চলতে চলতে একটা তামাসা দেখে।

দেখলাম কঙ্কার সেই দূর সম্পর্কের বড়লোক ননদের বাড়ীর দেওয়ালে ঝুলন্ত এক নারীমূর্ত্তি, পড়ে যাচ্ছিল, প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে ছাদের কার্নিশটা।

কে ও ? কেউ নয় কঙ্কা !

তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলাম।

কৌতূহলী জনতা অনেকক্ষণ তামাসা দেখে ক্লান্ত হয়েই বোধ করি একটা উঁচু মই সংগ্রহ করে আনলো। নামানো হলো কঙ্কাকে। কিন্তু নামালেই তো শেষ হলো না, পুলিশে এমন অদ্ভুত ঘটনার কারণ অনুসন্ধান না করে ছাড়বে কেন ?

বাড়ীর ঝি পুলিশের কাছে এজাহার দেয়—ওর দোষ কি, মুখরা ননদ মিথ্যা সন্দেহের তাড়নায় গালি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, দিয়েছে চুল কেটে, রেশমের গোছার মত চুল কঙ্কার। দিয়েছে লোহা তাতিয়ে ছ্যাঁকা! অবশেষে কলহের উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ছাদ থেকে।

বাড়ীটা নতুন, আর কার্নিশগুলো শক্ত ছিল, তাই রক্ষে।

———

লড়াই

"লক্ষ্মণ হানিল বাণ অগ্নি অবতার।
তরুণী বরুণ বাণে করিল সংহার॥
পাশুপত বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বৈষ্ণব বাণেতে বীর করে নিবারণ॥"

বটতলায় ছাপা বিবর্ণ মলিন মলাটছেঁড়া রামায়ণখানা প্রতি সন্ধ্যায় নিয়ম করে পড়া চাই মুকুন্দর। হ্যারিকেনের সামনে পুঁথিখানা মেলে ধরে দুলে দুলে আর সুর করে পড়তে থাকে মুকুন্দ, ছেলেকে শোনাবার জন্যে না নিজের জন্যেই বলা শক্ত।

নেশা ধরেছে বাপ-ব্যাটার।

সন্ধ্যাবেলা দোকান বন্ধ করে এসেই মুকুন্দ হাত-পা ধুয়ে হ্যারিকেনটি জ্বেলে নিয়ে ছোট জলচৌকিটার ওপর বসায়, কুলুঙ্গি থেকে রামায়ণখানি পেড়ে নিয়ে ডাক দেয়—কানাই ঘুমিয়েছিস নাকি?

কোনদিনই ঘুমোয়না কানাই, তবু প্রশ্নটা তার করাই চাই।

ঘুমোবে কি—কানাই তো বিকেল থেকেই ছট্‌ফট্ করে বাপের আশাপথ চেয়ে।··· পিতৃভক্ত বলে যে খুব বেশী খ্যাতি আছে কানাইয়ের এমন মনে করবার কারণ নেই, তবু এ সময়টা বাপকে দেখলে তার যেন চোখ জুড়োয়। গাছ-পালায় ঘেরা আলো-আঁধারি উঠোন, দালানের দেওয়ালে কালো কালো ছায়া···লণ্ঠন বসাবার জলচৌকিটার নীচে ঘন অন্ধকার। এই পরিচিত অথচ রহস্যময় পারিপার্শ্বিকতার মাঝখানে পাঠক-মুকুন্দর রূপটা যেন নতুন, আকর্ষণীয়!

বড়ো বড়ো দু'টি চোখ মেলে বাপের মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে বসে থাকে কানাই। অতি পরিচিত এই শব্দযন্ত্রটা—সারাদিন যেটা রাজ্যের লোকের সঙ্গে বকাবকি করে মরে, গালাগালি করে কানাইকে আর কানাইয়ের মাকে, উঠোনের লাউ কুমড়োর ডগা সামলাতে গরু-ছাগল তাড়ায় 'হেট্ হেট্' করে—তার মধ্যে থেকে কেমন করে বার হয় এমন চিত্ত-চমকপ্রদ শব্দের সমারোহ! কোথায় লুকানো থাকে এই শব্দভাণ্ডার? এতো রোমাঞ্চকর ছবি!

ছবি ছাড়া আর কি? চোখের উপর যে স্পষ্ট দেখতে পায় কানাই—রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইয়ের অলৌকিক কীর্তিকাণ্ড, দশমুণ্ড রাবণের এককুড়ি অগ্নিবর্ষণকারী জলন্ত চোখ, দশজোড়া হাতের ধারালো অস্ত্রের ঝক্‌ঝকানি, অসংখ্য বানরকুলের লাঙ্গুল অন্দোলন।······

মাঝে মাঝে কানাই বাপের মুখ ছেড়ে বইয়ের পাতায় ঝুঁকে পড়ে, কালো পিঁপড়ের সারির মতো অজস্র কালো কালো লাইন আলাদা আলাদা থাকতে থাকতে হঠাৎ কেমন

একাকার হয়ে যায়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখদুটো জ্বালা করে আসে। কোঁচার খুঁটটা তুলে চোখ মুছতে দেখে মুকুন্দ হঠাৎ চোখ তুলে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সন্দেহে বলে—কাঁদছিস্ কেন রে, কানাই ?

দিনের বেলায় মুকুন্দর থেকে এখনকার মুকুন্দ যেন আলাদা মানুষ। এখন ছেলের সঙ্গে কথা কইতে কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ে স্নেহের সুর, ছেলের মার সঙ্গে কোমল অন্তরঙ্গতার। এ সময় অনায়াসে বসা যায় বাপের কাছ ঘেঁসে, সাহস করে জিগ্যেস করা যায় সেই সব প্রশ্ন, যে সব প্রশ্নের রাশি মস্তিষ্কের কোষে কোষে ভীড় করে বেড়াচ্ছে।

বাপের কথায় অপ্রতিভ কানাই মাথা হেঁট করে হাসে—যাঃ কাঁদবো কেন। চোখ জ্বালা করছে যে—

ঘুম পেয়েছে আর কি—সারাদিনে তো চোখের পাতা বুজবিনে—পঠিত পাতার মধ্যে একটা আঙুল রেখে বইটা মুড়ে মুকুন্দ রান্নাঘরের দিকে চেয়ে হাঁক দেয়—কই? খেতে টেতে দিচ্ছ না কেন ছেলেটাকে? ঘুম লাগে না ওর?

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে কানাইয়ের মা রাধা বলে—কেন, বেশ তো রাম-রাবণের যুদ্ধ চলছিল—আবার ঘুম লাগা কিসের?

—রাম-রাবণের যুদ্ধ তো দিনের বেলা—বলে মুচকি হাসে মুকুন্দ।

—তা বটে—ব'লে হাসির ঝিলিক মেরে রান্নাঘরে ঢুকে যায় রাধা।

অবশ্য সব দিন এতো সহজে যায় না, যায় সেদিন যেদিন হয়তো কড়ায় চাপিয়ে এসেছে বড়িচচ্চড়ি, কিম্বা জলন্ত উনুনের মুখে সমর্পন করে এসেছে পাকা পটল বা কচি বেগুন ···

মা তাড়াতাড়ি গেলে যেন হাড়ে বাতাস লাগে কানাইয়ের। ঠিক জানে মা এসে বসলেই পাঠের বাঁধুনি যাবে এলিয়ে - আসরটা হবে মাটি। বকবক্ করে যেলাই আজে বাজে কথা কয়ে হঠাৎ এক সময় খাওয়ার জন্যে তাড়া দেবে রাধা।

—এইটুকু শেষ করে নিই—বলে আরব্ধ অধ্যায়ের বাকী অংশটুকু পড়ে ফেলবে বটে মুকুন্দ, কিন্তু সে কি পাঠ? নেহাৎই উচ্চারণ মাত্র। হয়তো বা তরণীসেনকে বধ করতে বাকী রেখেই মুকুন্দ হাই তুলে বইখানা মুড়ে ফেলবে। কানাই বেচারা যে সেই লঙ্কাপুরীতেই পড়ে রইলো. এটা আর খেয়ালই হয় না তার।

নিরাপত্তা হিসাবে সারাদিনটা মা'র স্নেহচ্ছায়াটা পছন্দ করলেও সন্ধ্যাবেলার এই রামায়ণের আসরে মা'র উপস্থিতি নিতান্তই চক্ষুশূল কানাইয়ের।

এতো বাজে কথাও বলতে পারে রাধা। নীলমণির মা'র নতুন কেনা গাইটা দিন সাড়ে চার সের দুধ দেয়, কিংবা লক্ষ্মী বাঁড়ুয্যের মেয়ের শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না···এগুলো কি একটা বলবার মতো কথা? কি রস পায় ওতে রাধা? ···অথচ লঙ্কাদাহনের মতো মারাত্মক কাহিনীটা শুনতে শুনতে ঘনঘন হাই তুলবে আর

বলবে—নাও নাও, তোমাদের পুঁথিপত্তর তোলো দিকিন, রাত দুপুর অবধি হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকতে পারিনে বাপু।

মা চলে গেলে নিশ্চিন্ত কানাই বাপের আরো কাছ ঘেঁসে বসে উত্তেজনারুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আচ্ছা বাবা, লক্ষ্মণ যদি অতো বীর তবে একদিনে সব মেরে দিল না কেন?

মুকুন্দ হেসে ওঠে—দূর পাগলা, লঙ্কাপুরীতে কী সোজা রাক্ষসের কাঁড়ি? সেদিন পড়লাম শুনলি না? একলক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি রাবণের। লক্ষ জানিস তো? দশ দশে একশো, একশো দশে হাজার, আর একশো হাজারে এক লক্ষ—বুঝতে পারলি? তা ছাড়া সৈন্য হচ্ছে একশো অক্ষৌহিণী।

অতো হিসেব কানাইয়ের মাথায় ঢোকে না....লাখ-বেলাখ যে বিরাট একটা কিছু, এইটুকু তার বোধগম্য, তাই হিসেব-পত্তরে কান না দিয়ে মহোৎসাহে বলে—আর যদি মিনিটে মিনিটে বাণ মারে? শতঘ্নী বাণ, সহস্রঘ্নী বাণ, অগ্নিবাণ আর ব্রহ্মবাণ?

উচ্চারণে ভুলচুক নেই কানাইয়ের।

মুকুন্দ ছেলের উৎসাহদীপ্ত মুখের পানে চেয়ে একবার হেসে ওঠে—ক্ষ্যাপা ব্যাটার সব মুখস্থ।...ওগো শুনছো, 'কালেখ্যে' তোমার ছেলে লড়ায়ে গোরা হবে দেখছি।

আবার 'ওগো'! এইটাই বড়ো বিরক্তিকর কানাইয়ের। শতঘ্নীবাণ না হোক্, প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে বাবার কাছ থেকে যে তথ্যগুলো আদায় করে নেবার ইচ্ছে থাকে মনে মনে, সেগুলো কেবলি বাধাপ্রাপ্ত হয় বাবার এই অনর্থক 'ওগো' ডাকে।

রাধা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেই তো সব মাটি। মেয়েমানুষ যুদ্ধের কলকৌশল কিছুই তো বোঝে না ছাই।·· রাধা থেকে ডাকলেই তাই দুই চোখে অগ্নিবাণ হেনে কানাই মাকে বলে—এখনি খাবো না আমরা, যাও। ঘুম পায়নি আমার।

রাধা বিরক্তস্বরে বলে—তা' পাবে কেন? পুঁথিপত্তর সাঙ্গ হলেই দাওয়ায় পড়ে ঘুমোলে বুঝবো। খেয়ে নিবি আয় শিগগীর, লক্ষ্মীছাড়া!

—মিথ্যে গালমন্দ করা কেন বলে মনের অসন্তোষ প্রকাশ করে মুকুন্দ। নিজে যে সারাদিন ছেলেকে "হারামজাদা শয়তান" ভিন্ন ডাকে না, মেরে পিঠের ছাল তোলে, সে কথা আর মনে থাকে না তখন।

রাধাও অবশ্য সে সব কথা তুলে পরমগুরুকে অপদস্থ করে না। শুধু মুখঝামটা দিয়ে বলে যায়—বেশ তো, ছেলের সোহাগ করোনা বসে বসে, এর পর ভাত না গিলে ঘুমিয়ে কাদা হ'লে বুঝবে।

বলে বটে, তবে কণ্ঠস্বরে ছেলের সোহাগ সম্বন্ধে খুব বেশী আপত্তির ভাবও ধরা পড়ে না।

মুকুন্দ বোধ করি ছেলের সোহাগার্থেই সূচিপত্র দেখে বীরত্বব্যঞ্জক জায়গাগুলো বেছে

বেছে পড়ে ··নিত্য শোনা একই কাহিনী, তবু কানাইয়ের প্রত্যেক সঙ্কটমুহূর্ত্তে গায়ে কাঁটা দিয়ে আসে, বুক দুর্‌দুর্‌ করে, উত্তেজনায় চোখমুখ রাঙা হয়ে ওঠে।···

রাম আর লক্ষ্মণ, রাবণ আর কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ আর হনুমান—প্রত্যেকের জায়গায় এক-একবার নিজেকে বসিয়ে নিয়ে যে রকম অদ্ভুতভাবে কল্পনার রাশ ছেড়ে দেয় কানাই, জানতে পারলে স্বয়ং বাল্মীকি-কৃত্তিবাসকেও হেঁটমুণ্ডে হার স্বীকার করতে হ'ত।

খেলা মানে যুদ্ধ, যুদ্ধ খেলা।

অন্য সব ছেলেরা মাঝে মাঝে মুখ ভার করে বলে—"কেনো'র সঙ্গে আমরা আর কেউ খেলবোনা ভাই, কেবল কেবল মরতে ভাল লাগেনা বাবা।" তা' অভিযোগ তা'দের অন্যায় নয়—কল্পনায় যাই করুক, বাস্তব ক্ষেত্রে কানাই সংহারকের পার্ট ছাড়া আর কিছু নিতে রাজী নয়। কাজেই পালা করে সকলকেই একাধিকবার মৃত্যু বরণ করতে হয়।

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা সকলের কাছে পুরনো হয়ে আসে, হয় না শুধু কানাইয়ের কাছে। সুযোগ আর সুবিধে পেলেই সে মারণাস্ত্র তৈরি করতে বসে। আর স্বপ্ন দেখে—বড় হয়ে যখন সত্যিকার যুদ্ধ করবে তখনকার ঐশ্বর্যময় সমরোপকরণের।

কিন্তু কানাইয়েরই বা দোষ কি? যুগযুগান্তর ধরে পৃথিবীর ইতিহাস যুদ্ধ ভিন্ন আর কি নতুন কথা বলছে? যুগের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তন হয় পদ্ধতির, ইতিহাসটা থাকে অভিন্ন।

স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে পাঠ্য পুস্তকেও সেই একই নজীর দেখে আসছে কানাই।

পাঠ্যতালিকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে যাচ্ছে পুরাণের যুগ, ফিকে হয়ে আসছে রাম-লক্ষ্মণের বীরত্বমহিমা···স্পষ্ট হয়ে উঠছে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, রাণাপ্রতাপ, বিজয়সিংহ। পুরাণ থেকে ইতিহাসে—অতীত থেকে বর্তমানে—সংগ্রামের পথ বেয়ে এগিয়ে আসছে মানুষ···কিন্তু হঠাৎ কখন স্তব্ধ হয়ে গেল সেই প্রাণপ্রবাহ?

"পলাশীর যুদ্ধ" বইখানা হাতে করে কিশোর বালক স্তব্ধ হয়ে ভাবে···পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজও অব্যাহত আছে সেই সংগ্রামের লীলা, উত্তাল হয়ে উঠছে তাজা রক্তের জোয়ার! শুধু ভারতের মাটি ঘুমন্ত ঠাণ্ডা। তার সমুদ্রে জোয়ার ওঠে কেবল পূর্ণিমার জ্যোৎস্না লেগে···আর মানুষের যা সংগ্রাম সে শুধু জীবনসংগ্রাম!

নিরীহ বাংলার তেলেজলে গড়া কাঁচামাটির ছেলে—ওর রক্তে কেন যুদ্ধের ক্ষুধা? ওর চোখে কেন প্রতাপ-শিবাজীর স্বপ্ন?

ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর স্বপ্ন অবশ্য মুকুন্দর নিজের। গোটাচারেক ক্লাস পার

হ'তেই রাধা বরাবর বলেছে—আর বিত্তের দরকার কি, দোকানের কাজকর্ম শিখুক এবার। এখন থেকে না শেখালে বাবু হয়ে যাবে যে!

কথাটা তখন মুকুন্দর মনঃপুত হয়নি, একটা পাশ দিয়ে বসলে দোকানের কদর বাড়বে কতো। 'মনিহারী দোকান' না বলে মুকুন্দর দোকানকে তখন 'ষ্টেশনারি শপ্' বলবে লোকে। বাবু-ভদ্দরলোক এলে দুটো ইংরিজি কথা বলতে পারবে ছেলে, তাই বছর বছর এগিয়ে পাশের পড়া পড়চে এখন কানাই। কিন্তু আজকাল মুকুন্দ পড়েছে চিন্তায়। পুঁথি-কেতাবে যে রকম মন কানাইয়ের, তার সিকিও নেই দোকানের ওপর...যখন-তখন কী ভাবে বসে বসে। গেরস্থর ছেলের ওসব কি!

পঞ্জিকায় কী যেন একটা শুভদিন দেখে ছেলেকে ডেকে বললে মুকুন্দ—চল্ দিকিন, আজ সুযাত্রার দিন—দোকানে গিয়ে বসবি চল্।

কানাই বিব্রতভাবে বলে—কেন?

—কেন? বাঃ!...হাসতে চেষ্টা করে মুকুন্দ—কেন কি রে? বুঝেপড়ে নিতে হবে না? আর ক'দিন, এই পাশটা দিতে যা দেরী, তারপর ওই দোকান আছে আর তুমি আছো, আমি বাপু দায়ে খালাস।

কানাই বিরক্ত ভাবে বলে—দোকানটোকান আমার ভাল লাগে না।

—বটে। মুকুন্দ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে—তা' কি তোমার ভালো লাগে শুনি? কি করবে এর পর?

—আমি লড়াইয়ে যাবো।

একটু 'গোঁ' ভরে কথাটা উচ্চারণ করে কানাই।

মুকুন্দ বার দুই ছেলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে গম্ভীরভাবে বললে—ও, লড়ায়ে যাবে? কথাটা ভালো—তবে তোমার জন্যে ফের আবার একটা লড়াই বাধাতে হয় বিলেতে। পৃথিবীর সব যুদ্ধটুদ্ধ মিটে শান্তি হ'ল, এখন ছেলে বায়না নিচ্ছেন কিনা 'লড়ায়ে যাবো'!

শান্তি হয়ে গেছে! হ্যাঁ, কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই তো বলছে সবাই।

কানাই কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ে। হায়! কিছুদিন আগেও যদি এমন সাহস করে বলবার শক্তি হ'ত! কানাইয়ের ভাগ্যদোষেই যে অমন ঘোরালো যুদ্ধটার এতো তাড়াতাড়ি শান্তি হয়ে গেল এতে আর সন্দেহের কি আছে। হাতের গোড়ায় আসতে না আসতে কোথায় যেন ভোজবাজীর মতো মিলিয়ে গেল।...কিন্তু লড়ায়ে যেতে চাইলেও একটু যেন খটকা আছে কোথায়। পলাশী...পাণিপথ....হলদিঘাটের যুদ্ধে যে গৌরব, 'মিলিটারী'তে ভর্তি হয়ে সেটা বজায় থাকবে তো? খাকি সুটটা অবিশ্যি দেখতে মন্দ নয়,

'মন্দ নয়' কেন বরং ভালোই, কিন্তু উষ্ণীষ-কোমরবন্ধ-লৌহবর্মের কাছে? খাকি সুটে সুবিধা হয়তো আছে কিন্তু সমারোহ কোথায়?

তা ছাড়া—কোথায় সেই লড়াই? কাদের সেই জয়পরাজয়? ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে তার যোগ আছে না কি কিছু?—ভারতে দু'শো বছর ধরে যে স্রোত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সে তো আজও তেমনি স্তব্ধ।

ছেলেকে চুপ করে থাকতে দেখে মুকুন্দ বুঝলে—ওষুধ ধরেছে, মনে মনে হেসে বললে—তা' বেশ তো, লড়াইয়ে গেলেও কিছু আর এখুনি যাচ্ছো না? দোকানটা একবার ঘুরে আসতে দোষ কি?

—না আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি।

—ইস্কুলে? আজ ছুটি না?

—ক্লাসের ছুটি। স্কুলের মাঠে লেকচার হবে তাই শুনতে যাচ্ছি।

মুকুন্দকে দ্বিতীয় কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে ছুটে পালায় কানাই।

"কপাল আঁকড়ে বসে থাকলে চল্‌বে না ভাই, কপাল আমাদের নিজেদের গড়তে হবে। লড়তে হবে—কাড়তে হবে—নিজের গণ্ডা আদায় করে নিতে হবে। ঘরের পাশে শত্রু বসে আছে 'ওৎ' পেতে, হুঁসিয়ার সব, হুঁসিয়ার! আপনাদের জাত-মান-ধন-প্রাণ রক্ষা করতে পরের মুখ চেয়ে বসে থাকবো কেন আমরা?—এসো এগিয়ে এসো—পৃথিবী জুড়ে লড়াই করছে মানুষ, শুধু আমরাই পড়ে মার খাবো? কখনই নয়!—মায়ের দুধ খাওনি তোমরা?—ভগবানের দেওয়া হাত নেই দু'খানা? বীরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ো, বাঙালীর কলঙ্ক ঘোচাও..."

সহর থেকে নেতারা এসেছেন।

ভাষায় তাঁদের আগুন জ্বলে। এক-একটি শব্দস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে ওঠে বিদ্যুতের মতো। আগুনের ছোঁয়াচ লাগে ছায়াশীতল আম্রকাননের নিবিড় স্নিগ্ধতায়। অনেকদিনের স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডা ঘুম ভেঙ্গে যায়। হুঁসিয়ার হয়ে ওঠে নিরীহ চাষারা।

লড়াই! লড়াই!

স্কুলের মাঠ থেকে কানাই ফিরে এলো সেই অগ্নিকণা বয়ে। কানাইয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনার জোরেই কি সেই আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ এলো হাতের গোড়ায়? শ্রীচৈতন্যের দেশে শানানো হবে তলোয়ার?—দু'শো বছরের থমকে-যাওয়া নদীতে দেখা দেবে নতুন বন্যা?

সহর থেকে যাঁরা এসেছিলেন—ফিরতি ট্রেণেই ফিরে গেছেন তাঁরা। কতো কাজ

তাঁদের, কতো চিন্তা! লড়াই করবার সময় কোথা? লড়াই চলে তাঁদের মস্তিষ্কের কোঠরে। তাই নিয়ে গিয়েছেন লড়াইয়ের সঙ্কেত, দিয়ে গিয়েছেন মন্ত্রগুপ্তি শিক্ষা।

কানাইয়ের দল এসে জমা হয় মাতব্বরদের আড্ডায়, দেখে আয়োজনের ঘটা। অধীর হয়ে প্রশ্ন করে—কই লড়াই? কোথায় সেই রণক্ষেত্র? শত্রুপক্ষ কারা?

মাতব্বররা মুচকি হাসে—রোস্ না, সময়ে জানতে পারবি। শত্রু-মিত্র কি আগে চিনতাম রে বাবা? ভগবান এতোদিনে চোখ ফুটিয়েছে। চোখ ফুটিয়ে গেছে 'ন্যাতা'রা।

চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা তো বসে বসে মতলব ভাঁজছে, দৃষ্টিহীন কানাইয়ের শান্তি নেই। ঘুম নেই রাত্রে···রাত্রির অন্ধকারে ঝিকিমিকি তারাভরা আকাশের পানে চেয়ে খোলা চোখে স্বপ্ন দেখে সে—প্রতাপ-প্রতাপাদিত্য-বীরবাদল-মোহনলালের·· নতুন যুগের বীর নেতাজীর। স্বপ্ন দেখে—উন্মুক্ত রণক্ষেত্রের···দুই সীমান্তে দুই দলের শিবির···স্বপ্ন দেখে—খোলা তলোয়ারের ঝন্‌ঝনানির।

যতোই হোক্ চাষার ঘরের ছেলে।

'বই কেতাবে'র দৌড় এতদূর নয় যে, আণবিক বোমার খবর রাখবে, ঘুরে ফিরে তাই সেই অচলযুগের পটভূমিকাতেই নিজেকে দাঁড় করিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

এমনি একদিন জেগেই ছিল সে। টোকা পড়লো জানলার গোড়ায়।···

—কে?—চমকে উঠলো কানাই।

—চুপ, আমি নবীন, আয় বেরিয়ে আয়, তোর বাবা টের পায় না যেন।

গায়ের কাপড়টা জড়াতে জড়াতে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে কানাই।—কি ব্যাপার নবীনকাকা?

নবীন ফিসফিস করে বললে—এখানে কথা হবে না, চল্ ইস্কুলের মাঠে, ওখান থেকেই বেরোনো হবে।

বেরোনো হবে!

- তারা কি এসে গেছে?

গলার স্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসে কানাইয়ের, বুক ঢিপ ঢিপ করে।

নবীন একটু আশ্চর্য হয়ে বলে—কারা এসে গেছে শুধোচ্ছিস? নেপাল—মতি—রামকেষ্ট—হরি—

—না, না, ওরা নয়, ওরা নয়—তারা···মানে শত্রুরা।

শুকনো গলাটা ঢোক গিলে ভিজোতে চেষ্টা করে কানাই। হায় ভগবান! উৎসাহের চোটেই যদি শরীর অবশ হয়ে আসে, বীরত্ব সে দেখাবে কি ক'রে?

নবীন কিন্তু হেসে ওঠে। অন্ধকারে হাসিটা দেখা যায় না, ঠাণ্ডা একটা শব্দ শুধু।

—শত্রু আবার 'আসবে' কোথায় রে ক্ষ্যাপা ছেলে? ঘাড়ের ওপর তো বসেই আছে তারা, জমি-জায়গা দখল করে। এইবার ট্যাঁ-ফোঁ ঘোচাচ্ছি বাছাদের। চল চল—দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কানাইয়ের হাতটা ধরে টেনে নিয়ে যায় নবীন।

ইস্কুলের মাঠে গুলতানি।

একদল বুঝি এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যে, বাকী দল যাবে—হাতিয়ার শানাচ্ছে। বিদ্যুৎ-ঝলকানো ইস্পাতের ফলা নয়—মোটা মোটা খেঁটে বাঁশ। সহজ সরল অস্ত্র।

কানাই কি কিছুই বুঝতে পারে না? অমন নির্ব্বোধের মতো শুধু সম্মুখবর্ত্তির অনুসরণ করে চলেছে কেন খালি হাতে?

বেশীদূর এগোতে হ'ল না—অগ্রবর্ত্তীদল ফিরছে। 'কাজ ফতে!' 'এঁ্যা! বলিস কি?'...'পাড়াকে পাড়া'?..."তবে আবার কি। যে দু'চার ব্যাটা ছিট্‌কে পালাচ্ছিল তাদের দিয়েছি একেবারে এই—'

খেঁটে বাঁশটা মাথার ওপর বাগিয়ে তুলে ধরে ইসারায় বুঝিয়ে দেয় মতি।

অদ্ভুত একটা আর্ত্তরোল আসছে, তার সঙ্গে বিশ্রী গন্ধ আর বাঁশ ফাটার শব্দ। ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া আর খড়ের চাল বৈ তো নয়। আকাশটা অমন লালে লাল হয়ে উঠেছে কেন?...তরণীসেনের মতো 'চিকুর শর' হেনেছে নাকি কেউ? লক্‌লক্ করে শিখা উঠছে কিসের? দশমুণ্ড রাবণের বিশখানা হাত? দিকে দিকে প্রসারিত হয়ে গ্রাস করতে চাইছে পৃথিবীর সমস্ত শুভ আর কল্যাণ?

—চল্ চল্, ঘর চল্! -নবীন সাবধান করে দেয়—ঘরে গিয়ে বেমালুম নাক ডাকাবি সবাই, কাক-পক্ষীতে জানতে না পারে। শালার পুলিশ এসে দেখবে পাড়া নিশুতি।... আরে, এটা আবার কি? এঃ রাম! রাম!

মতি দাঁত বার করে হাসে—ব্যাটা পালিয়ে আসছিল, দিয়েছি ভবলীলা সাঙ্গ করে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ওরা, কিন্তু কানাই? ওর চোখ অমন বিস্ফারিত হয়ে উঠছে কেন? 'লীলাসাঙ্গ' করা জীবটাকে চিনে ফেলেছে বলে? ওপাড়ার সেই লোকটা না? প্রায়ই যার সঙ্গে ছিপ ঘাড়ে করে মাছ ধরতে যায় মুকুন্দ পীরতলার পুকুরে? কপালের আধখানা ফেটে গিয়ে জমাট হয়ে রয়েছে রক্তের চাপ!

রক্ত!

কিন্তু ভয় পেলে চলবে কেন? লড়াইয়ের সঙ্গে ও-জিনিষটার যে বড়ো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

এই তবে লড়াই? ইতিহাসের যে ধারা দেড়শো বছর ধরে স্তব্ধ হয়ে আছে, তাকে মুক্তি দেবে এই নতুন রক্তের স্রোত? প্রতাপ আর প্রতাপাদিত্য, শিবাজী আর পৃথ্বীরাজের হাতে লেগেছিল যে রক্ত, সেও তবে এমনি কালো, আর জমাট বাঁধা!

———

পূরবী

বয়সের সেই অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিল পূরবী, যেখানে—সম্মুখে রয়েছে রহস্যময় যৌবনের দুর্নিবার আকর্ষণ, আর পিছনে থমকে দাঁড়িয়ে আছে পরিত্যক্ত কৈশোর, ম্লান দৃষ্টি মেলে।

অদ্ভুত এই দিনগুলি, অকারণ শঙ্কায় কম্পিত, অকারণ পুলকে চঞ্চল। মনটাকে যেন হঠাৎ নতুন আবিষ্কার করেছে পূরবী, তাই কি যে করবে সেটাকে নিয়ে বুঝতে পারে না।

শ্রাবণের নির্জ্জন মধ্যাহ্নে মেঘমেদুর আকাশের পানে চেয়ে হৃদয় যখন অনাস্বাদিত কোন বেদনায় ভারী হয়ে আসে, ঘুমভাঙ্গা রাতে পাণ্ডুর চাঁদের মৃত্যু-বিবর্ণ হাসি দেখে ওঠে শিউরে, শীতশেষের প্রথম এলোমেলো হাওয়ায় অপরাধীর মত থরথরিয়ে কাঁপে, ও বুঝতে পারে না তার অর্থ।

বুঝতে পারে না অজানা এই অনুভূতি কোথায় ছিল লুকানো।

সমস্ত চেতনা যেন উন্মুখ হয়ে থাকে কিসের প্রত্যাশায়? কি সে? কি? কে বোঝাবে সে কথা পূরবীকে?

তবু ভারী ভালো লাগে আপনার মন নিয়ে আপনি খেলা করতে। শিশুর মতো—নূতন পাওয়া খেলনাটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে।

আবার হঠাৎ একসময় যেন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে পূরবী, ফেলে আসা কৈশোর দিনের পানে ফিরে চেয়ে ব্যাকুল চিত্ত 'হায়' 'হায়' করে ওঠে!

তাই এই বয়সের সব মেয়েদের মত পূরবীরও আজকাল স্বভাবের নেই সামঞ্জস্য। কখনো ছেলেমানুষের মত ছোট ছোট ভাই বোনদের সঙ্গে করে ছুটোছুটি হুটোপাটি, স্ফূর্ত্তিতে টলমল খুসিতে জলজল। বকুনি খেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরতে আসে। আর কখনো পাঁচজনকে এড়িয়ে সংসার থেকে পাশ কাটিয়ে একা একা ঘোরে, অকারণ অভিমানে ছলছলিয়ে ওঠে, এতটুকু তিরস্কারের ভর সয় না। ছোটদের দল থেকে ডাক এলে দেয় না সাড়া।

কিন্তু সবাই বোঝে না এই বয়ঃসন্ধির দ্বন্দ্ব।

কেউ বলে 'ঢঙ্'। কেউ বলে 'আদিখ্যেতা'। কেউ বলে—'মেয়ে দিন দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছে—শাসন করা দরকার।'

এবং শেষোক্ত কাজটির ভার নিতে গুরুজনরা কুণ্ঠিত হন না। 'দশ বর্ষানির' উপদেশটাই তাঁরা সর্ব্বদা মেনে চলতে চান। পরবর্ত্তীযুগকে রাখতে চান শুধু শাসনের শৃঙ্খলে।

ক্ষমা নেই, শ্রদ্ধা নেই, মমতা নেই, স্নেহ যদি বা থাকে—সে অনিষ্টকর অন্ধ স্নেহ। যা শুধু শিশুর উপরই খাটে!

তাই যৌবনপ্রাপ্ত সন্তানকে মা-বাপ করেন সন্দেহ, করেন ঘৃণা। যে প্রেম মানুষকে করেছে 'মানুষ', যে প্রেম তা'র জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যে প্রেম বিধাতার আশীর্বাদ ভিন্ন আসে না, সেই প্রেমের গন্ধে নাকে কাপড় দিয়ে শিউরে সরে যান তাঁরা। লাঞ্ছনার সীমা থাকে না সেই হতভাগ্য সন্তানের, দৈবক্রমে যার অন্তরে জ্বলে উঠেছে প্রেমের প্রদীপ।

কুলশীল গণ গোত্র, আর রাশি নক্ষত্র সবকিছু মিলিয়ে যদি প্রেমে পড়তে পারে ছেলে মেয়েরা, তবেই হয়তো—কিছুটা অনুমোদিত হয় তাঁদের কাছে সেটা, যাতে করে তাঁদের পরিশ্রম বাঁচে।

অবয়বহীন একটা অস্ফুট প্রেমের আভাস পূরবীর সমস্ত চৈতন্যকে তুলেছিল রাঙিয়ে, যেমন করে আকাশকে রাঙিয়ে তোলে অরুণোদয়ের আগের রক্তিমাভা। কিন্তু—কবে উঠবে সেই সূর্য্য পূরবীর জীবনে ?

বিধিবদ্ধ বিবাহিত দম্পতিমাত্রেই যে পরস্পরের হৃদয় রহস্যের সন্ধান পেয়েছে, এ বিশ্বাস আমার না থাক্, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে মনে হয়—হয়তো এ বয়সে যথা নিয়মে বিয়ে হয়ে যাওয়াই মঙ্গল। এই সদ্য জাগ্রত হৃদয়াবেগ পায় একটা আশ্রয়, সার্থক না হোক, শান্ত হয়।

কিন্তু তাই বা হয় কই ?

সেকালের মতো, একালে আর তৃষ্ণাবোধের আগেই তৃষ্ণার জলের জোগাড় করে রাখা সম্ভবপর নয়। এর পিছনে আছে অনেক ইতিহাস, অনেক সমস্যা। কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানশূন্য অভিভাবকবর্গ নিজেদের সমস্ত ত্রুটি আর সমাজের সমস্ত সমস্যার পূরণ করতে চান কেবলমাত্র চোখরাঙানি দিয়ে, কেবলমাত্র লাগামের জোরে।

হঠাৎ একদিন মা আবিষ্কার করলেন—পূরবী আজকাল স্নানের ঘরে করছে সময়ের অতিরিক্ত অপচয়, প্রসাধনে করছে অযথা বিলম্ব। মাথা নেড়ে ভাবলেন—উঁহু, এ ঠিক নয়।

শ্যামল মুখে খুসির আভা ফুটিয়ে বর্ষায় ধোওয়া সতেজ লতার মত পূরবীকে স্নান সেরে বেরিয়ে আসতে দেখেই তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করেন—ক'বার করে সাবান মাখছো আজকাল, রুবি ?

—ক'বার আবার—বা রে !

—ঘন্টাখানেক তো স্নানের ঘরে ঢুকেছ। এত ফ্যাসান তো ভালো নয় বাছা।

—ফ্যাসান কি করলাম, বাঃ। ব্লাউস্‌টা কাচলাম সাবান লাগিয়ে, তাই দেরী হল একটু।

—তাই বা কি দরকার ছিল শুনি ? বেশ তো ফরসা ছিল জামা, গেরস্থ ঘরের মেয়ের এত বাবুয়ানা ভালো নয় পূরবী, আজকাল আমি লক্ষ্য করছি বড্ড সখ বেড়েছে তোমার। পাউডার মাখতে আর চুলের বাহার করতে যে সময়টা নষ্ট করো সেটুকু সংসারের কাজ করলে তো উপকার হয়। এই যে ছেলেটা সেই থেকে বায়না নিয়েছে, ওকে এতক্ষণ ভোলালে হ'ত না ? বয়স হচ্ছে, খুকিটি তো নও ?

যেন তাঁর বুড়ো বয়সের এই খোকাটির সব দায়িত্ব পূরবীর। তা'কে নাওয়ানো খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো সব করবে পূরবী, একটুকু ত্রুটি হ'লেই সর্ব্বনাশ।

অপ্রতিভ পূরবী ব্যস্ত হয়ে খোকার কান্না থামাতে ছোটে। মনের ভার ওর অবশ্য বেশীক্ষণ থাকে না, খোকার হাসির সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে নতুন শেখা গানের কয়েক লাইন।

তাই যখন পিসিমা এসে আর একবার 'গেরস্থ ঘরের' মেয়েদের ডিউটি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন, তখন দমে না গিয়ে জানায় নিজের মনের খুসির খবর।

—দেখ দেখ পিসিমা, খোকন 'দিদি' বলতে শিখেছে···বল্‌তো রে দুষ্টু, 'ডিডি' 'ডিডি'—ওই দেখ পিসিমা—

—আমি ঢের দেখেছি, সকাল বেলা বসে বসে ভাই নিয়ে সোহাগ করার চেয়ে নটেশাক ক'টা বেছে দিলে আমার একটু সুবিধে হ'ত। তোদের বয়সে আমরা দু'বেলা সংসার ঠেলেছি—

বলে বিরক্ত মুখে পিসিমা বোধকরি নটেশাকের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

ছুতায়নাতায় সকলেই জানাতে চায়—পূরবীর 'বয়স হয়েছে'। কিন্তু—কিসের সে বয়স? শুধু মায়ের আর পিসির সাহায্য করবার? বাড়ীশুদ্ধ সকলের সুবিধে আর আয়েশের জোগান দেবার?

অবিশ্যি সকলেই এরকম নয়। বৌদি এসে বলে—ঠাকুরঝি সিনেমায় যাবে?

—হঠাৎ?

—হঠাৎ মানে—ইয়ে—তোমার দাদা কথায় কথায় বলছিল—

পূরবী আজকাল বুঝতে পারে, এটা বৌদির ছল, ব্যবস্থা ওদের হয়েই থাকে, তা'ছাড়া পূরবীকে যে সঙ্গে নিতে চায় সেটা নিতান্তই চক্ষুলজ্জার দায়ে।

হেসে বলে—আর তৃতীয় ব্যক্তিকে জোটানো কেন বাপু? কেটে পড়না দুজনে।

—ধেৎ, ভারী অসভ্য হচ্ছো আজকাল। যাবে না তা'হলে?

—উঁহু।

—বেশ এই চললাম তোমার দাদাকে বলতে—বোনের মত হল না। বলে বৌদি চলে যায় হাঁফ্ ছেড়ে।

পূরবী কৌতুকের হাসি হাসে। আজকাল ওদের এই ছল, এই চক্ষুলজ্জার ব্যাপারটা খুব সহজেই বুঝতে পারে পূরবী। ভারি মজা লাগে ওর।

সেদিন ছোড়দা এসে ডেকে বললে—এই রুবি একটা জিনিষ দেখবি?

—কি গো ছোড়দা?—উৎসুক প্রশ্ন করে রুবি।

—জিনিষ নয় ঠিক, মানুষ। মুকুল রায়কে ধরে এনেছি।

—কোন মুকুল রায়, ছোড়দা? কবি মুকুল রায়?

—হ্যাঁরে, বলছিলাম না সেদিন—আমাদের কলেজে পড়ে, ফিফ্‌থ ইয়ারে। চল্‌না।

—আমি যাবো কি বল? পিসিমারা তাহলে আস্ত রাখবে নাকি?

—আরে চল্‌না এমনি, পাড়াসুদ্ধু লোককে বলে বেড়াবার দরকার কি? তুই কবিতা টবিতা লিখতে পারিস শুনে বলেছিল—আলাপ করবার কথা। আমাদের বাড়ীর কাণ্ড তো সকলে জানে না।

পূরবী রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলে— ছি ছি তোমারই বা কী কাণ্ড ছোড়দা? ওই কবিতা লেখার কথা বলেছ? বিশ্রী অপরূপ লেখা—

—দূর বিশ্রী কেন? বেশ তো লিখিস তুই, চর্চা করলে আরো ভালো হবে, ওই জন্যেই তো আরো লেখকটেখকদের সঙ্গে আলাপ করা দরকার। চল্‌না—

—মা কিন্তু বকবেন। ভয়ে ভয়ে আপনার আশঙ্কা ব্যক্ত করে পূরবী।

এ আশঙ্কা অবশ্য ছোড়দার নেই তা নয়, তবু মুখে সাহস দেখিয়ে বলে—একটা ছেলে একটা মেয়েকে দেখলেই খেয়ে ফেলবে—এই পচা পুরনো ধারণাটা ওঁদের ছাড়া দরকার।

দরকার হয়তো সত্যি, কিন্তু ছাড়াবে কে? পূরবীর মত সাধারণ মেয়ের সে সাহস কোথায়? তবু ছোড়দার প্ররোচনা আর নিজের ঔৎসুক্যের জয় হ'ল। হ'ল বটে—কিন্তু পিসিমার দলই হয়তো যথার্থ জ্ঞানী।

কুমারীর স্বপ্নালস দৃষ্টি মেলে নারী প্রথম যে পুরুষের পায় দেখা, তাকেই দেয় আপনার সর্ব্বস্ব উজাড় করে।

মুকুল রায়কে শুধুই কি কবি বলে, আর্টিষ্ট বলে পূজা করলে পূরবী? ওর সমস্ত দেহ মন স্তবগান করে উঠলো না কি সৌন্দর্য্যের পদতলে? বীণার মত বেজে উঠলো না তা'র স্পর্শময় বাতাসের তরঙ্গে?

পূরবীর জীবনে আজকেই এল না কি সূর্য্যোদয়ের শুভদিন?

আর মুকুল?

সেও মুগ্ধ হয়েছে বৈ কি। তেমন সৌন্দর্য্য না থাক্—অকপট কুমারীচিত্তের মাধুর্য্যই কি কম লোভনীয়? কবির ভাষায়—'তখন উষার আধ আলো পড়েছিল মুখে দুজনার'—

তাই এত সহজে এত কাছাকাছি এসে পড়তে বাধলোনা তাদের।

দূরে গলির মোড়ে যখন মুকুলের দীর্ঘায়ত গৌরদেহ প্রথম চোখে পড়ে, পূরবীর সর্ব্বাঙ্গে ছন্দে ছন্দে সাড়া দেয় এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত। তাই সংসারের সহস্র কাজের ফাঁকে এই সময়টুকু রাখে নিজস্ব করে।

কাজের ছলে অন্যমনস্কতার ভানে দাঁড়ায় এসে ছাদের আলসের ধারে।

মুকুলের মুগ্ধ আনন্দময় দৃষ্টি ঠিক জানে এই খবর।

কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেল এই চুরি।

অলস বৈকালে পিসিমার ছাদে কাজ থাকবার কথা নয়। প্রচণ্ড রৌদ্রে বড়ি আচারের তদারক করতেই আসা যাওয়ার অভ্যাস তাঁর, তবু হঠাৎ কি একটা কাজের ছলে ধীরে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ পূরবীর বুকের রক্ত চমকে ওঠে তাঁর তীব্র কণ্ঠস্বরে।

—হতচ্ছাড়া মেয়ে, তাই তোমার বিকেল হলেই ছাতে আসার জন্যেই ঘুরঘুরুনি? ও হতভাগা কী ইসারা করলো তোর সঙ্গে?

—কী আবার?—এইটুকু শুধু বলতে পারলো পূরবী।

—ওই যে চোখ ঠারাঠারি, হাসাহাসি, মানে বুঝিনা বটে? হবে না—যেমন ধিঙ্গি মেয়ে পুষে রাখা ঘরে! বাইরের বেটাছেলের সঙ্গে হাসি গপ্‌পো, বই পড়া—কত আদিখ্যেতা। এইবার বুঝুক বৌ, মেয়েকে আস্কারা দেওয়ার ফল। এখুনি হয়েছে কি, কেলেঙ্কারির আরো কত বাকী আছে—

বলে দুমদুম্ শব্দে পিসিমা নীচে নেমে যান।

বোধ হয় 'আরো যা কিছু বাকী আছে'—তারই বিশদ আলোচনা করতে।

স্তব্ধ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে পূরবী।

ওর জীবনের সমস্ত শোভা সমস্ত সৌন্দর্য্যের যে এমন কদর্থ হ'তে পারে একি কল্পনা করেছিল কোনোদিন?

মুকুল ওকে পরিহাস করে বলে—'হেলেনা' 'জুলিয়েট' 'বিরহিনী শকুন্তলা,' 'প্রাসাদ শিখরিণী', 'বাতায়নবর্ত্তিনী' এমনি কত কিছু।

সংসারের অভিধানে তার বিশেষণ এই?

নীচে যখন নামলো—সে শুধু না নেমে উপায় নেই বলেই। কিন্তু উদ্যত বজ্রের মত সমস্ত সংসার ওর মাথার উপর নেমে এল!

আড়ালে আবডালে চাপা তিরস্কার।

মা বললেন—গলায় দড়ি দিতে পারলি না সর্ব্বনাশী?

বাবা বললেন—আধুনিক শিক্ষার কুফল এসব।

দাদা বললেন—খবরদার বৈঠকখানার দিকে যাবিনা—সেই রাস্কেলটাকেও দিয়েছি আচ্ছা করে 'কড়্‌কে'।

বৌদি টেনে টেনে বলে—কি জানি ভাই ঠাকুরঝি, তোমার লজ্জা করে না? আমি তো তোমার দাদা ছাড়া আর কারুর দিকে তাকাতেই পারি নে। সিনেমায় সেদিন একটা ছোঁড়া খালি খালি 'হাঁ' করে তাকাচ্ছিল, দেখে এমন লজ্জা করছিল!

সেজকাকা ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে আজকালকার মেয়েদের এমন ব্যাখ্যানা সুরু করেন যা উচ্চারণ করতে পারে শুধু সেকালের লোকেরাই।

খুড়িরা মুখ টিপে হাসাহাসি করতে থাকে—এ সব কাণ্ড তারা আগেই লক্ষ্য করেছে, শুধু নাকি দোষের ভাগী হ'বার ভয়েই মুখে চাবি লাগিয়ে রেখেছিল।

এতগুলো নিষ্ঠুর দৃষ্টির সামনে কোথায় লুকোবে পূরবী আপনার রক্তাক্ত হৃদয় ?

অপমানিত মুকুল হয়তো আর আসবে না।

এইখানেই মেয়েদের সঙ্গে প্রভেদ পুরুষের। প্রেমের জন্য মেয়েরা সব ছাড়তে পারে—পুরুষ ছাড়তে পারে না ত'ার মর্য্যাদা, তা'র অহঙ্কার।

সাহসেই সঙ্গে প্রেমাস্পদকে গ্রহণ করবে এমন শক্তি নেই। তার বিরুদ্ধে সেই জাতিধর্ম্ম-কুলশীলের সমস্যা।

কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কে করবে ?

সাগর পার থেকে বিদেশী ত্রাণকর্তা এসে ?

শুধু পুরনো বনেদের নিন্দাবাদ করেই শক্তিমান তরুণের কর্ত্তব্য হবে শেষ ? গড়বে না তারা নতুন ইমারৎ ?

অভিভাবকদের দল এইবার বোধ করি ঘুম থেকে ওঠেন।

প্রবল উদ্যম চলে পূরবীর বিয়ের। হৃদয়ক্ষতের উপযুক্ত প্রলেপ সংগ্রহ করে আনার চেষ্টায় ত্রুটি থাকে না আর।

পূরবী ভেবেছিল—

হয়তো শেষ পর্য্যন্ত অলৌকিক কোনো উপায়ে ওকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে মুকুল হয়তো—আকস্মিক কোনো কাণ্ডে মৃত্যু ঘটবে পূরবীর।

হয়তো—অসম্ভব একটা কিছু ঘটবেই তার জীবনে।

কিন্তু কিছুই হ'ল না। যথানিয়মে—বিয়ে হয়ে গেল।

বাড়ীসুদ্ধ সকলে প্রিয় দুহিতার বিচ্ছেদ আশঙ্কায় চোখের জল ফেললে।

পূরবীও চোখের জলে বিদায় নিলে, কিন্তু সে চোখের জল কি মুকুলকে না পাওয়ার বেদনায়, না পরিচিত সংসার থেকে বিদায় নিতে ? কিংবা তার অভাবে প্রত্যেকের কি কি অসুবিধা হবে তাই ভেবে ?

স্বামী, সংসার, সন্তান—কত কিছুর অন্তরালে কোন ফাঁকে ধীরে ধীরে কিশোরী পূরবীর মৃত্যু ঘটে, কে তার হিসেব রাখে ?

পৃথিবীই শুধু চলে আপন নিয়মে।

এখন—শ্রাবণের মেঘমেদুর আকাশের পানে চেয়ে পূরবীর যে অস্বস্তি জেগে ওঠে, সে অকারণ নয়, কোলের ছেলের সর্দ্দিকাসির আশঙ্কায়। শীত শেষের প্রথম এলোমেলো হাওয়া উঠলেই ব্যস্ত হয়ে স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেয়—'টিকা' দেবার ব্যবস্থা করতে।

কিন্তু—হাঁ, সকলের শেষে 'কিন্তু' একটা থেকে যায় বৈকি।

ঘুমভাঙা রাতে হঠাৎ যখন ঘরের বাতাস অসহ্য গুমোট হয়ে আসে, জানলা খুলে পাণ্ডুর চাঁদের হল্‌দে আলো দেখে শিউরে ওঠে পূরবী।

সমস্ত অতীতের পানে চেয়ে একটা চাপা 'হায়' 'হায়' গুমোট বাতাসকে আরো ভারী করে তোলে।

রেলের চাকুরী করি।

সম্প্রতি গ্রেড্ বাড়ার সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাশ পাশ পাইয়া পশ্চিমাঞ্চলটা একটু ঘুরিয়া আসার বাসনা হইয়াছিল। ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়া ভাবিলাম—দেশের বাড়ীটা একবার দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি?

কথাতেও আছে পিতৃপুরুষের ভিটা সকল তীর্থের সার।

সেখানে ঠাকুমা থাকেন, আপন নয়—বাবার দূর সম্পর্কের খুড়ি, কিন্তু ছেলেবেলা হইতে তাঁহাকেই আপন ঠাকুমা বলিয়া জানি। তিনিও আমাদের দেখিলে যেন হাতে চাঁদ পান। যাই হোক একটা শনিবারে বাড়ী রওনা হই।

ষ্টেশনে হরিমোহন কাকার সঙ্গে দেখা, দেখিয়া খুব খুসী—কে শম্ভু! বাড়ী এলে নাকি? এবার অনেক দিন পরে—খবর ভালো তো? উন্নতি হয়েছে? মাইনে বেড়েছে?…বেশ বেশ, শুনে বড় আনন্দ হ'ল বাবা, আচ্ছা চল, সকালে দেখা হবে।

বলিলাম—কাকা, ঠাকুমা ভালো আছেন তো? খোঁজ খবর রাখো তো?

—নিই বই কি। বল কি বাবাজী? আর তাঁর খোঁজ নেওয়ার কথা বলছো—তিনিই সকলের খোঁজ নিয়ে বেড়ান। সমুদয় গ্রামের খবর বামুন খুড়ির কাছে। খুব শক্ত আছেন—এখনো কাঠ কেটে জল তুলে দু'বেলা রেঁধে ভাত দিচ্ছেন। পুষ্যি বেড়েছে কি না আবার।

—কে বাড়লো পুষ্যি?

—সেই এক বিধবা নাতনী এসে জুটেছে, বেহদ্দ বাচাল! ভাইপোর মেয়ে বুঝি, ভাইপোটা সেদিন বসন্ত হয়ে মারা গেলো তো।

—কে? প্রতাপ কাকা মারা গেছেন?

—গেল বৈকি। এখন সেই পাহাড়ে চণ্ডাল মেয়েকে কে সামলায় বলো। আচ্ছা এসো বাবাজী, চলি তাহলে? সঙ্গে দুটো সুমুদ্দুরের কাঁকড়া আছে—ছেলেগুলো খাবো খাবো করে, তাই কলকেতা থেকে বয়ে আনা। দেরী দেখলে তোমার খুড়ি রাগ করে চুলোয় জল ঢেলে দেবে।

মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া যান খুড়ো।

হাসিয়া আপন পথ ধরি।

খুড়ি সম্বন্ধে অত্যুক্তি করেন নাই কাকা। ডেলি প্যাসেঞ্জার মানুষ, একই ট্রেণে প্রতিদিন যাতায়াত করিতেছেন। ঘণ্টা মিনিট সবই খুড়ির মুখস্থ। অঙ্ক কষিয়া যদি ধরা পড়ে ষ্টেশন হইতে আসার পথে অযথা বিলম্ব ঘটিয়াছে—ক্রোধের পরিসীমা থাকে না খুড়ির।

এটা কড়া শাসনের, কি বেশী প্রেমের নমুনা, বলা কঠিন।

কিন্তু বাড়ী আসিয়া মুস্কিলে পড়িলাম। খবর দেওয়া ছিল না, এমনিই আসিয়াছি, অন্য সময় হইলে নির্ভয়ে উঠোনের বেড়ার দরজা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়ি এবং ঠাকুমাকে যে ডাক দিই সেটাও নেহাৎ নিঃশব্দ নয়। কিন্তু কে যে আবার উৎপাত বাধাইতে আসিল।

কিছুক্ষণ ইতস্তত: করিতেছি, সেই 'নাতনীটা' কেমন কে জানে—হঠাৎ চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া নিজেই বাহিরে আসিয়া হাজির।

আমাকে দেখিয়া—আপনারা হয়তো বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, লজ্জা পাওয়া বা বিব্রত হওয়া দূরে থাক্, স্বচ্ছন্দে হাসিয়া উঠিয়া কহিল—ও মা, আপনি আবার কে? বেড়ার শব্দ শুনে ভাবলাম দিদিমার লঙ্কাগাছ মুড়োতে গরু ঢুকেছে বুঝি!

দেখুন কাণ্ড!

কিন্তু এতদুর অপবাদে আমিই বা মুখ বুজিয়া থাকি কেন? কহিলাম—তবু রক্ষে, আমি ভাবলাম ঠাকুমা বাড়ী নেই—ভেতরে কে? চোর বুঝি!

—চোর নয়, তারও তো এখনো প্রমাণ হয় নি। যাক আপনিই বোধ হয় সেই বিখ্যাত শঙ্কু?

কী অদ্ভুত! এ রকম সাংঘাতিক বাচাল মেয়ে তো কখনো দেখি নাই—তাও এই পল্লী অঞ্চলে। তবে কথায় হারি কেন! বলিলাম—বিখ্যাত কিসে?

—উঠতে বসতে 'শঙ্কু' 'শঙ্কু' 'শঙ্কু', এসে অবধি কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

শুনুন স্পর্দ্ধা! আমার নামটা এমনই কর্ণবিদারক?

গম্ভীরভাবে বলিলাম—তার জন্যে আমি দায়ী নই। কিন্তু সরুন, বাড়ী ঢুকতে দিন।

সরিয়া জায়গা দিল বটে—কিন্তু সেও গম্ভীরভাবে কহিল—দিদিমার মানা আছে যাকে তাকে দরজা খুলে দিতে।

এতবড় ধৃষ্টতার কি উত্তর দিব? তবু রাগ চাপিতে না পারিয়া কহিলাম—বাড়ীর মালিককে মানা নেই নিশ্চয়?

—মালিক? ও! বলিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বুঝিলাম হরিমোহন কাকা অত্যুক্তি করেন নাই—সাংঘাতিক বাচাল মেয়েই বটে।

দাওয়ায় বসিয়া রুমাল নাড়িয়া বাতাস খাইতে খাইতে কহিলাম—ঠাকুমাটি গেলেন কোথা?

—কে জানে, হরদমই তো পাড়া বেড়াচ্ছে বুড়ি, বাড়ীতে থাকে ক'মিনিট?

—থাকা সম্ভবও নয় এত বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করে থাকা? বাপ্‌স!

—তার মানে? আমিই বাড়ী ছাড়া করেছি তাঁকে?

ভ্রূকুটি করিবার কায়দাটা বেশ জানে বটে।

কিন্তু আমিই বা মান রাখিব কিসের খাতিরে? তাহার মতো মেয়ের পক্ষে একটা বুড়িকে অতিষ্ঠ করা কিছুই নয়, এই মতই ব্যক্ত করি।

কি বিপদ, এ মেয়ে তো কিছুতেই দমেনা।

কোথা হইতে এক গ্লাস জল ও কলাপাতার টুকরায় করিয়া দু'খানা পাকা পেঁপে, কচিশশার টুকরা এবং নারিকেল লাড়ু আনিয়া সামনে নামাইয়া দিয়া একখানা পাখা লইয়া বেয়াড়া বাতাস দিতে স্বরু করিল।

—এ আবার কি ? হয়েছে হয়েছে রাখুন পাখা।—রীতিমত ব্যস্ত হইয়া উঠি।

—ও কি ! অত অস্থির হচ্ছেন কেন? ভারী তো ছটফটে আপনি ! দেখুন, বাড়ীর মালিকের অভ্যর্থনার ত্রুটি হ'লে দিদিমার কাছে মুখনাড়া খেতে হবে শেষটা। চুপ করে বসে থাকুন।

—অসম্ভব ! বলিয়া পাখাখানা কাড়িয়া লইতে যাইব—এমন সময় ঝাঁপের দরজা ঠেলিয়া ঠাকুমা ঢুকিয়া পড়িলেন।

—ও বাবা আমার শঙ্খধন ! এতদিন মনে পড়লো বুড়িকে ? একটা খবরও দিতে নেই ? এসে কত কষ্ট হ'ল, আমি তো জানি না।

—কষ্ট কিছু হয়নি ঠাকুমা, অভ্যর্থনার ত্রুটিও হয় নি, কিন্তু বোসো তুমি, হাঁফাচ্ছো যে—

—হাঁফাই দাদা, আজকাল আর তেমন বল নেই শরীরে। হরিমোহনের সঙ্গে রাস্তায় দেখা, বললে—বামুনখুড়ি তুমি এখানে ? শঙ্খ বাড়ী এলো যে। শুনে উঠি-পড়ি করে ছুটে আসছি।

—কী আশ্চর্য্য ! আচ্ছা দুরন্ত মেয়ে তো তুমি—বুড়ো হয়ে এখনো ছুটোছুটি রোগ সারল না ? বোসো, বাতাস খাও।

বাতাসের কথায় ঠাকুমার ব্যজনকারিণীর প্রতি দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

—তুই আবার সাত তাড়াতাড়ি পাখা ঠক্‌ঠকাতে এসেছিস কেন ? যা সরে যা—মেয়ের যদি কোন জ্ঞানগম্যি আছে !

আমিই অপ্রতিভ হইয়া পড়ি।

—উনি অতিথিসেবার পুণ্য অর্জ্জন করছিলেন ঠাকুমা। এই দেখ, জল খাবারও এসে গেছে।

—আ আমার কপাল, কী জল খাবারের ছিরি ! মাণিক আমার, সোনা আমার, এতদিন পরে বাড়ী এলো—

—তবে আর কি, তোমার সোনা মাণিকের জন্যে আমি ময়রার দোকানে ছুটি !

বলিয়া পদশব্দে ক্রোধ গোপনের চেষ্টামাত্র না করিয়া পাখা ফেলিয়া চলিয়া যায় মেয়েটা।

ঠাকুমার উপর কিন্তু একটু রাগ হয়। সত্যি, বুড়িগুলোর যেন মায়া মমতা, ভদ্রতা অভদ্রতা জ্ঞান লোপ পায়।

আড়াল পাইতেই প্রতাপকাকার মৃত্যু সংবাদে দুঃখ প্রকাশ করি। কি হইয়াছিল, কবে গেলেন, ইত্যাদি মামুলি প্রশ্ন।

ঠাকুমা কপালে করাঘাত করিতে থাকেন। এই আমার কপাল, আর ওই আবাগীর কপাল। সাধে ওকে দেখলে আমার বিষ ওঠে শঙ্কু? সর্ব্বনেশে অপয়া মেয়ে। পেটে যখন এসেছে তখন ঠাকুমা ঠাকুদ্দা দুইই খেয়েছে, জন্মেই মা খেয়েছে, অষ্টমঙ্গলার ভেতর সোয়ামী খেয়েছে—এখন বাপকে খেয়ে এখানে এসে উঠেছেন, বোধ হয় আমায় খেতে।

তাহাতে দুঃখ করিবার খুব বেশী কারণ না থাকারই কথা, কিন্তু বুড়ো বয়সে প্রাণের মায়া বোধ করি বেশী হয়।

কথায় কথায় দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা ব্যক্ত করি। ঠাট্টা করিয়া বলিলাম—চলো না ঠাকুমা তীর্থ ভ্রমণ করিয়ে আনি!

—হায় কপাল! কোমোর ভেঙে গেল এখন আবার তীর্থ!

কথাটা কিন্তু মিথ্যা। শক্তির অভাব সত্যই এমন কিছু হয় নাই, হরিমোহন কাকা এইমাত্র বলিয়া গেলেন 'কাঠ কেটে জল তুলে সংসার করছেন'।

আসল ব্যাপার—শুচিবাইয়ের জন্য ঠাকুমা বাড়ী হইতে এক পা নড়িতে পারেন না। বেঘোরে পড়িয়া কোথায় কি বিভ্রাট ঘটিয়া যাইবে এই ভয়।

কালই চলিয়া যাইব শুনিয়া আমার আদর যত্ন লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন ঠাকুমা।

দায়ে পড়িয়া মেয়েটাকে পঞ্চাশবার ডাকিতেই হয়। এদিকে খুব কাজের আছে দেখিলাম। নাম শুনিলাম নিরু। সেই চা দিল, জল খাবার তৈরী করিয়া দিল। কুয়ার জল তুলিয়া দিবে, নাছোড়বান্দা।

অগত্যা বলি—মেয়েমানুষের তোলা জলে স্নান করিলে পুরুষ মানুষের কি হয় জানেন?

—কি আবার হয়?

—হাতে পায়ে কুষ্ঠ।

—যাঃ।—বলিয়া ঘড়াটা নামাইয়া রাখিয়া পালায়।

•

কিন্তু ঠাকুমার ব্যবহারটা সত্যই অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। মেয়েটা যে তাঁহার যথার্থই দুই চক্ষের বিষ তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

এক সময় আমায় চুপি চুপি বলেন—তুই তো পশ্চিমে যাবি শঙ্কু, ও ছুঁড়িটাকে নিয়ে যেতে পারিস? মোগলসরাইতে ওর একটা মাসী না কে আছে—সেখানে গছিয়ে দিগে—

—কেন? ও যেতে চায় বুঝি?

—আমার কপাল! যেতে চাইবে! মাসীকে সাতজন্মে চেনেই না। কিন্তু আমি ওই আগুনের খাপরাকে সামলাই কি করে? তাই কি মেয়ের হায়া লজ্জা কিছু আছে?

মায়ের শিক্ষে তো পায় নি, বাপের সঙ্গে বিদেশে ঘুরেছে আর বেয়াড়া তৈরি হয়েছে। আমাদের গাঁয়েঘরে এ মেয়ে নিয়ে নিন্দের পরিসীমা থাকবে না ভাই। এইটুকু উপকার কর আমার। তোদের তো রেল ভাড়া লাগে না। বিধবা বোন বলে বিনি ভাড়ায় নিয়ে যাবি। লক্ষ্মীদাদা আমার, অমত করিসনে।

শুনিয়া ভারী দুঃখ বোধ করিলাম। আহা কোথায় একটা অজানা অচেনা মাসীর বাড়ী ঠেলিয়া পাঠাইয়া দেওয়া—কিন্তু ঠাকুমার নির্ব্বন্ধে রাজী হইতে হইল।

তাহাকে যে কেমন করিয়া রাজী করানো হইল, সে কথা আমার অজ্ঞাত।

ট্রেনে উঠিয়া প্রথমেই মুখঝামটা খাইতে হইল।

—কে আপনাকে আমার ভালো করতে বলেছিল শুনি? মাসীর বাড়ীর চিনি না কাউকে, মানুষে বুঝি থাকতে পারে?

কৌতুকের হাসি হাসিলাম।

—পরিচয় করে নিতে তো এক মিনিটিও লাগে না আপনার!

—সে তো আপনি বলে, সবাইয়ের সঙ্গে বুঝি পারা যায়?

আমি কেন বিশেষ হইলাম—সেটা প্রশ্ন করিতে সাহস হয় না, কি জানি কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে।

আশঙ্কা খুব মিথ্যাও নয়। গুছাইয়া বসিয়া স্মিতমুখে একবার সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ীর আরাম আয়েশের প্রশংসা করিয়া সহসা কহিল—আপনি কিন্তু বড্ড মিথ্যাবাদী।

—কারণ? হঠাৎ এ রকম বদনাম?

—দিদিমা বললে রেলের ভাড়া লাগবে না, পাশ পাওয়া যায়, এটী বাজে কথা। রেল কোম্পানি এখন চালাক হয়েছে, যাকে তাকে পাশ দেয় না।

—যাকে তাকে না দিক্—কাউকে কাউকে দেয়।

কাকে—বলুন না।

—ধরুন স্ত্রী।

—ইস্! আপনার তো বিয়েই হয়নি এখনো।

—নাই বা হ'ল, কোম্পানিকে ঠকালে পাপ নেই। বৌয়ের নাম করে একটা পাশ রাখা ভাল, কত সময় উপকার দেয়। এই যে ধরুন আজকে কেমন কাজে লাগলো?

মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া নিরু সশব্দে হাসিয়া ওঠে—বলেন কি, সাংঘাতিক লোক তো আপনি! রেল কোম্পানিকে এত ঠকানো?

—বললাম তো ওতে পাপ নাই।

কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া আবার কথা শুরু করে। বাবা! এত বকিতেও পারে! চলন্ত পথের নানা বিষয় লইয়া প্রশ্নের আর অন্ত নাই। আমার এদিকে ঘুম আসিতেছে। কহিলাম—এবার একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো, সারা রাত বসে থাকলে অসুখ করবে।

—আমার অসুখ করবে? সেগুন কাঠে ঘুণ ধরে না—বুঝলেন মশাই। বরং আপনার হ'তে পারে। এই বেলা কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন।

—সর্ব্বনাশ। কিছু খেতে পারব না আমি এখন।

—তা বললে হয় না, কত কি খাবার করে আনলাম আপনার জন্যে। বলিয়া কৌটাটি খুলিয়া খাবার সাজাইতে আরম্ভ করিল।

খাবারের পরিমাণ দেখিয়া আমি যতই মিনতি করি, নিরুর কানে যেন ঢুকতেই চায় না। আমি যে রাক্ষস নই সেটা আর কোনোক্রমেই বুঝাইতে পারি না।

শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই শেষ করিতে হয়।

—জুলুম করে সমস্ত খাওয়ালে নিরু?

এই প্রথম তাহার নাম ধরিলাম। বোধকরি সেইজন্যই একবার দুই চোখ তুলিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলে—আপনার সঙ্গে যে এখন জুলুম করারই সম্পর্ক, মনে নেই রেল কোম্পানিকে কি বলে ঠকিয়েছেন?

সাংঘাতিক সাহস মেয়েটার। আমারও দুষ্ট বুদ্ধি চাপে, বলি—তা'হলে অবশ্য আমারও কিছু দাবী বেড়েছে, এবার তোমাকে খাওয়াই।

—ধেৎ, পাগল না কি!

—কেন পাগল কিসে?—বলিয়া খাবারের ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিতেই হঠাৎ আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলে—শঙ্কু দা, আপনি কি বোকা। বিধবাকে বুঝি রেলগাড়ীতে রান্না জিনিষ খেতে আছে?

ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া আসিলাম।

বলিতে পারেন—কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তর্ক তুলি নাই কেন? বলুন, কিন্তু আপনারা তো নিরুপমাকে চোখে দেখেন নাই। সেদিকে এক মুহূর্ত্ত তাকাইলেই বুঝিতেন, এখানে তর্ক চলে না।

—শঙ্কুদা রাগ করলেন?

—না।

—তবে যে হাঁড়িমুখ করে রইলেন?

উত্তর দিলাম না, কেমন অবসন্নতা বোধ করিতেছিলাম।

—আমার কপাল! কেউ আমায় দেখতে পারে না।—বলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল নিরু।

কিন্তু কি সান্ত্বনা দিব!

ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হইতে থাকে।

চলন্ত ট্রেনের একটানা শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। স্তব্ধতা ভাঙিয়া হঠাৎ কথা কহিয়া ওঠার সাহস হয় না যেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিতে থাকে, একভাবে বসিয়া থাকি দুইজনে। ঘুমাইবার কথা মনে পড়ে না।

রবিবাবুর "একরাত্রি" মনে পড়িতেছে। নিরু আমার বাল্যসখী নয়, বন্যার স্রোতে ভাসিয়া দুইজনে একজায়গায় আসিয়া দাঁড়াই নাই, তবু সুরবালার সঙ্গে নিরুপমার কোথায় যেন মিল আছে।

অবশেষে রাত্রি ভোর হইল।

ট্রেন মোগলসরাইয়ের কাছাকাছি আসিতে মৃদুস্বরে ডাকিলাম—নিরু, প্রস্তুত হও।

অপ্রস্তুতের মতই চমকাইয়া উঠিল নিরু···কি বলছেন?

—তোমার গন্তব্যস্থল এসে গেল।

—ওঃ! আচ্ছা আপনি আর কতদূর যাবেন শঙ্কুদা?

—দিল্লী আগ্রা বৃন্দাবন হরিদ্বার—লছমনঝোলা—

—কী মজা আপনার! খানিক থামিয়া আবার বলে—আচ্ছা শঙ্কুদা, আমার বুঝি এই পর্য্যন্ত পাশ?

—না, বরাবরই আছে। মিসেসকে তো মাঝপথে ফেলে যাবার কথা নয়।—বলিয়া ঈষৎ হাসি।

এ পরিহাস গায়ে মাখে না নিরু। আসন্ন প্রভাতের রক্তিম আকাশের পানে সুদুর-বিস্তারি দৃষ্টি মেলিয়া অন্যমনাভাবে বলে,—তা' হলে ইচ্ছে করলেই সমস্ত দেশ বেড়িয়ে আসতে পারি আমি?

—তা পারো।

—তবে তাই কেন নিয়ে চলুন না, শঙ্কুদা। দু'টি পায়ে পড়ি আপনার। অনেক দূর দেশে, অনেক তীর্থে···কতো মন্দির—কতো নদী পাহাড়, এ জীবনে আর কি এমন সুযোগ হবে শঙ্কুদা? এই তো সামনেই কাশী, বাবা বিশ্বনাথকে দেখবো—শঙ্কুদা গো, মোগলসরাইতে এখন আর নামছিনা আমি, এই গ্যাঁট হয়ে বসলাম, সেই ফেরবার সময় নামিয়ে দিয়ে যাবেন···আর দেখুন, সঙ্গে একটা মানুষ থাকলে আপনারও তো কত সুবিধে? আমি আপনার রান্না বাসনমাজা সব করে দেব। বলুন—যাচ্ছি তো তাহ'লে?

—সাহস হয় ?

—কেন হবে না, বাঃ। গায়ে গয়নার বালাইও নেই আমার—ভয়টা কি ? এবার নিতান্তই হাসিয়া ফেলিতে হয়।

—লোকে নিন্দে করবে না ?

—লোকে ? ও!

একটা যেন থাবড়া খাইয়া চুপ করিয়া যায় নিরু। অপ্রতিভ আর বোকার মত নীরবে বসিয়া থাকে।

ষ্টেশনে নামিয়া একাওয়ালাকে ঠিকানা বলিয়া দিই, সে খানিক দূর গিয়া একটা জীর্ণ বিবর্ণ ছোট্ট একতলা বাড়ীর সামনে নামাইয়া দিল।

নিরুর মাসীর বাড়ী। বাড়ী না বলিয়া খাঁচা বলিলেও সত্যের অপলাপ হয় না। নিরু নামিয়া পায়ের ধুলা লইল। বাড়ীখানার দিকে একবার ম্লান দৃষ্টি মেলিয়া কহিল—কে জানে—কেমন মাসী, কেমন সব বাড়ীর লোক! হয়তো—এখানেও ঠাঁই হবেনা, এরাও একদিন ঠাকুমার মতো দূর দূর করে বিদেয় করে দেবে, ভেসে ভেসে বেড়াবো আবার একটু আশ্রয়ের জন্যে। বিধবার মত এমন আপদ সংসারে আর নেই, শঙ্কুদা!

পুরুষের চোখে জল ?

হাঁ কখনো কখনো আসে বৈ কি! সূক্ষ্ম স্নায়ু শিরা দিয়াই গঠিত যে, কাঁচের তৈরী তো নয়।

—নিরু মাপ করো।

—মাপ কিসের ? নিরুপমা আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া থাকে।

কিন্তু সত্যই বটে, মাপ কিসের ? মাপ চাহিবার মত অন্যায় করিলাম কখন ? শাস্ত্র, ধর্ম্ম, বিশ্বাস, কিছুতেই আঘাত করি নাই। বিশ্বস্ততার জন্য আবার মাপ চাহিবার কি আছে ?

সেই একাখানা চড়িয়াই ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম।

বিধবা নিরুপমা, তাহার সমস্ত সম্ভ্রম লইয়া সগৌরবে বৈধব্য পালন করিতে থাকুক। ভবিষ্যতে একদিন তাহার এই ছেলেমানুষী, বেহায়াপনা, আর বাচালতা নিঃশেষে ঘুচিয়া যাইবে—এ ভরসা রাখি।

হয়তো গোবর ও গঙ্গাজলের সাহায্যে আপনার শুচিতা রক্ষা করিয়া, স্বেচ্ছায় নিজেই একদিন সমাজ রক্ষার গুরুদায়িত্ব ভার মাথায় তুলিয়া লইয়া হরিনামের মালা হাতে পাড়ায় পাড়ায়—

কিন্তু থাক ও সব কথা।

———

এমন একটা ভবিষ্যযুক্ত দেশ নয় যে স্টেশনে নেমেই চোখে পড়বে আরোহীপ্রার্থী অপেক্ষমান ট্যাক্সির সারি! এতোখানি আশা করেও আসেনি এরা—সোমেন আর সীতা।

তাই বলে এতোটাও আশঙ্কা করেনি যে যানবাহনজাতীয় কিছুই থাকবে না, একখানি চাকারও চিহ্নমাত্র নয়। স্টেশন মাস্টারের খুপরিখানার সামনের এই গজ কয়েক টিনের শেড্‌টার নীচে জিনিষপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে অসহায় দৃষ্টি মেলে অদূরে চোখের সামনে মাঠ আর জঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পেলে না বেচারারা। ট্রেন থেকে যে কয়েকজন লোক নেমেছিল ওদের সঙ্গে, বলা বাহুল্য ওদের মতো সম্ভ্রান্ত চেহারা নয়, তারা কাঁটাতারের বেড়া টপ্‌কে ওই গাছপালার মধ্যে কখন যে অদৃশ্য হয়ে গেল কে জানে। একমেবাদ্বিতীয়ং কুলিটাকেও আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

একটা আস্তানা কি মিলবে এখানে? মেলা সম্ভব?

টাইম্‌টেব্‌ল থেকে একটা অজ্ঞাত অপরিচিত স্টেশনের নাম খুঁজে নিয়ে টিকেট কিনে ট্রেনে চড়ে বসার মতো ছেলেমানুষীর গুরুত্বটা এতোক্ষণে যেন উপলব্ধি হয় সোমেনের। বাড়ী থেকে যখন পালিয়ে এসেছিল—তখন কেবলমাত্র পালিয়ে আসার চিন্তাটাই ছিল মুখ্য, 'অবস্থাটা কি রকম হবে' এ চিন্তা ছিল গৌণ। 'পকেটে টাকা থাকলেই যা'হোক একটা উপায় হয়'—এমনি একটা ধারণা ঝাপ্‌সাভাবে ছড়িয়ে ছিল মনের মধ্যে, ট্রেনে এসেছে বাষ্পের বেগে, তাই চিন্তাটাও তেমন দানা বাঁধতে পায়নি।

'না হয় একটু অসুবিধে হবে, না হয় একটু কষ্ট'—এই তো? কিন্তু কষ্ট আর অসুবিধের ভয়ে কাতর হবার মতো বিলাসিতা এখন কি আর মানায় ওদের?

স্টেশনের চেহারা দেখে কিন্তু ধারণার চেহারাটা বদলাচ্ছে। পকেটের টাকার বাহুল্য ভরসার চাইতে ভয়ই যোগান দিচ্ছে যেন।

—আসা তো গেল, আস্তানা জোটানো সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না—

এক্ষেত্রে সীতাকেই সাহস দেখাতে হয়, তাই সহজ গলায় বলবার চেষ্টা করে—জিগ্যেস করে দেখো না স্টেশন মাস্টারকে, একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না? গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে কিছু উপায় হবেই। নেহাৎ না হয়—গাছতলা তো কেড়ে নেয়নি কেউ?

হাসবার চেষ্টা করে সীতা।

—তাও কেড়ে নিতে পারে! দেশে আর কিছু না থাক্‌ 'থানা-পুলিশ' গোছের কিছু একটা অবশ্যই আছে।

—বাঃ! থানা-পুলিশের কথা উঠছে কেন? আমরা কি চোর না কি?

সোমেন গম্ভীর ভাবে একটু হাসে—নয়, তার প্রমাণ কি? তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, এটা বিশ্বাস করাতে হলেও তো কলকাতার আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে যেতে হবে।

—ও আবার কি কথার ছিরি! তার মানে?

সীতা ভুরু কোঁচকায়।

—তার মানে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি ব্যক্তি অবিশ্বাসের প্রস্তুতি নিয়েই চরে বেড়াচ্ছে। 'কামিনী আর কাঞ্চন' এই দুটো বস্তুর সঙ্গে 'গাছতলায় বাস'টা কি ঠিক খাপ্ খাওয়াতে পারবে কেউ? উঁহু। পুলিশ লেলিয়ে দেবে। দেখছি নেহাৎই ছেলেমানুষী হয়েছে কাজটা।

সীতা তীক্ষ্ণস্বরে বলে—তবে তুমি কি চাও? ফিরতি ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যেতে?

—এখুনি অতোটা নয়, তবে—মনে হচ্ছে বিপদে পড়তে হবে হয় তো।

—বিপদ!

সীতা শান্ত স্থির দৃষ্টিতে সোমেনের দিকে তাকালো—এখনো বিপদের ভয় করো তুমি?

মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হয়ে গেল সোমেন।

ক্ষণপূর্ব্বের অসতর্ক চাপল্য অতর্কিত আঘাতে মাথা হেঁট করলো যেন। এতোক্ষণে যেন খেয়াল হলো কেন পালিয়ে এসেছে এখানে।

কী লজ্জা! কী লজ্জা! রহস্যালাপের অভ্যাসটা এখনো কেন ভুলে যায়নি সোমেন!

স্যুটকেসটার ওপর চুপ করে বসে থাকে দু'জনে।

মনে হচ্ছে এমনি করেই বুঝি বসে থাকবে যুগান্তকাল ধরে। বুকে চাপানো আছে অনন্তকালের পাষাণভার, চোখের দৃষ্টিতে অনন্তকালের নিরুপায় প্রশ্ন—'কোথায় গেল' 'কেন গেল?'

নাঃ, ওদের আর হাসবার অধিকার নেই, অধিকার নেই হালকা রহস্যালাপের। আনন্দের জগত থেকে নির্ব্বাসন হয়েছে ওদের। চিরদিনের প্রাণ-প্রাচুর্য্যে চঞ্চল মুখর স্বভাব, অসতর্ক মুহূর্ত্তের পরেই তাই এমনি চাবুক খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। শ্যামলী নেই, ওরা রইল, এ অপরাধের কি শেষ আছে?

একমাত্র সন্তান শ্যামলী!

সতেরটি বছরের শরৎ-বসন্তে-গড়া ফুটন্ত ফুল! সে ফুল কী অদ্ভুতভাবে ঝলসে শুকিয়ে গেল! পেন্সিলের ছুরিতে হাত কেটে কেউ কখনো মারা যায়? কাউকে মারা যেতে শুনেছে কেউ? কোথায় ছিল এত বিষ, যে বিষ শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়ে নীলে নীল করে দিল তাজা রক্তের স্রোত! স্তব্ধ করে দিল তার গতি!

কিন্তু সীতা কি সত্যি বুঝতে পেরেছে, শ্যামলী মারা গেছে!

এই সমস্ত বই খাতা পেন্সিল কলম পড়ে থাকবে শ্যামলীর, সেই ছুরিটাও থাকবে অবিকৃত, শুধু শ্যামলীরই চিহ্নমাত্র থাকবে না! এই বিরাট পৃথিবীর কোনো একটু কোণেও নয়! আকাশে নয়, মাটিতে নয়, জলে নয়, নিমেষের জন্য একটু ছায়াও পড়বে না কোথাও!

অসংখ্য শাড়ী ব্লাউস আর অজস্র উপকরণে ঠাসা প্রকাণ্ড আলমারীটার দু'খানা কপাটই হাট করে খুলে ধরে সীতা যখন বোকার মতো তাকিয়ে থাকে এক এক সময়, ও কি বুঝতে পারে এগুলো আর কোনোদিন পরবে না শ্যামলী? খুলবে না স্নো আর সেন্টের শিশি?

বোধ হয় বুঝতে পারেনি, তাই সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে অবাক্ করে দিয়ে অমন চুপচাপ ছিল এতোদিন! নাকি তারাই বুঝতে দেয়নি? আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সীতার বুদ্ধিবৃত্তি অনুভূতিকে!

শ্যামলী চলে যাবার ছত্রিশ দিন পরে অজ্ঞাত অপরিচিত এই অদ্ভুত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে, পড়ন্তবেলার চিতা-সাজানো আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এতদিনে কি নিশ্চিত হলো সীতা, শ্যামলী সত্যিই মারা গেছে। কাঁদা উচিত ওর। নিঃশব্দ অশ্রুজল ফেলে নয়, তীব্র আর্ত্তনাদ করে।

চমকে উঠলো সোমেন। সীতার কান্না! চীৎকার করে কাঁদছে সীতা! সে চীৎকার এতো ধারালো, এতো তীব্র!

এই অদ্ভুত আর্ত্তনাদ কোথায় লুকানো ছিল সীতার কণ্ঠের মধ্যে? হঠাৎ কি পাগল হয়ে গেল সীতা? কই, এতোদিন তো এমন করেনি একবারও। ওর এই কান্নার অভাবটাই কি কম পীড়া দিয়েছে হিতৈষী আত্মীয় বন্ধুদের! একমাত্র সন্তান হারিয়ে যে মেয়েমানুষ চুপ করে বসে থাকে, অভ্যাগতদের অভ্যর্থনাও করতে ছাড়ে না, কুশলপ্রশ্ন করে তাদের, শ্যামলীর কথা বাদে আর যতো অবান্তর কথা আছে সংসারে, বেছে বেছে সেই কথাগুলোই কয়—আড়ালে তার সমালোচনায় পঞ্চমুখ হবে না, এমন হৃদয়হীন পাষণ্ড তো আত্মীয়রা নয়!

একটু অস্বস্তি সোমেনেরই কি না হয়েছে? কাঁদাই তো উচিত ছিল সীতার? সেইটাই সঙ্গত। পাঁচজনের মুখ চাপা দেওয়া যায় না।

দুর্ঘটনার রাত্রে—খবর পেয়ে যখন আত্মীয়-আত্মীয়ার দল নিশ্চিন্ত নিদ্রার আরাম তুচ্ছ করে হুড়মুড় করে এসে পড়লেন ওদের বাড়ীতে, আর সীতাকে জাপটে ধরে ওর চোখেমুখে জল, আর মাথায় বাতাস দেবার জন্যে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিলেন, তখন সুকৌশলে তাঁদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শ্যামলীর চুলগুলো নিয়ে আঁচড়াতে বসা সীতার পক্ষে বড্ডো বেশি বেমানান হয়নি কি? মার হাতে ছাড়া কক্ষনো কারোর হাতে চুল বাঁধতে ভালোবাসতো না শ্যামলী, এটা না হয় সীতাই জানে, কিন্তু যাঁরা শ্যামলীকে সাজিয়ে পাঠিয়ে দেবেন বলে স্নো সেন্ট চিরুনি পাউডার হাতে করে বসে রইলেন, তাঁরা তো জানতেন না।

'ধন্যি শক্ত মেয়েমানুষ'—এ মন্তব্য তখন অস্ফুট থেকে স্ফুটতর যদি হয়েই থাকে, দোষ দেওয়া যায় না কাউকে।

যাই হোক—সীতা তার কর্ত্তব্য পালন না করুক্, আর পাঁচজনে তাঁদের কর্ত্তব্য পালন না করে ছাড়বেন কেন ?

তাই—সীতা মূর্চ্ছা না গেলেও তার চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে দিয়ে সচেতন করে ছাড়লেন তাঁরা, অধৈর্য্য না হলেও বুকে জাপটে ধরে—"অধৈর্য্য হয়োনা মা, সোমেনের মুখ চাও, পৃথিবীর নিয়মই এই, অধৈর্য্য হলে চলবে কেন মা, কি করবে ? সবই কর্ম্মফল—" ইত্যাদি ভালো ভালো উপদেশ দিতে শুরু করলেন।

অতঃপর সেই চলেছে ছত্রিশ দিন ধরে।

'কর্ম্মফলের' লীলাকীর্ত্তন !

শ্যামলীর এই অসঙ্গত মৃত্যুটা যে বিধাতার হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা নয়, ভগবানের অন্যায় অবিচার নয়, শয়তানের ক্রুর হিংসা নয়, 'দৈব' নামক কুৎসিত খেয়ালী লোকটার জঘন্যতম খেয়াল নয়, কেবলমাত্র সীতার "কর্ম্মফল" এই কথাটি বুঝিয়ে ছাড়বার জন্যে দিনের পর দিন বেড়াতে আসছেন তাঁরা নিজেদের কাজের ক্ষতি করে। গাঁটের পয়সা খরচা করে গাড়ী ভাড়া দিয়েও আসছেন। ফেরার সময় সোমেনের গাড়ীই পৌঁছে দেবে তাদেরকে। দেবে না-ই বা কোন্ মুখে ? তাঁরা এতোটা ভদ্রতা করেছেন, আর এটুকু পাববে না সোমেন ?

সংসারে যে এতো আত্মীয়, এতো হিতৈষী, এতো সমব্যথী ছিল তাদের, একথা কি কোন দিন জানতো এরা ? সোমেন আর সীতা ? যারা জীবনে কোন দিন ছায়া মাড়ায়নি ওদের, পায়ের ধুলো দেয়নি ওদের বাড়ী, 'বড়লোক' বলে নাক কুঁচকেছে, তারাও ছুটে আসছে মনের গলদ কাটিয়ে। এদের সোনা রূপো আর ঝকঝকে গাড়ী বাড়ীর জৌলুস আজ আর ম্লান করতে পারছে না তাঁদের। এখন আর পিঠে হাত বুলিয়ে দেবার নির্ম্মল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে চান না কেউ।

'আহা !' 'আহা !' সমবেদনায় মুখর হয়ে উঠেছে প্রত্যেকের মুখ।

এতোদিন সুখ সৌভাগ্য আর স্বভাবগর্ব্বে ঠিকরে বেড়াতো সীতা, এইবার আয়ত্তে পাওয়া গেছে তাকে।

"মানুষের সুখ পদ্মপত্রে জল্ বৈ তো নয় !"

"এই তো সবই গেল, আর কি রইল বলো ?—কথায় বলে 'একসন্তান' ! অনেক জন্মের মহাপাপ না থাকলে এমন হয় না ভাই।"

"কি করবে বলো মা, যা করে এসেছো তার ফল ভুগতে হবে তো ?"

"সবই প্রাক্তন। দুনিয়ার নিয়ম এই···আহা !"

প্রত্যেকে এই একই ধরণের কথাগুলো শিখে ফেললো কি করে এইটাই আশ্চর্য্য। কেউ বাদ যায় না, ছোট বড় সবাই ওই বড়ো বড়ো কথা বলে।

শুধুই কি আত্মীয় ? ঘুঁটেওয়ালি, গয়লানী, ও-বাড়ীর রাঁধুনী, পাশের বাড়ীর ঝি, সবাই আসছে সীতার পিঠে হাত বুলোতে। আসছে 'আহা' করতে। শ্যামলী যেন খুলে নিয়ে গিয়েছে ওর আভিজাত্যের বর্ম্মখানা। অবিশ্যি ভাল ভেবেই আসছে তারা। একমাত্র সন্তানহারা জননীকে সান্ত্বনা দিতে আসবে না ? সমাজ, গোষ্ঠি, মনুষ্যত্ব—এ সব শব্দ তবে আছে কেন ?

সীতা যদি ওদের সহানুভূতিতে বিগলিত না হতে পারে, কাঠের পুতুলের মতো বসে থাকে, না হয় তো অভ্যাগতদের চা-জলখাবারের যোগাড় করতে বসে, সে কি তাঁদের দোষ ? সীতার নির্জ্জলা চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁদের চোখের জল শুকিয়ে যেতে বাধ্য হয় অবিশ্যি, তবে বাংলাভাষায় অনেক ভালো ভালো বাক্য আছে, আছে অনেক সদুপদেশ বাণী, তাই রক্ষা।

কাঁদাতে যদি নেহাতই না পারা যায় সীতাকে, সীতার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির বোঝা সম্বন্ধে অবহিত করানো তো যাবে। দেওয়া যাবে তত্ত্বজ্ঞান। এমনিতে সীতা 'আহার নিদ্রা ত্যাগ' করবার সংকল্প করতো কি না ঈশ্বর জানেন, কিন্তু না করে উপায় কি ? ভোর থেকে রাত অবধি কেউ না কেউ তো উপস্থিত আছেনই, সীতাকে 'একটু কিছু' মুখে দেবার জন্যে অনুরোধ উপরোধ করতে।

একফোঁটা সরবৎ নিয়ে কেউ যদি সাধাসাধি করতে থাকে, জানাতে থাকে করুণ মিনতি, 'এটুকু গলায় না ঢাললে শুকিয়ে নির্ঘাত মারা যাবে সীতা' বলে আক্ষেপ করতে থাকে, কোন্ মুখে আর তাদের সামনে ভাত ডাল খাবার বায়না ধরবে সীতা ? কোন্ লজ্জায় বলবে একটু চায়ের অভাবে মাথার যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছে না সে ?

নিদ্রার সময় আছেন জ্যেঠতুতো খুড়শাশুড়ী। দুঃসংবাদের বার্ত্তা পেয়ে যিনি দেশ থেকে ছুটে এসেছেন একটি ক্ষ্যাপাটে ছেলে, দুটি আইবুড়ো মেয়ে, বিধবা বৌ, আর গুটি তিন-চার নাত নাতনী নিয়ে। একেবারে নিকট আত্মীয় বলেই ফেলে যেতে পারছেন না।

সীতাকে কাছে নিয়ে শোবার ভার নিয়েছেন তিনি।

অদ্ভুত অধ্যবসায় ভদ্রমহিলার, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। ঘুমকে এমন কন্ট্রোলে রাখা কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। প্রায় সারারাত ধরে তিনি বোঝাতে থাকেন সীতাকে—ইহলোক, পরলোক, জন্ম-জন্মান্তর, লীলাময়ের লীলা, আর ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার নিগূঢ় তত্ত্ব। সাড়া না পেলেই গায়ে হাত বুলিয়ে করুণকণ্ঠে শুধান—বৌমা, ঘুমিয়ে পড়লে না কি মা ? আমার সেই মামাতো ভাইঝির কথা বলছিলাম, তিনমাসের মধ্যে স্বামী গেল, বাপ গেল, জোয়ান জোয়ান দুই ছেলে গেল, 'ঘরনী গিন্নী' মেয়েটা দুম্ করে বিধবা হলো। এখন আমার ভাইঝি একরকম ভিক্ষে করেই দিন কাটাচ্ছে। অথচ কী সুখ ঐশ্বয্যি ছিল—

এ রকম ভালো ভালো অনেক উদাহরণ আছে তাঁর স্টকে। সুবিধে পেলেই আমদানি

করেন। গায়ে হাত দেবার পরও যদি সাড়া না মেলে, ঠেলা দিলেও ঘুম না ভাঙে, নিতান্তই তখন হাই তুলতে হয় তাঁকে।....ঘুমিয়ে পড়েছে! আহা, ঘুমই ওষুধ, সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা! তা বৌমার মনটা খুব ভালো তাই, নইলে আমার কেষ্ট যেতে ছ'মাস চোখে পাতায় এক করতে পারিনি। ঠায় বসে রাত কাটিয়েছি—বলে অবশেষে চোখের পাতায় এক করেন।

এই সস্নেহ আবেষ্টন থেকে মাথা তুলে কী করে—কোন্ লজ্জার মাথা খেয়ে বলবে সীতা, সোমেনের কাছে না শুলে তার ঘুম আসে না। শ্যামলীকে হারিয়েও না। উনিশ বছরের অভ্যাস, এতো বড় আছাড় খেয়েও গুঁড়ো হয়ে যায়নি।

হিসেব করে দেখলো সীতা—শ্যামলী যাবার পর সোমেনের সঙ্গে ওর প্রথম দেখা হয়েছে হাওড়া স্টেশনে। সত্যিকার দেখা।

পালিয়ে যাবার পরিকল্পনাটা যে কি ভাবে কখন করতে পেরেছিল, এলোমেলো ভাবে গুছিয়ে নিয়েছিল স্যুটকেস দুটো, নিজেরই সেটা স্মরণ নেই ভালো করে। শুধু অনবরত মনের মধ্যে ধ্বনি উঠেছে...পালাতে হবে—পালাতে হবে—যেখানে হোক! যে-কোনো চুলোয়! একটি বার সহজ ভাবে হাঁফ্ ছাড়তে পারবে যেখানে। যেখানে একটিবার শুধু পাশাপাশি বসতে পারবে দু'জনে। নিবিড় সান্নিধ্যে সোমেনের কোলে একটু মাথা রাখতে পারবে সীতা। তাই কাউকে না জানিয়ে গভীর রাত্রের ট্রেনে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা। জানতে পারলে কেউ দয়া করে সঙ্গ নিতে চাইবে কি না কে বলতে পারে।

স্টেশনে এসে হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠেছিল সীতা। অস্বাভাবিক ভাবেই হেসে উঠে বলেছিল—খুব ঠকিয়ে আসা হলো সবাইকে, কি বলো ?

—ঠকিয়ে ?—অবাক্ হয়েছিল সোমেন।

—তা নয় তো কি ? সকাল বেলা এসে সকলে দেখবে পাখী পলাতক, কী মজা।

- খুড়িমাকে সুদ্ধু না জানিয়ে আসাটা—কেমন হলো কে জানে ?

সোমেন বলেছিল একথা। এতোটা এ্যাড্ভেঞ্চার বোধহয় তার ঠিক ধাতস্থ হচ্ছিল না।

—যা হলো, তা হলো। উঃ বাবা, বাঁচা গেছে ! 'কর্ম্মফলের' হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেলো তো তবু !

ট্রেনে চড়েও সারা পথ নানান ছেলেমানুষী করলো সীতা, ডালমুট কিনে খেলো কোন একটা স্টেশনে, খেলো মাটির ভাঁড়ের অখাদ্য চা।

সোমেন কি ক্ষুব্ধ হয়েছিল তাতে ?

না।

ক্ষতির পরিমাণ যতোই প্রবল হোক্, যতো তীব্র হোক্ বেদনা, পুরুষ চায় তাকে চাপা দিতে, চায় বিস্মৃত হ'তে। বরং ক্ষতিকে সহ্য করে নিতে পারে, সহ্য করতে পারে না শোককে। আর পুরুষের কাছে ভারাক্রান্ত নারী-হৃদয়ের চাইতে ভয়াবহ বস্তু আর কি আছে? তাই ভেবেছিল বোধ হয় সামলাতে পেরেছে সীতা। ভাবতে পারেনি আচমকা এমনি বুকফাটা আর্ত্তনাদে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। হারিয়ে ফেলবে নিজেকে।

থামাবার চেষ্টা বৃথা হলো। আরো বেড়ে যাচ্ছে তাতে, উথলে উঠছে উত্তাল সমুদ্র। ছত্রিশ দিন পরে সত্যি করে অনুভব করলো সোমেন, শ্যামলী মারা গেছে।

কিন্তু—এ কী!···কোথায় ছিল এতো লোক!

এই জনবিরল প্রান্তরের মাঝখানে মুহূর্ত্তের মধ্যে কি করে জমে উঠলো জনতা? মাটি ফুঁড়ে উঠলো না কি? কুলিকামিন, ঝাড়ুদার, স্টেশন মাস্টার, ফায়ারম্যান, সিগ্‌ন্যালার—কে নয়?

আশ্চর্য্য!

কিন্তু এতোগুলো কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে কি করে বরদাস্ত করবে সোমেন নিজের কোলের উপর সীতার এলোচুল ছড়ানো মাথাটাকে। কি করবে নিষ্ঠুরের মতো ঠেলে তুলে তাকে বসিয়ে না দিয়ে।

স্টেশনমাস্টার লোকটি বয়স্থ। দায়িত্বটাও তাঁরই বেশি। কাজেই সোমেনকে ডেকে প্রশ্ন না করে ছাড়েন না তিনি। সোমেন প্রশ্নের উত্তরে হতাশ প্রশ্নই করে—নেহাৎই শুনতে চান কারণটা?

—দেখুন, আমার তো একটা ডিউটি আছে! কিছু যদি মনে না করেন······আপনার স্ত্রী বোধ হয়? ইয়ে—মাথার একটু দোষ আছে মনে হচ্ছে, ঠিক না?

সোমেনের ইচ্ছা হলো বলে—হ্যাঁ তাই। কিন্তু অসুবিধা তাতে বাড়বে বই কমবে কি? অগত্যা খুলেই বলে কারণটা। বলতে বাধ্য হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতিতে শিউরে গলে পড়েন ভদ্রলোক!

—অ্যাঁ বলেন কি! ঈস্! আর মা লক্ষ্মীকে এই ভাবে—উঃ!···এখানে উঠবেন কোথায়?

—কিছুই স্থির করে আসিনি, হঠাৎ খেয়ালের বশে—

—বিলক্ষণ, তা তো হবেই। বলেন কি, একমাত্র সন্তান? এতে যে পাগল হয়ে যায় মানুষ! তা বেশ চলুন এই গরীবের বাসায়, তারপর একটা ব্যবস্থা আমি করে দেবো। চলুন—চলুন—

সোমেন বিব্রত ভাবে বলে—আবার আপনার বাসায়টাসায় উঠে ব্যস্ত করা!—কাইগুলি যদি তাড়াতাড়িই একটু অন্য কোন ব্যবস্থা—মানে, টাকাকড়ির জন্যে আটকাবে না—

—সে বুঝতে পেরেছি মশাই, চেহারা দেখেই বুঝতে পারা যায়, কিন্তু তা বলে—এই বিদেশে বিভুঁয়ে বাঙালী আপনি, এই দুঃসময়ে অমনি ছেড়ে দিতে পারি? আমরাও তো ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি মশাই। আচ্ছা আমিই গিয়ে বলছি মা লক্ষ্মীকে—

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে যান সীতার দিকে, যেখানে সীতা কান্না থামিয়ে অবাক্ হয়ে শুন্‌ছিল জনৈক ঝাড়ুধারিনী হরিজন মহিলার অপূর্ব্ব বাংলা ভাষা।

—সংসার মে হরদম ওহি তো এক ঘটনা হোচ্ছে দিদি, আসছে—ফিন্ যাচ্ছে। ভাগমানকো কুচ্ছু দোষ না আছে, এতো তুম্‌কো করমফল। ওহি জনম্ মে তুম—

স্টেশনমাস্টার মশাইয়ের আগমনে তার বাক্যস্রোতে বাধা পড়ে।

করুণাবিগলিত কণ্ঠে মাস্টার মশাই বলেন—বুড়োছেলের কথাটি যে রাখতে হবে মা লক্ষ্মী—

সীতা আরো অবাক হয়ে তাকায়—আমাকে বল্‌ছেন?

—হ্যাঁ মা তোমাকেই বলতে এসেছি। শুনলাম সমস্তই। কি আর করবে বলো মা, সবই—

—জানি, সবই আমার কর্ম্মফল—সীতা শান্ত গলায় বলে—ওর হাত এড়াবার জো নেই, তাও বুঝতে পারছি এবার। এখন শুধু দয়া করে বলতে পারেন কলকাতায় ফেরবার নেক্‌স্‌ট্ ট্রেন কখন?

দুই একদিনের ভিতর চার মেয়ের চিঠি আসিয়াছে—বাসুদেবের বিবাহের সংবাদে খুসী হইয়াছে সকলেই। শীতের রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া জয়াবতী ছোটমেয়ে মঞ্জুলীর সন্থ আগত দীর্ঘ পত্রখানি পড়িতেছিলেন।

মঞ্জুলী লিখিয়াছে—"মাগো, এতদিনে তা'হলে দাদার বিয়ে হচ্ছে? শুনে পর্য্যন্ত যে কি আনন্দ হচ্ছে মা, সে বলে বোঝাবার ভাষা নেই। কি করে দাদার সম্মতি আদায় করলে? মেয়ে বুঝি খুব সুন্দরী? পাশটাশ করা না কি? অন্ততঃ ম্যাট্রিকটাও হওয়া দরকার কিন্তু। আমাদের মতন "ক্লাশ সেভেন" মেয়ে দাদার পছন্দ হবে না নিশ্চয়। এই তো আমরা—'মুখ্যু' বলে উঠতে বসতে খোঁটা খাই তোমার জামাইয়ের কাছে। তোমরা আমাদের পাশটাশ করাওনি—সে কি আমাদের দোষ, বলতো মা?"

বৌ গান জানে? বাজনা? দাদার আবার যা গান বাজনার সখ। বৌয়ের নাম কি···লেখনি কেন? যাক্ গে, শিগ্‌গির তো যাচ্ছি, গিয়ে সব জেনে নেব।

বিয়ের বাজার সব হয়ে গেছে না কি? অন্ততঃ শাড়ীগুলো বাপু কিনে ফেলো না, আমরা গেলে পছন্দ করে কেনা হবে। তোমাদের সেকেলে পছন্দে এখনকার মেয়েদের মন ওঠে না। এই তো—এবার পূজোয় অত দাম দিয়ে শান্তিপুরে শাড়ীখানা দিয়েছ—এই বাজারে কুড়ি বাইশ টাকার কম নয় হয়তো—কিন্তু কি বিশ্রী সেকেলে। কেমন বৌ হচ্ছে তা কিন্তু লেখনি····খুব সুন্দর নয় নাকি? দেখ, রং যদি খুব ফরসা হয়, চকোলেট অথবা ডিপ্ গ্রীন রঙের বেনারসী কিনলে ভালো হয়—রং ময়লা হলে, হেলিয়োট্রোপ্ নয় স্কাইব্লু, অথবা ক্রীমকালার—আমরা যাবার আগে যদি বেনারসীখানা কিনে ফেলো তাই বলে দিলাম।

এখানে—আমার ছোট ননদ একটা নতুন প্যাটার্ণের কঙ্কণ গড়িয়েছে—চমৎকার ডিজাইন, যদি বলো নিয়ে যেতে পারি, নাকি কঙ্কণ দেবে বাপের বাড়ী থেকে? যা হয় জানিও।

টয়লেট জিনিষের কি সাংঘাতিক দামই হয়েছে আজকাল—তোমার জামাই বলছিল—"তিনশো টাকার কমে হবে না—নেহাৎ খেলো দিলে তো চলবে না—"

এমনি আবোল তাবোল বকুনিতে পুরা তিনটি পাতা ভরাইয়াছে মঞ্জুলী। দাদার বিবাহের সংবাদে খুসী হইয়াছে বোঝা যায়। চিঠি সে লেখে কমই, কিন্তু যখন লেখে এমনি দুইচার পাতা ভর্ত্তি, কিন্তু বেশীর ভাগই থাকে তাহার 'ক্ষুদে ছেলেটি'র দুর্দ্দান্তপনার অসংখ্য উদাহরণে ভরা। এ চিঠিতে আবার খোকার কথা লিখিতেই ভুল।

মনে মনে হাসিয়া জয়াবতী চিঠিখানা আবার উল্টাইয়া দেখেন যদি কোনোখানটা পড়িতে বাদ গিয়া থাকে। ছেলেটিকে শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া ভারী আনন্দ হয়। কেমন দেখিতে হইয়াছে কে জানে। সেই ফুলের মত সুকুমার শিশুটি না কি 'দস্যি'

'ডাকাত' 'হিটলার' 'কালাপাহাড়' ইত্যাদি আখ্যা পাইয়াছে—সে নাকি সারাদিন কথার খই ফুটাইয়া বেড়ায়। এই দণ্ডেই দেখিবার জন্য প্রাণটা ছটফট করিয়া ওঠে।

প্রসবের পর দুই মাসের ছেলে লইয়া চলিয়া গিয়াছে মঞ্জুলী, সেই ছেলে দুই বৎসরের হইল। এতদিনের মধ্যে একবারও আনিতে পারেন নাই জয়াবতী। পাটনা হইতে মেয়ে আনার খরচ আছে বটে কিন্তু সত্যই এমন কিছু মারাত্মক খরচ নয়—সেবার তো মঞ্জুলী নিজেই লিখিয়াছিল অভিমান করিয়া—'সত্যি কিছু আর বিলেতে শ্বশুর বাড়ী হয়নি মা, যে দু'বছর ধরে পড়ে আছি? এখানে সবাই বলে—"মা বাপ তো নিয়ে যাবার নামও করেনা"—এমন লজ্জা করে।' আনি আনি করিয়া সেই অবধি আনা হয় নাই। শুধুই যে পয়সা খরচ তা'ও নয়—সুবিধা অসুবিধার কথাও ভাবিতে হয় বিস্তর। ইদানীং শরীরটা ভাঙ্গিয়াছে। ঝক্কি ঝঞ্ঝাটের নামে ভয় করে। কিন্তু মেয়েরা অত বুঝিতে প্রস্তুত নয়। তাহারা ত্রুটি পাইলে বলিতে ছাড়ে না। মনে মায়াও হয়, আহা—বেচারা ছেলেমানুষ। মা বাপের জন্য মন কেমন করে বৈকি, আর মা বাপ ছাড়া অভিমান করিবে কাহার কাছে?

যাক্ এতদিনে সব মেয়ে কয়টির মন রাখিতে পারিবেন জয়াবতী।

মঞ্জুলী তো দুই বৎসর—বড়মেয়ে শেফালীকে আট বৎসর দেখেন নাই জয়াবতী। আসামের ওদিকে জামাইয়ের কাজ, ছুটি কম, আসা যাওয়ায় পোষায় না। তাছাড়া ঈশ্বর কৃপায় সন্তান সংখ্যা তাহার দুই গণ্ডার উপর ছাপাইয়াছে, আনিবার নামে হৃৎকম্প হয়।

দীপালী থাকে যশোরে। তাহার বিবাহটাই তেমন ভালো হয় নাই, নেহাৎ পাড়াগাঁয়, মোটা ভাত কাপড়ে দিন কাটে বেচারার। অথচ মেয়েদের মধ্যে দীপুই তাঁহার সব চাইতে সুন্দরী। রূপগুণ কিছু নয়, আসল কথা আপন আপন ভাগ্য!

রূপালীর বরের রেলের চাকুরী, বদলীর কাজ, কাছে পিঠে থাকিলে নিজে হইতেই আসে মাঝে মাঝে, আনিতে হয় না। কাঁচড়াপাড়ায় থাকিতে যখন তখন আসিয়া হাজির হইত। খাইয়া বেড়াইয়া সিনেমা থিয়েটার দেখিয়া, দুই একবেলার পরই চলিয়া যাইত।

আনন্দ হয়—তবু তাই কি কম ঝঞ্ঝাট? জামাই মেয়ে, চারটি নাতিনাতনী সুদ্ধ বিনা নোটিশে আসিয়া পড়িলে কি যে মুস্কিল! দুইমাস থাকিলে সংসারের সোজা ব্যবস্থার ভিতর রাখা যায়—দুই দিন থাকিলে তাহাদের 'যত্ন আত্যি' বেশী করিতে হয় বৈকি। জামাই সঙ্গে থাকিলে আরোই হয়।

তাহার উপর আবার যেখানেই যাক্, কোলের ছেলেমেয়েগুলি মায়ের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া যাওয়া। শত কাজের ভিতর সেই দুরন্ত কাঁদুনে নাতিনাতনী সাম্‌লানো। এক এক সময় রাগও হইত সত্যি। এখন মন কেমন করে।

কাঁচড়াপাড়া হইতে বদলী হইবার পর কাটিহার, সৈদপুর—সাড়ে চার বছর আর এদিকে আসে নাই রূপালী।

এবারে ছেলের বিবাহের উপলক্ষে জেদ ধরিয়াছেন জয়াবতী, বাহিরের কুটুম্ব জড় করা হোক না হোক, মেয়ে জামাই নাতি নাতনী সবগুলিকে একত্র করিবেনই। নিজের সুখ সুবিধাই কি সব? তাহাদের মুখও চাহিতে হয় না কি?

দেবেন্দ্রনাথ আপত্তি করিয়াছিলেন বিস্তর, বলেন—"তোমার এই শরীর খারাপ, 'ম্যাও' ধরে কে? আনবো বললেই হয় না—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এক একটির পিছনে একটি করে রেজিমেণ্ট। তারপর সেই জামাই ব্যাটাদের নবাবি কত—এনে তখন পস্তাবে।"

জয়াবতী ক্রোধে বিরক্তিতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, স্বামীর এই নির্মায়িক উক্তিতেই যেন জেদটা চাপিয়াছে বেশী।···বেশ, তিনি নিজেই সকল ঝঞ্ঝাট বহিবেন—দেবেন্দ্রনাথের গায়ে আঁচ লাগিতে দিবেন না। সত্যই কি বিবাহ হইয়া গিয়াছে বলিয়া এতই পর হইয়া গিয়াছে মেয়েরা যে পিতৃস্নেহ সুদ্ধ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? বাসুর বিবাহে শেফালী, দীপালী, রূপু, মঞ্জু আসিবে না? বিবাহ উৎসব করিবে কে? পরে মেয়েদের মুখ দেখাইবেন কোন লজ্জায়? আর কি কখনও এ ভিটা মাড়াইতে আসিবে তাহারা?

জয়াবতীর ইচ্ছা ছিল মূল্যবান ছেলে বাসুর বিবাহে মোটা কিছু পণ আদায় করিবেন—ইচ্ছামত হাত মেলিয়া খরচ করিতে না বাধে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের এক গোঁ—'ছেলে বেচিতে পারিবেন না।'

ছেলে সুদ্ধ বলে—'বিবাহের খরচের জন্য যাহাদের অপরের কাছে হাত পাতিতে হয়, বিবাহ করার অধিকার তাহাদের নাই।'

এত সব বড় বড় কথা জয়াবতী বুঝিতে অক্ষম। কেন—তাঁহার মেয়েদের বিবাহে কি কেউ দয়া দেখাইয়াছিল? দেবেন্দ্রনাথ নিজেই কি দুই পাঁচ হাজার ধরিয়া দেন নাই? মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা! তবে?

পণ নেওয়াকে এক হিসাবে গৌরবজনক বলিয়াই মনে করেন জয়াবতী, আরে বাপু, ছেলের দাম থাকিলেই দর হয়! 'অখদ্যে' পাত্রের জন্য তো কেহ টাকার তোড়া বাড়াইয়া ধরে না।

কিন্তু এসব জায়গায় জয়াবতীর হাত নাই।

যাক্, সসৈন্য কন্যাগুলির যাতায়াতের খরচাই নাকি পাঁচশো টাকা লাগিবে। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'মেয়ের বিয়েতে ফতুর হয়েছি—ছেলের বিয়েতে বাড়ী বাঁধা দিতে পারব না'! সাধ আহ্লাদ মাথায় থাক্ যেমন তেমন করিয়া কাজ সারা হোক এই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা।

জয়াবতী ভাবেন—সাধ আহ্লাদই যদি না থাকিল তো মানুষে পশুতে প্রভেদটা কোনখানে? গরু গাধারা তো মেয়েছেলের বিবাহে পাঁচজনকে লইয়া উৎসব করিতে

যায় না? লোক-লৌকিকতা কুটুম্ব বন্ধুত্বের সুখ বাঘ ভালুকে অবশ্যই বোঝে না। গহনা কাপড়ের রসাস্বাদন করিবার ক্ষমতা কিছু আর কুকুর বিড়ালের নাই! তবেই না মানুষের সহিত জানোয়ারের প্রভেদ? আহার চেষ্টায় ছুটাছুটি করার মধ্যে পৌরুষ কিছু নাই, সে উহারাও করে। জয়াবতী চান মানুষের মত করিয়া বাঁচিতে—সংসার হইতে পাশ কাটাইয়া ফাঁকি দিয়া চলা নয়—সংসারের মাঝখানে প্রতিষ্ঠার আসন পাতিয়া রাজত্ব করা!

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ চিরকালই তাঁহার মতের প্রতিকূল। দুই বিভিন্ন মনোভাব লইয়া এই দীর্ঘকাল তাঁহারা সংসার করিয়া আসিতেছেন। ঘাত প্রতিঘাত অবশ্য বাহ্যতঃ গড়ায় না—চলিতে থাকে মনে।

জয়াবতীর সাধ মিটাইতে নিতান্তই যাহা করিতে হয়, সে যে দেবেন্দ্রনাথের অনভিপ্রেত ব্যাপার, সেটুকু গোপন করিবার চেষ্টা দেবেন্দ্রনাথ করেন না। অন্যপক্ষে—যে ইচ্ছাকে দমন করেন জয়াবতী, সেটা অভাবগ্রস্ত স্বামীর মুখ চাহিয়া নয়, অভিমানে। তবু আদর সোহাগ, স্নেহ ভালবাসা, পরস্পরের মঙ্গল ইচ্ছার মধ্য দিয়াই জীবনের এই দীর্ঘ পথ কাটিয়া আসিতেছে।

মনের আর মতের মিল দুইটা কি অভিন্ন? সন্দেহ আছে।

কিন্তু এবারে জয়াবতী অভিমান ছাড়িয়া হাল ধরিয়াছেন। ভরসা শুধু ছোটছেলে সত্যদেব। উপার্জ্জন করিতে অবশ্য শেখে নাই—মায়ের হুকুম তামিল করিতে শিখিয়াছে।

লুকাইয়া দশভরির তোলা চুড়িজোড়াটা আটশো টাকায় বিক্রী করিয়া ফেলিয়াছেন জয়াবতী মাস্‌তুতো-বোন সুবর্ণর কাছে। প্রায় নতুনই ছিল, নূতন চাকুরিতে ঢুকিয়া বাসু গড়াইয়া দিয়াছিল কয়েক মাসের মাহিনা জমাইয়া—মঞ্জুর বিবাহের পর। সে আর ক'দিন?

কিন্তু যাক্- তোলা চুড়ির প্রয়োজনই বা কি এত? শাঁখা লোহা অক্ষয় হোক, সেই যথেষ্ট সম্মান লোকসমাজে।

অন্ততঃ ঝোঁকের মাথায় এমনি উদারতার হাওয়া বহিতে থাকে মনে। এ টাকাটা রাখিবেন তিনি গোপনে নিজের হাতে, কাহারও কোন ত্রুটি হইতে দেখিলে খরচ করিবেন।

•

নিমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে অনুরোধ পত্র গিয়াছিল—আজ সকলকে মণিঅর্ডার করিতে গেছে সত্যদেব। তাই নিশ্চিন্ত চিত্তে মেয়েদের চিঠি লইয়া রোদে পিঠ দিয়া বসিয়াছেন জয়াবতী।

একই কথা লিখিয়াছে সকলে।

রূপালী লিখিয়াছে—দাদার বিয়ের ফুল ফুটলো তা'হলে? শুনে ভয়ানক আনন্দ হ'ল। বিশেষ তো যুগযুগান্তরের পরে চারটি বোন এক হবো বলে। বৌ কেমন? নাম কি? কত বড়? ইত্যাদি।

দীপালী নিজে লেখে নাই, লিখিয়াছেন তাহার শ্বাশুড়ী। লেখাটা বোধ করি একটি সদ্য-শিক্ষার্থী বালকের, কিন্তু ভাষাটা তাঁহার নিজস্ব। তিনি লিখিয়াছেন "পূবের সূয্যি পশ্চিমে উঠেছে"—"বিস্মরণ বাপের স্মরণ হয়েছে"—বৌমাকে তাই বলছি পীরের দরজায় সিন্নী মেনেছিলে না কি, বৌমা?

অবশেষে—বিস্তর প্রতিবন্ধকের ফিরিস্তি দাখিল করিয়া তিনি জানান দিয়াছেন 'এত সত্ত্বেও তিনি বধূমাতাকে পাঠাইতে প্রস্তুত, যেহেতু—তাঁহার মত শ্বাশুড়ী অনেক তপস্যায় মেলে'—ইত্যাদি।

শেফালি লিখিয়াছে—"মা. ঈশ্বর কৃপায় বাসুর সুমতি হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। অনেক দিন আপনাদের দেখি নাই—যাইবার ইচ্ছা যথেষ্ট থাকিল। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সকলেরই প্রায় সর্দ্দিকাসি, ছোট খুকিটা আমাশায় ভুগিতেছে, আপনার জামাতার ব্লাডপ্রেসার বাড়িয়াছে, আমারও ক'দিন বাতের ব্যাথাটা চাগিয়াছে, এসব না কমিলে যে কিরূপে যাইতে পারিব জানি না। যাই হোক্ সতুকে পাঠাইবেন লইয়া যাইতে—জানেনই তো আপনার জামাতার একতিল অবসর নাই।"

শেফালি মাকে বলে "তুমি", চিঠিতে লেখে "আপনি"।

শেষ পর্য্যন্ত আসিবে সকলেই এটা নিশ্চিত, কারণ যাহারা প্রবাসে থাকে, তাহারা মুখে কলকাতার অজস্র নিন্দা করে—কিন্তু প্রাণ পড়িয়া থাকে কলিকাতায়। সুযোগ পাইলে সাধ্যপক্ষে আসিতে ছাড়িবে না।

সামনের দিনগুলা ঠেলিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয় জয়াবতীর, কবে সেই উৎসব আনন্দমুখর দিনগুলি আসিবে—জয়াবতীর আজীবনের সাধ পূর্ণ হইবে। মেয়েদের বিবাহে সকল সাধ ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া শুধু কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন, ছেলের বিবাহ দিবেন নিজের স্বাধীনতায়—সৌষ্ঠব সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়া।

কিন্তু বসিয়া বসিয়া দিবাস্বপ্ন দেখিলে চলিবে না—আছে অজস্র কাজ, বড়ি দেওয়া, সুপারি কাটা হইতে সুরু করিয়া—জানা অজানা কত কাজের ফিরিস্তি মনের ভিতর আসিয়া জমা হয়। চিঠি মুড়িয়া উঠিয়া পড়েন।

প্রথম সাধেই কিন্তু বাগড়া দিল বাসুদেব নিজে। বলিল—সানাই বসাবে? আরো কিছু নয়! বুড়োবয়সে তোমাদের কথায় পড়ে গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছি বলে যা তা করবে না কি? সানাই বাজিও সতুর বিয়েতে, যত খুসি। এখন ও সব মতলব ছাড়ো।

পাশেই যে বড় বাড়ীটা ভাড়া লওয়া হইয়াছে তাহার গেটের উপর মঞ্চ বাঁধিয়া নহবৎখানা বসাইবার ব্যবস্থা করাইতেছিলেন জয়াবতী।

আশ্চর্য্য! ছেলের বিবাহে ছেলেই যেন কর্ত্তা! এখনকার ছেলেদের লজ্জা কি কিছুতেই

নাই ? বাপের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কেবলই 'আইটেম' ছাঁটিয়া ছাঁটিয়া ব্যয়ের মাত্রা কমাইতে চায় যেন আর কার বিবাহ।

কিন্তু বৌয়ের শাড়ী জামা সাবান পাউডারগুলির উপর তো বেশ চাপান পড়িল! হিসাবের অনেক উপরে উঠিয়াছে সেগুলি।

গৃহিনীর বিবাহিতা বোনঝি ভাইঝিগুলির নাম কাটা গিয়াছে নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ হইতে, কিন্তু কর্ত্তার অফিসের বন্ধু বান্ধবের সংখ্যাই না কি বত্রিশ জন। সাহেবসুবোও আছেন, খরচ কি তাঁদের জন্য নাই ?

আর বাসুদেবের বন্ধুর সংখ্যা ? সে আর উল্লেখ করিয়া কাজ নাই। মাত্র আটষট্টিখানা নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইয়াছে বাসু নিজের নামে—সৌখীন কার্ডে, কায়দার ভাষায়।

সাধ কাহারও কম নাই, ব্যয় সংক্ষেপ কেবল জয়াবতীর বেলায়! ছোট ছেলে সতুর সঙ্গে জয়াবতী এই লইয়া হাসাহাসি করেন—মনের চাপা উষ্মাগুলিও প্রকাশ করিয়া বাঁচেন।

এমনি কথা কাটাকাটি, তর্কাতর্কি, মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়া আকাঙ্ক্ষিত দিনটি আসিয়া পড়িল। আসিয়া পড়িল—রূপালী শেফালী দীপালী মঞ্জুলী ও তাহাদের রেজিমেণ্টের দল।

আনন্দে দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছেন জয়াবতী, কা'কে ছাড়িয়া কা'কে দেখিবেন ?

শেফালীর যে মেয়েকে ফ্রক-পরা দেখিয়াছিলেন সে এখন মায়ের মাথা ছাড়াইয়াছে! মেজটিও কম যায় না। শেষের দিকে তিন চারটিকে তো তিনি জন্মাতেই দেখেন নাই!

দীপালী বড় মেয়েটিকে রাখিয়া আসিয়াছে। তাহার শাশুড়ীর বিশ্বাস—'মেয়ে বড় হইয়াছে, এখন যেখানে সেখানে পাঠানো ভালো নয়'।

জয়াবতী ব্যথিতভাবে বলেন—হ্যাঁরে এটা কি 'যেখান সেখান' হ'ল ? মামার বাড়ী তো তার, না কি ?

দীপালী লজ্জিত ভাবে বলে—কি জানি বাপু, ওইসব কথা বললেন—তা ছাড়া পাঁচজন আসবে গয়না কাপড়ও তেমন নেই—তাই আর আনলাম না।

জয়াবতী চাহিয়া দেখিলেন, নিজের মেয়ের অঙ্গেও গহনা কাপড়ের বালাই অল্পই আছে। পূজায় যে শান্তিপুরে শাড়ীখানি তিনিই দিয়াছেন সেইটুকুই বোধ করি সম্প্রতি সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছে। ব্রোঞ্জের উপর পাতমোড়া গাছ কয়েক চুড়ি হাতে, তা' ছাড়া কোনোখানে সোনার চিহ্ন মাত্র নাই।

তাহারই উল্লেখ করিয়া এক সময় চুপি চুপি বলিলেন—কি হ'ল যে সব ? দেড় হাজার দু'হাজারের গয়না তো ছিল তোর ?

—সংসারে টানাটানি—তা' ছাড়া ছোট ননদটিকে পার করতে এবারে সব গেছে।—বিপন্নভাবে উত্তর দেয় দিপালী।

—চমৎকার! জয়াবতী বিরক্তি গোপন করিতে পারেন না—ননদটি তো পার হলেন··· বলি, তোমার নিজের মেয়ের বেলায়? সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে ননদের হিল্লে হ'ল, আর তখন? তখন কে দেখবে?

—সে ওদের মেয়ে, ওরা বুঝবে, আমি কি করবো বল?

জয়াবতী চুপ করিয়া যান। কিন্তু চুপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, নিজের গলার হার, হাতের বালা খুলিয়া মেয়েকে পরাইয়া দেন। বাক্স হইতে দুই এক খানা চওড়া পাড়ের শাড়ীও বাহির করিয়া দিতে হয়।

শীর্ণ পাকৃসিটে চেহারা হইয়া গিয়াছে দীপালীর, যেন কত কালের বুড়ী। কপালের চুলগুলা উঠিয়া প্রকাণ্ড টাক, তাহার উপর সিঁদুর লেপিযাছে মা ষষ্ঠীর মতো। অত ফ্যাসান ট্যাসান কোথায় গেল দীপালীর? ট্রেনের কাপড় ছাড়িয়া খালি গায়ে একখানা তসর শাড়ী পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

রূপালীই যা বদলায় নাই একফোঁটা, আসিবামাত্রই ছেলেমেয়েগুলি ছাড়িয়া দিয়া গল্পে মস্‌গুল। তাহারা কাঁদুক্ চেঁচাক্, স্নান করুক্ আহার করুক্, সব বুঝিবে মা।

মঞ্জুলী আবার ছেলে লইয়া এমন ব্যস্ত যে কথা কহিতে অবসর নাই, তবু সঙ্গে আনিয়াছে ছেলের বালক-বাহনটিকে।

শেফালী মাকে প্রণাম করিয়াই চীৎকার সুরু করিয়াছে। আস্তে কথা কহিতে পারেই না সে।···

"অ সতু, ট্রাঙ্ক সুটকেশ্‌গুলো একেবারে মুটেকে দিয়ে দোতলায় তুলিয়ে দিতে পারলি না? কি বোকা ছেলে রে।···এই নীলিমা, বসলি যে বড়? ছোট খোকার পোষাক-টোষাকগুলো বদ্‌লে দে? খবরদার খালি গায়ে রাখবি না, ফট্ করে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।····প্রতিমা, গল্পে জমে যাচ্ছিস? যা শিগগির রেলের কাপড়চোপড় ছেড়ে সাবান মেখে আয়, চেহারা যা হয়েছে!···মা, খুব খানিকটা গরম জল চাই, সবাই স্নান করবে।···এই মণ্টু বিণ্টু, এসেই লাট্টু ঘোরাচ্ছিস? তোদের নিয়ে কি করবো রে! পকেটে করে লাট্টু এনেছিস! বদ্ধ পাগল না কি? তা' যা—দাদুর টাকের উপর ঘোরাগে যা লাট্টু। 'ন্যাণ্ডো' 'গুণ্ডা' কোথায় গেল? নিশ্চয় বাইরে আছে।·· অ-কালীচরণ, যা বাবা, দেখগে কোথায় বেরিয়ে গেল—উর্মি, রমি, অশোকাই বা কোথায় গেল রে? ছাতে? এসেই ছাতে গেছে? ওমা কী ঘেন্নার কথা গো, মাথা খুঁড়ে মরবো না কি? ন্যাড়া ছাত যে···অ বাবা কালীচরণ—"

কালীচরণই তাহার অগতির গতি, পারের কাণ্ডারী। দীর্ঘকালের পুরনো চাকর, শেফালীর বিবাহ দিয়া নিয়া গিয়াছে সে।

ঘূর্ণিবাত্যায় পড়িয়া হাঁপাইয়া উঠিয়া জয়াবতী নিজেই গরম জল বসাইতে যান।

খানিক পরে মঞ্জু আসিয়া বিস্ফারিত চক্ষে বলে—মা, বাইরের ঘরে নাকি কেউ যায়নি? তোমার জামাইরা হাত মুখ ধোবার জল পায়নি, এক ফোঁটা চা পায়নি—একলা বসে আছে, ছি ছি কী কাণ্ড!

চা পাননি? মুখ ধুতে পাননি? সে কি কথা?—বিন্দাবন কোথা গেল? আর সতু? উনিই বা কই?—উদ্বিগ্ন ভাবে জয়াবতী বলেন।

—বৃন্দাবনকে নিয়ে তো ছোড়দা বাজারে বেরোলো, বাবা ওপরে শুয়ে আছেন, বললেন মাথা ধরেছে।

—এই কি মাথা ধরিয়ে পড়ে থাকবার সময়?

সমস্ত ক্রোধটা স্বামীর উপর ঝাড়িতে চান জয়াবতী। ছেলের বিবাহের উপলক্ষে এক সপ্তাহ ছুটি লওয়াইতে কি কম সাধ্য সাধনা করিতে হইয়াছে? কেবল বলেন—'আমি আর কি করবো? দিন তিনেক নিলেই ঢের।' কেন রে বাপু, জামাইদের আদর আপ্যায়ন করিলেও তো উপকার ছিল!

—যা মা যা, তোরাই দেখাশোনা করে নে। কে বা কি করে? বাস্থর বিয়ে বিয়ে করে ক্ষেপেছি কি সাধে? একটা বৌ এলে তবু···বাইরের উঠোনে বড় বড় হু'টো ড্রাম ভরিয়ে রেখেছি, সাবান তোয়ালে মাজনটাজন সব আছে, সে দিকে—

—সে সবের জন্যে ভাবতে হবে না, সে সঙ্গেই আছে। তোমাদের সেই পেটেণ্ট 'নিমের মাজন' অরে 'টার্কিশবাথ', ওরা ব্যাভার করলে তো? বলিয়া চলিয়া যায় মঞ্জু।

সেই মঞ্জু! যে একখানা ডুরেশাড়ী কিনিয়া দিলে সাতবার মায়ের গলা ধরিয়া আদর করিত।

তাড়াতাড়ি চা জলখাবারের ব্যবস্থা করিতে বসেন জয়াবতী। অনুষ্ঠানের তো ক্রটি রাখেন নাই—বামুনই আছে তিনটা। রান্নার দিকে দুইজন, চা জলখাবারের জন্য একজন। তবু দেখাইবার লোকের অভাবে ক্রটি হইয়া যায়।

কিন্তু মেয়েরা তো কুটুম্ব নয়, দেখিয়া শুনিয়া আপনার স্বামী পুত্রের যত্নগুলো করুক না।

দীপালী ওরই মধ্যে গেরস্থালি, তা' ছাড়া তাহার কোলের ছেলে তেমন শিশু নয়, তাই তাহাকে খোঁজ করেন জয়াবতী কাজের সাহায্যের জন্য। ইরা, তোর মাকে ডেকে দে তো—

—মা? মা আহ্নিক করছে—

—আহ্নিক করছে! সে আবার কবে ধরলো?

—অনেক দিন—জানো দিদিমা, তিন ঘণ্টা চার ঘণ্টা পূজো করে মা—কেমন স্তব করে—মার মন্তর হয়েছে কি না।

জয়াবতী অবাক্ হইয়া যান, দীক্ষা লইয়াছে দীপু? তাঁহার যে এখনও হয় নাই।

ইতিমধ্যে সেজ জামাই অসীম আসিয়া হাজির। স্নান সারা হইয়াছে, ধোপদস্ত সদ্য পাটভাঙা সাদা পায়জামার উপর হাফসার্ট ও সোয়েটার চাপাইয়া চটি ফট্ ফট্ করিতে করিতে সোজাসুজি অন্দরে আসিয়াছে। হাসিয়া বলে—মা, আমরা রাগ করে চলে যাচ্ছি।

সদাহাস্যময় এই ছেলেটিই জয়াবতীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। পরের ছেলে বলিয়া সমীহ করিতে হয় না উহার স্বভাবের গুণে। তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন—কেন বাবা, রাগ কিসের?

—বা রে, বিয়ে বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে এলাম, আমরা চা-ও পাচ্ছি না যে! কই মেঠাই মণ্ডা কোথায়? কি আছে বার করুন, ভীষণ খিদে পাচ্ছে।

জয়াবতী ব্যস্তভাবে ঠাকুরের সাহায্যে রাশীকৃত খাবার ও চা আনিয়া হাজির করেন।

—কই শ্যালারা কোথায় গেলো? একলা খাবো না কি? মা, বাসুদা বুঝি বিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়েছে?

—পালায়নি—ঢোক গিলিয়া জয়াবতী ছেলের দোষ সামলাইয়া বলেন—"ও বাড়ী"তে রয়েছে—বললে 'বাড়ীটা আগলানো দরকার তো—দিনকাল ভাল নয়'—আসবে, নিয়মকর্ম্মের সময় আসবে।

—চালাক ছেলে! তোফা আয়েশ করে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—জানে, নিশ্চিন্দির ঘুম এই তো শেষ—বলিয়া হা হা শব্দে হাসিয়া ওঠে অসীম।

রূপালী কাছেই ছিল—কারণ বরের কাছ হইতে খুব বেশী তফাতে তাহাকে কদাচিৎ দেখা যায়। ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলে—যা মুখে আসে বললেই হ'ল, মা রয়েছেন না?

—রয়েছেন মানে? মাকেই তো বলছি।…মা, কিছু অন্যায় বলেছি?

জয়াবতীও হাসিয়া ফেলেন, ইহার সঙ্গে পরিবার জো' নাই।

সকালের পর্ব্ব সারার পর, জয়াবতী সেইমাত্র দাসীদের মাছ কোটার তত্ত্বাবধানে গিয়াছেন, শেফালী কোলের মেয়েটাকে ট্যাঁকে করিয়া আসিয়া শ্লেষকণ্ঠে কহিল—মা তোমার পুণ্যবতী মেজ কন্যেটি 'আঁষ হেঁসেলে' খাবেন না।

—কে? দীপু আঁষ হেঁসেলে খাবে না? ও কি কথার ছিরি?

—ছিরি বিচ্ছিরি তোমরাই জানো। আমি বলতে গেলাম, চ্যাটাং চ্যাটাং করে অনেক কিছু শুনিয়ে দিলে। আমি তো বাবু মরণকাল অবধি এই নরক ঘেঁটে মরবো—বলিয়া 'নরকের' সঙ্গে তুলনীয় কোলের মেয়েটাকে গুছাইয়া কোলে চাপিয়া ধরিয়া কথার উপসংহার করে শেফালী—ওসব ধর্ম্ম পুণ্যির মর্ম্ম বুঝি না।

কিন্তু কাজের বাড়ীতে—একজন আলাদা খাইলে যে কী ঝঞ্ঝাট, সে মর্ম্মই বা কে বুঝিবে জয়াবতী ছাড়া? তা' ছাড়া—সধবা মেয়ে নিরামিষ খাইবে এই বা কেমন অনাসৃষ্টি কথা?

দীপালীকে তিনি ডাকিয়া পাঠান, বিরক্তি গোপনের চেষ্টা না করিয়া বলেন—কি ছিষ্টি-ছাড়া কথা বলছিসরে দীপু? হেঁসেলে খাবিনা নাকি?

—না মা, দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

—কি জানি মা, মন্তর তো সবাই নেয়, এমন কথা তো কখনো শুনিনি। খাবি কি?

—খাওয়ার আবার ভাবনা—খাওয়া আবার একটা জিনিস নাকি? শীর্ণ মুখে উদাস হাসি ফুটাইয়া দীপালী মায়ের চিন্তা দূর করিয়া বলে—একটা তোলা উনুনে দু'টো ভাতে ভাত করে নিলেই হবে।

—দুগ্‌গা দুগ্‌গা—কী অলুক্ষুণে কথা!

আর কথা জোগায় না জয়াবতীর মুখে।

ইহারই মাঝখানে রূপালীর একটা ছেলে সিঁড়ি হইতে গড়াইয়া পড়িয়া কপাল ফাটাইয়াছে। ছেলেকে তুলিয়া 'ফার্ষ্ট এড্'-এর পরিবর্ত্তে বাড়ীসুদ্ধ সকলে এমন গোলমাল বাধাইয়া তুলিল যে, বেচারা ছেলেটা কাঁদিতে ভুলিয়া গেল।

রূপালী তখন বোনঝিদের খোসামোদ করিয়া গান শুনিতে বসিয়াছে—শেফালী তুমুল চীৎকারে তাহাকে সচেতন করিতে থাকে—

—অ রূপি, রাক্ষুসী, গেলি কোথায়? ছেলে পড়ে কপাল ফাটালো, কোন্ চুলোয় নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছিস? ওমা এ সব কি আলবড্ডে কাণ্ড! নীলি। উর্মি! রমি! হারামজাদিরা মুল্লুক ছেড়ে গেল কোথায়?...ডেকে দেনা তোর সেজমাসীকে।

ততক্ষণে জয়াবতী ছেলেকে টানিয়া তুলিয়াছেন।

হাসিটা রূপালীর রোগ, হি হি করিয়া হাসিয়া বলে—ওমা কপালটা ফেটে চৌচির করেছে যে! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, আর দৌরাত্ম্যি করবি শয়তান?...এই দিলু, বাইরে বলগে যা—তুলো ব্যাণ্ডেজ বেঞ্জিন সব নিয়ে বাড়ীর মধ্যে আসতে।

শেফালী গালে হাত দিয়া বলে—অবাক্ করলি! ওই সব এনেছিস না কি সঙ্গে করে?

—আনবো না? গয়না কাপড় না আনলেও বরং চলবে, ও সব না আনলে অচল, এক একটা যে আস্ত শয়তান।—বলিয়া যথেষ্ট কর্ত্তব্য সারা হইয়াছে বোধে রূপালী সরিয়া পড়ে। রক্তটক্ত দেখিলে তাহার গা কেমন করে। রূপালী না দেখিলেও চিকিৎসা অবশ্যই হইবে, এটা জানা কথা। সকলেই যখন আছে।

বাসুদেবকে লইয়া দেবেন্দ্রনাথ বসিয়াছেন নান্দীমুখে, উঠিবার কথা নয়, উঠিবার অনুমতি যখন পাইলেন তখন ছেলে শান্ত হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ প্রথমেই তাহার খোঁজ লইলেন—কোথায় গেল ছেলেটা? খুব বেশী কেটেছে না কি?

জয়াবতী দুঃখিত স্বরে কহিলেন—আহা, বেশী বলে বেশী, কপালের এই এতটা ফেটে গেছে।

—এখুনি হয়েছে কি, আরো কত বাকী আছে—বলিয়া বিদ্রূপ হাস্যে মুখ বাঁকাইয়া বাসুদেব চলিয়া যায়।

জয়াবতী বিবাহের দিন ছেলের উপর রাগ করিবেন না প্রতিজ্ঞায় তাড়াতাড়ি হাসিবার মত মুখে বলেন—ষাট্ ষাট্, কথা শোন ছেলের, বাকী আবার কি রে?

—এই তো কপাল ফাটার সুরু, কত কপাল ফাটবে এখন!

—কি যে বলিস বাবু!

বেজার মুখে উঠিয়া যান জয়াবতী।

বরযাত্রী যাবার সময় পাওয়া গেল না দীপুর বর সুরেনকে। সুরেন নাকি দূর সম্পর্কের এক বোনের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। 'গরীব' বলিয়া তাকে হেনস্থা করা হইয়াছে! শ্বশুর ডাকিয়া কুশল প্রশ্ন পর্য্যন্ত করেন নাই, ভায়রাভায়েরা বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়াছে, শ্যালকরা মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার উপর বাড়ীর ভিতর হইতে দুইটা পান চাহিতে গিয়া—অনেক বাক্যবাণ হজম করিতে হইয়াছে। গরীব বলিয়া যে তাহাদের মান মর্য্যাদা থাকিবে না—এমন কথা আইনে নাই!

দীপালী কপাল কুঁচকাইয়া চলিয়া গিয়াছে পূজার ঘরে। দাদার বরযাত্রার সাজ দেখিবার স্পৃহা তাহার নাই।

জন্ম মৃত্যু বিবাহ, কাহারও জন্য আটক থাকে না, সুরেন তো তুচ্ছ কথা। বর যথাসময়েই বাহির হইয়া যায়। কিন্তু পরে জয়াবতী খোঁজ করেন, কে কি হেনস্থা করিয়াছে তাঁহার জামাতাকে।

শেফালী তাচ্ছীল্যভরে ঠোঁট উল্টাইয়া বলে—এমন কিছু বলা হয়নি যা'তে মানের কানা খসে যায়! নীলি মিনিটে মিনিটে মুঠোমুঠো পান নিয়ে যাচ্ছিল, জিগ্যেস করতে বললে—'মেজ মেসোমশাই চাইছেন—উনি রোজ একশো দু'শো পান খেতে পারেন'। আমার বাবু অসহ্য হ'ল, বলেছি—তা' নইলে আর অমন 'দারিদ্দির দশা'? পেটে ভাত জোটে না—দু'শো পানের খরচ! এতেই একেবারে—

ইরা ফোঁস্ করিয়া বলিয়া উঠিল—আর বললেন না যে মার গয়না বেচে বাবা পান খেয়েছেন?

—বলেছি তো বলেছি, তোর বাবার কানে ধরে তো বলতে যাইনি? তুমিও বাবা কম শয়তান মেয়ে নও, এইটুকু মেয়ের পেটে এত। তখুনি টুক্ করে গিয়ে বাবাকে লাগানো কেন?

—আমার বাবাকে যা ইচ্ছে বলবেন কেন? আপনারা বড়লোক বলেই না?—তেরো বছরের ইরা পাকা গৃহিনীদের মত চোখে অঞ্চল চাপা দেয়।

জয়াবতী কাহাকে ফেলিয়া কাহার মন রাখিবেন?

তবু এক্ষেত্রে শেফালীকেই তিরস্কার করা দরকার, তাই বলিলেন—কেন বাবু বলতে গেলি? জামাইমানুষ, দুদিনের জন্যে কত সাধ্যি সাধনায় আনতে হয়েছে—পান খাক্ চা খাক্, বলবার দরকার কি? এখন বাড়ীর বেটাছেলেরা সব বেরিয়ে গেল, কে তাকে খোঁজ করতে যায়? গিন্নিবান্নি বয়স হ'ল, বুঝে সুঝে কথা কইতে শিখলি না।

শেফালী কিছুমাত্র না দমিয়া সমান অবহেলার সুরে কহিল—আমি বাবা অত বুঝাবুঝির ধার ধারি না—হক্ কথা বলবো, বাপকে করিনা ডর! মান যাদের নেই তারাই অহরহ "গেল গেল মান গেল" ভেবে তটস্থ। এই যে বৌকে দু'গাছা গিণ্টির চুড়ি হাতে দিয়ে রেখে দিয়েছে, শীতকালে ছেলেপুলের গায়ে একটা ভালো গরমজামা নেই, এতে মানের হানি হয় না? আমি বাবা অসহ্য সইতে পারি না, এতে তুমি আমায় যাই বল।

আসল কথা—নিজের বর আসিতে পারে নাই বলিয়া অপর জামাইদের "জামাই আদর" দেখিয়া গা জ্বলিয়া যাইতেছিল শেফালীর।

দীপালী বোধকরি এইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বচসা বাধিতে দেরী হইল না।

দেখা গেল কণ্ঠি পরিতে শিখিয়াছে বলিয়া রসনায় বিষ ছড়াইতে কিছু কম শিখিয়াছে দীপালী এমন নয়।

জয়াবতী থামাইবার চেষ্টায় কাঁদো কাঁদো হইয়া নিজেই থামিয়া গেলেন। রূপালী ব্যাপারটাকে হালকা করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় বার কয়েক—"মরেছে রে—ছেলেবেলার মত ঝগড়া করে মরছে দু'টোতে।...মেজদি, গলার শির ফুলে উঠলো যে, নে তবে শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়া, নইলে ঠিক মানাচ্ছে না।...বড়দি তোমার রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখে খোকা ভয় পাচ্ছে—" ইত্যাদি আবোল তাবোল বকার পর ব্যাপার সিরিয়াস্ দেখিয়া সরিয়া পড়িল।

শুনা যায়—নন্দনকাননের একটি পুষ্পে হাত দিতে গিয়া দেবাসুরের যুদ্ধ বাধিয়াছিল, কাজেই এতবড় কলহের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ "এ বাড়ীতে জল গ্রহণ করিব না"—বলিয়া যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে দীপালী, এমন কিছু অভাবনীয় হয় না সেটা।

অতঃপর—বরকনে আসিবার আগেই সকালবেলা সুরেন দীপালীদের লইয়া যশোরে চলিয়া গেল।

শেফালী বৈকালের ট্রেনে আসাম রওনা হইল—প্রায়-বালক একটি ভাগিনেয়র ভরসায়।

মঞ্জু এতকথা কিছুই জানিত না, তাহার ছেলের গা গরম হইয়াছে—তাই মাথায় জলপটি দিয়া বাতাস দিতেছিল এবং মাথার শিয়রে বসিয়া চোখের জল মুছিতেছিল। ছেলের অসুখ করিলে তাহার পৃথিবীটাই বিষ মনে হয়, তা দাদার বিয়ে—আর বরকনে!

বর পর্য্যন্ত কাছে নাই, "এ বাড়ীর রান্না গলা দিয়ে নামান শক্ত"—বলিয়া সে নাকি হোটেলে গিয়াছে চপ্ কাট্‌লেট খাইতে। এই ফাঁকে ছেলের জ্বর একশো দুই ডিগ্রি উঠিয়া বসিয়া আছে।

কাঁদিতে কাঁদিতে মঞ্জু সুটকেশ গুছাইতে থাকে, গোলমালের বাড়ীতে এই ছেলে লইয়া থাকিলে যে বাঁচানো কঠিন হইবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বিয়েবাড়ীর আমোদ মাথায় থাক তার। ছেলে লইয়া সরিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে।

বাসু বাড়ীর বাহিরে প্যাণ্ডেলের ভিতর বৌ লইয়া গিয়া বসাইয়াছে—আটষট্টি জন বন্ধুর সহিত ইনট্রোডিউস্ করিয়া দিতে। হাজার বাতির তেজে বিদ্যুৎবাতি জ্বলিতেছে, বৌ হাসিয়া হাসিয়া দুই চারিটি কথায় সকলকেই পরিতুষ্ট করিতেছে।

এ দৃশ্যে যে দেবেন্দ্রনাথের অপমান করা হইল কেন কে জানে, তিনি বাহির হইতে চলিয়া আসিয়া অন্দরে আশ্রয় লইলেন।

সারাদিনের রুদ্ধ বেদনার ভারে অবসন্ন-চিত্ত জয়াবতী নির্জ্জনের আশায় তিনতলার এই ছোট ঘরখানিতে বিশ্রাম লইতে আসিয়াছিলেন, দেখিলেন মাদুরে বসিয়া গম্ভীর মুখে সিগারেট টানিতেছেন দেবেন্দ্রনাথ।

স্বামীর কাছে বসিয়া পড়িয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলেন জয়াবতী—মেয়েগুলোর কীর্ত্তি দেখলে?

—আমি ঢের দেখেছি, তুমিই দেখ।

জয়াবতী নিজের মর্ম্মোচ্ছ্বাসেই বলিতে থাকেন—আজকের দিনটা অন্ততঃ থেকে যা—এই কাজের বাড়ী পাঁচশো লোক এসেছে, সকলেই মেয়েদের কথা জিগ্যেস করছে—আমি যে কি জবাব দিই!

—কেন? আরো সাধ করো! 'মেয়ে আনবো—জামাই আনবো—ঘটা করে ছেলের বিয়ে দেব'—বলি পয়সাকে পয়সা জ্ঞান না করে টাকার বৃষ্টি করা হ'ল—অনুষ্ঠানের ত্রুটি তো হয়নি কিছু? মিটেছে তো সাধ? শিক্ষা হয়েছে, না আরো চাই?

জয়াবতী ধীরে ধীরে উঠিয়া যান, তিনতলার সিঁড়ি বাহিয়া চারতলার ছাদে। উঠিতে গিয়া একবার দাঁড়াইয়া যান, সিঁড়ির সামনের ঘরটায়। মেজের ঢালা বিছানায় রূপালীর ছেলেমেয়েরা ঘুমাইতেছে, একখানা বড় লেপের তলায় পাঁচটি 'ঢিবি' পাঁচটি মনুষ্য শাবকের আভাস দিতেছে মাত্র, আর কিছু দেখা যায় না। শীতের রাতে এমনি 'ঢিবি' হইয়া ঘুমাইত, শেফালী, দীপালী, রূপালী, বাসু, সতু, একখানা বড় লেপের তলায়।

নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের পানে সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি মেলিয়া ভাবেন জয়াবতী···কেন এমন হয়!

একটি গাছের পাঁচটি ফলতো বিভিন্ন আস্বাদের হয় না? শুধু মানুষই বা কেন এক গর্ভে আশ্রয় লইয়া, একই মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, এক প্রাণরসে সঞ্জীবিত হইয়া, এমন পরস্পর-বিরোধী মনোবৃত্তি লইয়া গড়িয়া ওঠে?

ছেলেদের মধ্যে একজন চাকরটিকে পর্য্যন্ত উঁচু কথা বলে না, আর অপরজন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপর ছুরি শানাইয়াই আছে। মেয়েরা—কেহ হিন্দুয়ানীর নাম শুনিলে নাক বাঁকায়, কেহ গোবর ও গঙ্গাজলের সাহায্যে সর্ব্বদা শুচিতা বাঁচাইয়া চলিতে চায়, কাহারও গহনার বাক্স খোলা পড়িয়া থাকে, কেহ মাথা-সাবানখানা লইয়া চাবির ভিতর তোলে, কাহারও ছেলেদের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র নাই, কেউ ছেলেটি ছাড়া জগতের আর কিছু দেখিতে পায় না। কাহারও কিছুতেই মন ওঠে না, কেউ সবই 'বাড়াবাড়ি' দেখে।

কী আশ্চর্য্য! শেফালী, দীপালী, রূপালী, মঞ্জু, বাসু, সতু সব—জয়াবতীরই ছেলেমেয়ে! একদিন অন্তরের নিভৃত প্রদেশে ইহাদের আসন ছিল পাতা, মাতৃস্নেহরসে পুষ্ট হইয়া একে একে খেলিতে নামিয়াছিল সংসার হাটে।

আজ উহারা কত দূরে সরিয়া গিয়াছে। রুচি প্রবৃত্তি শিক্ষা দীক্ষা ভাব ভাষা কিছু দেখিয়াই আর নিজের সন্তান বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

'পরিবর্ত্তনশীল জগৎ।'

জয়াবতী এই দার্শনিক তত্ত্বটির দোহাই দিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সহজে সান্ত্বনা আসে না।

দেবেন্দ্রনাথই কি কম বদলাইয়াছেন?

একদিনের কথা মনে পড়ে—শেফালী তখন নিতান্ত শিশু। দোলনায় শোয়া শিশুটিকে—দেবেন্দ্রনাথের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া জয়াবতী প্রবল দোলা দিতে গিয়া আছাড় দিয়াছিলেন। ঠোঁট কাটিয়া রক্তে ভাসিয়া গেল মেয়েটা—কিন্তু মেয়ের আগে মেয়ের মায়ের কান্না সামলাইয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। 'বেশ হইয়াছে' 'শিক্ষা হইয়াছে' বলিয়া তিরস্কার করেন নাই।

এখন সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকেন উচিত কথা শুনাইয়া দিবার জন্য।

কিন্তু জয়াবতী?

হয়তো এমনি পরিবর্ত্তনের ছাপ তাঁহারও লাগিয়াছে, শুধু নিজেকে নিজে চেনা যায় না বলিয়াই সেটা মনে পড়ে না।

সেল্‌সম্যান ছোকরা যেন ধৈর্য্যের পরীক্ষায় জীবনপণ করেছে।

তা নইলে—সতরঞ্চের ওপর ছড়ানো শ' আড়াই শাড়ীর ঘাড়ে আরো খান তিরিশেক শাড়ীর একটা বস্তা এনে নামিয়ে দেয়?

শাড়ীর সেই বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে যে মহিলাটি সাম্রাজ্ঞীর ভঙ্গীতে বসেছিলেন, তিনি নতুন এই আক্রমণে দিশেহারা হয়ে উঠলেন কিনা ঈশ্বর জানেন, বাইরের ভাবটা কিন্তু অটলই রইলো।

মুখের চেহারায় বরাবর একটা নাসিকাকুঞ্চিত ভাব বজায় রেখে চাঁপারকলি আঙুলের ডগা দিয়ে প্রত্যেকখানি শাড়ী পরীক্ষা করে চলেছেন তিনি—বোটানির ছাত্রের অসীম অধ্যবসায় আর সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে।

আশ্চর্য্য! এই দু'শো আশীখানা শাড়ীর মধ্যে একখানাও কি ঠিক পছন্দসই থাকতে নেই? যাদের নির্দ্দেশে এসব মাল তৈরী হয়—মাথাগুলো তা'দের এতো মোটা হয় কেন?

একজোড়া আটপৌরে তাঁতের শাড়ী কিনতে এসে কি পরিশ্রম!

রংটা হৃদয়গ্রাহী হয় তো-পাড়টা বেমানান, পাড়টা চোখে লাগে তো—রংটা অচল! এ দুটোতে যদি বা কোনো গতিকে সামঞ্জস্য বিধান হয়, জমিটা ফেল্ করে স্পর্শসুখ পরীক্ষায়।

এ ছাড়া—আঁচলার কম বেশী, ইঞ্চির তারতম্য, এসব ছোটোখাটো অসুবিধেগুলোও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

ছেলেদের 'কনে' পছন্দ, আর মেয়েদের শাড়ী কেনা, দু'টোই প্রায় এক। তফাৎ শুধু ছেলেরা বাছাই করে জীবনে একবার, মেয়েরা জীবনভোর।

প্রত্যেকখানি একবার করে এবং কয়েকখানি বারবার দেখার পর—নাঃ কোনটাই চললো না দেখছি—বলে ভ্যানিটি ব্যাগটি বাগিয়ে ধরে মহারাণীর ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ান দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী মহিলা।

কিন্তু সেল্‌সম্যান ছোকরা কি মরিয়া হয়ে উঠেছে?

এখনো সে মুখে যে হাসিটি ফুটিয়ে রেখেছে, সে কি নিছক ব্যবসাদারী সৌজন্যের হাসি? না ভেতরের অসহ্য জ্বালাটা ফুটে উঠেছে হিংস্র হাসির মূর্ত্তিতে?

—দয়া করে দাঁড়ান আর একটু—দ্রুত পদক্ষেপে আলমারী থেকে বিশেষ আর একটি বস্তা বার করে এনে ধপাস্ করে সামনে ফেলে দেয় ছোকরা।

মহিলার গমনোন্মুখ গতিকে অগ্রাহ্য করে দড়ির বাঁধন খুলতে খুলতে বলে—এবারে বুঝেছি কি ধরণের জিনিস ইউজ্ করা অভ্যাস আপনাদের। আগের গুলো দেখানোই ভুল হয়েছে আমার। ও শাড়ী আপনাদের জন্যে নয়। এইবার দেখুন দিকি···নয়নমনস্নিগ্ধকর একখানি চমৎকার শাড়ী তুলে ধ'রে ছোকরা কথা শেষ করে—এ যদি পছন্দ না হয়, তা'হলে বুঝবো শাড়ী কেনার ইচ্ছাই নেই আপনার।

আঁতে ঘা দিয়ে কথা!

সত্যিই এ শাড়ীর খুঁৎ খুঁজে বার করা শক্ত! জমির আভিজাত্যে, পাড়ের অভিনবত্বে, রঙের ঔজ্জ্বল্যে, এবং রং পাড় আঁচলা সব কিছুর বিন্যাস কৌশলে অনবদ্য।

কিন্তু একে কি আটপৌরে শাড়ী বলা চলে?

ভদ্রমহিলা উদাসীন গাম্ভীর্য্যের সুরে নিমপাতার আমেজ মিশিয়ে বলেন—থাক্ থাক্, ও আর দেখাতে হবে না, আমি তো আগেই বলেছি রাফ ইউজের জন্যে—

—তা'তে কি! নিয়ে যাননা—ব্যবহার করে দেখুন কি রকম টেঁকসই জিনিস। নিয়ে যান দু'পীস···আরও একটা ডিসেণ্ট রং আছে—বলে বস্তার নীচের দিক থেকে আর একখানা শাড়ী নিয়ে টানাটানি করে জীবনপণকারী ছেলেটা।

—থাক্ না, মিছে কষ্ট করছেন কেন? দামটা শুনি আগে—

—দামটা—অবিশ্যি আপনার কিছু বেশী পড়বে, বত্রিশ থেকে ছত্রিশের মধ্যে। কিন্তু জিনিস তেমনি সরেস পাচ্ছেন।

একমুখ হাসি নিয়ে অবলীলাক্রমে কথাটা উচ্চারণ করে যায় ছোকরা, যেন মারাত্মক কিছুই বলছেনা, যেন আটপৌরে একজোড়া শাড়ীর জন্যে সত্তর টাকা খরচ করাটা স্বাভাবিক ব্যাপার, যদি মালটা সরেস পাওয়া যায়।

হিংস্র প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া আর কি বলা যায় একে? তা' নয়তো নেওয়া হয়েই গিয়েছে ধরে নিয়ে প্যাকেট করতে বসে বাছাই শাড়ী দু'খানা?

—কি আশ্চর্য্য, বাঁধছেন কেন?···কুইনিন ট্যাবলেট হাতে ম্যালেরিয়া রোগীর মুখশ্রী নকল করে সুন্দরী ভদ্রমহিলা বলে ওঠেন—নেবো তা'তো বলিনি আপনাকে?

—নেবেন না—সে আলাদা কথা, নিলে ভাল করতেন। দেখালাম তো পনেরো বিশ টাকার কাপড়, কিছুতেই চোখে ধরলোনা আপনার—গম্ভীরভাবে কথা কটা বলে এতোক্ষণ পরে ছোকরা খদ্দেরের ওপর থেকে সমস্ত মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে পাশের সহকারীর সঙ্গে কথা সুরু করে।

—কী অদ্ভুত অধ্যবসায়!

বেঞ্চির একেবারে কোণে একটু পিছন দিকে বসে যে ভদ্রলোক নিঃশব্দ বিস্ময়ে বহুক্ষণ ধরে এই নির্ব্বাচন পর্ব্ব লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর কণ্ঠ হতে এই অস্ফুট মন্তব্যটি বার হয়।

ভদ্রমহিলা চমকে মুখ ফিরিয়েই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—কতো সহজে রিজেক্ট করতে পারো তোমরা—অবাক্ হয়ে তাই দেখছি!

প্রায় তেমনি মৃদু কণ্ঠেই দ্বিতীয় মন্তব্যটা উচ্চারিত হলো।

—নেবার উপযুক্ত না হলে রিজেক্ট করা ছাড়া উপায় কি—বলেই দ্রুতগতিতে দোকান থেকে নেমে পড়েন ভদ্রমহিলা।

এ ভদ্রলোক ব্যস্তবাগীশের ভূমিকায় দোকানীকে উদ্দেশ করে তাড়াতাড়ি বলেন—ও মশাই শুনছেন—ওই শাড়ীখানা দেখান দিকি, বেশ ভালোই মনে হলো—

—কোন্ খানা ?—ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে দ্বিতীয় খদ্দেরের দিকে মন দেয়।

—ওই যে এখুনি যেখানা রাখলেন।…বলুন তো বিয়েতে উপহার দেওয়া চলে ?

—বিয়েতে ? নিশ্চয়। এ শাড়ী উপহারের জন্যেই খুব চলছে আজকাল। পড়তে পাচ্ছে না। ফ্যান্সি জিনিস, অথচ—

তার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বলে ওঠেন—আচ্ছা বাঁধুন, বাঁধুন, কতো বলছিলেন যেন—ছত্রিশ না ?—এই ধরুন।

চারখানা নোট এগিয়ে ধরেন ভদ্রলোক।

ফেরত টাকাটা নিতে যা দেরী, পরক্ষণেই হাওয়া!—সেল্‌সম্যান ছোকরা মুচকে হাসে। দোকানে বসে বসেই কতো সংসারলীলা দেখছে! কর্তার ধমকে গিন্নীর অভিমান, গিন্নীর 'দাবড়ানিতে' কর্তা ম্রিয়মাণ, নতুন বরের লোক দেখানো প্রেম, তরুণী প্রেয়সীর হাড়জ্বালানো আদিখ্যেতা, অনেক কিছুই চোখে পড়ে।—কম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হলো না!

বেশ বোঝা যাচ্ছে আজকের এটি স্রেফ্ মান অভিমানের পালা।

গিন্নী তো গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেলেন, মান ভাঙাতে শাড়ীখানাই নিতে হলো কর্তাকে। শাড়ীর দাম টাম নিয়েই বোধ হয় বচসা হয়ে গেছে বাড়ীতে। চক্ষুলজ্জা ঢাকতে কর্তা একটা 'বিয়ের উপহারের' ছুতো করলেন আর কি!

একটু বেশী দীর্ঘাঙ্গী বলেই তবু কোনো গতিকে কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছনো গেলো। জনারণ্যে হারিয়ে যাবার মেয়ে নয়, অনেকদূর থেকে চোখে পড়ে।

খুব খানিকটা পা চালিয়ে পাশাপাশি হয়ে পড়ে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে সুরেশ্বর বলে—কে তোমাকে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামতে বলেছে ? মহিলাদের এতো তাড়াতাড়ি রাস্তা হাঁটা অশোভন।

চিত্রা দাঁড়িয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে—রাস্তার মাঝখানে মহিলার অনুসরণ করাটা খুব শোভন কেমন ?

—কে কার অনুসরণ করেছে, সেটা কি বাইরের লোকের চোখে চট্ করে ধরা পড়ে ?

—কিন্তু এতো নিষ্ঠুরতা কেন ? দু'একটা কথা কইলে কি সমস্ত মহিমা নষ্ট হয়ে যাবে তোমার ?

—দরকারই বা কি ?

—কিছু না এমনি। হঠাৎ দোকানে উঠে চমকে গেলাম। তারপর অবাক হয়ে দেখছি বসে বসে—তোমার চমৎকার সুন্দর নিষ্ঠুরতা! কতোটুকু ত্রুটির জন্যে কতো সহজে বাতিল করে দিতে পারো!

—ত্রুটি ত্রুটিই। তার সঙ্গে আপোস করা আমার দ্বারা হয় না।

—তা' জানি। আচ্ছা ও কথা থাক। বাড়ী ফিরছো?

—হ্যাঁ।—আবার চলতে সুরু করে চিত্রা।···চলতে চলতে বলে—কেন, যেতে চাও?

—অতো দুঃসাহস নেই। কতোদিন আছো এ পাড়ায়?

—অনেক দিন।...আর কি কি জানতে চাও? ক'টি ছেলে মেয়ে? স্বামীর অবস্থা কেমন? দাম্পত্যজীবন সুখের হয়েছে তো? এখনো—কোনো অবসর মুহূর্তে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে কিনা?—এই সব তো?···কৌতূহল মিটিয়ে দিচ্ছি—ছেলে মেয়ে তিনটি, স্বামীর অবস্থা—

—থাক্ চিত্রা, তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানবার কৌতূহল আমার নেই। শুধু হঠাৎ দেখতে পেয়ে কথা কইবার লোভটা দমন করতে পারলাম না তাই।···আচ্ছা চললাম।

ঘুড়ির সুতো ততক্ষণই ছাড়তে হয়, যতক্ষণ হাওয়ার টানটা জোর থাকে। হাওয়ার টান আলগা হয়ে এলেই সুতো গুটিয়ে নেওয়া দরকার। গমনোন্মুখ সুরেশ্বরের কাপড়ের প্যাকেটধরা হাতটার ওপর চাঁপার কলি আঙুলের ছোট্ট একটু টোকা পড়ে।...সুতো গুটিয়ে নেওয়ার কৌশল।

—থাক্, যথেষ্ট রাগ প্রকাশ হয়েছে। চলো দিকি, বাড়ী গিয়ে বসা যাক্। পথে দাঁড়িয়ে কথা কইবার কোনো মানে হয় না।

সুরেশ্বর মৃদু হেসে বলে—মানে তো কিছুরই হয় না। বাড়ী গিয়ে বসবারই বা কি মানে আছে? পথের দেখা পথে ফুরোলেই তো ভালো।

—আচ্ছা খুব কবিত্ব হয়েছে। আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল না থাক্, তোমার সম্বন্ধে আমার অসীম কৌতূহল। চলো—শুনি গে—তোমার ক'টি ছেলে মেয়ে, বৌ সুন্দরী কি না, এখনো সেই কাজটাই করছো কি না, কলকাতায় এলে কতোদিন পরে, আসার কারণটা কি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যস!

ইঞ্জিনের পিছনে মালগাড়ীর মতো দিব্যি চললো সুরেশ্বর। কেন, ওর কি উচিত ছিলো না উদাসীন অবহেলায় আপত্তি করা? অনায়াসেই তো বলতে পারতো—থাক আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহলের প্রয়োজন কি?···বলতে পারতো—তোমার বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোতে পেয়ে কৃতার্থ হবো, এ দুরাশা নিয়ে তো তোমার সঙ্গ ধরিনি।

নাঃ! পুরুষের হৃদয়ে এতো দুর্জ্জয় অভিমান থাকে না, যাতে কোনো লাভের অঙ্ক লোকসানের খাতায় জমা হতে পারে।

অতএব কিছু পরেই—

চিত্রার বসবার ঘরে গুছিয়ে বসে চা খেতে দেখা গেলো সুরেশ্বরকে। দেখা গেলো—চিত্রার বরের সঙ্গে বর্ত্তমান পরিস্থিতির আলোচনা করতে। চিত্রার তিন বছরের মেয়ের মুখে ইংরিজি গান শুনে সুরেশ্বরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও শুনলাম, অবহিত হয়ে শুনতে দেখলাম চিত্রার সাত বছরের ছেলের অশেষ বিদ্যাবত্তার ইতিবৃত্ত।

কোনো কিছুর ত্রুটি দেখলাম না।

আবার, সুরেশ্বর যে এই আট বছর পরে ভাগ্নীর বিয়ে উপলক্ষে কলকাতায় এসেছে, সুরেশ্বরের ভাগ্যে যে এখনো মা ষষ্ঠীর কৃপা জোটেনি, ওর বৌকে আর কে কি বলে কে জানে—সুরেশ্বর তো সুন্দরীই দেখে, ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই চিত্রার জানা হয়ে গেলো সহজেই।

এর পরই হয়তো চিত্রা বলতো—বৌকে নিয়ে এসো একদিন—

হয়তো সুরেশ্বর রাজী হতো।

ছন্দভঙ্গ হলো চিত্রার তিন বছরের মেয়ে শানুর এক কীর্ত্তিতে। কোন্ ফাঁকে সে সুরেশ্বরের পাশ থেকে কাপড়ের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে গেছে কে জানে।···ব্রাউন পেপারের সেই খামটাকে হঠাৎ টুপি বানাবার সাধ হলো কেন তার—তাই বা কে জানে! মোটকথা সহসা দেখা গেলো—আবরণমুক্ত শাড়ীখানা টেবিলের ওপর পড়ে প্রখর বিদ্যুতালোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নির্লজ্জ হাসি হাস্‌ছে।

হাস্‌ছিলো হাস্‌তো, কিছুই এসে যেতোনা, যদি চিত্রা সে হাসিকে আমল না দিয়ে নিজের পেটেন্ট বাঁকা হাসিটি হেসে বলতো—আমার রিজেক্ট মালটাই নিলে শেষ পর্য্যন্ত?

ছন্দভঙ্গ হতোনা—যদি সুরেশ্বর কৌতুকহাসি হেসে উত্তর দিতো—হতভাগ্যের ভাগ্যে আর কি জুটবে?···তারপর নেমে আসতো গেরস্থালা কথায়' ভাগ্নীকে দেওয়া যায় কিনা শাড়ীটা, বিয়েতে আজকাল কী চলে আর না চলে, কতো চাহিদাই বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন, ইত্যাদি।

শাড়ীখানা গুছিয়ে মুড়ে নিয়ে সুরেশ্বর উঠতো, গেট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে আসতো চিত্রা। বলতো—অনেকদিন পরে দেখা হয়ে ভারী খুসি হওয়া গেলো।

ফেরার পথে রাস্তায় যেতে যেতে সুরেশ্বর ভাবতো—চিত্রার ছোট মেয়ে-ছেলের হাতে কিছু খেলনা কিনে দিলে ভালো দেখাতো! বড্ডো আকস্মিক আসা হয়ে গেলো। আর কোনোদিন যদি সুবিধে করে আসা হয়, নিশ্চয় আনতে হবে খেয়াল করে।

অনেকদিন আগে নিভে যাওয়া আগুনের ভস্মস্তূপের অন্তরালে কোথাও কোনোখানে যদি আত্মগোপন করে থাকতো এতোটুকু অগ্নিকণিকা, সৌজন্যের এই স্নিগ্ধ বারি সিঞ্চনে চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেতো সেটুকু।

যা হয় সচরাচর। এখানে ওখানে—যা হচ্ছে যখন তখন।

আগামীকাল স্মৃতিশাড়ীখানা বদলে ওই দামের মধ্যেই সস্তাগোছের একখানা ক্রেপ্ বেনারসী নিয়ে যাবার সময় স্বরেশ্বর ভেবে পেতোনা ধাঁ করে ওই শাড়ীখানাই কিনে বসেছিলো কি ভেবে? অসম্ভব কোনো আশায় নয় তো?

বিয়েবাড়ীর গোলমালে দ্বিতীয়বার আর যাওয়া হয়ে উঠতো না। ছুটি ফুরিয়ে যেতো। …কর্ম্মস্থলে ফিরে পনেরো দিনের জমানো কাজ উদ্ধার করতে নিজের নামটাই ভুলতে বসতো, তা' চিত্রা।

এইটাই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু অস্বাভাবিক করে তুললো চিত্রাই।

বিদ্যুতালোকিত শাড়ীটার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তীব্র প্রশ্ন করে উঠলো—এর মানে?

কৌতুকের বদলে অপ্রতিভ হাসি হেসে স্বরেশ্বর বললো—কি হলো?

—পয়সার অভাবে কিনতে পারিনি আমি? তাই করুণায় বিগলিত হয়ে প্রেজেন্ট করতে এসেছো? আজকাল অনেক পয়সা হয়েছে তোমার, না?

স্বরেশ্বরও কঠিন হয়ে ওঠে, শাড়ীখানা গুটিয়ে তুলে নিয়ে ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে বলে—হঠাৎ তোমাকে প্রেজেন্ট করতে যাবো একথা ভাবলে যে? এমন অসম্ভব ধারণার হেতু?

আরক্ত মুখখানা পাংশুমূর্ত্তি হয়ে যায়। বাঁকা হাসি নয়, টেনে আনা হাসি হেসে চিত্রা বলে—তবু ভালো। পুরুষমানুষের কাণ্ডজ্ঞানের অভাবটাই বড়ো বেশী চোখে পড়ে কিনা, তাই আশঙ্কা হচ্ছিলো।

স্বরেশ্বর দাঁড়িয়ে উঠে বলে—নিজের সম্বন্ধে প্রাধান্যবোধটা বড়ো বেশী থাকলেই আশঙ্কাটা তাদের প্রবল হয়, চিত্রা! "ওই বুঝি অপমান হয়ে গেলো'—এই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে থাকতে কাঁটার স্বভাবধর্ম্মটাই তাদের স্বভাবগত হয়ে যায়, অন্যকে বিদ্ধ করা ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না।

আগুনের মতো রাঙামুখ থেকে উত্তর আসে—প্রাধান্যবোধটা কি অকারণেই জন্মায় স্বরেশ্বর? কারণ কিছু থাকে বৈকি।… কিন্তু ছিলো তাই রক্ষে, না থাকলে হয়তো বা—আচ্ছা থাক্, রাত হয়ে যাচ্ছে তোমার।

স্বরেশ্বর তিক্তহাসি হেসে বলে—অর্থাৎ—'বিদায় হও' এই তো? তথাস্তু। দয়া করে নিজে ডেকে এনেছিলে এইটুকুই যা সান্ত্বনা। তার জন্যে ধন্যবাদ।

স্বরেশ্বরের ছায়া মিলিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত গেটের রেলিঙ্ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে চিত্রা।…ঘটনাটা কি ঘটে গেল ভাবতে চেষ্টা করে।…শাড়ীখানা দেখেই হঠাৎ মাথার মধ্যে অমন আগুন জ্বলে উঠলো কেন? যার জন্যে পাগলের মতো অমন একটা প্রশ্ন করে নিজেকে খেলো করে বসলো! সত্যিই তো—খামোকা স্বরেশ্বর তা'কে সামান্য একটা শাড়ীই বা উপহার দিতে আসবে কেন? কোন্ সাহসেই বা আসবে?

পথে যেতে যেতে স্বরেশ্বরের ইচ্ছে হয় নিজেকে ধরে চাবুক মারে।

অমন সুন্দর অনুকূল অবস্থাটাকে অতো বিশ্রী ভাবে মোড় ঘুরিয়ে ফেলবার সমস্ত বোকামীটাই তো তার। অকারণ বিরক্তি প্রকাশ, ওটা তো চিত্রার চিরদিনের স্বভাব। সে বিরক্তিকে অগ্রাহ্য করে অনায়াসেই তো স্বরেশ্বর পরিহাসের ভঙ্গীতে বলতে পারতো—

'উপহার নয় দেবী, দীনভক্তের পূজা উপচার'···নিশ্চয় কৃত্রিম বিরক্তির মেঘ কেটে গিয়ে আলো ফুটে উঠতো সে মুখে।

দেওয়া উচিত কি না, দিতে পারা সম্ভব কি না, দেবার অনুকূল আবহাওয়া তৈরি করা যাবে কি না, এসব কোনো কিছুই না ভেবেও চিত্রার কথা মনে করেই তো চট্ করে কিনে বসেছিলো শাড়ীখানা?···আবহাওয়াটাও তো প্রায় তৈরি হয়ে এসেছিলো, সমস্ত নষ্ট হয়ে গেলো সুরেশ্বরের বোকামিতে! যেখানে মলয় বাতাস বইতে পারতো, সেখানে জ্বলে উঠলো আগুন!

কেন এমন হয়?

বারে বারেই কেন ঘটনাস্রোত সুরেশ্বরের হাত ছাড়িয়ে মোড় ঘুরে যায়?

*　　*　　*　　*

কেন যায়—সে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, সুরেশ্বর। চিন্তাভঙ্গীও সকলের সমান নয়।

হয়তো—তোমার আজকের এই ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসার উত্তরে একথা বললে ভালো শোনাতো —'আগুন জিনিষটা এমনি যে, নিভে যাওয়া ভস্মস্তূপের নীচে যদি কোথাও কোনোখানে স্ফুলিঙ্গমাত্র অবশিষ্ট থাকে, বাতাস পেলেই সে আত্মপ্রকাশ করে বসে। আর আগুনের স্বধর্ম্মই তো দহন।

কিন্তু তা' না করে বলবো—আগুনের কথা রেখে দাও বাপু, ও জিনিস অতো সস্তা নয়। রাত্তির দিন জ্বালানি জোগান দিয়ে তাই বড়ো টিকিয়ে রাখা যায়? কোন্ ফাঁকে নিভে বসে থাকে!····সেই আগুনকে আবিষ্কার করতে চাইছো নিভে যাওয়া ভস্মস্তূপ থেকে?·· পাগল আর কা'কে বলে?

আসলকথা—তোমার সামনে নিজের দৈন্যটা প্রকাশ হয়ে পর্য্যন্ত মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিলো চিত্রার, তাই তোমাকে বাড়ী এনে আপ্যায়িত করবার ছুতোয় দেখিয়ে বাঁচছিলো নিজের সাজানো ঘর, সুপুরুষ বর, গুণবান ছেলে মেয়ে।···তোমার হাতে শাড়ী দেখে আগুন জ্বলে উঠলো সেই খাটো হয়ে যাবার আশঙ্কাতেই। চিত্রার নাগালের বাইরের জিনিষটা তোমার নাগালে আসবে কেন?

আর তোমার?

ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ অমন বেকুবের মতো অতোগুলো টাকা খরচ করে ফেলে বুকের ভেতরটা সমানেই খচ্ খচ্ করছিলো তোমার। দেখেছি তো—চিত্রার বরের সঙ্গে আলাপ করবার সময়, আর চিত্রার মেয়ের গানের প্রশংসা করবার সময় তোমার ফাঁকা ফাঁকা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। খরচটা সামলে নেবার একটা ছুতো পেয়ে বর্ত্তে গেলে তুমি।

তুমি যদি বলো···

কাল সকালে উঠে তুমি ভাববে—'জীবনটা কি অদ্ভুত অর্থহীন'····আর চিত্রা ভাববে —'জীবনের সমস্ত অর্থ হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলো'—তা'হলে মাথা নেড়ে বলবো—তা আর নয়? কাল সকালে—তুমি ভাববে—খুব রক্ষে হয়েছে বাবা! কী বোকামিটাই করে বসছিলাম, আর একটু হলেই অতোগুলো টাকা—

চিত্রা ভাববে—দূর ছাই কী বোকামিটাই করে বসলাম। ও রকম না হ'লে শাড়ীখানা বরকে দেখানোও যেতো।

'চিত্রার মত মেয়ের আকর্ষণ যে কোনোদিনই ফুরোয় না, বারো বছর পরেও সমান তাজা থাকে, এ বিজ্ঞাপনটা বরের কাছে জাহির করতে পারাও তো কম গৌরবের নয়।

এখন তুমিই বুঝে দেখো সুরেশ্বর, কোনটা মিলে যায়। জিগ্যেস করে দেখো তোমার মনকে।

লকলকে একটি লিনেন সার্ট, মটমটে এক প্যাণ্ট, তার সঙ্গে পালিশ করা একজোড়া কাবুলী চপ্পল। আর কি চাই? এর বেশী আর কি দরকার?

একবার কোনপ্রকারে এইটুকু জোগাড় করে ফেলতে পারলেই বেশ কিছুদিন মানমর্য্যাদা বজায় রেখে চলা যায়। এছাড়া অবিশ্যি আর একটা জিনিস লাগে, সে হচ্ছে চুলের কায়দা, তা সে তো বিনা খরচেই হয়।

কাচানো বা ইস্ত্রী করার জন্যেও ধোবার মুখাপেক্ষী হবার দরকার নেই, ওটা আজকাল গেরস্থ লোকে সহজ করে নিয়েছে। শিখে নিয়েছে বিদ্যেটা।

ওই বিদ্যের জোরেই শক্তিপদ একটা স্যুটের ওপর দিয়ে বছর দেড়েক ধরে বাবুয়ানা চালাচ্ছে। অবিশ্যি রোজ নয়, সপ্তাহে একদিন ওর বাবুগিরি। সহরতলীর এই 'পাখীর বাসা' থেকে প্রত্যেক রবিবারে রবিবারে ও চলে যায় কলকাতায়! সেখানে না কি ওর বড় মানুষ মামা মিস্টার এম. এন. ঘোষের বাড়ি।

নামের আগে এখনো মিস্টার ব্যবহার করেন, সোজা বড়লোক নয় তা হ'লে। শক্তিপদর সহকর্ম্মী পাড়ায় যারা থাকে, ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকিয়ে দেখে শক্তিপদকে—যখন সে লকলকে লিনেন সার্টের সঙ্গে মটমটে প্যাণ্ট পরে মস্‌মসিয়ে পাড়ার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যায়! মামার কথা সকলেই জানে, আর অত বড়লোক মামা যে গেঞ্জিকলের মজুর শক্তিপদকে ভাগ্নে বলে স্বীকার করেন, শুধু স্বীকার করা নয়—সপ্তাহান্তে হা পিত্যেশ করে বসে থাকেন তাকে দেখবার জন্যে, এইতেই তাজ্জব বনে যায় তারা।

অবিশ্যি অমন মামা থাকতে এমন অবস্থা কেন শক্তিপদর, সে প্রশ্ন প্রথম প্রথম উঠেছে, কিন্তু শক্তিপদর লুকোছাপা নেই, 'ঢাক-ঢাক গুড় গুড়' নেই। ও স্পষ্টই স্বীকার করেছে, মামা মামী 'চক্ষের মণি' করলে কি হবে, মামাতো ভাইরা একটু 'ইয়ে'র চক্ষে দেখে! তা দোষও দেওয়া যায় না তাদের, তারা হ'ল সব এক একটি কেষ্ট বিষ্টু।

এম. এ. পাশের নীচে কেউ নেই, মামাতো বোন পর্যন্ত বি. এ. পাশ। তারা নন্-ম্যাট্রিক শক্তিপদকে হতজ্ঞান না করে কি করবে?

সেই জন্যেই নিজের বিদ্যের উপযুক্ত কাজ বেছে নিয়েছে শক্তিপদ। তবে বুড়োবুড়ি যে ক'দিন আছে হপ্তায় হপ্তায় না গিয়ে পারে না।

আগে শক্তিপদ কাজ করতো গেঞ্জিকলে, খেতো ওখানেরই 'পাইস্ হোটেলে' আর থাকতো একটা মুদির দোকানে। আপাততঃ কিছুকাল ধরে সহকর্ম্মী বন্ধু রাধানাথের সংসারে পেইং গেষ্ট হয়ে আছে।

রাধানাথ ওইখানকারই ছেলে, তার রীতিমত সংসার আছে, মা বোন, ছোট দুই ভাই। এতগুলো লোকের পক্ষে বাড়িটুকু যথেষ্ট নয়, নেহাৎই এককোঠা এক দালান।

তবু ওরই মধ্যে সে দালানের একটু কোণ ঘিরে বন্ধুকে ঠাঁই দিয়েছে। নিজের ঠাঁইয়ের

অভাব বলেই বোধ হয় বন্ধুকে ঠাঁই দেওয়া সহজ হয়েছে! প্রাচুর্য্য থাকলে হতো কি না সন্দেহ।

'সুবিধের' আস্বাদ যারা জেনেছে, তারাই 'অসুবিধে'র ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। আর অসুবিধেই যাদের সঙ্গের সাথী, জীবনে যারা জানলো না সুবিধের চেহারাটা কি, তাদের ভয়টা কি? রাধানাথের 'মোজেক' করা বাথরুমের ভাগ নেবে না শক্তিপদ, নেবে না খাবার পাতের মাখন সন্দেশের ভাগ।

রাধানাথ রাস্তার কলে গিয়ে চান করে, শক্তিপদও তাই করবে, রাধানাথ ভোরবেলা আখের গুড় দিয়ে বাসি-রুটি খেয়ে কাজে ছোটে, শক্তিপদও তাই ছুটবে, রাধানাথ খেটে খুটে এসে চটা-ওঠা এনামেলের গ্লাসে চা নিয়ে বসে, শক্তিপদও তাই বসবে, তবে আর ভাবনার কি আছে?

শক্তিপদ বড়লোকের ভাগ্নে?

তাতে কি? তার জন্যে তো শক্তিপদ চালিয়াৎ নয়। শুধু বড়মানুষ মামার বাড়ি যাবার সময় সৌষ্ঠবযুক্ত হয়ে না গেলে নিজেরও লজ্জা, তাঁদেরও লজ্জা। তাই এই সাজ-সজ্জা।

নইলে এমন অমায়িক ছেলে হয় না।

রাধানাথের মা বলেন—ছেলে নয় তো, হীরের টুকরো!

রাধানাথের বোন অবশ্য অন্য কথা বলে।

তা' সে নেপথ্যে বলে। সে অনেক রকম কথা জানে।....তার সখও অনেক। নিজেদের বাড়ির এই "পাখীর বাসা" নামও তার দেওয়া।...একটা কাগজে বড় বড় করে 'পাখীর বাসা' লিখে দেওয়ালে সেঁটে রেখেছে।

সন্ধ্যার পরে রাস্তার দিকের দেড় হাত চওড়া রোয়াকে সঙ্গীতের জলসা বসে। রাধানাথ একটা ভাঙা হারমোনিয়ম নিয়ে গান গায়, শক্তিপদ একটা এ্যালুমিনিয়মের ডেকৃচি বাজিয়ে তাল দেয়।...একটি একটি করে এসে জোটে পানু, মানিকলাল, সুধীর। কোনদিন খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে যায়, কোনদিন ওরই মধ্যে একটু জুৎবরাত করে বসে।

আনক দিন থেকে ইচ্ছে এক জোড়া বাঁয়া তবলা কেনে, সে আর কুলিয়ে উঠছে না। সাংঘাতিক দাম হয়ে গেছে যে আজকাল। কারণ গান বাজনার চাষটা আজকাল খুব জোর হচ্ছে তো, আর তবলাটা যেন রীতিমত জাতে উঠে পড়েছে! মামার কাছে চাইলে অবিশ্যি একজোড়া বাঁয়া তবলার দাম কিছুই নয়, কিন্তু ওইটি শক্তিপদর ধাতে সয় না। ওই চাওয়া। বরং নিজের কতো কষ্টের টাকা, তাই থেকেই এটা ওটা নিয়ে যায় উপহার হিসেবে। হেয় হবে কেন?

মাঝে মাঝে যেদিন বাইরের লোক থাকে না, রাধানাথের বোন কানন রোয়াকের

ভিতর দিকে ঘরের চৌকাঠে বসে। বসে থাকতে থাকতে শক্তিপদর তবলা পিটোনোর বহরে হেসে খুন হয়।···হাসতে হাসতে বলে—ও শক্তিদা, একটু আস্তে! গরীবের ডাল সেদ্ধ হয় ওতে। ফুটো হয়ে গেলে কালকে স্রেফ ভাতে ভাত।

'ভাতে ভাত' মোটে খেতে পারে না শক্তিপদ, তাই ওইটিই কাননের তাকে ক্ষ্যাপানোর অস্ত্র। তা ছাড়া এর চাইতে উচ্চাঙ্গের পরিহাসবাণী শিখলোই বা কবে সে?

ঘাটতি যে এদের সব দিকেই!

বিত্তের ঘাটতি, বুদ্ধিতে ঘাটতি, শিক্ষায় ঘাটতি, ভাঁড়ারে ঘাটতি। সেই জন্যেই হয়তো বিধাতা-পুরুষ ওদের হৃদয়ের দিকে কিছু বাড়তি রেখেছেন। নইলে ব্যালেন্স ঠিক থাকবে কি করে? নইলে বাড়তিদের সঙ্গে পাশাপাশি জায়গা নিয়ে টিঁকে থাকতো কি করে? বিশ্বের বাজারের দাঁড়িপাল্লায় যে হাস্যকর ভাবে হালকা হয়ে উঠে পড়তো!

রাধানাথের মা-টি বড় ভালমানুষ, বোন কানন কিন্তু ঠিক মায়ের উল্টো। 'দজ্জাল' বললেই ঠিক বলা হয় ওকে। বাড়তি একটা লোককে সখ করে বাড়িতে ডেকে এনে রাধানাথ যে তার খাটুনী চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এ কথা সে অহরহ সাড়ম্বরে ঘোষণা করে। আবার ইচ্ছে করে খাটতেও ছাড়ে না! মনে হয় বাড়তি লোকটার জন্যে আরও চারগুণ খাটলেও বুঝি ক্লান্তি আসবে না তার।

নইলে—শক্তিপদর জামা সাবান দিয়ে দেওয়ার, রান্নার মাঝখানে ইস্ত্রী তাতিয়ে দেওয়ার, কি এতো গরজ তার?

রাধানাথ মাঝে মাঝে মুখরা বোনের মুখের জন্য ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু যখন দেখে শক্তিপদ সে বাক্যবাণ প্রসন্ন মনে নিচ্ছে, তখন স্বস্তি পায়।

গানের আসর থামলে কাননই আগে উঠে পড়ে। এবেলা রান্নাবান্নার ভার তারই ওপর। এরা ওঠবার আগেই তাড়াতাড়ি জায়গা করে খেতে দেয়!

খেতে বসে শক্তিপদ গলা ছেড়ে বলে···রান্না হচ্ছে আজকাল চমৎকার! ভাগ্যিস সকালবেলাটা মাসীমার হাতে হাঁড়ির ভার, তাই কোনরকমে বেঁচে থাকা।

কানন রান্নাঘর থেকে খরখর করে ওঠে—কুমড়ো আর কচু দিয়ে লোকেদের বৌয়েরা এসে কি কোর্মাকারি রাঁধবে দেখবো! হুঁঃ।

শক্তিপদ সেই কুমড়ো কচুর ঘণ্ট দিয়েই অম্লানবদনে খান-দশেক রুটি সেঁটে বলে—পড়লো কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। আমি তো কাউকে ডেকেডুকে কিছু বলিনি!

কানন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

—গায়ের চামড়া যার গণ্ডারের নয়, তার গায়ে কথা শুধু যে বাজে তা' নয়, ফোস্কা পড়ায়, বুঝলেন মশাই! ডেকে না বললেই কি বোঝা যায়না? আমি ছাড়া আর আছে কে?

রাধানাথ আগে আগে এ ধরণের কথায় একটু হকচকিয়ে যেত। বোন তার মুখরা সত্যি, কিন্তু একটা বাইরের লোকের কাছেও একটু সমীহ করবে না? এখন সয়ে গেছে, এখন হাস্যবদনে এ কৌতুক উপভোগ করে।

কিন্তু রাধানাথ আঁচাতে গেলে শক্তি যে কথাটা বলে সেটা গলা খাটো করে বলে। বলে, যখন তখন লোক্‌কে বউ তুলে খোঁটা দেবার মানে?

কাননও গলা খাটো করে ভেঙিয়ে বলে, পড়লো কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। আমি তো কাউকে ডেকে হেঁকে বলিনি!

হুঁ—রাধানাথের আসার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে নেয় শক্তিপদ—এর উত্তুর তোলা রইল।...কই কানন, উনুনেব আঁচ রাখো নি? হায় হায়! আমার যে একটু দরকার ছিল!

বলা বাহুল্য শেষের কথাটা আবার বেশ চড়া গলায় উচ্চারিত হয়।

কাননও চড়া গলায় বলে—আপনার তো দরকারের মধ্যে ইস্ত্রী তাতানো? সে কাজ মিটে গেছে!

—মিটে গেছে, তার মানে?

—তার মানে ইস্ত্রী করে রাখা আছে।

—এতো কষ্ট করতে তো কেউ কাউকে বলে নি!

—আমি কারুর বলার তোয়াক্কা রাখি না, যা করি নিজের খুশিতে করি।

শক্তিপদ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, রাধানাথ এসে তাড়া দেয়—কি এখনো কোঁদল চলছে? ভোরবেলা উঠতে হবে না?

...রাধু তো বেশ বলছিস? কাল বারটা কি?

—ও হো হো—রাধানাথ হেসে ওঠে, রবিবারটা ভুলে যাচ্ছি, আরে!

জোরালো বা ঘোরালো ভাষা এদের নেই, তা বলে সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার প্রকাশ নেই তা নয়। এমনি জোলো জোলো আর সাধারণ সাধারণ কথা হ'লেও মনে করে বেশ মজার কথা বলা হ'ল। মজাটা এইখানেই।

রবিবার সকাল থেকে মামার বাড়ি যাবার তোড়জোড় চলে। আগে সকালের দিকেই রওনা দিত আজকাল কেন কে জানে কেমন যেন গড়িয়ে যায়; সেই খাওয়া দাওয়ার সময় এসে যায়, কাজেই দুটো খেয়ে একটু জিরিয়ে তারপরে যাওয়া।

তবে সকাল থেকে জুতোয় কালি পড়ে, মাথায় সাবান পড়ে, দাড়িতে ক্ষুর পড়ে।

বেরোবার সময় কানন একটা পানের খিলি নিয়ে এসে বললো—সাহেবের পান খাওয়া চলবে?

—পান ? শক্তিপদর মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—পান কোথা পেলে ?

পানের মতো বিলাসিতার এ বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ।

একমাত্র চায়েরই সর্ব্বত্র অবাধ গতি। 'বাকিংহাম্ প্যালেস' থেকে বঙ্কু হাড়ির গাছতলায় সংসারে পর্য্যন্ত চায়ের প্রবেশাধিকার। কিন্তু পানের তেমন নয়।

কানন পানটা হাতে দিতে দিতে বলে—পেয়েছি কোথাও।···তারপর বড়লোক মামারবাড়ি চললেন ?

শক্তিপদ বললো—ওই বুড়ো বুড়ি যতক্ষণ! তারপর কে কার দোরে পা ফেলতে যাচ্ছে।

—বেশ চমৎকার দেখায় কিন্তু আপনাকে স্যুট পরলে।

—দেখাবে না কেন ? চেহারাটা কি খারাপ ?

—ওঃ ভারী তো চেহারা তার আবার গুমোর!

—গুমোর করবার মতো জিনিস থাকলেই গুমোর করে লোকে!

—যান, একটু মুখ বদলে আসুন। মামার বাড়ির হালুইকর বামুনের রান্না খেয়ে এসে তাই এখানের রান্নার এত নিন্দে!

—হয়েছে ঝগড়া থামাও। যাচ্ছি তা'হলে ?

—যাচ্ছি বলতে নেই, বলতে হয় আসছি।

মটমটে জামা প্যাণ্ট পরে, পালিশ করা জুতোর মস্মস্ শব্দ তুলে মামার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয় শক্তিপদ। পিছনে রোয়াকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখতে থাকে কানন।

এক সময় মা ঘর থেকে ডাকে—কানন!

মনে হয় কানন শুনতে পেলো না, কিন্তু একটু পরে আবার ঢুকেও যায়।

মা বলে—বাইরের দাওয়ায় হাঁ ক'রে দাঁড়িয়েছিলি কেন ?

—হাঁ ক'রে আবার কি ? একবার একটু হাঁফ ফেলতেও দোষ আছে না কি ? গরুও তো একবার গোয়াল থেকে বেরোয় ?

মা থতমত খেয়ে বলে—রাগ করছিস, পাড়ার পাঁচজনে পাছে কিছু বলে, তাই সামলে মরি!

যার যা সামলানো দরকার!

ওদিকে শক্তিপদ তার ফর্সা স্যুটটি অতি কষ্টে সামলেসুমলে গোয়াবাগানের একটি বস্তির সামনে এসে দাঁড়ালো।

বস্তির সামনেই রাস্তার কল!

কলের আশেপাশে জনারণ্য। রমণীর সংখ্যাই অবশ্য তুলনায় অনেক বেশি। শক্তিপদ

এসে দাঁড়াতেই একটি মেয়ে একজন বর্ষীয়সীকে উদ্দেশ ক'রে আস্তে আস্তে সম্ভ্রমের স্বরে বলে—এই যে দাশুর মা, তোমার ভাগ্নে এসেছে!

দাশুর মা আধ বালতি জল না হতেই বালতিটাকে টেনে তুলে সরে এসে স্নেহবিগলিত স্বরে বলে—এই যে বাবা এসেছো? চলো। ভাল আছ তো?

শক্তিপদ ওর সঙ্গে সঙ্গে গলির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বলে—আছি একরকম। তারপর তুমি ভাল আছো তো? মামা?

—তোমার মামার কথা আর বলো না বাবা! আবার সেই হাঁপানি চাগিয়েছে।

তক্তাপোষের পাশে একটা প্যাকিংবাক্স উপুড় ক'রে রাখা। এইটিই শক্তিপদর জন্য নির্দিষ্ট রাজাসন।

মস্ত বড় চাকরে ভাগ্নে, কোথাকার কোন গেঞ্জিকলের নাকি ম্যানেজার, যে "লোক" দু'ঘণ্টার জন্যে সরে নড়ে এলে কলের কাজ বানচাল হয়ে যায়, সেই ভাগ্নে ফি হপ্তায় পাঁচ ঘণ্টার জন্যে সরে নড়ে আসে মামামামীকে দেখবার জন্যে, এ কি সোজা কথা?

মামা মামী ভাগনের এই মহানুভবতায় বিগলিত!

তা ছাড়া যখনই আসে, রুগ্ন মামা খাবে বলে সন্দেশ, বেদানা, ন্যাসপাতি, কমলালেবু ইত্যাদি নানা জিনিস নিয়ে আসে!—আবার মাঝে মাঝে—'মামার কি ভাল লাগবে না লাগবে জেনে বুঝে কিনে দিও মামী'—বলে নগদ টাকাও কিছু দেয়।

মামা ভয়ানক মানী লোক, ভাঙে তো মচকায় না। অনেক দুঃখে নামতে নামতে একেবারে এই বস্তিতে এসেছে, জীবনযাত্রার মান অনেক খাটো করেছে, কিন্তু মানে খাটো হয় নি! আর্থিক সাহায্য হিসেবে দিতে চাইলে সে ভাগ্নের টাকা পত্রপাঠ ফেরত দিতো, কিন্তু শক্তিপদর এতটা অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শন ঠেলতে পারে না!

তা' মামা এমন মানী বলেই তো শক্তিপদ এমন নির্ভয়ে আসতে পারে, নইলে 'বড় চাকরে'র পক্ষে গরীব আত্মীয়ের বাড়ী আসা কি সহজ সাহসের ব্যাপার?

মামা জিজ্ঞেস করে—তোদের কলের কাজটাজ কেমন চলছে?

শক্তিপদ নড়ে চড়ে টাইট হয়ে বসে বলে—তা আজকাল বরং ভালই চলছে, ধর্মঘটের হিড়িকটা তেমন নেই, সুতোও পাওয়া যাচ্ছে যথেষ্ট। আগের চাইতে মাল অনেক বেশী ছাড়তে পারা যাচ্ছে।

মামা এই ঘরে নিতান্তই বেমানান এই চকচকে স্যুটপরা সুকান্তি মূর্ত্তিটির পানে তাকিয়ে স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলে—তা'হলে আজকাল খাটুনি তেমন নেই কেমন? বিনা উপদ্রবে মিল চলছে যখন—

—খাটুনি ?—শক্তিপদ একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলে—খাটুনির কথা আর জিজ্ঞেস কোরোনা মামা। এই—হপ্তায় একদিন এসে মামীর হাতে খেয়ে যাই, তাই দেহটা টিকে আছে।······আগাগোড়া তদারকী সবই তো আমার ঘাড়ে।

মামী ঘরে ছিল না, এইবার একটি সত্যিকার ডিস পেয়ালায় চা এনে সামনে ধরে বলে—চায়ের সঙ্গে দু'খানা পাঁপর ভাজা খাবে বাবা ?

শক্তিপদ হাঁ হাঁ করে ওঠে—না মামী, না! তুমি একটু বোসো স্বস্তি হয়ে।

মামী মনে মনে হাসে।—স্বস্তি! যতক্ষণ না এই রাজ-অতিথিটিকে খাইয়ে দাইয়ে পাঠিয়ে দিতে পারবে ততক্ষণ কি তার স্বস্তি আছে না কি ?

কিন্তু এই অস্বস্তির মধ্যে আনন্দ আছে, গৌরব আছে। এর জন্যে বস্তির আর সকলে কত সমীহ করে।

ওপাশের ঘরের সৌখিন বউ চাঁপা চায়ের পেয়ালা দেয়, হয়তো বা চা করেও দেয়। এপাশের মোটাগিন্নী রান্নার সাহায্য করে দিয়ে যায়, মামীর উনুনের আঁচ ভাল না হ'লে আপনার জলন্ত তোলা উনুনটা গামছায় ধরে এ ঘরে দিয়ে যায়।

ওদের মাত্র দুই বুড়োবুড়ির সংসার, কত জিনিসের অভাব! ভাগ্নে এলেই সকলে খোঁজ নেয় কিছু লাগবে কি না। কর্তার ভয়ে সামনা-সামনি কিছু নেবার উপায় নেই, মামী লুকিয়ে চুরিয়ে নেয়। হ'ল না হয় কারুর ঘর থেকে এক টুকরো আদা কি দু'টো পিঁয়াজ, হ'ল দুটো কাঁচালঙ্কা কি এক চিমটে পাঁচফোড়ন।

শক্তিপদ বলে—লুচিফুচি করতে যেওনা মামী, রুটি কর রুটি। তোমার হাতের রুটি, তার স্বাদই আলাদা। আর আমার রাঁধুনী ব্যাটার হাতে লুচিও ঘুঁটে হয়ে দাঁড়ায়। লুচিতে অরুচি ধরিয়ে দিয়েছে হতভাগা।

শুনে মামী সারদার বুকটা করকর করে।

কত পয়সা খরচ করে, তবু ভাল খাওয়া হয় না ছেলেটার। কর্তার এক অদ্ভুত জেদ। ছেলেপিলে সব গেছে, দুই বুড়োবুড়ি গিয়ে পড়ে থাকলেই হয় ভাগ্নের কাছে। মানুষ কি এমন থাকে না ? তা ছাড়া—অমন ভাগ্নে!

শক্তিপদ নিজে একটা মানুষের জন্যে যা খরচ করে সারা হয়, তার অর্দ্ধেক খরচে তিনটে মানুষের চালিয়ে দিতে পারতো সারদা! অথচ খাওয়াদাওয়াও ভাল হতো! ওই—ওই জেদেই সর্ব্বনাশ করেছে!

রুটি আলুর দম, বেগুন ভাজা, পিঁয়াজ দিয়ে সাঁতলানো একটু মুসুর ডাল। তারিয়ে তারিয়ে খায় শক্তিপদ, আর সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের রাঁধুনীটার শত ব্যাখ্যানা করে।

মামীর হাত পা কামড়ানি আসে, মামার মনটা স্নেহে ছলছল করে।

কথায় কথায় রাত হয়ে যায়, শক্তিপদ উঠে পড়ে। দেড়ঘণ্টা বাসে যেতে হবে তো ?

চলে যাবার সময় মামী বস্তীর গলি থেকে বেরিয়ে রাস্তার কলের সামনে এসে দাঁড়ায়। এঘর ওঘর থেকে অনেকেই বেরিয়ে এসে উঁকিঝুঁকি মারে। প্রতি হপ্তায় দেখে, তবু কারুর কৌতূহলের শেষ নেই।

লকলকে লিনেন সার্ট, মটমটে স্যুট, আর কাবুলী চপ্পল অন্তর্হিত হ'লে মামীর কাছে এসে ভীড় করে ওরা।

মোটাগিন্নী বলে—আজকের বাজারে এমন ছেলে দেখা যায় না। গরীব বাপ মাকেই লোকে পোঁছেনা—আর এতো মামা মামী—

ললিতের মা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—ধন্যি বলি তাই তোমার কর্তার খোটকে! রাজার হালে থাকতে পেতে।

সারদা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে—কপাল আমার! ওই খোটের জন্যেই তো আজ এমন হাল!

রাত্রে বাইরের দরজায় প্রায়শঃই কানন দাঁড়িয়ে থাকে, কারণ শক্তিপদ না থাকলে গানের আসর বসে না। এক সপ্তাহের ক্লান্তি রাধানাথের চোখে এসে ভর করে। মায়ের রুগ্ন ধরণের শরীর, সন্ধ্যে থেকেই তো সে বিছানায়!

কানন বলে –হ'ল রাজভোগ খেয়ে আসা ?

—হ'ল।

—যাক বাবা, আজ রাত্রের মতো কচু কুমড়োর দায় থেকে নিশ্চিন্তি!

—হয়েছে, খুব কথা হয়েছে! এখন সরো দিকিন, ঢুকতে দাও। রাধানাথের অর্ধেক রাত তো ?

—ও বাবা, তা আর বলতে!

—তোমার চক্ষে বুঝি ঘুম নেই? কি যেন গান গায় তোমার দাদা? আঁখি হ'তে নিলো ঘুম হরি, কে নিলো হরি'—

—আঃ! চাপা গলায় ব'কে উঠে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ায় কানন।

এমনি করে চলে—দিনের পর দিন! রাধানাথ আর তার মা কি একটা ক্ষীণ আশা মনে মনে পোষণ করে কে জানে! হয়তো সেই জন্যেই মেয়ের বিয়ের তেমন চেষ্টাও করে না।··· কিন্তু শক্তিপদ যখন রুক্ষ চুলে ব্যাক্‌ব্রাশ করে ইস্ত্রী করা স্যুট পরে বেরিয়ে যায়, তখন তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে দু'জনেরই যেন একটা হতাশ নিঃশ্বাস পড়ে।

• ওকে কি বাঁধা যাবে ?

শক্তিপদ অবিশ্যি যখন তখন বলে—আমি বাবা গরীবই আছি গরীবই থাকবো। ভেক্ নইলে ভিখ মেলে না, তাই সভ্যভব্য হয়ে যাওয়া। নইলে মামাতো ভাইরা গেঞ্জি কলের কুলি বলে নাক সিঁটকোবে হয়তো!

তবু—তবু যেন সন্দেহ রয়ে যায়!

কিন্তু একদিন ওদের পাখীর বাসায় এলো ঝড়! সন্ধ্যার পরে যেমন গানের আসর বসে তেমনি বসেছে। ঘরের চৌকাঠের ভিতরে কানন আছে বসে।

শক্তিপদ মহোৎসবে ডেক্‌চি বাজাচ্ছে, এমন সময় সামনে একটা সাইকেল রিক্সা এসে দাঁড়ালো।…তার মধ্যে একটা ট্রাঙ্ক একটা বিছানা, আর বালতি বাসন গোছের দু' একটা কি।

চেনা রিক্সাওয়ালা, এই অঞ্চলেই ওর বাসা।

সে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কাছে এসে বলে—এই দেখুন তো রাধানাথবাবু, এই মেয়েছেলেটি কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?…আমায় বললেন—এখানে যে গেঞ্জিকল আছে, তার ম্যানেজারের বাড়ি যাবো।…যতো বোঝাই, ম্যানেজার এখানে কোথা? সে কলকাতায় থাকে, মটরে চড়ে আসে যায়, সে কথা কে শোনে!…সেই এক জেদ—নাম শক্তিপদ দাস, গেঞ্জিকলের ম্যানেজার, ইনি নাকি তাঁর মামী।…আমাদের শক্তিবাবু নয়তো?

শক্তিপদ ডেক্‌চিতে হাত দিয়ে বজ্রাহতের মত তাকিয়ে থাকে।

রাধানাথ শশব্যস্তে উঠে বলে—মামী? শক্তিপদর মামী?

কাননও অজ্ঞাতসারে রোয়াক থেকে নেমে ফুটপাতে দাঁড়িয়েছে।

রাধানাথ ফিসফিস করে বলে—ব্যাপার কি শক্তিপদ? উঁকি দিয়ে দেখ তো কে? ম্যানেজারের মামী শক্তিপদকে খুঁজবে কেন?

খুঁজবে কেন, সে উত্তর কে দেবে?

শক্তিপদর কি কথা কইবারই শক্তি আছে?

তবু উঠতে হয়, রাধানাথের ঠেলায় রিক্সাখানার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, আর ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মামী চীৎকার ওঠে—ওরে শক্তি বাবারে, তোর মামা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন রে!

উত্তাল তরঙ্গ কিছুটা শান্ত হ'লে মামীকে রোয়াকে তোলা হয়।

হাত ধরে তোলে কানন। কাননের মা উদ্‌ভ্রান্তের মতো রোয়াকে দাঁড়িয়ে থাকে।… জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে রিক্সাখানা ছেড়ে দেওয়া হয়।

মামী এতোক্ষণে একটু স্থির হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধস্বরে বলে—এমন অখদ্যে জায়গায়

তুমি আড্ডা দিতে এসেছো বাবা? সারা সহর ঘুরে বেড়িয়েছি আমি।…মুখপোড়া রিক্সাওলা বলে কিনা ম্যানেজার আবার কে? সে এখানে থাকে টাকে না।…শক্তিপদ দাস বলে একজনকে চিনি, রাধানাথের বাড়ি থাকে, সে তো কলের মজুর।…শোন দিকি কথা? চলো বাবা চলো, তোমার বাড়ীতে।…মানী লোক কখনো তো মুইয়ে ডুব দেননি, মরণকালে বলে গেলেন, চলে যেও শক্তির কাছে। আমাদের বস্তির একটি ছেলে সঙ্গে করে এনে বাস থেকে রিক্সায় তুলে দিয়ে পালালো, বলে—বড়লোকের বাড়ি যেতে পারবো না।

শক্তির মুখে তবু কথা নেই। সেই যে ঘাড় হেঁট করে থাকে, মুখই তোলে না। মামার শোকটা তার বড্ডই লাগলো বুঝি!

কানন বলে—আচ্ছা মামীমা, আপনি এখন এখানে একটু বিশ্রাম করুন, তারপর ঠিক জায়গায় যাবেন।

মামী সন্দিগ্ধভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে বলেন—না বাছা, এখানে আর বিশ্রাম টিশ্রাম দরকার নেই। দুঃখী মানুষ আমরা, আমাদের আবার বিশ্রাম!

…শক্তি, চলো বাবা, বাড়ী চলো।

এবারে শক্তিপদ মুখ তোলে।

পরিষ্কার ঠাণ্ডা গলায় বলে—আর কোথাও কোনো বাড়ী আমার নেই মামী! এই আমার আশ্রয়। এরা দয়া করে একটু আশ্রয় দিয়েছেন তাই এখানে আছি। রিক্সাওয়ালা তোমায় ঠিকই বলেছে, শক্তিপদ দাস কলের কুলিই!

অনেক ঝড়ের পর যখন চারিদিক শান্ত হয়েছে…মামী আশ্রয় পেয়েছেন কাননের মায়ের বিছানায়, আর মামীর জিনিসপত্রগুলো জায়গা পেয়েছে চৌকীর তলায়, তখন খানচারেক বাতাসা আর একঘটি জল নিয়ে শক্তিপদর বিছানার শিওরে এসে দাঁড়ালো কানন।

শক্তিপদর মামা মরেছে, অশৌচ। খায়নি কিছু। সকালে চান করে তবে খাবে।

—জল একটু খাও, শক্তিদা!

শক্তি শুয়েছিলো, ধড়মড় করে উঠে বলে—এখনো তুমি আমার মুখ দেখছো কানন?

কানন মৃদু হেসে বলে—কেন, মুখটা কি অপরাধ করলো?

—এতবড়ো হতভাগা মিথ্যেবাদীর মুখ দেখলে পাপ হয় কানন! আমাকে তোমার ঘেন্না হওয়া উচিত।

কানন এবারে প্রায় শব্দ করে হেসে উঠে বলে—মুখ্যু মেয়েমানুষের কি অতো উচিত অনুচিত জ্ঞান থাকে শক্তিদা? সে জ্ঞান থাকলে তো অনেক আগেই ঘেন্না হওয়া উচিত ছিলো।

—আগে? আগে তো তুমি—

—অনেক আগেই বুঝে ফেলেছিলাম শক্তিদা! মেয়েমানুষ যতোই মুখ্যু হোক, তাকে ঠকানো বড়ো শক্ত।…সে সব জেনে বুঝেও চুপ করে থাকে কেন জানো? পাছে তার পাখীর বাসাটুকু ভেঙে যায়!

শক্তিপদ বিহ্বলভাবে বলে—সব বুঝে ফেলেছিলে?

—স—ব!

—তবু তুমি—?

তবু আমি—বলে মুখ তুলে হঠাৎ একটু অন্য ধরণের হাসি হাসে কানন।

যে হাসির সঙ্গে মুখ্যু বিদ্বানের কোন তফাৎ নেই।

সুভাষ-কাকীমার নামে একেবারে ছিছিকার পড়ে গেলো! মেয়েমানুষ যে এতো বড়ো কঠিন প্রাণ হ'তে পারে এ যেন ধারণার অতীত।

মেয়েমানুষ কেন, কোনো মানুষের পক্ষেই কি সম্ভব? যে কঠোর কাজ মানুষের পক্ষেই অসম্ভব, তেমন কাজ যদি কোনো মেয়েমানুষে অম্লানবদনে করতে পারে, তা'হলে তা'কে লোকে কি না বলবে!

কতোটুকুই বা বলতে পারবে?

আমার নিজের কাকীমা আর মা বাড়ী এসে দালানে পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন, বোধ হয় মনের ওপর এতোবড়ো একটা ধাক্কার ধাক্কা সামলাতে।

সুভাষ-কাকীমারা আমাদের জ্ঞাতি নয়, কাজেই অশৌচের বালাই নেই। তা'ছাড়া—মৃত্যুবাড়ী থেকে ফিরে সধবা মানুষের নাকি তক্ষুনি স্নান করতে নেই, তাই মা-কাকীমা কাপড় ছেড়ে বসেছেন। পিসিমা একেবারে ঘাট থেকে একটা ডুব দিয়ে ফিরলেন।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ভিজে থানের আঁচলটা নিঙড়ে নিঙড়ে সেই নিঙড়ানো জলটুকু দিয়ে পা ধুয়ে দালানে উঠে পিসিমা চাঁচাছোলা মাজাঘসা গলায় বলে উঠলেন—যাক এতো দিনে গিরিনখুড়োর হাড় ক'খানা জুড়োলো। আহা, আজন্ম দুঃখী! রোগে-শোকে জরজর দেহখানা টিঁকেছিলো শুধু পরমায়ু ফুরোয়নি বলেই। নইলে মরেই তো ছিলেন!

আলনা থেকে শুকনো মটকার থানখানা পেড়ে নিয়ে প'রে মার কাছাকাছি বসে পড়ে থানের আঁচলখানা দিয়েই ন্যাড়া মাথাটা ঘসে ঘসে মুছতে লাগলেন পিসিমা।

মা নিশ্বাস ফেলে বললেন—'মানুষ জন্ম' হয়ে পর্য্যন্ত এমন সর্ব্বনেশে কথা কখনো শুনিনি ঠাকুরঝি!

—তুমি তো সেদিনের মেয়ে বৌ, তুমি শোনোনি—সে কিছু মস্ত কথা নয়। জগতের কেউ কখনো শুনেছে?

কাকীমা বললেন—আমি শুধু ভাবছি—পারলো কি করে? প্রাণ ছিঁড়ে পড়লো না! একদিন নয়, আধ দিন নয়, ছ'সাত মাস। এই দুরন্ত সংবাদ চেপে রেখে স্থির থাকা, উঃ ভাবাই যায় না!

—পাষাণে তৈরী বুক!—বললেন মা।

পিসিমা বললেন—ওগো কার ভেতরে কি থাকে, সে শুধু সময় এলেই ধরা পড়ে! সুভাষ ছোঁড়া যখন ছিলো, তখন মনে হ'তো বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই। তারপর—ছোঁড়া হঠাৎ চলেই বা গেলো কেন তাই বা কে বলবে? আমার মনে নিচ্ছে—বৌয়ের ভেতরের অন্য গুণ টের পেয়েই সুভাষ মনের ঘেন্নায় চলে গেছলো!

জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না। মানুষকে ধিক্কার দেবার যতোরকম ভাষা আছে, সব এঁরা একে একে ব্যবহার করবেন। শেষ পর্য্যন্ত সংসারের কাজের তাড়ায় যদি ওঠেন।

চুপচাপ খানিক শুয়ে অবেলায়—অন্যমনা-ভাবে বেরিয়ে পড়লাম।

আজ রবিবার। রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় ফেরার কথা। কিন্তু কিছুতেই যেন ইচ্ছে হলো না। সারাদিন সুভাষ-কাকীমা সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে শুনতেই বোধ করি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবন, সামান্য একটু আলোচনার বস্তু পেলে এরা আষ্টেপৃষ্ঠে তার সদ্ব্যবহার না করে ছাড়ে না। সে জায়গায় এতো বড় একটা সাংঘাতিক ব্যাপার! এরপর—সুভাষ-কাকীমাকে কোন প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হ'তে হবে কে জানে!

আচ্ছা, সুভাষ-কাকীমা কি কোন গর্হিত অপরাধ করেছেন? না কি কুলধর্ম্ম নষ্ট করেছেন? না সামাজিক কোনো অনাচার করেছেন? কি যে করেছেন, সে কথা বলা বড়ো শক্ত। যা'করেছেন, সে কাজ বোধ হয় কেউ কখনো করেনি, তাই সে-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোনো আলোচনা এখনো হয় নি।

ফিরতি পথে দেখি দীনেশ রায়ের বৈঠকখানার উঁচু রোয়াকে বসে জনকতক মিলে ওই আলোচনাই চালাচ্ছে। রোয়াকের সিঁড়িতে তিন চারটে হ্যারিকেন লণ্ঠন নিবুনিবু অবস্থায় কমিয়ে বসানো আছে। অন্ধকারে ঠিক চেনা কাউকেই যাচ্ছেনা।

শুক্লপক্ষে কেরোসিন খরচের দরকার বড়ো হয় না, রাতবিরেতে পথ হাঁটতে একটা লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ই যথেষ্ট। কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র। আজ গ্রামে একটা মৃত্যু ঘটে গেছে, আজ সন্ধ্যার পর থেকে পথে বেরোতে হাতে একটু আগুনের ছোঁয়া থাকা ভালো।

গ্রামের লোকের অন্ধকারে চোখে মাণিক জ্বলে। আমাকে দেখেই দীনেশ রায় হাঁক দিলেন—কে যাচ্ছে ওখানে? মনোতোষ না কি?

বাধ্য হয়ে এগিয়ে গেলাম।

দীনেশ রায় বললেন—আজকের দিনে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজী?

বললাম—বিকেলে বেরিয়েছি।

—আচ্ছা বোসো একটু। এই সুরেনদা তো তোমাদের দোর দিয়েই যাবেন, এক সঙ্গে যেও, আলো ধরে দাঁড়িয়ে দেবেন অখন।

—দরকার হবে না।—বলে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু যেতে দিচ্ছে কে?

দীনেশ রায় উদারকণ্ঠে বলে উঠলেন—তোমার দরকার নেই, আমার দরকার আছে। আমি তোমায় একা আঁধারে ছেড়ে দিতে পারিনা। এসো এসো।···তারপর আজ আর ফিরবে না বুঝি?

—আজ্ঞে না। কাল যাবো।

—কাল ছুটি আছে না কি?

—নাঃ ছুটি কিসের?

—তবে ?

জানি উত্তর দেবার স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখেও এঁরা প্রশ্ন করতে ছাড়বেন না। এই এঁদের বিশেষত্ব।

বললাম—এমনি গেলাম না আজ, ভালো লাগলো না।

দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন—হুঁ। ভালো আর লাগবে কোথা থেকে ? দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেছো একেবারে, কি বলো ? সুভাষের স্ত্রীর কীর্ত্তিকলাপ শুনলে তো ?

—শুনলাম।

—বলি তোমরা তো কলকাতায় থাকো হে, অনেক রকম কেতা দেখা অভ্যেস, এমন কেতা দেখেছো সেখানে ?

বিনীত ভাবে বললাম—আজ্ঞে না।

সুরেন সরকার গলা ঝেড়ে বললেন—সাফাই শুনলে তো ? বলে কিনা বুড়ো মানুষটার মনে দাগা লাগবে বলে—তাই! শ্বশুরের জন্যে প্রাণ ফেটে মরে যাচ্ছিলেন! ছেলে ভোলানো আর বলে কাকে।···বলি—তুই পারলি কি করে তাই বল ?

—অসৎ মেয়েদের রীতির কথা ছেড়ে দাও সুরেনদা, তারা কি পারে আর না পারে।··· খবরটা বুড়োর কানে উঠলেই তো—মাছ খাওয়া শাড়ী পরা ঘুচে যেতো!

মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা যন্ত্রণা বোধ করলাম।

বললাম—আচ্ছা কাকা, আমি চলি।

—আঁধারেই চললে ?

—হ্যাঁ।—নেমে পড়লাম।

দীনেশ রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—বলি পৈতে গাছটা গলায় আছে তো হে ? না কি কলকেতার ফ্যাসানে ধোবার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছো ? গাছতলা দিয়ে যাওয়া—মানো না তো কিছু! মৃত আত্মা তিনদিন তিনরাত জায়গা ছেড়ে নড়তে চায় না, ঘুরে বেড়ায় বুঝলে ?

গাছতলা দিয়ে যেতে যেতে আবার বাড়ীর বিপরীত দিকে ঘুরলাম।

মৃত আত্মা জায়গা ছেড়ে না নড়ে যদি তিনদিন ধরে সেইখানেই ঘুরে মরে, তা'হলে গিরীনঠাকুর্দ্দার আত্মাও নিশ্চয় কাছে পিঠে কোথাও ঘুরছে! এ সব ঘটনা টের পাচ্ছে, এসব আলোচনা শুনতে পাচ্ছে!

কি হচ্ছে সে আত্মা ? সন্তুষ্ট ? না কি এইসব গ্রাম্য বৃদ্ধদের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে চাইছে ? কে জানে কি!

সুভাষ-কাকীমার প্রতি খুব বেশী স্নেহভাব তো কখনো দেখিনি তাঁর। তা' ছাড়া—

সুভাষ কাকা "সিনেমা সিনেমা" হুজুগ করে বম্বে চলে যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি তো যতো দূর নয় ততো দূর খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন, পুত্র-বধূর ওপরও কম খাপ্পা হন নি। অবিশ্যি দোষ দেওয়াও যায় না।

ছ'টি সন্তানের মধ্যে সুভাষ তাঁর শেষ অবশিষ্ট সন্তান। সেই ছেলেও যদি বাড়ী থেকে উধাও হয়ে যায়, তার স্ত্রীর ক্ষমতা থাকেনা ধরে রাখবার, তা'হলে কি করে তিনি সেই অক্ষমতাকে মার্জ্জনা করতে পারেন? কি করে প্রসন্ন থাকতে পারেন বৌয়ের ওপর?

বৃদ্ধ শ্বশুর আর তরুণী পুত্রবধূ—এই সংসার। শ্বশুর যদি রাগ করে সাবু বার্লি সমেত ভারী কাঁসার বাটিটা বেআন্দাজী ছুঁড়ে মেরে বৌয়ের কপাল ফাটান, তা'হলেও কেউ ধরবার নেই।

প্রথম প্রথম নাকি খুব চিঠির ঘটা ছিলো সুভাষ কাকার, টাকাও পাঠিয়েছিলেন ক'বার, কিন্তু মাস ছয় সাত আর কোনো খবর নেই।

না টাকা, না চিঠি। সংসারে দারিদ্র্যের চরম! পাড়ার গিন্নীদের দিয়ে নিজের যা একটু সোনাদানা ছিলো, সবই বিক্রী করিয়েছিলেন সুভাষ-খুড়িমা।

বম্বে গিয়ে সুভাষ কাকা যে, কোনো কুহকিনীর কুহকজালে আটকা পড়ে গেছেন, সে বিষয়ে আর কারুর মতদ্বৈধ ছিলো না।

ওদের যে কি করে চলে, সেকথা গ্রামের কেউ কোনদিন ভেবে দেখেনি, কিন্তু ওদের নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিলো না!

একটা অসহায় মেয়েমানুষ যে নিজের জোরে দাঁড়িয়ে থাকবে, স্বামী অনাসক্ত হয়ে গেছে বুঝেও ভেঙে পড়বে না, সব সময় হেসে কথা কইবে লোকের সঙ্গে, এটা সত্যিই বড়ো দৃষ্টিকটু। কিন্তু সে তো তবু সহ্যের সীমানায় ছিলো! আর আজ যা জানা গেলো। এ যে সহ্যের অতীত।

আজ যা জানা গেলো—সেটা হচ্ছে এই—গিরীনঠাকুর্দ্দার মৃতদেহ যখন পড়ে, আর বাড়ী লোকে লোকারণ্য, তখন সুভাষ-কাকীমা পাড়ার সমস্ত মান্যগণ্য ভদ্রলোকদের সামনে একখানা খামের চিঠি ফেলে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন—এই নিন, এ চিঠি পড়ুন। পড়ে আমার কি কর্ত্তব্য আদেশ দিন। যদি কোনো প্রায়শ্চিত্তের দরকার থাকে, তার ব্যবস্থাও দেবেন।

এক পাশে দাঁড়িয়ে আমিও দেখছিলাম সব।

প্রবীণেরা সকৌতূহলে চিঠি কুড়িয়ে নিলেন এই ভেবে যে গিরীনঠাকুর্দ্দার হয়তো লুকানো টাকাকড়ি কিছু ছিলো, সেই সংক্রান্ত কোনো লেখাপড়া।

চিঠিটাই হাঁ হাঁ করে কুড়িয়ে নিয়েছে লোকে, বাক্যার্থের দিকে কান দেয়নি।

মুখছেঁড়া খাম, পুরনো চিঠি, বার করতেই যতোগুলো সম্ভব মাথা তার ওপরে ঝুঁকে পড়লো। কিন্তু এ কী? এ কি চিঠি, না জলন্ত আঙরা?

প্রবীণদের মুখভঙ্গী দেখে, যারা চিঠি পড়েনি তা'রা উদগ্রীব হয়ে তাকালো—ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা কি?

সতীশ কুণ্ডু একটু ক্ষোভ এবং ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাসি মুখে ফুটিয়ে, চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে বললেন—সকলেই যখন এখানে উপস্থিত আছেন, বলে ফেলাই ভালো! সুভাষ বাবাজী আজ সাত মাস হ'লো গত হয়েছেন! বম্বে থেকে তাঁর এক বন্ধু যথা সময়েই জানিয়েছেন, তবে বৌমা এযাবৎ সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন!

ঘরের মধ্যে কি বাজ পড়লো!

মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখার সংবাদ এমন কিছু নতুন নয়। সময়ে অসময়ে অবস্থা বিবেচনা করে লোকে এমন করে থাকে কখনো কখনো। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু সংবাদ গোপন করবে স্ত্রী? উদ্দেশ্যটা কি?

ভীড়ের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠলো!

প্রবীণারা চোখ গোল করে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, আর সুভাষ-কাকীমা ভাবলেশশূন্য মুখে শ্বশুরের অসুখের সময়ে ব্যবহৃত ঔষধের শিশি, কাঁচের গেলাস, পিকদানী, কাঁথাকানি, জামা কাপড় ইত্যাদি একত্রে জড় করতে লাগলেন। অতঃপর কে একজন মহিলা বললেন—হ্যাঁ সতীশ, বৌমার করণীয় কাজ তা'হলে কি হবে?

সতীশ কুণ্ডু বললেন—আপনারাই বলুন। আমার এই ষাট বছর বয়সে এমন ঘটনা তো দেখিনি সত্যদি, অজান্তে হয়—সে আলাদা। বলে অজান্তে সাপের বিষে দোষ লাগে না।

সত্যদি বললেন—ছাইপাঁশ শাঁখা সিঁদুরের ব্যবস্থা নয় আমি করে দিলাম, কিন্তু একটা প্রাচিত্তিরের দরকার তো? জেনে শুনে এমন অনাচার!···হ্যাঁ গা বৌমা, এ চিঠি চেপে রাখবার বুদ্ধি তোমায় কে দিলে বাছা?

সুভাষ-কাকীমা মুখ তুলে, কে জানে হয়তো বা একটু হেসেই বললেন—বুদ্ধি আর কে দেবে পিসিমা? বোধ হয় আমার দুর্মতিই দিয়েছে।

—যাই হোক, বলি এর একটা মানে তো আছে? যদি উড়ো চিঠি বলে অবিশ্বাস এসে থাকে, পাড়ার পাঁচটা বিচক্ষণ লোককে দেখাতে হয়তো?

—অবিশ্বাস তো করিনি পিসিমা!

—তা' হলে?

সুভাষ-কাকীমা এইবার হাতের কাজ থামালেন, স্থির ভাবে বললেন—ভেবেছিলাম বাবা বুড়ো মানুষ, জীবনভোর অনেক শোকতাপ তো পেয়েছেন, মরণকালে না হয় আর নাই পেলেন!

—এইটাই কি আর একটা সহজ মানুষের মতন কথা হলো বাছা?—সত্যপিসি

বললেন—যে যার কর্ম্মফল নিয়ে এসেছে, ভোগ না করে উপায় কি? এই যে তুমি ছ'মাস ধরে জেনে শুনে তার ভিটেয় বসে বিধবা হয়ে সধবার আচরণ করলে, তা'তেই কি তার ভালো করলে? এতে তার আত্মার অসদ্‌গতি হবে না?······যাক, এখন ভট্‌চাযকে ডাকো, কি বলে সে দেখি। নারায়ণ নারায়ণ।

ভট্‌চাযও 'নারায়ণ নারায়ণ' করতে করতে এলেন। শুনে এসেছেন তো সব!

তিনি বিধান দিলেন, যেহেতু গিরীনঠাকুর্দ্দা শ্বশুর, সেই হেতু তাঁর শেষ-কৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবধুর বৈধব্যসাজ গ্রহণ দৃষ্টিকটু। অতএব মৃতদেহ বার করার আগেই সুভাষ কাকীমার 'শেষকৃত্য' করে দেওয়া হোক।

সুভাষ-কাকীমা বললেন—আমার সঙ্গে কি আপনারা কেউ যাবেন পিসিমা? না, আমি একা গেলে চলবে?

সত্যপিসি গম্ভীরবদনে বললেন—তোমার অবিশ্যি কোনো সাহায্যের দরকার নেই দেখছি, তবে আমার তো একটা কর্ত্তব্য আছে? সেই আঠোরো বছর বয়েস থেকে এই কাজে চুল পাকালাম।···নাও চলো। ···থাক্‌ থাক্‌, গামছা কাপড় কিছু নেবার দরকার নেই।...নাও দীনেশ, তোমরা ততোক্ষণ ইদিক্‌কের গোছগাছ করো।

এতো বড়ো একটা কাণ্ডে সুভাষ-কাকীমা তাঁকে কাঁদবার কোনো সুযোগই দিলেন না দেখে বোধ হয় চটে গেলেন সত্যপিসি!

এসব হ'লো সকালের কথা। রবিবার বলেই আমি ছিলাম।

এখন বাড়ীর বিপরীত মুখে চলতে চলতে—কোন আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে কে জানে—গেলাম গিরীন ঠাকুর্দ্দারই বাড়ীতে। রাত হয়ে গেছে, সে কথা আগে খেয়াল হয়নি, খেয়াল হ'লো সুভাষ-কাকীমার দরজায় এসে।

ইতস্তত: করে চলেই আসছিলাম, হঠাৎ দেখলাম পঞ্চা কলুর ছোট মেয়েটা বেরিয়ে এসে বললো—দাদাবাবু এসে ফিরে যাচ্ছেন যে? কাকীমা শুধালো কিছু দরকার আছে?

বললাম—না, এমনি দেখতে এসেছিলাম। তুই এখানে রাত্তিরে থাকবি বুঝি?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, মা পেইঠে দেলো। বললে—"বুড়ো তো ম'লো, বামুন দিদি একা থাকবে? নন্দী, তুই যা আত্তিরটুকু থাকগে!"

—পাড়ার আর কেউ নেই?

—না তো!

কথার মাঝখানে সুভাষ-কাকীমা বেরিয়ে এলেন। জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় সাজ-সজ্জার পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছেনা তাই রক্ষে।

সুভাষ-কাকীমা আমার চাইতে বয়সে বড়ো নয়, নিজের কাকীও নয়, তাই প্রণাম কখনো করিনি, অতএব 'ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম!

বললেন—মনোতোষ না? এমন সময় এদিকে?

—ভাবলাম আপনার একটা খবর—

—এসেছো তো ভালোই হয়েছে ভাই—বলেই থামলেন, সামান্য একটু হেসে বললেন—'ভাই' বলেই বলছি কিছু মনে কোরোনা, 'বাবা বাছা' করে বলতে পারি না। বলছি—গ্রামে আর কাউকে বলতে পারিনি, তোমায় বলছি—তোমার কাকার তো পারলৌকিক কাজের কিছুই হয়নি, এতোদিন পরে কিছু হয় কিনা, কিংবা কি হয়, তোমাদের কলকাতায় কালীঘাটের কোনো পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করতে পারো?

বললাম—আচ্ছা।

—আর শোনো, ওই সঙ্গে আমার কোনো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যদি দেন!

আমি ক্রুদ্ধ স্বরেই বললাম—কেন? আপনার আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের?

—মস্ত একটা পাপ তো করলাম এতোদিন ধরে? বিধবা হয়ে জেনে শুনে সে খবর চেপে রেখে সধবার আচরণ করা! হিন্দুধর্ম্ম কি এতোটা অনাচারের ভার সইতে পারবে?

আমি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলাম—'পাপ' বলে নিজে স্বীকার করেন আপনি?

—করেছি বৈকি ভাই, হাজার হোক হিন্দুরই মেয়ে তো? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের লোভটাও মস্ত হয়ে উঠেছিলো। ভাবলাম বুড়ো মানুষকে এই শেষ জীবনে আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিই কেন? ওকে পুত্রশোকের হাত থেকে রক্ষা করতে তো আমিই পারি? দেখি না ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে! তাই রাবণ রাজার মতো নিজের মৃত্যুবাণ প্রাণপণ যত্নে লুকিয়ে তুলে রাখলাম।

রাগ করে বললাম—তা' যথাসময়ে তো আবার নিজে হ'তেই বার করে দিয়েছেন। এতোদিনের যন্ত্রণার কথা থাক, আজকের লাঞ্ছনাতেও কি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?

সুভাষ-কাকীমা এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—কি জানি, বুঝতে পারছি না! মনে হচ্ছে একটা কিছু শাস্তিই হোক! খুব কঠিন শাস্তি! এতোদিন ধরে হেসে গল্প করে সহজ হ'য়ে বেড়ানোর জন্যে ভয়ঙ্কর কোনো শাস্তি!...অজান্তে সাপের বিষ খেলে দোষ হয়না জানি, কিন্তু জেনে বুঝে সে বিষ হজম করলে? তার জন্যে কোনো শক্ত বিধান শাস্ত্রে নেই?

উত্তর জোগাচ্ছিল না। হঠাৎ বারো বছরের 'নন্দী' চৈতন্য করিয়ে দিলো—দাদাবাবু এবার ঘরে যাও। গাঁ ঘরের লোক তো ভালো নয়! কোথায় অনাচকানাচ দে' দেখবে, আর কুচ্ছো রটাবে। 'আত' হয়েছে তো!

কথাটা বড়ো নিদারুণ সত্যি!

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেও এক কথায় উল্টো মুখ ধরতে পারাও শক্ত। তাই বললাম—একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করবো কাকীমা, গিরীনঠাকুর্দা আপনার সঙ্গে যা ব্যবহার করতেন, সে তো কারুর অবিদিত নেই? অথচ তাঁর জন্যে ..

—এটা কি একটা কথা হ'লো মনোতোষ—কাকীমা হেসে ফেললেন—উনি রাগের মাথায় যখন তখন আমার মাথা লক্ষ্য করে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন বলে আমি জেনে বুঝে ওঁর মাথায় লাঠি বসানোর ভারটা নেবো?

—কিন্তু লোকে কি এর মর্ম্ম বুঝলো?

—লোকের বোঝাটাই তো শেষ কথা নয় ভাই!

—আচ্ছা আর একটি শেষ কথা—কিছুতেই এ সন্দেহকে দূর করতে পারছি না। ভাবছি কি করে পারলেন?

সুভাষ-কাকীমা এবারেও একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারি না মনোতোষ—কি করে পারলাম?

॥ সম্পূর্ণ নতুন উপন্যাস ॥

লবণ-স্বাদ

বদলী করে দিয়েছে, নতুন অফিসের কর্মভার গ্রহণের তারিখ, ঘণ্টা মিনিটে নির্দেশ করে দিয়েছে, দেয়নি শুধু বাসার আশ্বাস।

বাঙালীর ছেলে পাঞ্জাব-সীমান্তের একটি মফঃস্বল শহরে, যেখানে অন্ততঃ তিনশো মাইলের মধ্যে কোনও আত্মীয়ের ছায়া মাত্র নেই, সেখানে হঠাৎ গিয়ে পড়ে যথাসময়ে কাজে যোগ দেবার অসুবিধেটা কতদুর সেকথা বোঝবার দায় সরকারের নয়।

চাকরি নেবার সময় বণ্ডে সই করনি তুমি, যে কোনও জায়গায় যেতে প্রস্তুত ? মনে নেই সেকথা ?

সরকার কি বণ্ডে সই করেছিল, যখন যেখানে পাঠাবে তোমাকে, তোমার জন্যে ঘর সাজিয়ে রাখবে ? তুমি তো তুমি কোন্ ছার, নেহাৎ চুনো পুঁটি না হও চিংড়ি-চিতলের চাইতে বেশীও নও! বলে কত রুই-কাতলাই বদলী হয়ে পরের বাসায় নাক গুঁজে থেকে দিন কাটাচ্ছে, কাপড়ের তাঁবুতে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সংসার পেতে বসেছে!

তবু তো তুমি প্রভাত গোস্বামী, ঝাড়া হাত-পা মানুষ। না স্ত্রী, না পুত্র, না ডেয়ো, না ঢাকনা। একটা সুটকেস, একটা বেডিং, একটা জলের কুঁজো, একটা টিফিন কেরিয়ার, সর্বসাকুল্যে এইতো তোমার সম্পত্তি। এতেই ভাবনায় অস্থির ?

তা সত্যি বলতে প্রভাত একটু বেশীই ভাবছে। তার কারণ এ যাবৎ নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেওয়ার অবস্থা ওর কখনো ঘটেনি। হাওড়ায় দেশের বাড়ীতে বাড়ীর ছোট-ছেলের প্রাপ্য পাওনা পুরোদস্তুর ভোগ করেছে, চাকরির প্রথম কালটা কাটিয়ে এসেছে লক্ষ্ণৌতে কাকার বাড়ী। কাকাই চাকরির জোগাড়দার। তিনি কী অফিসে, কী বাসাতে সদাসতর্ক দৃষ্টি রেখে আসছিলেন ভাইপোর সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে। কিন্তু বিধি হলো বাদী।

বদলীর অর্ডার এলো।

প্রভাতের মা অবশ্য খবরটা শুনে ভেবে ঠিক করে ফেললেন, এ নিশ্চয় ছোট বৌয়ের কারসাজি, বরকে বলে-কয়ে ভাসুরপোর বদলীর অর্ডার বার করিয়ে দিয়েছে, কারণ—

কারণ আর নতুন কি, বলাই বাহুল্য। পর নিয়ে ঘর করায় অনিচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়।

খুড়ি চেষ্টা করছিলেন, সামনে পূজোর ছুটিতে নিজের বিয়ের যুগ্যি বোনঝিটিকে নিজের কাছে আনিয়ে নেবেন, এবং অদুর ভবিষ্যতে দিদির কাছে ঘটকী বিদায় আদায় করবেন।

কিন্তু হলো না।

জগতের বহুবিধ সাধুইচ্ছের মত সে ইচ্ছেটা আপাততঃ মুলতুবি রাখতে বাধ্য হতে হলো তাঁকে। বদলিটা পুজো পর্যন্তও ঠেকানো গেল না। পূজোর ছুটিতে চলে আসবার জন্যে

বারবার অনুরোধ জানিয়ে কাকা-কাকী বিদায় দিলেন। প্রভাত সেই বিষণ্ণ আর্দ্রতার ছোঁয়ার সঙ্গে নিজের অসহায়তার ভয়াবহতা মিশিয়ে চিত্তকে বেশ ঘনতম আবৃত করে গাড়ীতে উঠলো।

আর বেচারা হতভাগ্যের ভাগ্যে, সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে গেল প্রবল বর্ষণ।

সারারাত্রি ঠায় জেগে কাটিয়ে দিলো প্রভাত, বন্ধ কামরার মধ্যে বৃষ্টির শব্দের প্রচণ্ডতা অনুভব করতে করতে। গাড়ীতে আরও তিনজন আরোহী ছিলেন, তাঁদের প্রতি ঈর্ষা কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে প্রভাত নিশ্চিত হলো। আর যাই হোক, ওরা কেউ বদলী হয়ে যাচ্ছে না।

তবে বৃষ্টির আওয়াজ একটু উপকার করলো প্রভাতের। তিন দিক থেকে তিনটি নাকের আওয়াজ তার কর্ণকুহরকে শিহরিত করতে ততটা পেরে উঠলো না।

কানের থেকে মনটাই তার কাছে প্রধান হয়ে রইলো।

স্টেশনে যখন নামলো প্রভাত, তখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু শেলেট পাথরের মত আকাশের নীচে পৃথিবীটা যেন শোকগ্রস্তের মত জড় পুঁটলি হয়ে পড়ে আছে।

ভেবেছিল, কুলিও পাওয়া যাবে কিনা। কিন্তু আশঙ্কা অমূলক, কুলি যথারীতি গাড়ী থামবার আগেই গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রভাতের অনুমতি ব্যতিরেকেই তার জিনিসপত্র টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে ফেললো এবং কোথায় যাবেন ও গাড়ী হবে কিনা শুধিয়ে মুখপানে তাকিয়ে রইলো।

আর ঠিক এই মুহূর্তে—এই ভয়াবহ সঙ্গীন মুহূর্তে ঘটে গেল এক অদ্ভুত অঘটন।

অতএব সেই অঘটনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রভাতকে স্বীকার করতেই হলো কলিতে ভগবান নেই, এটা ভুল সিদ্ধান্ত। ভগবান আছেন, এবং আর্তের আকুল আবেদন তাঁর কানে এক ক্ষেত্রেও অন্ততঃ পৌঁছোয়।

আর পৌঁছলে আর্তত্রাণকল্পে দূতও পাঠান তিনি।

সেই দূত হিসেবে এসে দাঁড়ালেন একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক, ও অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, একটি রীতিমত রূপসী তরুণী।

খুব সম্ভব পিতা কন্যা।

প্রভাতের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক দরাজগলায় বলে উঠলেন, 'কোথায় উঠবেন ?'

প্রভাত প্রথমটা থতমত খেলো। এমন পরিচিত ভঙ্গীতে যিনি প্রশ্ন করলেন, তিনি পূর্বপরিচিত কিনা স্মরণ করতে চেষ্টা করলো, তারপর সচকিত হলো। পরিচিত নয়। কিন্তু একটি রূপসী তরুণীর সামনে বুদ্ধু ব'নে চুপ করে থাকার লজ্জা বহন করা চলে না। তাই মৃদু হেসে বললে, 'ঠিক এই মুহূর্তে নিজেকেই ও প্রশ্ন করছিলাম।'

'বুঝেছি!' সবজান্তার ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে ভদ্রলোক কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে

হেসে বলেন, 'বলিনি তোকে ? মুখ দেখেই বুঝেছি বাসার ব্যবস্থা হয়নি। নতুন বদলী হয়ে এলেন বোধহয় ? ওপরওলাদের আক্কেল দেখছেন তো ? বদলী করেই খালাস। সে ওঠে কোথায়, খায় কি, তার দায়িত্ব নেই। পাঁচ বচ্ছর ধরে শুনছি মশাই, গভর্ণমেন্ট কোয়ার্টার্স তৈরি হবে। তা সে শোনাই সার। ছেলেবেলায় শুনতাম আঠারো মাসে বচ্ছর, এখন দেখছি ছাব্বিশ মাসে—'

ভদ্রলোকের কথার মাঝখানে ফাঁক পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হয়ে, ফাঁকটা একরকম করে নিয়েই বলে ওঠে প্রভাত, 'তা আপনি তো এখানকার সব জানেন শোনেন। বলুন দিকি, সুবিধেমত কোনও মেস বা হোটেল কোথায় পাওয়া যেতে—'

'বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! আমি তবে নাহোক আপনাকে দাঁড় করিয়ে সময় নষ্ট করছি কেন? মল্লিকা, শোন্! কথা শোন্ ভদ্রলোকের! আমার নিজের আস্তানা থাকলে আমি সন্ধান দিতে যাবো কোথায় মেস আছে, কোথায় হোটেল আছে! চলুন চলুন, এই গরীবের গরীবখানায় গিয়ে উঠুন তো। তারপর বুঝবেন থাকতে পারবেন কি, না পারবেন!'

প্রভাত ব্যাকুল স্বরে বলে, 'না না সে কি, আপনার বাড়ীতে গিয়ে উৎপাত করবো কেন, আপনি শুধু যদি—'

'আহা-হা, উৎপাতে কি! এ তো আমার ভাগ্য! আপনাদের মত অতিথি পাওয়া পরম ভাগ্য! আজ ভালো লোকের মুখ দেখে উঠেছিলাম মল্লিকা, কি বলিস ? চলুন চলুন, এই যে গরীবের একখানা হাঁটুভাঙা পুষ্পরথও আছে।'

অদূরে অবস্থিত একটি টাঙার দিকে চোখ পড়ে প্রভাতের। ভদ্রলোক কুলিটাকে চোখের ইসারা করেন এবং মুহূর্তে সে কর্তব্য পালন করে। আর প্রভাত এক নজরে দেখে এইটুকু অবশ্য অনুভব করে, গাড়ীর ব্যাপারে ভদ্রলোক অতি বিনয়ী নয়। গাড়ীটা হাঁটুভাঙাই বটে।

সেই গাড়ীতেই যখন ভদ্রলোক প্রভাতকে উঠিয়ে দিয়ে সকন্যা নিজে উঠে পড়েন, তখন প্রভাত সভয়ে না বলে পারে না, 'ভেঙে যাবে না তো ?'

আশপাশ সচকিত করে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক। হাসির দাপটে দুলে দুলে বলেন, 'না মশাই, সে ভয় নেই, দেখতে যেমনই হোক ভেতরে মজবুত!'

'কিন্তু আপনি ওদিকে কেন ?' প্রভাত তারস্বরে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'আপনি এদিকে আসুন। আমিই কোচ্‌ম্যানের পাশে—'

কিন্তু ততক্ষণে বিশ্রী একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ী চলতে সুরু করেছে।

ভদ্রলোক ওদিক থেকে বলেন, 'না মশাই, আমার আবার উল্টোদিকে ছুটলে মাথা ঘোরে।'

অতএব পরিস্থিতিটা হলো এই, টাঙার পিছনের সিটে প্রভাত আর মল্লিকা। প্রতিমুহূর্তে ঝাঁকুনি খেতে খেতে আর পরস্পরের গায়ে ধাক্কা লাগাতে লাগাতে উল্টোমুখো ছুটতে লাগলো টাঙাটা।

যতটা সম্ভব সঙ্কুচিত হয়েও প্রভাত সেই দুরূহ অবস্থা থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হলো না, আর মনে মনে বলতে বলতে গেল, মাথা ঘোরাবার ব্যবস্থাটা তাহলে আমার জন্যেই বহাল হলো!

এও ভাবলো, ভদ্রলোক বাংলা থেকে বহুদূরে আত্মীয়সমাজের বাইরে থাকেন বলেই এমন মুক্তচিত্ত।

যাই হোক, আপাতত যে 'প্রবাসে বাঙালী' লাভ হলো, এ বহুজন্মের ভাগ্য। অন্তত: আজকের মত মালপত্র রেখে অফিসটা তো দর্শন করে আসা যাবে। তারপর কালই একটা কোনো ব্যবস্থা করে নিতে হবে! সরকারি অফিস যখন আছে, মেস বোর্ডিং কোথাও না কোথাও যাবেই জুটে।

আবার ভাবলো, এ যুগেও তাহলে এরকম অতিথিবৎসল লোক থাকে!

ভদ্রলোক যদি একা হতেন, হয়তো প্রভাত কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হতো, হয়তো ভাবতো এতই বা আগ্রহ কেন? মতলব খারাপ নয় তো? কোনো গুণ্ডার আড্ডায় তুলে নিয়ে গিয়ে টাকাকড়ি কেড়ে নেবে না তো!

কিন্তু সকল সন্দেহ মুক্ত করে দিয়েছে মল্লিকার উপস্থিতি।

বুঝে ফেলেছে, আর কিছুই নয়, বাঙালীহীন দেশে বাঙালী-পাগলা লোক!

কিন্তু মেয়েটা একটাও কথা কয়নি কেন? বোবা না কি? বাপ তো বারবার ডেকে ডেকে সালিশ মানছিল। যার জন্যে নামটা জানা হয়ে গেছে। বোবাকে কি কেউ ডেকে কথা কয়?

প্রভাত একবার চেষ্টা করে দেখবে না কি? আচ্ছা কী কথা বলা চলে? এখানের আবহাওয়া? কতদিন এদেশে আছেন? না কি আপনাদের বাসা আর কত দূরে?

আলাপ জমাতে গেলে ভদ্রলোক বিরক্ত হবেন? নাঃ, তা নিশ্চয়ই নয়। মেয়েকে যখন এভাবে বসতে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে সোজামুখো ছুটছেন, তখন মাথার পিছনে কান খাড়া করে রেখেছেন বলে মনে হয় না।

ত্রিভঙ্গঠামে হলেও টাঙাটা ছুটছিল ভালোই।

দু'পাশে নীচু জমি, সেখানে সবুজের সমারোহ, মাঝখানে সরু আলরাস্তা চড়াই উৎরাইয়ের বৈচিত্র্যে লোভনীয়।

ক্ষণে ক্ষণে ঝাঁকুনি!

তা সেটা অস্বস্তিকর হলেও তেমন বিরক্তিকর তো ঠেকছে না কই। অনেকক্ষণ চলার

পর, প্রভাত যখন অনুমান করছে লোকালয়ের বাইরে চলে এসেছে, তখন দূরে থেকে কয়েকটা ছোট ছোট কটেজ দেখা গেল। ওদেরই একটা নিশ্চয়ই। প্রভাত এবার মনের জোর সংগ্রহ করে ধাঁ করে বলে ফেললো, 'আর বেশীদূর আছে নাকি?'

মল্লিকা চমকালো না।

বরং মনে হলো যেন একটা কোনো প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুতই হচ্ছিল। কারণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, 'ওই তো দেখা যাচ্ছে।'

• কথা বাড়াবার জন্যেই বলে প্রভাত, 'ওদের মধ্যে কোনটা?'

'সবগুলোই।'

'সবগুলো!'

'হ্যাঁ। তা ও তো কুলিয়ে উঠছে না, আরও বাড়ী তৈরির কথা হচ্ছে।'

বিস্ময় বোধ না করে পারে না প্রভাত।

পরিবার বড় হলে বাড়ী বড় করে তৈরি করে লোকে, আলাদা আলাদা কটেজ, এটা কি রকম। তবু বলে, 'খুব বড় জয়েণ্ট ফ্যামিলি বুঝি?'

হঠাৎ মল্লিকা অনুচ্চ একটু হেসে ওঠে। ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে 'সামনে-ছোটা' ভদ্রলোককে একবার দেখে নেয়, তারপর বলে, 'এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারেন নি? কী ছেলেমানুষ আপনি!'

বুঝতে পারবে!

কী বুঝতে পারবে প্রভাত!

ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না কোনদিক থেকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। মল্লিকাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা করছে। তাই ওই কটেজগুলোর মধ্যেই বোধগম্য কিছু আছে কিনা দেখবার জন্যে অনবরত ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে থাকে।

বেশীক্ষণ অবশ্য সন্দেহদোলায় দুলতে হলো না। টাঙাটা ঝড়াং করে থেমে গেল এবং ভদ্রলোক নেমে পড়ে বললেন, 'এই যে এসে গেছি। সাবধানে নামুন প্রভাতবাবু।'

প্রভাতবাবু!

নাম জানাজানিটা কখন হলো? প্রভাত সবিস্ময়ে বলে, 'আমার নামটা জানলেন কি করে?'

'কি করে?' একটু হেসে বললে, 'হাত দেখে। সুটকেসের ওপর টিকিট এঁটে রেখে নিজেই ভুলে যাচ্ছেন মশাই? আসুন, এই গরীবের গরীবখানা। এই সামনের ছোট্টখানি নিয়ে সুরু করেছিলাম। আপনাদের পাঁচজনের কল্যাণে আশেপাশে আস্তে আস্তে—সাবধানে। পাথরটার ওপর পা দিয়ে আসুন। সারারাত বৃষ্টি পড়ে কাদা—মল্লিকা, তুই

গণেশকে পাঠিয়ে দিগে যা। জিনিস-পত্রগুলো নামিয়ে নিক। প্রভাতবাবু সাবধান, শুধু এই পাতা পাথরের ওপর দিয়ে—'

সাবধানে পা টিপে টিপে এসে প্রথম কটেজটার সামনে দাঁড়ায় প্রভাত, আর সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ে।

'আরাম কুঞ্জ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য মডারেট চার্জে আহার ও বাসস্থান। প্রোঃ এন্ কে চ্যাটার্জী।'

কী বোঝা উচিত ছিল, এতক্ষণে বুঝতে পারে প্রভাত। জলের মত পরিষ্কার।

লোকালয়ের বাইরে বহুবিস্তৃত জমি নিয়ে চ্যাটার্জির 'আরাম কুঞ্জ।'

ঘরের পিছনে বারান্দা। সরু একফালি, তবু তাতেই দুখানি বেতের চেয়ার, একটি ছোট টেবিল।

চায়ের ট্রেটা চাকরেই দিয়ে যায়, তবে তত্ত্বাবধানে আসে মল্লিকাই। হেসে একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বলে, 'এতক্ষণে বুঝেছেন বোধহয়?'

নতুন বাড়ী, ছবির মত সাজানো ঘর, পিছনের এই বারান্দা থেকে যতদূর চোখ পড়ে, উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রান্তরের সীমায় আকাশের কোলে পাহাড়ের নীলরেখা। মেঘমেদুর আকাশের বিষণ্ণতা কেটে আলোর আভাস উঁকি দিচ্ছে। সৌন্দর্যে মোহগ্রস্ত প্রভাত এতক্ষণ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সেইদিকে, চা এবং মল্লিকা, দু'টোর চাঞ্চল্যে চোখ ফিরিয়ে হেসে বলে, 'একটু একটু।'

'আপনি একটু বেশী সরল।'

'তার চাইতে বলুন না কেন, একটু বেশী নির্বোধ।'

'বলাটা ভদ্রতা নয়, এই যা।'

'কিন্তু কি করে জানবো বলুন? ভাবলাম প্রবাসে বাঙালী—'

মল্লিকা হেসে ওঠে।

প্রভাত ভাবে, ঠোঁটে রঙের প্রলেপ বলেই কি দাঁতগুলো অত শাদা দেখাচ্ছে? কিন্তু তাতে শাদাই দেখাবে, অমন মুক্তোর মত নিখুঁত গঠনভঙ্গী হবে?

'জায়গাটা বড় সুন্দর।'

'হ্যাঁ।' মল্লিকা ঈষৎ হাসির সঙ্গে বলে, 'নামটা যখন 'আরাম কুঞ্জ!' কিন্তু হাসির সঙ্গে মুখটা অমন কঠিন হয়ে ওঠে কেন ওর?

'বাস্তবিক সার্থকনামা। কিন্তু আমাকে তো এক্ষুনি বেরোতে হবে। আমার অফিসটা কতদূরে, উত্তরে কি দক্ষিণে, পূর্বে কি পশ্চিমে কিছুই জানি না। এখানের ব্যবস্থাটাই বা কি রকম হবে—মানে আপনার বাবাকে তো আর দেখতে পাচ্ছি না।'

'পাবেনও না!' মল্লিকা হেসে ওঠে, 'ওই একবার যা স্টেশনে দর্শনের সৌভাগ্য। আবার গেছেন লোক ধরতে—কিন্তু উনি আমার বাবা নয়, মামা।'

প্রভাত যেন একটু বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

ভদ্রলোক তাহলে স্রেফ হোটেলের আড়কাঠি। আর এই সুসজ্জিতা সুবেশা রূপসী তরুণী তাঁর মেয়ে না হলেও ভাগ্নী।

তবে আসল মালিক বোধহয় এর বাবা।

• শালাকে লাগিয়ে রেখেছেন লোক ধরে আনতে! কিন্তু সারাক্ষণ লোক কোথায়? ট্রেন তো আর বারবার আসে না।

সেই সন্দেহই ব্যক্ত করে প্রভাত।

মল্লিকা বলে, 'ওসব অনেক সিক্রেট! বুঝবেন না।'

'তা নাহয় বুঝলাম না। কিন্তু এখানে থাকার ব্যবস্থা কি, চার্জ কি রকম, এখান থেকে অফিস যাওয়া সম্ভব কিনা, এগুলো তো বুঝতে হবে।'

'আমার কাছে সবই জানতে পারেন।'

'আপনিই কর্ণধার?'

মল্লিকা হঠাৎ চোখ তুলে কেমন যেন একরকম করে তাকালো। তারপর বললো, ' 'দেখাশোনা করি। চা টা খান। এখুনি তো বেরোবেন, বলছেন। ভাত—'

'না না, ওসব কিছু না। এই এতবড় ব্রেকফাস্ট করে—চাজটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না।'

মল্লিকা হেসে ওঠে।

'আচ্ছা ভীতু লোক তো আপনি! মারাত্মক কিছু একটা নয়। চলুন, দেখাইগে খাতাপত্তর।'

চার্জ? না এমন কিছু মারাত্মক সত্যিই নয়।

ব্যবস্থার তুলনায় তো নয়ই।

ব্যবস্থা যে এত উত্তম হতে পারে, এটা প্রভাতের ধারণার মধ্যে ছিল না। 'আরাম কুঞ্জে'র শুধু যে নিজস্ব একটা টাঙা আছে তাই নয়, একখানা জিপও আছে এবং সেই জিপখানা বোর্ডারদের জন্যে সর্বদা খাটে, নিয়ে যায় শহরের মধ্যস্থলে, অফিস পাড়ায়, কর্মকেন্দ্রে।

'নইলে আপনারা গরীবের আস্তানায় থাকবেন কেন? এ আপনার গিয়ে খোলা বাতাসটাও পেলেন, আবার কাজকর্মেরও অসুবিধে হলো না—'

প্রোঃ এন্ কে চ্যাটার্জি বলেন, 'আপনার আশীর্বাদে যিনি একবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তিনি বারে বারে পায়ের ধুলো দেন।'

হ্যাঁ, চ্যাটার্জির দর্শন আর একবার মিলেছে।

কোনও রকম অসুবিধে হচ্ছে কিনা জানাবার জন্যে এসেছে। বারে বারে প্রশ্ন করছেন।

প্রভাত হেসে বলে, 'অসুবিধে কি মশাই, বরং সুবিধেটাই এত বেশী হয়ে যাচ্ছে যে ভয় হচ্ছে, এরপর আর কোথাও—'

'এরপর আর কোথাও মানে?' হাঁ হাঁ করে ওঠেন চ্যাটার্জি, 'আবার কোথায় যাবেন? নিজের ঘরবাড়ীর মতন থাকবেন। ওইজন্যেই যার টানা লম্বা ঘরদালান না করে ছোট ছোট কটেজ করা।'

প্রভাত কুণ্ঠিত হাস্যে বলে, 'কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এত আসে?'

'বলেন কি মশাই?'

হা হা করে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক, 'দেখতে নিরীহ হলে কি হবে, জায়গাটা কতবড় বিজনেস ঘাঁটি! অবিশ্যি একদিক থেকে বলেছেন ঠিকই, বাঙালী কমই আসেন। মানে, বিজনেসের ব্যাপারে তো বুঝতেই পারছেন?'

'কতদিন আছেন আপনি এখানে?'

'ওঃ, সে কী আজ? রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম 'ধুত্তোর বাংলা দেশ!' তারপর কোথা দিয়ে যে কি হলো! এখানেই—'

'দেশে আর কখনো যাননি?'

চ্যাটার্জি একবার তীব্র কটাক্ষে প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন। নিছক সরল কৌতূহল, না আর কিছু?

নাঃ, সরল বলেই মনে হচ্ছে।

বোকা প্যাটার্নের ছেলেটা!

বলেন, 'গিয়েছিলাম! একবার বাপ মরতে গিয়েছিলাম, আর একবার বিধবা বোনটা মরতে বাচ্চা ভাগ্নীটাকে কুড়িয়ে নিয়ে চলে এসেছি, ব্যস! সেই অবধি।'

প্রভাত হাসে, 'কিন্তু এমন নিখুঁৎ বাঙালী রয়ে গেছেন কি করে বলুন তো? এতদিন থাকলে লোকে তো—'

'বলেন কি মশাই, বাঙালীর ছেলে, বাঙালী থাকবো না? যাক্, তাহলে অসুবিধে কিছু নেই?'

'না না, মোটেই না। আপনার বোর্ডিংয়ের নামকরণ সার্থক!'

চ্যাটার্জি একটু মিষ্ট মধুর হাসেন, 'হ্যাঁ, সকলেই অনুগ্রহ করে ওকথা বলে থাকেন। ক্রমশঃই বুঝবেন, কেন নিজের এত গৌরব করলো চ্যাটার্জি। এ তল্লাটে 'আরাম কুঞ্জ' বললে চিনবে না এমন লোক নেই। আর ওই যা বললাম, একবার যিনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন—'

প্রভাত সসঙ্কোচে বলে, 'কিন্তু আমাকে যে এখানে থাকতে হবে। মানে যতদিন না ফের বদলি হচ্ছি।'

'কি আশ্চর্য! থাকবেন তার চিন্তার কি আছে?' চ্যাটার্জি মুচকে হাসেন, 'দেখবেন, এখান থেকে আর বদলি হতেই চাইবেন না। তবে শুনুন—' চ্যাটার্জি চুপি চুপি বলেন, 'স্থায়ী বোর্ডারদের চার্জ অনেক কম! ব্যবস্থা করছি বলে তো আর আক্কেলের মাথা খেয়ে বসিনি মশাই। বিবেচনাটা আছে। দেখবেন ক্রমশঃ, চ্যাটার্জির বিবেচনার ত্রুটি পাবেন না।'

'স্থায়ী বোর্ডারদের চার্জ অনেক কম—' এই আশ্বাস বাণীটি হৃদয়ে মধুবর্ষণ করতে থাকে। হৃষ্টচিত্তে প্যাড্ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসে প্রভাত।

মাকে লেখে, কাকাকে লেখে।

মাকে লেখে—'মা তোমাদের কাছ থেকে আরও অনেক দূরে চলে এসেছি। আসবার সময় মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অজানা জায়গা—কোথায় থাকবো, কি করবো। কিন্তু ভাগ্যক্রমে স্টেশন থেকেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। একটি বাঙালীর হোটেল পেয়েছি, বাঙালী রান্নাও খেলাম। ঘর নতুন, সুন্দর সাজানো, বাড়ীটি ছবির মতন, আর জায়গাটা এত চমৎকার যে, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের সকলকেই দেখাই! ঘরের পিছনের বারান্দায় বসলে যতদূর চোখ চলে, যাকে বলে মুক্ত প্রান্তর, আর তার ওপারে পাহাড়। পরে আবার চিঠি দেবো। প্রভাত।'

কাকাকে লিখলো, 'কাকা, তোমাদের কাছ থেকে এসে মন কেমন করছে, একথা লিখতে গেলে ছেলেমানুষী, তাই আর লিখলাম না। থাকার খুব ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেছে। পরে আবার চিঠি দিচ্ছি। তুমি ও কাকীমা প্রণাম জেনো। আমার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থেকো। কাকীমাকে বোলো, জায়গাটা খুব সুন্দর।

ইতি—

প্রভাত।'

দু'জনকেই জানাতে উদ্যত হচ্ছিল, মল্লিকার মত একটি মেয়েকে এরকম জায়গায় দেখতে পাওয়ার বিস্ময় বোধটা, কিন্তু কিছুতেই ভাষাটা ঠিকমত মনে এলো না! ভাবলো, যাকগে, কী আর এমন একটা খবর।

ভাবলো কিন্তু সেই 'কী আর এমনটা'ই মনের মধ্যে একটা খবরের মত কানাকানি করতে থাকলো।

সত্যি, আশ্চর্য! এ ধরনের বাঙালী পরিবার পরিচালিত হোটেল, এখানে দেখতে পাওয়া অভাবনীয়। পুরীতে কাশীতে রাঁচিতে এখানে সেখানে দেখেছে প্রভাত, যতটুকু যা বেড়িয়েছে। অথচ ঠিক এ রকমটি কিন্তু দেখেনি। পাঞ্জাবের এই দূর সীমান্তে, শহর ছাড়ানো নির্জনতায়!

কিন্তু রাত্রে যেন নির্জনতাটা তেমন নির্জন রইলো না।

সারাদিনের ক্লান্তি আর গত রাত্রের ট্রেনের রাত্রি জাগরণ দুটো মিলিয়ে প্রভাতকে তাড়াতাড়ি বিছানা নেবার প্রেরণা দিচ্ছিল, তাই গণেশকে ডেকে প্রশ্ন করলো এখন থেকে পাওয়া যাবে কিনা।

গণেশ মৃদু হেসে জানালো, 'এখানে পাওয়া যাবে কিনা বলে কোনও কথা নেই। রাত দুটো তিনটেতেও লোক আসে, খাওয়া দাওয়া করে।'

প্রভাত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, 'অতরাত্রে লোক? তখনও কোনো ট্রেন আসে নাকি?'

গণেশ আর একটু ব্যঞ্জনাময় হাসি হেসে বলে, 'ট্রেন আসে কিনা জানি না বাবু। লোক আসে তাই জানি। তেমন হলে, আমাদের তো আর রাতে ঘুমোবার জো থাকে না। শীতের রাতে হী হী করতে করতে—'

'ওরে বাবা! এখানের শীত!' প্রভাত পুনঃ প্রশ্ন করে, 'তুমি তো বাঙালী?'

'তা হবে!'

তা হবে!

কৌতুক অনুভব করে প্রভাত গণেশের কথায়। বলে, 'তা হবে মানে? নিজে কোন্ দেশের লোক জানো না?'

'জানার কি দরকার বাবু! ভূতের আবার জন্মদিন! আপনার খাবার আনছি।'

প্রভাত ভাবলো খাবার কি গণেশই আনবে? অন্তত তার সঙ্গে আর কেউ আসবে না?

নাঃ এলোও না।

গণেশ এলো। তার সঙ্গে একজন অবাঙালী বয়।

পরিষ্কার কাঁচের পাত্রে, পরিষ্কার ন্যাপ্‌কিন! আহার্যের সুবাসে যেন ক্ষিদে বেড়ে ওঠে প্রভাতের।

কাকার বাড়ীর নিত্য ডাল রুটির ব্যবস্থার পরই এই রাজকীয় আয়োজনটা প্রভাতকে একটু ঔদারিক মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই।

তবু খেতে খেতে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলো প্রভাত, ইচ্ছে করে একটু দেরী করে খেতে লাগলো। যদি তদ্বিরকারিণী একবার এসে উদয় হয়।

না।

প্রভাতের আশা সফল হলো না!

অদৃশ্য একটা কর্মজগতের উপর কেমন একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা অনুভব করলো প্রভাত। এত কাজ! বাবাঃ!

বিছানায় পড়তে না পড়তেই ঘুম আসবার কথা, কিন্তু কিছুতেই যেন সে ঘুমটা আসছে না। উঁকি দিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে।

কত রকমের শব্দ।

কত জুতোর শব্দ, কত কথার শব্দ, কত গ্লাস প্লেট পেয়ালার ঠুং ঠাং শব্দ……কত লোক আসে এখানে? আর আসে কি রাত্রেই বেশী?

কেন?

• অচেনা পরিবেশে রাত্রির এই মুখরতায় একটু যেন ভয় ভয় করলো প্রভাতের, গা-টা সির্ সির্ করে উঠলো। তাড়াতাড়ি উঠে দেখলো, ছিটকিনি লাগিয়েছে কিনা।

তারপর ঘড়ি দেখলো।

মাত্র এগারোটা।

তখন লজ্জা করলো প্রভাতের।

নিজে সন্ধ্যা আটটায় শুয়ে পড়েছে বলেই মনে করছে কি না-জানি গভীর রাত। এই সময় লোকজন বেশী হওয়াই তো স্বাভাবিক!

পাখী সারাদিন আকাশে ওড়ে কিন্তু সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরে।

এইসব বিজনেস-ম্যানেরা সারাদিন অর্থের ধান্ধায় কোথায় খায়, কোথায় থাকে, কিন্তু রাত্রে আস্তানায় ফেরে, খায়-দায় আড্ডা জমায়। মদই কি আর না খায়? ভাবলো প্রভাত।

আমাদের বিবেচনাশীল প্রোপাইটার মশাই অবশ্যই সে ব্যবস্থা রেখেছেন। আবার ভয় এলো।

কেউ মাতাল-টাতাল হয়ে গোলমাল করবে না তো!

মাতালে বড় ভয় প্রভাতের।

কিন্তু না।

শব্দ ক্রমশঃ কমে এলো। ঘুমিয়ে পড়লো প্রভাত।

পরদিন চায়ের টেবিলে মল্লিকার আবির্ভাব। গত কালকের মত প্রসাধনমণ্ডিত নয়।

একটু যেন ঢিলেঢালা। সদ্য স্নান করেছে, খোলা ভিজে চুল।

প্রভাতের মনে হলো এ আরও অনেক মনোরম।

কাল ভেবেছিল রূপসী। আজ ভাবলো সুন্দরী!

কাল মনে করেছিল মনোহর! আজ মনে করলো মনোরম!

বয়সের ধর্ম।

প্রভাত একটু অভিমান দেখালো। 'কাল তো আর আপনার দর্শনই মিললো না।'

মল্লিকা দুটো চেয়ারের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। মধুর হাসি হেসে বললো, 'দেবীদর্শন এত সুলভ নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। আর আজও প্রত্যাশার পাত্র উপুড় করে রেখেছিলাম।'

'উঃ কী কাব্যিক কথা! চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল!'

'চোখ ঠাণ্ডা হলে, চা চুলোয় গেলেও ক্ষতি হয় না।'

মল্লিকার মুখটা সহসা একটু কঠিন হয়ে ওঠে। চাঁচাছোলা টানটান মুখটায় এই সামান্য পরিবর্তনটাই চোখে পড়ে।

সেই কঠিনমুখে বলে মল্লিকা, 'কম-বয়সী মেয়ে দেখলেই কি এরকম কাব্যি জেগে ওঠে আপনার?'

মুহূর্তে অবশ্য প্রভাতের মুখও গম্ভীর হয়ে যায়। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে সে বলে, 'ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন!'

'রাগ হয়ে গেল?'

'রাগ নয়, চৈতন্য!'

'অত চৈতন্যদেব না হলেও ক্ষতি নেই। আমি শুধু একটু কৌতূহল প্রকাশ করেছি। কারণ কি জানেন? আমি আপনাকে সাধারণ পুরুষদের থেকে আলাদা ভেবেছিলাম।'

প্রভাত এবার চোখ তুলে তাকায়।

একটি বঙ্ক গভীর দৃষ্টি ফেলে বলে, 'হয়তো আপনার ধারণা ভুল ছিল না। এটা ব্যতিক্রম। কিম্বা হয়তো আমি নিজেই নিজেকে জানতাম না। কোনও অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে আলাপের স্বযোগও তো আসেনি কখনো।'

'ওঃ, বুঝেছি।' মল্লিকা হেসে ওঠে, 'একেবারে গৃহপোষ্য। তাই সোনা কি রাঙ্ চিনতে শেখেন নি এখনো।'

'তার মানে?'

'মানে নেই। খান, খেয়ে ফেলুন।'

'কিন্তু দেখুন সকালে এত খাওয়া! এখুনি তো আবার অফিস যেতে হবে ভাত খেয়ে—'

'না তো!' মল্লিকা বিস্মিত দৃষ্টিতে বলে, 'তাই অভ্যাস নাকি আপনার? কাল যে বললেন—ইয়ে আমরা তো আপনার লাঞ্চটা টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে জিপে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।'

'বলেন কি! এ যে ধারণার অতীত!'

'কেন?'

'বাঃ। বাড়ীতেও তো এমন ব্যবস্থা সবসময় হয়ে ওঠে না!'

মল্লিকা হঠাৎ একটা দুষ্টুহাসি হেসে বলে, 'বাড়ীতে বৌ নেই বোধহয়? বুড়ো মা-পিসীকে দিয়ে আর কত—'

প্রভাতের মুখে একটা পরিহাসের কথা আসছিল। মুখে আসছিল—'বৌ তো কোনোখানেই নেই।' কিন্তু মল্লিকার ক্ষণপূর্বের কাঠিন্য মনে করে বললো না।

শুধু বললো, 'নাঃ; আপনাদের ব্যবস্থা সত্যিই ভালো!'

'শুনে সুখী হলাম। কিন্তু উত্তরটা পাইনি।'

'উত্তর? কিসের উত্তর?'

'ঘরে বৌ আছে কিনা?'

• 'জেনে আপনার লাভ?'

'লাভ? আপনি বুঝি প্রতিটি কথাও খরচ করেন লাভ লোকসানের হিসেব কষে?'

'তা পৃথিবীর নিয়ম তো তাই।'

'হুঁ। পৃথিবীর নিয়মটা খুব শিখে ফেলেছেন দেখছি। কাল তো সন্ধ্যাবেলাই শয্যাশ্রয় করলেন। নতুন জায়গায় ঘুম হয়েছিল?'

প্রভাত হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল সেই উদার উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে। আজ আর মেঘলা নেই। সকালের নির্মল আলোয় ঝকঝক করছে। মল্লিকার প্রশ্নে সচকিত হয়ে বলে, 'ঘুম? সত্যি বলতে প্রথম রাতটায় কিছুতেই ঘুম আসছিল না। এত রকম শব্দ!'

'শব্দ? কিসের শব্দ?'

একটু যেন উত্তেজিত দেখায় মল্লিকাকে। প্রভাত বিস্ময় বোধ করে হেসে ওঠে, 'ভয় পাবার কিছু নেই, বাঘের গর্জনের শব্দ নয়। মানুষের পায়ের, বাসনপত্রের, টুকরো কথার—'

'আর কিছু নয়?' মল্লিকার দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে।

প্রভাত ভাবে, মেয়েটার তো মুহূর্তে মুহূর্তে খুব ভাব পরিবর্তন হয়। কিন্তু কেন হয়? মুখে বলে, 'না তো। আর কি হবে?'

মল্লিকা নরম হয়ে যায়। সহজ হয়ে যায়। বলে, 'তাই তো! আর কি হবে। তবে বাঘের গর্জনও অসম্ভব নয়।'

'অসম্ভব নয়! বাঘ আছে!' প্রভাত প্রায় ধ্বসে পড়ে।

আর মল্লিকা হেসে ওঠে, 'ভয় পাবেন না। পাহাড়ের ওদিকে বাঘ ডাকে। তাছাড়া বাঘের চাইতে ভয়ঙ্কর তিন তিনটে কুকুর রাত্রে পাহারা দেয় এখানে। চেন খুলে রাখা হয়। বাঘও ভয় পাপ তাদের।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর আস্তে বলে প্রভাত, 'সন্ধ্যেবেলা আপনি খুব খাটেন, তাই না?

'শুধু সন্ধ্যেবেলা? সর্বদাই। অহোরাত্র।'

কেমন একটা ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে বলে মল্লিকা।

প্রভাত বলে, 'এত কী কাজ? লোকজন তো রয়েছে!'

'লোকজনকে দিয়ে কি সব হয়? অতিথির আদর অভ্যর্থনা নিজেরা না করলে?'

শুনে সহসা প্রভাতের সংস্কারগ্রস্ত গৃহস্থমন বিরূপ হয়ে ওঠে, আর অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন তুলে বলে ফেলে সে, 'এটা আপনার আপত্তি করা উচিত।'

মল্লিকা নিরীহ ভাবে বলে, 'কোন্‌টা অন্যায়? কিসে আপত্তি করা উচিত?'

'এই, যে আসে তার আদর অভ্যর্থনার দায়িত্ব আপনার নেওয়া। কতরকমের লোক আসে, আর ওইসব অঞ্চলের নানা জাতের ব্যবসায়ীরা যে কী ধরনের লোক হয়, জানেন না তো?'

মল্লিকা আরও নিরীহ ভাবে বলে, 'আপনি জানেন?'

'এর আর জানাজানির কি আছে?' প্রভাত সবজান্তার ভঙ্গীতে বলে, 'কে না জানে। না না, আপনি ওসব দিকে যাবেন না।'

'বাঃ, মামার ব্যবসার দিকটা তো দেখতে হবে?'

'দেখতে হবে!' প্রভাত চটে উঠে বলে, 'মামার ব্যবসাটাই বড় হলো? নিজের মান-সম্মানটা কিছু নয়?'

'কে বললে মানসম্মানের হানি হয়?'

আবার উত্তেজিত হয় মল্লিকা।

'হয় না? আপনি বলছেন কি?' প্রভাতও উত্তেজিত ভাবে বলে, 'এমন কিছু কম বয়স আপনার নয় যে, জগতের কিছু বোঝেন না। এ থেকে আপনার ক্ষতি হতে পারে, এ আশঙ্কা নেই আপনার?'

মল্লিকা গম্ভীর হয়ে যায়। বিষণ্ণভাবে বলে, 'আশঙ্কা থাকলেই বা কি। আমার জীবন তো এই ভাবেই কাটবে!'

প্রভাত এই বিষণ্ণ কথার ছোঁয়ায় একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলে, 'বাঃ, তাই বা কাটবে কেন? মেয়েদের জীবনে তো মস্ত একটা সুবিধে আছে। বিয়ে হলেই তারা একটা নতুন পরিবেশে চলে যেতে পায়।'

'হুঁ, সুবিধেটা মস্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, বিয়ে না হলে?'

'বিয়ে না হলে!' প্রভাত দুর্বলভাবে বলে, 'না হবে কেন?'

'সেটাই স্বাভাবিক!' মল্লিকা হেসে ওঠে, 'মা-বাপ মরা মেয়ে, মামার কি দায়!'

প্রভাত বোধকরি আবার ভুলে যায় সে কে, কী তার অধিকার, তাই রীতিমত চটে উঠে বলে, 'দায় অবশ্যই আছে। এদিকে তো বাঙালীয়ানায় খুব বড়াই করলেন আপনার মামা, বাঙালী সংসারে বাপ-মরা ভাগ্নীর বিয়ে দেবার দায় থাকে না? তা থাকবে কেন, আপনাকে দিয়ে দিব্যি সুবিধে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে—'

মল্লিকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে, 'খুব তো বড় বড় কথা বলছেন, আপনি আমার বিষয়ে কতটুকু জানেন ? জানেন, মামা আমাকে দিয়ে কি কি সুযোগ সুবিধে পাচ্ছেন ?'

'বেশী জানবার কিছু নেই। নিজের চক্ষেই তো দেখলাম, খাতা লিখছেন, হিসেবপত্তর দেখছেন, বোর্ডারদের সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য দেখছেন, নিজেমুখেই তো বললেন, অহোরাত্র খাটছেন। এই যথেষ্ট, আর বেশী না জানলেও চলবে। আমি বলবো আপনার মামার এটা রীতিমত স্বার্থপরতা। আর আপনার উচিত এর প্রতিবাদ করা।'

'সত্যি।' হঠাৎ বেদম খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মল্লিকা। আর নেহাৎ বাচাল মেয়ের মত বলে ওঠে, 'মনে হচ্ছে, আমার ওপর আপনার বড্ড মায়া পড়ে গেছে। লক্ষণ ভালো নয়!'

'উপহাস করছেন ?'

আহত কণ্ঠে বলে প্রভাত।

'কে বললে ?' মল্লিকা হাসি থামিয়ে বলে, 'খাটি সত্যি কথা। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি, মামা এরকম স্বার্থপর না হলে আপনিই বা আমার জন্যে এত দুশ্চিন্তা করবার অবকাশ পেতেন কোথায় ? আপনার সঙ্গেও তো সেই একই সম্পর্ক।'

প্রভাত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, আরক্ত মুখে বলে, 'মাপ করবেন। নিজের পোজিশানটা হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলাম!'

'আরাম কুঞ্জে'র ডানপাশের রাস্তায় জিপ গাড়ীটা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রভাত অফিসের সাজে সজ্জিত হয়ে এসে দেখলো ভিতরে আরও দু'জন ইতিমধ্যেই আসীন।

গতকাল একাই গিয়েছিল, এবং আজও সেইরকম ধারণা নিয়েই আসছিল, সহযাত্রী যুগলকে দেখে মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো।

তা, প্রভাত কি কুনো ?

মানুষ ভালোবাসে না সে ?

ঠিক তাও নয়। সত্যিকথা বললে বলতে হয়, প্রভাত একটু প্রাদেশিকতা দোষদুষ্ট। সহযাত্রিরা বাঙালী হলে সে যে পরিমাণ প্রসন্ন হয়ে উঠতো, সেই পরিমাণ অপ্রসন্ন হলো ওদের দেখে।

বিদেশী পদ্ধতিতে একটু সৌজন্যসূচক সম্ভাষণ করে প্রভাত গম্ভীর মুখে উঠে বসলো। দেখলো পায়ের কাছে তিনটা টিফিন ক্যারিয়ার বসানো এবং তাদের হাতলে এক একটা সুতো বেঁধে অধিকারীর নামের টিকিট লটকানো।

মিঃ গোস্বামী, মিঃ ট্যাণ্ডন, মিঃ নায়ার। প্রভাত ভাবলো সর্বধর্ম সমন্বয়। ভাবলো চ্যাটার্জি লোকটা ঝুনো ব্যবসাদার বটে!

গাড়ী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললো, তিনটি যাত্রী কেউ কারো সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করলো না। শুধু প্রভাতের মনে হলো আর অন্য দু'জন যেন অনবরত তার দিকেই লক্ষ্য করছে।

মনের ভ্রম ?

না কি, সম্পূর্ণ সাধারণ ব্যাপার ?

প্রভাতও তো বারবার ওদেরই দেখছে।

আজও সন্ধ্যায় গণেশ ও সেই অপর একজন খাবার নিয়ে এলো এবং যথারীতি মল্লিকার দেখা মিললো না।

সকাল থেকে অকারণেই প্রভাতের মনটা বিষ হয়েছিল। সকালের সেই লোকদুটো এ বেলাও সহযাত্রী হয়েছে। অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে এই ব্যবস্থাই চলতে থাকবে। জিপের ব্যবস্থা দেখে কাল খুসি হয়েছিল, আজ বিরক্তি বোধ করছে।

কম্পাউণ্ডের মধ্যে এদিক ওদিক দু'চারখানা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেছে। ওর মনে হচ্ছে, জগতের সকলেরই প্রভূত টাকা আছে। নেই শুধু প্রভাতের।

নিজের একখানি 'কার' চালিয়ে যথেচ্ছ বেড়াতে পাওয়াটাই প্রভাতের মতে আপাততঃ জগতের শ্রেষ্ঠ সুখের অন্যতম মনে হতে লাগলো। জিপের জন্য আলাদা চার্জ দিতে হবে, অথচ কেমন যেন দয়া দয়া ভাব। নিজেকেও 'দয়ার ভিখিরী' মত লাগছে।

গণেশকে প্রশ্ন করলো, 'গাড়ীতে আর যে দু'জন ভদ্রলোক ছিল, ওরা এখানে বরাবর থাকে ?'

গণেশ গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলে, 'কি জানি।'

'কি জানি মানে ? তুমি জানো না ?'

'আজ্ঞে না বাবু, আমাদের কিছু জানবার আইন নেই।'

'ব্যাপার কি বলো তো ? এখানে কিছু রহস্য টহস্য আছে না কি ?' প্রভাত উত্তেজিত ভাবে বলে, 'তোমাদের মালিক যখন স্টেশন থেকে নিয়ে এলেন, তখন যে রকম ভেবেছিলাম, সেরকম তো দেখছি না।'

গণেশ এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, 'বেশী ভাবাভাবির দরকার কি বাবু ? আছেন থাকুন। কোনও অসুবিধে হয় জানাবেন, চুকে গেল।'

'গাড়ীতে যারা গেল, তাদের আমার ভালো লাগেনি।'

'তা বিশ্বসুদ্ধ লোককে ভালো লাগবে তার কি মানে আছে ?' গণেশ ঝাড়নে হাত মুছতে মুছতে বলে, 'রেলগাড়ীতে কত লোক পাশে বসে যায়, সবাইকে আপনার ভালো

লাগে? আপনি বাঙালী, আপনার ভালোর জন্যেই বলছি বাবু, নিজের তালে থাকুন সুখে থাকবেন। অন্যদিকে নজর দিতে গেলে বিপদ আছে।'

গণেশ চলে যায়।

প্রভাতের মনে হয়, লোকটা নেহাৎ সামান্য চাকর নয়। কথাবার্তা বড্ড বেশী ওস্তাদমার্কা।

আজও দেরী করে খেলো প্রভাত, আর হঠাৎ মনে করলো এখানে থাকবো না। চ্যাটার্জির আরাম কুঞ্জ ছাড়া সত্যিই কি আর জায়গা জুটবে না? অফিস অঞ্চলে চেষ্টা দেখবো।

পিছনের বারান্দার দিকটা অন্ধকার, তার নীচেই সেই সুবিস্তীর্ণ জমি, জানলাগুলোয় শিক নেই, শুধু কাঁচের শার্সি সম্বল।

নাঃ! চলেই যাবে। অস্বস্তি নিয়ে থাকা যায় না।

খাওয়ার পর চিঠি লিখতে বসলো, –'শ্রীচরণেষু কাকিমা, আশাকরি কাকাকে লেখা আমার পৌঁছানো সংবাদ পেয়েছেন। লিখেছিলাম বটে থাকার জায়গা খুব ভালো পেয়েছি, কিন্তু একটা মস্ত অসুবিধে, অফিস থেকে অনেক দূর। রোজ যাতায়াতের পক্ষে বিরাট ঝামেলা। তাই ভাবছি, অফিস অঞ্চলে একটা ব্যবস্থা করে নেবো। নতুন ঠিকানা হলেই জানাবো। ইতি। •

আজও ভাবলো কাকিমাকে মল্লিকার কথাটা লিখলে হতো।

কিন্তু লিখতে গিয়ে ভাবলো কথাটাই বা কী, 'এখানে একটি মেয়ে আছে, নাম মল্লিকা,' তার পর?

এটা কি একটা কথা?

অথচ কথাটা মন থেকে তাড়ানো যাচ্ছে না।

চিঠিখানা কাল পাছে পোস্ট করতে ভুলে যায়, তাই অফিসের কোটের পকেটে রেখে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেল প্রভাত।

দরজায় দাঁড়িয়ে চ্যাটার্জি!

পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্থির হয়ে। প্রভাতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, বিনয়ে একেবারে গলে নীচু হয়ে বললো, 'এই দেখতে এলাম আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা।'

প্রভাত ভুরুটা একটু কুঁচকে বললো, 'কই, আমাকে তো ডাকেননি মিষ্টার চ্যাটার্জি!'

'আহা-হা, ডাকবো কেন, ডাকবো কেন? তন্ময় হয়ে চিঠি লিখছিলেন। স্ত্রীকে বোধহয়?'

চ্যাটার্জির গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি ঝলসে ওঠে।

প্রভাতের গতকাল এই লোকটাকেই ঈশ্বর প্রেরিত মনে হয়েছিল, কিন্তু আজ ওর ওই

অতি বিনীত ভাবটাতে গা জ্বলে গেল। তাছাড়া মনে পড়লো, মল্লিকার মামা। তাই ঈষৎ কঠিন স্বরে বলে উঠলো, 'স্ত্রী ছাড়া জগতে আর কাউকে কেউ চিঠি লেখে না?'

'আহা হা লিখবে না কেন?' আর একটু ধূর্তহাসি হাসেন চ্যাটার্জি, 'লেখে পোস্টকার্ডে, ছু'পাঁচ লাইন। আর এত তন্ময় হয়েও লেখে না। আমরা তো মশাই এটাই সার বুঝি।'

আপনারা যা বোঝেন, হয়তো সেটাই সব নয়। চিঠি আমার কাকিমাকে লিখেছি।' বলে কথায় উপসংহারে সুর টেনে দেয় প্রভাত।

কিন্তু চ্যাটার্জি উপসংহারের এই ইঙ্গিত গায়ে মাখেন না। একটা অভব্য কৌতুকের হাসি মুখে ফুটিয়ে বলে ওঠেন, 'কা-কি-মা-কে! আপনি যে তাজ্জব করলেন মশাই! কাকিমাকে—চিঠি, তাও এত ইয়ে! তা কী লিখলেন?'

প্রভাত আর শুধু ভুরু কুঁচকেই ক্ষান্ত হয় না, প্রায় ক্রুদ্ধগলায় বলে, 'প্রশ্নটা কি খুব ভদ্রতা সঙ্গত হলো মিষ্টার চ্যাটার্জি?'

'আহা-হা, চটছেন কেন? চটছেন কেন? এমনি একটা কথার কথা বললাম। বারো মাস যত ননবেঙ্গলী নিয়ে কারবার, ছুটো খোলামেলা কথা তো কইতে পাই না। আপনি বাঙালী বলেই—যাক্, যদি রাগ করেন তো মাপ চাইছি।'

এবার প্রভাতের লজ্জার পালা।

ছি ছি, বড় অসভ্যতা হয়ে গেল। হয়তো লোকটা ভাগ্নীর কাছে গিয়ে গল্প করবে। কী মনে করবে মল্লিকা তা কে জানে।

আসলে লোকটা মুখ্যু। তাই ভাবভঙ্গীতে কেমন অমার্জিত ভাব. নেহাৎ পদবীটা চ্যাটার্জি তাই! নইলে নেহাৎ নীচু ঘরের মনে হতো।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'না না, রাগের কথা নয়। লক্ষ্ণৌতে কাকা-কাকিমার কাছেই ছিলাম এতদিন, এসে চিঠিপত্র না দিলে ভালো দেখায়? তা লিখেছিলাম কাকিমাকে চিঠি, বললেন স্ত্রীকে। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। মাথা নেই তার মাথাব্যথা।'

'তাই নাকি? হা-হা-হা! ভারী মজার কথা বলেন তো আপনি!' চ্যাটার্জি হেসে ঘর ফাটান।

চ্যাটার্জি চলে গেল, প্রভাত ভাবতে থাকে, অকারণ বিরূপ হচ্ছি কেন? না না, এটা ঠিক নয়। সন্দেহের কিছু নেই। রহস্যই বা কি থাকবে! লোকটা ঝুনো ব্যবসাদার, এই পর্যন্ত। জিপের সহযাত্রিরা বাঙালী নয়, এতে বিরক্তির কি আছে? অফিসে তো সে ছাড়া আর একজনও বাঙালী নেই! যাচ্ছে না প্রভাত সেখানে?

গণেশটার কথাবার্তাই একটু বেশী কায়দার। যেন ইচ্ছে করে রহস্য সৃষ্টি করতে চায়। ওর সঙ্গে আর কথা বেশী বলার দরকার নেই।

আর—

আর মল্লিকার সঙ্গেও দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। কী দরকার প্রভাতের, কার মামা তার ভাগ্নীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করছে কি ন্যায় ব্যবহার করছে তার হিসেব নিতে যাওয়া!

সিদ্ধান্ত করলো খাবে, ঘুমোবে, কাজে যাবে, ব্যস।

মনটা ভালো করে, দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো প্রভাত।

ঘড়িতে দেখলো রাত পৌনে দশটা।

কিন্তু প্রভাতের নিশ্চিন্ততার সুখ যে ঘণ্টা কয়েক পরেই এমন ভাবে ভেঙে যাবে, তা কি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল? ঘণ্টা কয়েক!

ক'ঘণ্টা? পৌনে দশটার পর শুয়ে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে প্রভাত? ঘুমের মধ্যে সময় নির্ণয় হয় না, তবু প্রভাতের মনে হলো ঘণ্টা তিন চার পার হয়েছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, জানলার কাঁচে খুব দ্রুত আর জোরে একটা টকাটক শব্দে! পিছনের খোলা বারান্দার দিকের জানলা।

ভয়ে বুকটা ঠাণ্ডা মেরে গেল প্রভাতের, ঝপ করে বেড্ সুইচটা টিপে আলোটা জ্বেলে ফেলে কম্পিত বক্ষে সেই দিকে তাকালো।

কে ও?

চোর ডাকাত? খুনে গুণ্ডা?

জানলা ভেঙে ফেলবে? অশরীরি যে একটা আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসেছিল সেটা তাহলে ভুল নয়।

না কি সেই বাঘের চাইতে ভয়ঙ্কর কুকুরগুলোরই কোনও একটা কাঁচ আঁচড়াচ্ছে!

কিন্তু তাই কি?

এতো নির্ভুল মানুষের আওয়াজ! যেন সাঙ্কেতিক।

কাঁচ ভেদ করে গলার শব্দ আসে না, তাই বোধহয় ওই শব্দটাই অবলম্বন করেছে।

শব্দ মুহুর্মুহু বাড়ছে। টকটক! টকাটক ঘটঘট!

কেউ কোনো বিপদে পড়েনি তো!

দেখবে না কি! না দেখলেও তো বিপদ আসতে পারে। ঈষৎ ইতস্ততঃ করে প্রভাত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানলার কাছে গিয়ে পর্দাটা সরাতে গিয়েই চমকে উঠলো!

কী সর্বনাশ, এ যে মল্লিকা!

কোনো বিপদে পড়েছে তাহলে!

মল্লিকা এতক্ষণ ব্যাকুল আবেদন জানাচ্ছে, আর প্রভাত বোকার মত বিছানায় শুয়ে ভয়ে কাঁপছে? কী বিপদ! কুকুরে তাড়া করেনি তো?

কী ভাবে যে জানলার ছিটকিনিটা খুলে ফেলেছিল প্রভাত তা আর মনে নেই। শুধু

দেখতে পায় জানলা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই মল্লিকা উদ্‌ভ্রান্তের মত ঝুপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে জানলটা ফের বন্ধ করে দিয়ে আর পর্দাটা টেনে দিয়ে প্রভাতের বিছানার ধারে বসে হাঁফাচ্ছে।

প্রভাত চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ।

এ কী! এর মানে কী!

হাঁফানো থামলে মল্লিকা কাতর বচনে বলে, 'মিষ্টার গোস্বামী, আমায় ক্ষমা করুন, দয়া করে আলোটা নিভিয়ে দিন।'

প্রভাত প্রায় অচেতনের মত এই অভূতপূর্ব ঘটনার সামনে দাঁড়িয়েছিল রাত দু'টোর সময় তার বিছানার উপর একটি বেপথু সুন্দরী তরুণী!

এ স্বপ্ন? না মায়া?

কথা কইলে বুঝি এ স্বপ্ন ভেঙে যাবে, এ মায়া মুছে যাবে।

ভেঙে গেল স্বপ্ন, মুছে গেল মায়া! প্রবল একটা ঝাঁকুনি খাওয়ার মত চমকে উঠলো প্রভাত।

কী বলছে বেপরোয়া মেয়েটা!……

দয়া করে আলোটা নিভোন!

প্রভাত প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কী বলছেন আপনি?'

'মিষ্টার গোস্বামী, কী বলছি, তার বিচার পরে করবেন, যদি আমাকে বাঁচাতে চান—'

হঠাৎ নিজেই হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয় মল্লিকা। বিছানার উপর ভেঙে পড়ে চাপা কান্নায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

আর সেই অন্ধকার ঘরের মাঝখানে প্রভাত বাক্‌শক্তিহীন ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

কতক্ষণ?

কে জানে কতক্ষণ!

হয়তো বা কত যুগ!

যুগ যুগান্তর পরে কান্নার শব্দ স্তিমিত হয়, অন্ধকারেও অনুভব করতে পারে প্রভাত, মল্লিকা উঠে বসেছে।

কান্নাভেজা গলায় আস্তে কথা বলে মল্লিকা, 'মিষ্টার গোস্বামী, আপনি হয়তো আমাকে পাগল ভাবছেন!'

ভূতের মুখে বাক্য ফোটে।

'আপনাকে কি নিজেকে, তা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনি ধারণা করতে পারবেন না মিষ্টার গোস্বামী, কী অবস্থায় আমি এভাবে আপনাকে উত্ত্যক্ত করতে এসেছি!'

অবস্থাটা যদি এত ভয়াবহ না হতো শুধু স্নায়ু নয়, অস্থিমজ্জা পর্যন্ত এমন করে সিটিয়ে না

উঠতো, তাহলে হয়তো প্রভাত সহানুভূতিতে গলে পড়তো, কী ব্যাপার ঘটেছে জানবার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতো। কিন্তু অবস্থাটা ভয়াবহ!

তাই প্রভাতের কণ্ঠ থেকে যে স্বর বার হয়, সেটা শুকনো, আবেগশূন্য।

'সত্যিই ধারণা করতে পারছি না। কিন্তু দয়া করে আলোটা জ্বালাতে দিন, অবস্থাটা অসহ্য লাগছে।'

'না না না!' মল্লিকা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'চলে যাবো, ভোর হলেই চলে যাবো আমি। শুধু ঘণ্টা কয়েকের জন্যে আশ্রয় দিয়ে বাঁচান আমাকে।'

'কিন্তু মল্লিকা দেবী, আপনার এই বাঁচা মরার ব্যাপারটা তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমি।'

'পারবেন না! সে বোঝবার ক্ষমতা আপনাদের পুরুষদের থাকে না। তবু কল্পনা করুন, বাঘে তাড়া করেছে আপনাকে।'

'বাঘে!'

অস্ফুট একটা আওয়াজ বার হয় প্রভাতের মুখ থেকে। ভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করবার আগেই পিছনের সেই পাহাড়ের কোল পর্যন্ত প্রসারিত অন্ধকার তৃণভূমির দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে তার, আর অস্ফুট ওই প্রশ্নটা উচ্চারিত হয়।

অন্ধকারের অসহনীয় ধাক্কাটা বুঝি ক্রমশঃ সহনীয় হয়ে আসছে, ভেন্টিলেটার দিয়ে আসা দূরবর্তী কোন আলোর আভাস ঘরের চেহারাটা পরিস্ফুট করে তুলছে। হাসির শব্দটা লক্ষ্য করে অনুমান করতে পারছে প্রভাত, মল্লিকার মুখে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের রেখা। সেই রেখার কিনারা থেকে উচ্চারিত হলো, 'হ্যাঁ বাঘই! শুধু চেহারাটা মানুষের মত।'

স্তব্ধতা! দীর্ঘস্থায়ী একটা স্তব্ধতা!

তারপর একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, 'এরকম পরিবেশে এইরকম ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বলতে পারেন, এত রাত্রে আপনি নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলেন কেন?'

আবার মিনিটখানেক নিস্তব্ধতা, তারপর মল্লিকার ক্লান্ত করুণ স্বর ধ্বনিত হয়, 'এই আমার ললাটলিপি মিষ্টার গোস্বামী! চাকরবাকর শুয়ে পড়ে, আমাকে তদারক করে বেড়াতে হয়, আগামী ভোরের রসদ মজুত আছে কি না! হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে পড়লো, স্টোরে সকলের ব্রেক-ফাস্টের উপযুক্ত ডিম নেই। তাই মুরগীর ঘর তল্লাস করতে গিয়েছিলাম। মিষ্টার গোস্বামী, কেন জানি না আমার হঠাৎ মনে হলো আপনার ঘরটাই নিরাপদ আশ্রয়।'

'অদ্ভুত মনে হওয়া। মল্লিকা দেবী, আমিও একজন পুরুষ, এটা বোধকরি আপনি হিসেবের মধ্যে আনেন নি!'

'এনেছিলাম! সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্থির করেছিলাম, আপনি মানুষ!'

'আপনার এই বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এটা কেন ভাবছেন না, হঠাৎ যদি কারো চোখে পড়ে আপনি আমার ঘরে, এবং আলো নিভোনো ঘরে, তাহলে অবস্থাটা কি হবে? আমার কথা থাক, আপনার দুর্নাম সুনামের কথাই ভাবুন!'

'ভাবছি। বুঝতে পারছি,' মল্লিকা আরও ক্লান্তগলায় বলে, 'কিন্তু তবু তো সে মিথ্যা দুর্নাম। সত্যিকার বিপদ নয়। বাঘের কামড় নয়।'

অন্ধকারেই জিনিসপত্র বাঁচিয়ে বারকয়েক পায়চারি করে প্রভাত, তারপর দৃঢ়স্বরে বলে, 'কিন্তু সেই বদলোকটা যে কে, আপনার চেনা দরকার ছিল। আপনার মামাকে তার স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

'মামাকে! আমার মামাকে!' মল্লিকা আর একবার কান্নায় ভেঙে পড়ে, 'আমার মামাকে আপনি চেনেন না, তাই বলছেন! মামা তাঁর খদ্দেরকে খুশি করতে, নিজেই আমাকে বাঘের গুহায় ঠেলে দিতে চান—'

'মল্লিকা দেবী!'

তীব্র একটা আর্তনাদ ঘরের স্তব্ধতাকে খান খান করে ফেলে!

না!

সে আর্তনাদের শব্দ কারও কানে প্রবেশ করে ভয়ঙ্কর একটা কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করেনি। মোটা কাপড়ের পর্দা ঘেরা কাঁচের জানলা ভেদ করে কারো নিশ্চিন্ত ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়নি।

এখন সকাল।

এখন প্রভাত এসে দাঁড়িয়েছে সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্যের সমানে! গত দু'দিন শুধু সামনেই তাকিয়ে দেখেছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। আজ দু'পাশে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখতে থাকে। ডানদিকে নীচু জমিতে ওই চালাঘরটা তাহলে মুরগীর ঘর। ওর জালতির দরজাটা সন্দেহের নিরসন করছে।

রাত দুটোর সময় ওইখানে নেমেছিল মল্লিকা ডিমের সন্ধানে।

মল্লিকা কি পাগল?

কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

মল্লিকা কি একটা গল্প বানিয়ে বলে গেল!

কিন্তু তা'কি কখনও সম্ভব?

চিরদিন সাধারণ ঘর-গেরস্থীর মধ্যে মানুষ নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত প্রভাতের ওই সন্দেহটাকে 'সম্ভব' বলে মনে করতে বাধে।

তবে চ্যাটার্জির যে রূপ উদ্‌ঘাটিত করলো মল্লিকা, সেটাকে 'অসম্ভব' বলে উড়িয়ে দেবে, এত অবোধ সরলও নয় প্রভাত। জগতের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ না দেখুক, জানে বৈকি!

স্বার্থের প্রয়োজনে স্ত্রীকে কন্যাকে বোনকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়, জগতে এমন পুরুষের অভাব নেই একথা প্রভাত জানে না এমন নয়। এইদণ্ডে ওই পিশাচ লোকটার আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছে করছে তার।

কিন্তু!

কিন্তু কী এক অমোঘ অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা হয়ে গেল সে। তাই ভাবছে, মল্লিকাকে সে কথা দিয়েছে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। এই নরক থেকে, এই হিংস্র জানোয়ারের গুহা থেকে।

অথচ জানে না কেমন করে রাখবে সেই প্রতিজ্ঞা!

কাল নিরীক্ষণ করে দেখার দরকার হয়নি, আজ দেখছে। দেখছে সমস্ত সীমানাটা কাঁটা-তারের বেড়ায় ঘেরা, সেই ব্যাঘ্রসদৃশ কুকুরগুলো চোখে দেখেনি বটে, কিন্তু রাত্রে তাদের গর্জন মাঝে মাঝেই কানে এসেছে।

রাতে যাওয়া হয় না। তাছাড়া যানবাহন কোথা? সেই চ্যাটার্জির জিপগাড়ীই তো মাত্র ভরসা। এক যদি মল্লিকা শহরের দিকে যাবার কোনও ছুতো আবিষ্কার করতে পারে।

কিন্তু মল্লিকা বলেছে, 'অসম্ভব'।

'কিন্তু তুমি তো মামার সঙ্গে রোজ স্টেশনে যাও লোক ধরতে!' বলেছিল প্রভাত।

'হ্যাঁ, মামার সঙ্গে।' মল্লিকা মৃদু তীক্ষ্ণ একটু হেসেছিল।

তবু তাকে আশ্বাস দিয়েছে প্রভাত।

প্রভাত নয়, প্রভাতের শিরায় শিরায় প্রবাহিত পুরুষের রক্ত। যে রক্ত পুরুষানুক্রমে মধ্যবিত্ত জীবনের দায়ে স্তিমিত হয়ে গেলেও একেবারে মরে যায়নি।

আশ্বাস দিয়েছে সেই রক্ত। আশ্বাস দিয়েছে তার যৌবন।

চায়ের সময় হয়ে গেছে।

প্রভাত এখনো নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়নি। আকাশে আলো ফুটতে না ফুটতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

এখন ফের ঘরে এলো। সাবান তোয়ালে টুথব্রাশ নিয়ে সংলগ্ন স্নানের ঘরের দিকে এগোতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

তাকিয়ে দেখলো বিছানাটার দিকে।

রাত দুটোর পর আর শোয়া হয়নি প্রভাতের। শোবার সময় হয়নি, হয়তো বা সাহসও হয়নি। এখন তাকিয়ে দেখছে কোথায় বসেছিল সেই ক্রন্দনবতী। কোনখানটায় আছড়ে পড়ে চোখের জলে সিক্ত করে তুলেছিল!

সত্যিই কি এসেছিল কেউ? না কি প্রভাতের স্বপ্নকল্পনা? চমকে বিছানার কাছে এগিয়ে এলো। বালিশের গায়ে একগাছি লম্বা চুল।

ঈশ্বর রক্ষা করেছেন।

এখুনি চাকরবাকর বিছানা ঝাড়তে আসবে।

এ দৃশ্য যদি তাদের চোখে পড়তো! চারিদিকে সন্ধানীদৃষ্টি ফেলে ফেলে দেখলো আর কোথাও আছে কি না!

নেই।

নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কিন্তু?

সমস্ত নিশ্চিন্ততা ছাপিয়ে মল্লিকার একটা কথা মাথার মধ্যে কাঁটার মত বিঁধছে।

সে কাঁটা বলছে—একথা কেন বললো মল্লিকা?

কথাটা আবার মনের মধ্যে স্পষ্ট পরিষ্কার উচ্চারণ করলো প্রভাত। নতুন করে আশ্চর্য হলো।

'প্রতিজ্ঞা! প্রতিজ্ঞা করছেন? পুরুষের প্রতিজ্ঞা! কিন্তু আপনি কী সত্যি পুরুষ!'

তীব্র তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত একটু হেসেছিল মল্লিকা এই প্রশ্নের সঙ্গে।

কোন্ কথার পিঠে এ প্রশ্ন উঠেছিল তা মনে পড়ছে না প্রভাতের। বোধকরি প্রভাতের প্রতিজ্ঞামন্ত্র পাঠের পর। না কি তাও নয়?

না তা নয়। বোধহয় চলে যাবার আগে। হ্যাঁ তাই। চলে যাবার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিল, 'প্রতিজ্ঞা করছেন? পুরুষের প্রতিজ্ঞা! কিন্তু আপনি কি সত্যি পুরুষ!'

এ কিসের ইঙ্গিত!

মল্লিকার করুণ অভিব্যক্তি আর ভয়াবহ ভাগ্যের পরিচয়ের সঙ্গে ওই হাসি, আর প্রশ্নের সামঞ্জস্য কোথায়?

যথারীতি গণেশ এলো।

প্রভাত বিনা প্রশ্নে চায়ের ট্রেটা কাছে টেনে নিলো। কিন্তু তবু চোখে না পড়ে পারলো না কেমন একরকম তাকাচ্ছে আর মিটি মিটি হাসছে গণেশ।

কেন, ওরকম করে হাসছে কেন ও? ও কি ঘরে ঢুকেছিল?

দীর্ঘ বেণী থেকে খসেপড়া কোনও দীর্ঘ অলক আর কোথাও কি চোখে পড়েছে ওর?

কোন বাক্য বিনিময় হলো না অবশ্য। কিন্তু গণেশের ওই চোরা ব্যঙ্গের চাউনিটা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে গেল।

আর একদণ্ডও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

কী হয়, ওই অফিস যাবার মুখেই যদি প্রভাত বিল মিটিয়ে দিয়ে মালপত্র নিয়ে চলে যায় 'ওবেলা আর আসবো না' বলে!

ভালোমন্দ যাইহোক হোটেল একটা জুটবেই।

এরকম 'হিংস্র সুন্দরে' তার দরকার নেই।

এর অন্তরালে কোথাও যেন বিপদের চোরা গহ্বর, এর শিরায় শিরায় যেন ভয়াবহ রহস্যের জাল পাতা!

চ্যাটার্জি লোকটা নোংরা নীচ ইতর কুৎসিত!

চ্যাটার্জির খদ্দেররা সৎ নয়।

নির্ঘাৎ রাত্রে এখানে মাতলামি চলে, নোংরামি চলে, জুয়োর আড্ডা বসে। হয়তো বা কালোবাজারের হিসেব নিকেশ হয়, হয়তো খাদ্যে আর ওষুধে কী পরিমাণ ভেজাল দেওয়া সম্ভব, তারই পরিকল্পনা চলে।

চ্যাটার্জি এদের পালক, পোষক!

কী কুক্ষণেই স্টেশনে চ্যাটার্জির কবলে পড়েছিল প্রভাত।

একবার ভেবেচিন্তে দেখলো না, যার সঙ্গে যাচ্ছি, সে লোকটা কেমন!

'কী নির্বোধ আমি!'

কিন্তু শুধু কি ওইটুকু নির্বুদ্ধিতা!

কী চরম নির্বুদ্ধিতা দেখিয়েছে কাল রাত্রে।

তুমি প্রভাত গোস্বামী, বিদেশে এসেছো চাকরি করতে। কী দরকার ছিল তোমার নারীরক্ষার নায়ক হতে যাবার। কোন সাহসে তুমি একটা অসহায় বন্দিনী মেয়েকে ভরসা দিতে গেলে বন্ধন মোচনের। যে মেয়ের রক্ষকই ভক্ষক।

জগতে এমন কত লক্ষ লক্ষ মেয়ে পুরুষের স্বার্থের আর পুরুষের লোভের বলি হয়েছে, হচ্ছে, হবে। যতদিন প্রকৃতির লীলা অব্যাহত থাকবে, ততদিনই এই নিষ্ঠুর লীলা অব্যাহত থাকবে।

প্রভাত ক'জনের দুরবস্থা দূর করতে পারবে?

তবে কেন ওই মেয়েটাকে আশ্বাস দিতে গেল প্রভাত চরম নির্বোধের মত!

চলে যাবে। আজই। জিনিসপত্র নিয়ে।

তাকিয়ে দেখলো চারিদিক।

কীই বা! এই তো সুটকেস, বিছানা, আর আল্‌নায় ঝোলানো দু-একটা পোষাক। দু' মিনিটে টেনে নিয়ে গুছিয়ে ফেলা যায়। টিফিন বাক্সটা তো জিপেই আছে!

মল্লিকা তো চোখের আড়ালে।

মল্লিকার সঙ্গে তো জীবনে আর চোখোচোখি হবে না।

আল্‌নার জামাটায় হাত দিতে গেল।

আর মুহূর্তে অন্তরাত্মা 'ছি ছি' করে উঠলো!

প্রভাত না মানুষ ? ভদ্ররক্ত গায়ে আছে না তার ?

অফিসে গিয়ে মনে হলো, কাকিমার চিঠিটায় মল্লিকা সম্পর্কে দু' লাইন জুড়ে দিয়ে পোস্ট করবে।

পকেট থেকে বার করতে গেল, পেলে না।

কী আশ্চর্য, গেল কোথায় চিঠিটা ? নিশ্চিত মনে পড়েছে, কোটের পকেটে রেখেছিল !

কিছুতেই ভেবে পেলে না, পড়ে যেতে পারে কি করে।

কোটটা হ্যাঙ্গার থেকে তুলে নিয়েছে, গায়ে চড়িয়েছে, গাড়ীতে উঠেছে, গাড়ী থেকে নেমে অফিসে ঢুকেছে। এর মধ্যে কী হওয়া সম্ভব !

চিঠিটা তুচ্ছ, আবার লিখলেই লেখা যায়, হারানোটা বিস্ময়কর !

কিন্তু আরও কত বিস্ময় অপেক্ষা করছিল প্রভাতের জন্য, তখনও জানে না প্রভাত। সে বিস্ময় স্তব্ধ করে দিল খাবারের কৌটো খোলার পর।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় নাকি 'চাপাটি' হয়ে উঠেছিল সঙ্কেত প্রেরণের মাধ্যম। ইতিহাসের সেই অধ্যায়টাই কি মল্লিকা কাজে লাগালো ?

রুটির গোছার নীচে শাদা একটা কাগজের মোড়ক ! এটা কী !

টেনে তুললো।

খুলে পড়লো।

স্তব্ধ হয়ে গেল।

'দয়া করে রাত্রে জানলাটা খুলে রাখবেন !'

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ছিঁড়ে ফেললো টুকরোটা। না না না ! কিছুতেই না !

এ কী কুৎসিত জালে জড়িয়ে পড়ছে সে !

মল্লিকা কী !

ও কি সত্যি বিপন্ন, না মায়াবিনী !

ভদ্র মেয়ের এত দুঃসাহস হয় ?

কিন্তু সেই কান্না ? সে কী মায়াবিনীর কান্না ?

রাত্রে প্রতিজ্ঞা করলো, তবু বিচলিত হবে না সে। জানলা খুলে রাখবে না। কে বলতে পারে বিপদ কোন পথ দিয়ে আসে। তার কি মোহ আসছে ?

মায়ের মুখ স্মরণ করলো।

প্যাড টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো মাকে।

লেখা চিঠিটা আজ আর কোটের পকেটে রাখলো না, নিজের অফিসের ব্যাগে রেখে দিল।

নিশ্চিন্ত হয়ে শুলো।

কিন্তু ঘুমের কি হলো আজ ?

কিছুতেই কেন শান্তির স্নিগ্ধতা আসছে না ! কী এক অস্বস্তিতে উঠে বসতে ইচ্ছে করছে।

পাখার হাওয়াটা যেন ঘরের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিছানায় ছুঁচ ফুটছে ! মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। জানলাটা একবারের জন্যে খুলে দিয়ে এই উত্তপ্ত বাতাসটা বার করে দিলে ক্ষতি কি ?

মনস্থির করে উঠে বসলো।

• জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে চিন্তা করে খুলে ফেললো ছিটকিনিটা, ঠেলে দিলো কপাটটা।

হু হু করে স্নিগ্ধ বাতাস এসে ঢুকছে, জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুম এসে যাচ্ছে যেন।

আশ্চর্য ! অন্য অন্য কটেজগুলোর জানলা সব খোলা ! ওদের ভয় করে না ? চোর, ডাকাত, বন্য জন্তুর ?

প্রভাত ভাবলো ওরা সকলেই অবাঙালী।

ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে বাক্সর মধ্যে ঘুমোনোর কথা ভাবতেই পারে না ওরা।

প্রভাত কী ভীতু !

থাক খোলা, কী হয় দেখাই যাক না !

কিন্তু কী দেখতে চায় প্রভাত ?

দেখা গেল কিছুক্ষণ পরে।

আর প্রভাতের মনে হলো, মল্লিকা কি জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকতে অভ্যস্ত ?

'মল্লিকা দেবী, এ রকম অসমসাহসিকতা করছেন কেন ?'

'কী করবো ? কখন কথা বলবো আপনাকে ?'

আজও ভেঙে পড়ে মল্লিকা, 'দিনের বেলা চারিদিকে পাহারা। ওই গণেশটা হচ্ছে মামার চর। সহস্র চক্ষু ওর। শুধু এই রাত্তিরে তাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে।'

'কিন্তু কি বলবেন তাড়াতাড়ি বলুন।'

'আশ্চর্য ! আশ্চর্য আপনি !' মল্লিকার তীক্ষ্ণকণ্ঠ ধিক্কার দিয়ে ওঠে, 'আপনি কী শুকদেব ?'

'মল্লিকা দেবী ! আপনার ওপর থেকে আমার শ্রদ্ধা কেড়ে নেবেন না !'

মল্লিকা সংযত হয়।

ক্ষুব্ধহাস্যে বলে, 'কী জানেন, পুরুষের একটা রূপই দেখেছি, তাই সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়। আর ভালোকথা, সভ্য সুশ্রী কথা কবে শিখলাম বলুন ? সেই আট বছর বয়েস থেকে মামার হোটেলের চাকরাণীগিরি করছি। মামার হুকুমে তাঁর খদ্দেরদের আকর্ষণ করতে—'

'থাক। শুনতে কষ্ট হচ্ছে! আজ আপনার কী বক্তব্য সেটাই শুনি।'

মল্লিকা খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

জানলা দিয়ে ছায়া ছায়া জ্যোৎস্না আসছে। ওকে মনে হচ্ছে বন্দিনী রাজকন্যা!

তবে—

আজ ওর গলা কান্নায় ভেজা নয়। ক্লান্ত বিষণ্ণ মধুর।

'মিষ্টার গোস্বামী, আজ আমি কিন্তু নিজের স্বার্থে আসিনি। এসেছি আপনাকে সাবধান করতে। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন করছি, রোজ আপনি কী এত লেখেন?'

'লিখি? লিখি মানে? চিঠি লিখি!'

'কাকে? কাকে এত চিঠি—'

প্রভাত বিরক্ত কণ্ঠে বলে, 'কেন বলুন তো? এ কী অদ্ভুত কৌতূহল আপনাদের! আপনার মামাও কাল নানান জেরায়—আপনাদের খাতায় এ নিয়মটাও তাহলে লিখে রাখা উচিত ছিল, এখানে থাকতে হলে বাড়ীতে চিঠি লেখা নিষেধ।'

'আপনি রাগ করছেন! কিন্তু জানেন, মামার সন্দেহ হয়েছে পুলিশের লোক!'

'চমৎকার।'

'ওই তো! গণেশ খবর দিচ্ছে আপনি লিখছেন। মামার ভাবনা, এগুলো আপনি রিপোর্ট লিখছেন। কারণ প্রথম দিন এসে নাকি নানা অনুসন্ধান করেছিলেন!'

'আরও চমৎকার লাগছে!'

'রাগ করলেও, সাবধান হোন, এই অনুরোধ। মামার এখানে অনেক রকম ব্যাপারই তো চলে! বলতে গেলে বেআইনি কাজের ঘাঁটি!'

'হুঁ। সেইরকমই সন্দেহ হচ্ছিল।'

'হওয়াই স্বাভাবিক। আপনি সরল হলেও নির্বোধ নয়। কিন্তু জানিয়ে রাখি শুনুন, কিছুদিন আগে আপনারই মতো একটি বাঙালী ছেলে বোর্ডারের ছদ্মবেশে এসে বাসা নিয়েছিল টিকটিকিগিরি করতে! সে আর ফিরে যায়নি।'

'মল্লিকা দেবী!'

মল্লিকা কিন্তু এ আর্তনাদে বিচলিত হয় না। তেমনি দার্শনিক ভঙ্গীতে বলে, 'হ্যাঁ। তাই। ওই জঙ্গলের দিকে অনুসন্ধান করলে হয়তো এখনো তার হাড়ের টুকরো পাওয়া যেতে পারে।'

বিচলিত প্রভাত সহসা আত্মস্থভাবে বলে, 'কিন্তু কি করে বুঝবো আপনিও আপনার মামার চর নয়?'

'কী করে বুঝবেন!' মৃদু শোনায় মল্লিকার কণ্ঠস্বর!

'হ্যাঁ। বিশ্বাস কি? যেখানে এত সতর্ক চক্ষু, সেখানে কী ভাবে আপনি রাত্রিবেলা একজন যুবকের ঘরে—'

হঠাৎ প্রায় শব্দ করে হেসে ওঠে মল্লিকা।

'সেটাই তো ছাড়পত্র মিষ্টার গোস্বামী। ওরা সন্দেহ করেছে আর অনুমান করছে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। আর প্রেমে পড়ার একটা অর্থই ওরা জানে। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি আপনি এখান থেকে পালান। মামাকে বলবেন, অফিসের দুরন্তর জন্যেই—'

প্রভাত আর একবার চেয়ে দেখে।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ রাত্রির গভীরে আরও পরিস্ফুট হচ্ছে। মল্লিকাকে অলৌকিক দেখাচ্ছে।

ক্ষণপূর্বের কটুমন্তব্যের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলো প্রভাত। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু গতকাল তো একথা হয়নি আমি একা পালাবো।'

'কাল আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। এই নরকের মধ্যে আর শাসনের মধ্যে বাস করতে করতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাই যা অসম্ভব—'

'কিন্তু যদি আমি সম্ভব করতে পারি।'

'চেষ্টা করতে যাবেন না, মারা পড়বেন।'

'মল্লিকা! যদি আমি খোলাখুলি তোমার মামার কাছে প্রস্তাব করি আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

আর বুঝি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না মল্লিকা। বসে পড়ে বলে, 'আপনি! আপনি কি পাগল। এ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবেন, তা জানেন?'

'খুন!'

'তা না তো কি! জানেন না, বুঝতে পারেন নি, আমিই মামার শিকার ধরবার সব চেয়ে দামী টোপ্।'

'বেশ' তবে লুকানো রাস্তাই ধরতে হবে।'

'শুধু তুমি রাজী কিনা—'

'আমি রাজী কিনা—শুধু আমি রাজী কিনা!'

একটা প্রবল বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে সহসা কি একজোড়া হিম,শীতল সাপ এসে আছড়ে পড়লো প্রভাতের উপর? আর তারা প্রভাতকে বেষ্টন করে ধরলো দৃঢ় বন্ধনে!

কিন্তু নাগপাশের বিভীষিকা নিয়েও বন্ধন কেমন করে এমন আবেশময় হয়ে উঠতে পারে?

'মল্লিকা!'

'চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই' এ কথাটা সব ক্ষেত্রে সত্য হয় কিনা জানি না, কিন্তু প্রভাতের পক্ষে হলো।

ভালোমানুষ প্রভাত, মধ্যবিত্ত গৃহস্থমনা প্রভাত, অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে একটা অসাধ্য-সাধনই করে বসলো।

কিন্তু এই অসাধ্যসাধন কি সত্যিই প্রেমের আকর্ষণে।

প্রভাত এমন করেই একটা হোটেলওয়ালি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল যে, ভয় ভাবনা ত্যাগ করে ফেললো। মস্ত একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে পিছপা হলো না?

তিনদিনে এমন প্রেমের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব?

হয়তো তা নয়!

মল্লিকার রূপ যৌবন একটা মোহের সঞ্চার করলেও, প্রভাতের ভদ্রচিত্তের কাছে সেই আবেদনই শেষ কথা হয়ে ওঠেনি।

মানবিকতার প্রশ্নটাও ছোট নয়।

মল্লিকার অশ্রুজলের আবেদন, একটি নিঃসহায়া নিরুপায় মেয়ের জীবনের অনিবার্য শোচনীয়তা, প্রভাতকে বিচলিত করে তুললো।

তাই হঠাৎ মোহে নয়, যা করলো জেনেবুঝেই করলো।

মল্লিকা যে নিষ্কলঙ্ক নয়, মামার শিকারের টোপ হবার জন্যে ওকে যে অনেক খোয়াতে হয়েছে, এ বুঝতে ভুল হয়নি প্রভাতের।

তবু সে মানবিকতার সঙ্গে যুক্তি আর বুদ্ধিকেও কাজে লাগিয়েছে।

ভেবেছে যুগটা আধুনিক।

এ যুগে সভ্যজগতের নিয়ম নয়, মানুষকে মাছ দুধের মত 'নষ্ট হয়ে গেছে' বলে ফেলে দেওয়া।

ভেবেছে, এ যুগে বিধবা বিয়ে করছে লোকে। বিবাহ বিচ্ছেদের সমুদ্র পার হওয়া মেয়েকে বিয়ে করছে।

ভেবেছে, ও তো মানসিক পাপে পাপী নয়।

দুর্ভাগ্য যদি ওকে নিদারুণতার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে থাকে, সে দোষ কি ওর? একটা মানুষকে যদি পঙ্কের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে সুন্দর জীবনের বৃন্তে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে প্রভাত, সে কাজে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে।

তবু মিথ্যা কৌশল অনেক করতে হলো বৈকি। প্রভাতকে কলকাতা থেকে বন্ধু মারফৎ 'মায়ের মারাত্মক অসুখ' বলে টেলিগ্রাম আনিয়ে ছুটি মঞ্জুর করতে হলো, আর মল্লিকাকে স্টেশনের ধারে টাঙা থেকে পড়ে গিয়ে 'পায়ের হাড় ভাঙতে' হলো।

অসহ্য যন্ত্রণার অভিনয়ে অবশ্য মল্লিকাও কম পারদর্শিতা দেখায়নি।

চ্যাটার্জি তাকে হিঁচড়ে টাঙায় তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জায়গাটা স্টেশন। অনেক লোকের ভিড়। তাদের পরামর্শের চাপে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ভাগ্নীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলো চ্যাটার্জিকে, আর 'ডাক্তার নেই, চারটের সময় আসবেন। রেখে যান'—নার্সের এই হুকুমও মানতেই হলো।

তারপর ?

উৎকোচের পথেও আসতে হয়েছে বৈকি। উৎকোচ আর ধরাধরি।

এই দুই পথেই তো অসাধ্যসাধন হয়।

এই তো জগতের সব সেরা পথ।

ট্রেনে চড়ে বসার পর আর ভয় করে না।

চ্যাটার্জি কি নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে ভাগ্নী খুঁজতে বেরোবে ?

আর পুলিশ ?

তার কাছে জবাব আছে।

মল্লিকা নাবালিকা নয়।

আর ততদিনে—পুলিশ যতদিনে খুঁজে পাবে, হয়তো রেজেষ্ট্রি করেই ফেলতে পারবে।

রেজেস্ট্রী ?

হ্যাঁ, ওটা চাই।

ওই তো রক্ষামন্ত্র। তারপর অনুষ্ঠানের বিয়েও হবে বৈকি। প্রভাত বলে, 'ওটা নইলে মন ওঠে না। সেই যে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি—'

মল্লিকাও তার স্বপ্নসাধের কথা বলে, 'জানো, ছেলেবেলায় এক পিসতুতো দিদির বিয়ে দেখেছিলাম, কেই থেকে সেইরকম 'কনে' হবার যে কী সাধই চেপে বসেছিল মনে, খেলাঘরে বিয়ে বিয়ে খেলতাম। কনে হয়ে ঘোমটা দিতাম। ঘোমটা খুলে অদৃশ্য অদেহী বরের দিকে চোখ তুলে তাকাতাম।'

'উঃ, ওইটুকু বয়সে কম পাকা তো ছিলে না ?'

প্রভাত হেসে ওঠে।

চলন্ত ট্রেনের কামরা।

জানলা দিয়ে হুহু করে দুরন্ত বাতাস আসছে, মল্লিকা গল্প করছে তার ছেলেবয়েসের দুরন্তপনার কথা।

কোনোরকমে গাছে চড়ে বসে থেকে মাকে নাজেহাল করতো। কেমন করে পারানির মাঝিদের সঙ্গে ভাব করে নৌকোয় চড়ে গঙ্গার এপার ওপার হতো।

হ্যাঁ, গঙ্গার তীরেই গ্রাম।

যোগের স্নানে লোক আসতো এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে। মল্লিকা সেই ভীড়ে মিশে মেলাতলায় ঘুরতো।

'আবার মার সঙ্গে মার কাজও করেছি বৈকি। ওই অতটুকু বেলাতেই করেছি। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়েছি। ছোট্ট কাচা শাড়ী পরে চন্দন ঘসেছি, ফুল তুলে রেখেছি।··· তারপর কোথা দিয়ে কী হলো, ফুলের বন থেকে গিয়ে পড়লাম পাঁকের গর্তে। স্বর্গ থেকে পড়লাম নরকে। ওর থেকে যে কোনোদিন উদ্ধার পাবো, সে আশা—'

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায় মল্লিকার। অশ্রুটলটল দুটি চোখে।

'আমার জীবন, যেন একটা গল্পের কাহিনী।'

মল্লিকা চেয়ে থাকে সুদূর আকাশের দিকে।

তা চ্যাটার্জির জীবনও একটা গল্পকথা বৈকি।

চাটুজ্যেবামুনের ঘরের ছেলে, বাপ সামান্য কি চাকরি করে, আবার যজমানীও করে। ছেলে ছোট থেকে উচ্ছন্নের পথে। নীচ জাতের ঘরে পড়ে থাকে, তাদের সঙ্গে তাড়ি খায়, গাঁজা খায়। বাপ বকেঝকে কাজ করতে বললে হি হি করে হাসে, আর বলে, 'বাগ্দীর ঘরের ভাত খেয়ে আমার তো জাতজন্মের বালাই নেই। ছুঁলে তোমার শালগেরামের জাত যাবে না?'

কিন্তু ছেলেবেলায় সেই দুষ্টুমি বয়েস হতেই পরিণত হলো কেউটে বিষে। একবার বাগ্দীদের হাতে মার খেয়ে হাড় ভেঙে ঘরে পড়ে রইলো তিন মাস, তখন বাপের কাছে দিব্যি গাললো, কান মললো, নাকে খৎ দিলো, আর সেরে উঠে মানুষ হয়েই একদিন রাতের অন্ধকারে গেল নিরুদ্দেশ হয়ে।

আর সেই রাত্রে বাগ্দীদের সেই বঙ্গিণী বৌটাও হলো হাওয়া। যার জন্যে মার খেয়ে হাড় ভাঙা।

তারপর বহু বহুকাল পাত্তা নেই, অবশেষে একদিন ভগ্নিপতিকে, অর্থাৎ মল্লিকার বাপকে, একটা চিঠি লিখে জানালো 'বেঁচে আছি, তবে এমন জড়িয়ে পড়েছি যে, যাওয়া অসম্ভব। ঠিকানা দিলাম, বাবা মরলে একটা খবর দিও। যতই হোক বামুনের ছেলে, নেহাৎ শুয়োর গরুটা আর খাবো না সে সময়।' ছেলে চলে যেতে মেয়ে-জামাইকে কাছে এনে রেখেছিল চাটুজ্যের বাপ।

তা বাপ মরতে দিয়েছিল চিঠি ভগ্নিপতি।

আর সেই খবর পেয়েই চাটুজ্যে গ্রামে চলে এসে বাপের ভাঙা ভিটেটুকু আর দু'পাঁচ বিঘে যা ধানজমি ছিল, বেচে দিয়ে বোন-ভগ্নিপতিকে উচ্ছেদ করে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করেছিল।

এসব কথা মল্লিকা তার মার মুখে শুনেছে। তখনও সে শিশু। তারপর তারও বাপ মরেছে। মা লোকের বাড়ী ধান ভেনে, বড়ি দিয়ে, কাজেকর্মে রেঁধে, দিন গুজরাণ করে মেয়েটাকে মানুষ করে তুলছিল। তা সে মাও মরলো। আর কেমন করে না জানি খবর পেয়ে মামা এসে ধরে নিয়ে গেল।

কে জানতো যে সেই তখন থেকেই মতলব ভাঁজছিল চাটুজ্যে।

'তখন তো বুঝিনি—' মল্লিকা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'মামার মুখে মধু, ভিতরে বিষ। মুখের মধুর মোহে তখন খুব ভালোবেসে ফেললাম। মনে হলো, মামার নামে যা কিছু নিন্দে শুনেছি সব বাজে। কিন্তু বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে—'

শিউরে ওঠে মল্লিকা। চুপ করে যায়।

প্রভাত ওর মুখের দিকে তাকায়।

সরল পবিত্র মুখ।

সত্যি, মানুষ কি এতই সস্তা জিনিস যে, সামান্য খুঁৎ হলেই তাকে বর্জন করতে হবে?

দুর পথে পাড়ি।

কত কথা, কত গল্প!

সেই বাগ্দীদের বৌটা?

সেটা নাকি আর কার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। মামা বলতো, 'আপদ গেছে। হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে আমার।' এখন আর কিছু নেই মামার, শুধু পয়সা আর পয়সা।

আচ্ছা, এর মাঝখানে লেখাপড়া শিখলো কখন মল্লিকা? এমন কায়দাদুরস্ত হলো কি করে?

তা তার জন্যে মামার কাছে ঋণী বৈকি!

যে উদ্দেশ্যেই হোক, মেম রেখে ইংরেজি শিখিয়েছে মামা, শিখিয়েছে চালচলন।

না, উদ্দেশ্যটা মহৎ নয়। যত অবাঙালী খদ্দেরদের জন্যে—তবু যে ভাবেই হোক মল্লিকা তো পেয়েছে কিছু!

বাংলা? সেটা সম্পূর্ণ নিজের আকুলতায় আর চেষ্টায়। পার্শেলে বই আনিয়ে আনিয়ে—

তাতে আপত্তি ছিল না মামার?

না। এদিকে যে আবার মল্লিকার তোয়াজ করতেন। বুঝতেন তো মল্লিকাই অর্ধেক আকর্ষণ। স্টেশনে একা গেলে লোক আসতে চায় না, মল্লিকা গেলে ঠিক বঁড়শি গেলে।

হ্যাঁ, ওখানে সব আছে।

মদ, জুয়া, ভেজাল, কালোবাজার! তারাই তো দামী খদ্দের! আর ওইজন্যেই তো পুলিশে অত ভয় চাটুজ্যের। পুলিশের লোক সন্দেহ হলেই—

'সব কথাই বলছি তোমায়, সব কথাই বলবো।' মল্লিকা বলে, 'প্রথম যেদিন তোমার ঘরে এসেছিলাম, সেদিন ঠকিয়েছিলাম তোমায়। অভিনয় করেছিলাম।'

'অভিনয়!'

আড়ষ্ট হয়ে তাকায় প্রভাত।

মল্লিকা মুখ তুলে বলে, 'হ্যাঁ অভিনয়! অভিনয় করতে করতেই তো বড় হয়েছি! মামার শিক্ষায় করেছি। আবার মামাকে ঠকাতেও করেছি। সেদিন গিয়েছিলাম মামার শিক্ষায় তোমার পকেট থেকে চিঠি চুরি করতে।'

চিঠি চুরি! পৃথিবীটা দুলে ওঠে প্রভাতের।

কিন্তু মল্লিকা অকম্পিত।

সে সব বলবে! তারপর প্রভাত তাকে দূর করে দিক, আর মুখ না দেখুক, তাও সইতে পারবে।

বলে, 'মরতে ইচ্ছে হতো মাঝে মাঝে। কিন্তু রূপ রস গন্ধ স্পর্শময়ী এই পৃথিবীর দিকে তাকাতে মনটা কেঁদে উঠতো! নিজের ওপর মায়ায় ভরে যেত মন। আর কল্পনা করতো, কবে কোনদিন আসবে তার ত্রাণকর্তা!'

আর তিনজন আশ্বাস দিয়েছিল!

'প্রথমবার এক বাঙালী মহিলা।'

মহিলা!

হ্যাঁ, একজন নার্স! স্বাস্থ্যান্বেষণে এসেছিলেন। বলেছিলেন, মল্লিকাকে নিয়ে যাবেন। তাকে সুস্থ জীবনের স্বাদ এনে দেবেন!

কিন্তু হঠাৎ একদিন মল্লিকাকে কিছু না বলে পালিয়ে গেলেন।

'তারপর আপনারই মত দু'জন যুবক। সহানুভূতি দেখিয়েছেন, উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন বলেছেন, যাবার সময় ভুলে গেছেন।'

'তার মানে, ওই আশা দিয়ে রেখে বিশেষ সুবিধে আদায় করে নিয়েছে!' প্রভাত রাগ করে বলে।

মল্লিকা মুখ তুলে বলে, 'পৃথিবীতে দেবতা আর ক'জন জন্মায়?'

প্রভাত তার হাতের ওপর একটা হাত রাখে, ঈষৎ চাপ দেয়। তারপর বলে, 'কিন্তু মনে আছে তো? তোমার মামা গরীব ব্রাহ্মণ! মামী হঠাৎ মারা যাওয়ায় অকূল পাথারে পড়েছেন। ছোট্ট একটি দোকান আছে, সেইটি ছেড়ে বাংলাদেশে এসে ভাগ্নীর জন্যে পাত্র খুঁজবেন, এমন অবস্থা নয়। দৈবক্রমে আমার সঙ্গে পরিচয়। আমি ব্যানার্জি শুনে, হাতে স্বর্গপ্রাপ্তি—'

হেসে ওঠে প্রভাত।

মল্লিকা বলে, 'ভুলে যাবো না।'

না, ভুলে গেল না তারা।

ওই গল্প দিয়ে ভোলালো বাড়ীর লোককে, আত্মীয়বর্গকে।

মা প্রথমটা কঠিন হয়ে গিয়েছিলেন বৈকি। কিন্তু মল্লিকার নম্রতা, মল্লিকার দুঃখগাথা, আর মল্লিকার রূপ এই তিন অস্ত্রে কাবু হয়ে যেতে দেরী হলো না তাঁর!

মামা চাটুজ্যে, বাপ মুখুজ্যে! এ মেয়েকে খুব অসম্ভ্রম করা যায় না।

তবু তল্লাস করতে ছাড়লেন না প্রভাতের মা। মল্লিকার বাপের দেশ রিষড়েয় খোঁজ করালেন—আঠারো বিশ বছর আগে সুরেশ মুখুজ্যে বলে কেউ ছিল কিনা।

ছিল! ছিল বৈকি!

তাদের জ্ঞাতি তো রয়েছে এখনও।

মা মরতে মেয়েটাকে মামা পাঞ্জাবে না ম্যাড্রাসে কোথায় যেন নিয়ে গিয়েছিল, সে তথ্যও পরিবেশন করলো কেউ কেউ!

মামাটার হাড়ির হাল হয়েছে?

হবেই তো!

বাপের ভিটেটুকু থেকে গরীব বোনকে উচ্ছেদ করে পয়সা করেছিল, সে পয়সা থাকে?

তা না থাক!

করুণাময়ীর শাস্তিটা তো থাকলো!

প্রভাতজননী করুণাময়ী নিশ্চিন্তচিত্তে বৌ বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন।

টালবাহানা করে ছুটি বাড়িয়ে নিয়েছে প্রভাত, উঠে পড়ে চেষ্টা করছে ফের বদলি হবার। মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করেছে ওই 'দেহাতি পাঞ্জাবী' জলহাওয়া সহ্য হচ্ছে না তার।

'আমার জন্যে কত জালা তোমার!'

মল্লিকা গভীর কালো চোখদুটি তুলে তাকায়।

আর কোনোদিন ওকে রূপসী মনে হয় না, মনে হয় লাবণ্যময়ী।

কাকিমা অবশ্য বিয়েতে আসেননি, নিজের গালে মুখে চড়িয়েছেন, আরও আগে কেন গেঁথে ফেলেননি বলে। আর শেষ আক্ষেপের কামড় দিয়েছে বড়জার কাছে চিঠিতে, তাঁর বোন ভগ্নিপতি কী পরিমাণ দানসামগ্রী, আর কী পরিমাণ নগদ গহনা দিতে প্রস্তুত, তার হিসেব দাখিল করে।

প্রভাত হাসে। মল্লিকার কাছে।

বলে, 'উঃ, ভাগ্যিস ওই দানসামগ্রী আর নগদের কবলে পড়ে যাইনি।'

ওদের হাওড়ার বাড়ীতে এখনও গ্রাম গ্রাম গন্ধ। ঘরে গৃহদেবতা, উঠোনে তুলসীমঞ্চ, রান্নাঘরে শুচিতার কড়া আইন।

তা ছাড়া গোহালে আছে গরু, পুকুরে আছে মাছ!

মল্লিকা বিভোর হয়, বিগলিত হয়।

এই তো ছিল স্বপ্ন!

ভাবে, ভগবান, আমার জন্যে এত রেখেছিলে তুমি!

প্রথম প্রথম সর্বদা একটা অশুচিতাবোধ তাকে সব কিছুতেই বাধা দিতো। শাশুড়ী ডাকতেন, 'বৌমা, আজ লক্ষ্মীপুজো, ঘরে-দোরে একটু আল্‌পনা দিতে হয়। পারবে তো? মেলেচ্ছ দেশে মানুষ, দেখনি তো এ সব। যাক, যা পারো দাও।'

মল্লিকা ভয়ে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। কিন্তু পারাটা তার যা 'পারার' মত হয় না। মনের জগতে ভেসে ওঠে শৈশবে-দেখা মায়ের হাতের কাজ। এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে আল্‌পনা দিতে ডাকতো মল্লিকার মাকে। ডাকসাইটে কর্মিষ্ঠে ছিলেন।

শাশুড়ী ডাকেন, 'বৌমা, একখানা সিল্কের শাড়ী টাড়ী কিছু জড়িয়ে আমার ঠাকুরঘরে একবার এসো তো, চন্দন ঘসে, ফুলকটায় একটু মালা গেঁথে দেবে।'

মল্লিকা কম্পিত চিত্তে ভাবে, এই মুহূর্তে ভয়ানক একটা কিছু হয় না তার!

হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কি ওই রকম কিছু?

শাশুড়ী ডাকেন 'কই গো বৌমা—'

ছুটে যাওয়া ভিন্ন গতি থাকে না।

ক্রমশঃ ভয় ভাঙে।

নিজেই এগিয়ে যায়। কিন্তু রাত্রে কাতরতায় ভেঙে পড়ে, 'আমার এতে পাপ হচ্ছে না?'

প্রভাত আদরে ডুবিয়ে দেয়। বলে, 'কী আশ্চর্য। পুণ্যি না হয়ে পাপ হবে? এসব তো পুণ্যকর্ম, বরং যদি কিছু পাপ থেকে থাকে, ধুয়ে মুছে যাবে। কিন্তু এখনো এত কাতর কেন তুমি মল্লিকা? আমি তো তোমায় বলেছি, স্বেচ্ছায় অন্যায় না করলে পাপ স্পর্শ করে না।'

ধীরে ধীরে বুঝি কেটে যায় সমস্ত গ্লানি। আর-একজন্মে জন্ম নেয় মল্লিকা। মন বদলেছে, দেহটাও বুঝি বদলাচ্ছে।

নখের আগায় নেল্ পলিশের বদলে হলুদের ছোপ, ঠোঁটে লিপস্টিকের বদলে পানের রাঙা, সুর্মাবিহীন চোখ নম্র কোমল। শাড়ী পরার ভঙ্গিমা বদলে ফেলেছে মল্লিকা, বদলেছে জামার গড়ন।

মল্লিকা আস্তে আস্তে তার মার মত হয়ে যাচ্ছে। পুণ্যবতী সতীমায়ের মত! যে মা তার খেটে খেয়েছে, কিন্তু সম্মান হারায়নি।

কিন্তু অনাবিল সুখ মানুষের জীবনে কতক্ষণ? প্রভাতের কাকার চিঠি আসে, 'বিয়ে তো আমরাও একদা করেছিলাম বাপু, কিন্তু এভাবে উচ্ছন্ন যাইনি। আর বেশী ছুটি নিলে চাকরীতেই ছুটি হয়ে যাবে। শীঘ্র চলে এসো। এবার একেবারে খোদ রাজধানী। তাছাড়া কোয়ার্টার্স পাওয়া যাবে।'

এখনো ভাইপোর জন্য কাকার দরদের পরিচয়ে কাকিমা বিরূপ, কিন্তু কাকা নিজ নীতিতে অটল আছেন।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মাকে দেখায় প্রভাত। মা বলেন, 'তা বটে। কিন্তু আমার যে অভ্যেস খারাপ করে দিলি বাবা! বৌমাটিকে ছেড়ে—'

প্রভাত বলে, 'উঃ মা! নিজের ছেলেটিকে ছেড়ে এতদিন থাকতে পারলে —'

মা হাসেন। বলেন, 'কী করবো। মেয়েটা বড় মায়াবিনী।'

'মায়াবিনী' শব্দের নতুন অর্থে হাসে প্রভাত।

আর মল্লিকাকে গিয়ে ক্ষ্যাপায়, 'ওগো মায়াবিনী, কী মায়া জানো।'

মল্লিকার চোখে কিন্তু শঙ্কা ঘনায়।

দিল্লী!

দিল্লী যে বাঘের গুহার তল্লাটে। মামাকে মাঝে মাঝেই আসতে হয় দিল্লীতে। 'মামার বেশীর ভাগ খদ্দের আসে দিল্লী থেকে।'

প্রভাত বলে, 'দিল্লী কত বড় শহর, কত তার লোকসংখ্যা। কে সন্ধান রাখবে, কোন কোয়ার্টার্সে সেই মিসেস ব্যানার্জি বাস করেন, যাঁর পুরনো নাম ছিল মল্লিকা।'

'না গো, আমার ভয় করছে!'

'তবে চাকরীবাকরী ছেড়েই দেওয়া যাক, কি বলো?'

'তাই দাও না গো।' মল্লিকা লুটিয়ে পড়ে। 'কলকাতায় একটা চাকরী জোগাড় করে নিতে পারবে না।'

'হয়তো পারি! কিন্তু লোকের কাছে 'পাগল' নাম কিনতে চাই না, বুঝলে? কেন ভয় পাচ্ছো?'

কিন্তু ভয়। ভয়! ভয় যে মল্লিকার স্নায়ুতে শিরাতে পরিব্যাপ্ত!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মল্লিকার ভয়ই জয়ী হয়।

লোকের কাছে 'পাগল' নামই কিনে বসে প্রভাত।

প্রভাতের দুই দাদা, যাঁরা বাড়ীর মধ্যেই আড়াল তুলে মায়ের সঙ্গে পৃথকান্ন হয়ে বাস করছেন, তাঁরা ছি ছি করেন, এবং পুরাণ উপপুরাণ থেকে সুরু করে আধুনিক ইতিহাস পর্যন্ত স্ত্রীর-বশ পুরুষের কী কী অধোগতি হয়েছে তার নজীর দেখান।

কাকা-সম্পর্ক ছেদ করেন, এবং পাড়া-প্রতিবেশী গালে হাত দেয়।

'দিল্লী' নামক ইন্দ্রপুরীর স্বর্গীয় চাকরী যে কেউ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়, এ লোকের ধারণার বাইরে।

শুধু করুণাময়ী।

করুণাময়ী ছোট ছেলের এই সুমতিতে পাঠবাড়ীতে হরিরলুট দিয়ে আসেন।

ধারেকাছে দুই ছেলে বৌ, কিন্তু করুণাময়ী থাকতেন বেচারীর মত। নিঃসহায় নিরভিভাবক। অথচ তেজ আছে ষোল-আনা, তাই পৃথকান্ন ছেলেদের সাহায্য নিতেন না। অসময়ে দরকার পড়লে, বরং পাড়ার লোকের কাছে জানাতেন, তো ছেলেদের নয়।

শাশুড়ীর এই অহঙ্কারে ছেলের বৌরাও ডেকে কথা কইতো না।

প্রভাত এসে পর্যন্ত করুণাময়ী একটা সহায় পেয়েছেন। তা ছাড়া ছোটবৌয়ের রূপগুণ। যেটা বড় মেজ বৌকে 'থ' করে দেবার মত। করুণাময়ীও একটা রাজত্বের অধিশ্বরী হয়েছিলেন। এই ক'মাস।

তবু মনের মধ্যে বাজছিল বিদায় রাগিনী! ফুরিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে এই আবুহোসেনের রাজ্যপাট! ফুরিয়ে যাবে সংসার করা!

ছুটি ফুরোলেই বৌ নিয়ে লম্বা দেবে প্রভাত, আর আবার দুই বৌয়ের দাপটের মাঝখানে পড়ে করুণাময়ীকে শুধু হরিনামের মালা সম্বল করে মানমর্যাদা বজায় রাখতে হবে।

কলকাতায় চাকুরী জোগাড় হয়।

প্রভাত এসে মাকে প্রণাম করে বলে, 'মাইনে অবশ্যি এখানে ও চাকরীর থেকে কম, কিন্তু ভবিষ্যৎ খারাপ নয়।'

করুণাময়ী আশীর্বাদের সঙ্গে অশ্রুজল মিশিয়ে বলেন, 'তা হোক। তা হোক। ঘরের ছেলে ঘরের ভাত খাবি, কী বা খরচ! আমি বলছি এই চাকুরীতেই তোর উন্নতি হবে।'

'তা হলে খুসি?'

'হ্যাঁ বাবা, খুব খুসি।'

ঘরে গিয়ে মল্লিকাকেও সেই প্রশ্ন করতে যায়। কিন্তু ঘরে পায় না মল্লিকাকে।

কোথায় সে?

রান্নাঘরে? ভাঁড়ার ঘরে? ঠাকুরঘরে? গোহালে?

না।

ছাতে উঠেছে মল্লিকা।

প্রভাত এসে আলশের ধারে বসে পড়ে। বলে, 'উঃ, খুব খাটালে। এই চূড়োয় উঠে বসে আছো যে?'

'খুঁজবে বলে।' মল্লিকা হাসে।

কিন্তু হাসিটা কেমন নিষ্প্রভ দেখায়।

'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আজ আমার জন্যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'ইস। সেইরকম বাড়ী কিনা!'

'আহা, বাড়ী মানে তো বড়বৌদি মেজবৌদি! ওঁদের নিন্দেয় কিছু এসে যায় না। যাক, খুসি তো?'

খুসি।

মল্লিকা অমন চমকে ওঠে কেন?

কেন বলে, 'কিসের খুসি?'

'বাঃ, চমৎকার। দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্কছেদের পাকা বনেদ গাঁথা হলো না? 'ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রির' কাজটা পেয়ে গেলাম না আজ।'

'ওমা! তাই বুঝি। সত্যি হলো?' মল্লিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রভাতের হঠাৎ মনে হয় মল্লিকার এই উচ্ছ্বাসটা যেন রঙ্গমঞ্চের অপটু অভিনেত্রীর 'শেখা ভঙ্গীর' মত।

ভুরু কুঁচকে বললো, 'কই, খুব খুসি তো মনে হচ্ছে না।'

মল্লিকা জোরে হেসে উঠলো, 'কী যে বলো। আমি বলে তোমাদের ঠাকুরের কাছে পুজো মেনেছিলাম, যাতে তোমার আগের চাকরীটা ঘোচে, এখান থেকে আর কোথাও যেতে না হয়।'

প্রভাত হাসে। বলে, 'আমাদের ঠাকুর নয়, তোমার ঠাকুর, সকলের ঠাকুর।'

মল্লিকা মাথা দুলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ গো মশাই, তাই।'

তবু প্রভাতের মনে হয় মার কাছে যে আন্তরিক অভিনন্দন পেলো, মল্লিকার কাছে যেন তেমন নয়।'

অথচ মল্লিকার জন্যেই তো—

এখানে টাকার অঙ্ক কম বলে?

কিন্তু তাই কি হতে পারে?

মল্লিকার দিল্লীর ভীতি তো দেখেছে সে।

তবে কেন তেমন খুসি হলো না মল্লিকা?

কিন্তু সত্যিই কি মল্লিকা খুসি হয়নি?

নিজেই সেকথা ভাবছে মল্লিকা।

খুসি খুসি, খুসিতে উপচে পড়া উচিত ছিল তো তার। কিন্তু তেমন হচ্ছে না কেন?

কেন হঠাৎ কেমন একটা শূন্যতাবোধ নিস্তেজ করে দিচ্ছে!

কেন মনে হচ্ছে কোথায় কী বুঝি একটা জমা ছিল তার, সেটা আর রইলো না।

কী সেই জমা?

কী সেই ফুরিয়ে যাওয়া?

কিন্তু ঘরকুনো প্রভাত বড় খুসিতে আছে।

হাওড়া থেকে বালি, অফিস থেকে বাড়ী। খাবার ঘর থেকে শোবার ঘর, মাঁর স্নেহচ্ছায়া থেকে স্ত্রীর অঞ্চলছায়া।

তাঁতির মাকুকে এর বেশী আর ছুটোছুটি করতে হয় না। আবাল্যের পরিবেশ মনকে সর্বদা সুধারসে সিক্ত করে রাখে, মাঝখানের বিদেশবাসের তিনটে বছর ছায়ার মত বিলীন হয়ে যায়।

এতদিনে বুঝি প্রভাত জীবনের মানে খুঁজে পায়।

কিন্তু মল্লিকা ক্রমশঃ জীবনের মানে হারাচ্ছে কেন? মল্লিকা কেন ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে? স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে?

হয়তো বা মাঝে মাঝে একটু রুক্ষও।

ছকে-বাঁধা সংসারের সুনিপুণ ছন্দের মধ্যে ও কি আর স্বাদ খুঁজে পাচ্ছে না? ভোর থেকে সুরু করে রাত্রি পর্যন্ত গৃহস্থালীর কাজগুলির ভার পেয়ে যে সে প্রতিমুহূর্তে কৃতার্থ হয়েছে। বিগলিত হয়েছে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে, লক্ষ্মীর ঘরে ধূপ ধুনো দিতে, পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের জন্যে মালা গাঁথতে, চন্দন ঘসতে।

সেই কৃতার্থমন্যতা কোথায় গেল?

কাজগুলো যান্ত্রিক হয়ে উঠছে কেন?

সংসারী গৃহস্থের মূর্তপ্রতীক প্রভাত। সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে অসময়ের ফুলকপির জোড়া হাতে ঝুলিয়ে, ভাবতে ভাবতে আসছে মাকে বলবে, 'মা, দুটোই যেন তুমি চিংড়িমাছ দিয়ে রেঁধে শেষ করে দিয়ো না। তোমার নিরিমিষ ঘরে রাঁধবে একটা—'

মনটা আনন্দে ভাসছে সিনেমার টিকিট কাটা আছে দু'জনের। মল্লিকা যেন একটু মনমরা হয়ে গেছে। ছেলেমানুষ, একটু আমোদ আহ্লাদের দরকার আছে বৈকি।

ভাবছে বলবে, 'মল্লিকা, তোমার সেই ফুলশয্যার শাড়ীটা পরো আজ। খোঁপায় দাও রজনীগন্ধার মালা—'

বাড়ীর কাছে এসে থমকে দাঁড়ান।

ওপাশে মল্লিকার জানলার নীচে কে একটা লোক দাঁড়িয়ে। কিন্তু চকিত ছায়া। মুহূর্তে বাগানের দিকে কোন পথে যেন মিলিয়ে গেল লোকটা।

জানলা দিয়ে উঁকি মারছিল কী উদ্দেশ্যে ?

কিছু চুরিটুরি করে পালালে না তো ?

তাড়াতাড়ি এসে বাড়ী ঢুকে ডাকলো, 'মা।'

মল্লিকা দালানের এদিক থেকে এসে দাঁড়ালো।

বললে, 'মা পাঠবাড়ী গেছেন।'

'ওঃ আজ সোমবার। কিন্তু তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?'

মল্লিকা অচঞ্চল কণ্ঠে বলে, 'এইতো এখানে, কেন ?'

'আর কেন। নির্ঘাৎ একটা কিছু গেছে। জানলার কাছে তোমার শাড়ীটাড়ী কিছু ছিল ?' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে যায় প্রভাত, বলে, 'জানলার নীচে একটা লোক দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল মনে হলো, আমি আসবার আগেই সাঁ করে চলে গেল।'

মল্লিকা বলে, 'কই, জানলার কাছে তো কিছু ছিল না।'

'যাক। ছিল না তাই রক্ষে। ছিঁচকে চোরদের জানো না। জানলায় আঁকশি দিয়ে জিনিস বার করে নেয়। ঘরে যখন থাকবে না, বাগানের দিকের জানলাটা বন্ধ করে রেখো।'

হ্যাঁ বাগানের দিকের জানলাটা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় প্রভাত স্ত্রীকে।

কিন্তু জানলা কি শুধু ঘরেই থাকে ?

আর সেইটা আটকাতে পারলেই সব নিরাপদ ?

'মা বলেছেন আমরা যেন দরজায় চাবি লাগিয়ে মেজদির কাছে চাবিটা রেখে চলে যাই।'

মল্লিকা বলে, 'পাঠবাড়ীতে কীর্তন না কি আছে।'

'কীর্তন।'

প্রভাত হাসে, 'মার ওই রোগ। কোথাও কীর্তন হলে আর মা—'

'হ্যাঁ।' মল্লিকা হাসে, 'আমায় বলছিলেন, 'সিনেমা দেখে কি হয়, কীর্তন শোনার আনন্দ আছে, পুণ্যি আছে।'

প্রভাতও হাসে। বলে, 'যার যাতে আনন্দ।'

ফুলশয্যার শাড়ীর কথা তোলবার আগেই অপরূপ সাজসজ্জায় ঝলমলিয়ে আসে মল্লিকা।

পাতলা জরিদার শাড়ী।

জরি-জড়ানো লম্বা বেণী।

ঠোঁটে গাঢ় রক্তিমা, নখে রঙের পালিশ। গালেও বুঝি একটু কৃত্রিম রঙের ছোঁয়াচ। সুর্মাটানা চোখে কেমন একটু বিলোল কটাক্ষ হেনে বলে, 'কেমন দেখাচ্ছে ?'

প্রভাত হাসে, আর বলে, 'বড্ড বেশী রূপসী। একটু যেন ভয় ভয় করছে।'

কিন্তু প্রভাতের সেই তুচ্ছ কৌতুকের কথাটুকু কি কোনও ক্রূর ভাগ্যদেবতাকে নিষ্ঠুর কৌতুকের প্রেরণা দিল ? তাই ভয় এলো ভয়ঙ্কর মূর্তিতে।

সিনেমা হল থেকে প্রভাতের বাড়ী ফিরতে এই পথটা একটু গা ছমছমে বটে। এরই আশেপাশে নাকি হাওড়ার বিখ্যাত গুণ্ডা পাড়া।

কিন্তু সন্ধ্যার শোতে সিনেমা দেখে তো কতবার ফিরেছে প্রভাত আর প্রভাতের পাড়ার লোকেরা।

ছদিন আগেও লাস্ট শোর ছবি দেখে এসেছে প্রভাতের মেজদা মেজবৌদি—

তবু পাড়ার লোক আর জ্ঞাতিগুষ্টি ধিক্কার আর ব্যঙ্গের স্রোত বহালো।

'হবেই তো! সুন্দরী রূপসী বৌকে সঙ্গে করে রাত নটায় গুণ্ডাপাড়া দিয়ে…ছি ছি, এত

কায়দাও হয়েছে একালের ছেলেদের !···হলো তো, বৌকে চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল, ভ্যাকা হয়ে দেখলি তো দাঁড়িয়ে ? · হ্যাঁ, তবু রক্ষে যে তোকে খুন করে রাস্তায় শুইয়ে রেখে যায়নি। ··

আবার একথাও বললো, 'পাড়া কি এত নিশুতি হয়ে গিয়েছিল সত্যি, যে অতবড় কাণ্ডটা কারুর চোখে পড়লো না, অতখানি চেঁচামেচি কারুর কানে গেল না ?···ভয়ানক একটা চেঁচামেচি ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে নিশ্চয়ই।'

চেঁচামেচি, ধ্বস্তাধ্বস্তি ?

হ্যাঁ, পুলিশকে তাই বলতে হয়েছে বৈকি।

বলতে হয়েছে একসঙ্গে চার পাঁচজন গুণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ে--

কিন্তু প্রভাত তো জানে একটাই মাত্র লোক। যে লোকটা একখানা ছোট গাড়ী নিয়ে পথের একধারে চুপ করে বসেছিল চালকের আসনে, গাড়ীর দরজা খুলে। স্পষ্ট শাদা চোখে দেখেছে প্রভাত, সেই খোলা দরজা দিয়ে ঝপ করে ঢুকে পড়েছে মল্লিকা।

আর প্রভাত ?

প্রভাত তো তখন রাস্তার ওপারে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রঙিন মশলা দিয়ে মিঠে পান সাজাচ্ছিল। হঠাৎ যে মল্লিকার রঙিন মশলা দেওয়া মিঠে পান খাবার ইচ্ছে হয়েছিল।

গাড়ীর নম্বর ?

না, সে আর দেখবার অবকাশ হয়নি প্রভাতের। গাড়ীর পিছনে বৃথা ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল। কিন্তু চালকের মুখটা দেখা হয়ে গিয়েছিল তার পাশের দোকানের আলোতে ?

চিনতে পেরেছিল বৈকি।

ওর সঙ্গে কতগুলো দিন একটা জিপের মধ্যে গায়ে গায়ে বসে কত মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়েছে প্রভাত।

বৌ হারিয়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না।

পুলিশ কেস করতে হচ্ছে বৈকি।

হাওড়া অঞ্চলের অনেক গুণ্ডাকেই দেখতে যেতে হচ্ছে প্রভাতকে, সনাক্ত করতে। কিন্তু কই ? সেই চার পাঁচটা লোককে তো—নাঃ। তাদের বার করতে পারছে না পুলিশ।

হাওড়া অঞ্চলে দুর্বৃত্তের অত্যাচারের একটা খবর খবরের কাগজেও ঠাঁই পেয়েছে বৈকি। তাও আর আজকাল কেউ তাকিয়ে দেখে না।

কেউ লক্ষ্য করেনি।

কিন্তু কে কত লক্ষ্য করে ?

কত লোকই তো হেঁটে গেছে এ পথে ? টুকরো ওই কাগজটুকু তো তাদের কারো চোখে পড়েনি। আশ্চর্য ! পড়তে প্রভাতের চোখেই পড়ল। কিছু না, শুধু একটুকরো কাগজে প্রভাতের বাড়ীর নির্ভুল ঠিকানা লেখা।

হাতের লেখাটা প্রভাতের চেনা।

মল্লিকার অনেক লেখাই তো দেখেছে সে এই দীর্ঘ সময়টার মধ্যে।